

তাফসীরে তাবারী শরীফ

প্রথম খণ্ড



আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ
ইব্‌ন জারীর তাবারী (রহ.)



তাফসীরে তাবারী শরীফ

প্রথম খণ্ড

আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী
রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে তাবারী শরীফ
(প্রথম খণ্ড)
তাফসীরে তাবারী শরীফ প্রকল্প

প্রকাশকাল ঃ

ভাদ্র ঃ ১৪০০
রবীউল আউয়াল ঃ ১৪১৩
সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৯৩

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১১৭
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭৩৯
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0105-9

প্রকাশক

পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

বাঁধাইয়ে

আল-আমীন বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ রফিকুল ইসলাম

মূল্য ঃ ৪৮০

TAFSIR-E-TABARI SHARIF (1st Volume) (Commentary on the Holy Quran) Written by Allama Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari (Rh.) in Arabic, translated into Bengali under the supervision of the Editorial Board of Tabari Sharif and published by Director, Translation and Compilation Section, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka--1000. September 1993

আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামগণের প্রতি।

মানবজীবনকে কুরআন মজীদের ছাঁচে গঠন করার জন্য প্রথমে কুরআন বুঝা প্রয়োজন। মাতৃভাষায় কুরআন মজীদকে বুঝার জন্য প্রায় শতাব্দী কালেরও অধিক সময় ধরে বাংলা ভাষায় তার তরজমা ও তাফসীর প্রণয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মুসলিম জগতে সমাদৃত প্রামাণিক তাফসীরগুলোর পর্যায়ক্রমে বংগানুবাদ প্রকাশের এক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীরে তাবারী আমাদের তাফসীর প্রকল্পের অন্যতম প্রকল্প। এ তাফসীরখানা ইসলামের প্রাথমিক যুগের জগদ্বিখ্যাত এক প্রামাণ্য তাফসীর। এর প্রণেতা আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র)।

কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহার করায় প্রায় সাড়ে এগার'শ বছরের সুপ্রাচীন এ তাফসীরখানা মুসলিম জাহানে বিশেষভাবে সমাদৃত। তত্ত্ব ও তথ্যের বিশুদ্ধতার কারণে পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিত ও গবেষকগণও তাফসীরখানার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে গ্রেট বৃটেনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাফসীরখানার প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে। এতে গ্রন্থখানির প্রতি তাঁদের প্রবল অনুরাগ প্রকাশ পায়।

খ্যাতনামা মুফাসসিরগণ সমন্বয়ে একটি সম্পদনা পরিষদ-এর তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট আলিমবৃন্দ তাফসীরখানার বাংলা তরজমা করেছেন। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ্ তাআলার শোকরগোজারী করছি। আশা করি, এভাবে এর বাকী খণ্ডগুলোও সুধী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে আমরা সক্ষম হবো ইন্‌শাআল্লাহ্। তদসংগে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি এর অনুবাদকবৃন্দ ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে মুবারকবাদ জানাই। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ এর প্রকাশনায় যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকেও মুবারকবাদ জানাই।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে কুরআনী যিন্দিগী যাপনের তাওফীক দিন এবং আল্লামা তাবারীকে জান্নাতে সুমহান মর্যাদা দান করুন এ মুনাজাত করি। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মোঃ শফিউদ্দিন
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ভাদ্র, ১৪০০ সাল
সফর, ১৪১৩ হিজরী

প্রকাশকের কথা

আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ–এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রথম খণ্ডের বংগানুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে জানাই সীমাহীন শুক্‌রিয়া।

বাংলাদেশ সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে এ তাফসীরখানা প্রথম থেকে তিন খণ্ড বংগানুবাদ প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যে এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলেও নানা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা হেতু প্রথম খণ্ডখানি প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এজন্য পাঠকবৃন্দের অসুবিধার কথা স্মরণ করে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

তাফসীরে তাবারীর অনুবাদ পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌ পাক আমাদের শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবূল করুন এ মুনাজাত করি।

নির্ভুলভাবে কিতাবখানি প্রকাশ করার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও এতে ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ রকম কোন ত্রুটি সুধী পাঠক আমাদের জানালে আমরা ইন্‌শাআল্লাহ্‌ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝা ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মদ লুতফুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০
ফোন ঃ ২৩১৩৯৬

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
ডঃ এ,বি,এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	ঐ
মাওলানা মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন	ঐ
মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হক	ঐ
জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য সচিব

অনুবাদক মণ্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
২. মাওলানা ইসহাক ফরিদী
৩. মাওলানা মোজাম্মেল হক
৪. মাওলানা আ.ন.ম রূহুল আমীন চৌধুরী
৫. মাওলানা বুরহান উদ্দীন
৬. মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল
৭. মাওলানা বশীর উদ্দীন
৮. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিশ্বমানবের হিদায়াতের জন্য রহমাতুল্লিল আলামীন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারীরূপে কুরআন করীম ও ফুরকানে হামীদ নাযিল করেন। এই মহাগ্রন্থ বিশ্বমানবকে সত্য-সুন্দর পথের দিশা দেয় এবং সার্বিক কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের মহান শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ মহাগ্রন্থ দিয়েছে সঠিক পথের নির্দেশনা। কুরআন মজীদের শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দুনিয়ার যেখানে যতদূর বিস্তার লাভ করেছে, শান্তি ও সুখের আলোকচ্ছটায় সেসব এলাকা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বমানবের প্রতি তাঁর পরম করুণার নিদর্শনস্বরূপ কুরআন করীম নাযিল করেছেন। সেজন্য তাঁর মহান দরবারে লক্ষ কোটি সিজদায়ে শোকরানা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম, যিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছরের বিরামহীন নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দ্বারা এ মহাগ্রন্থের সকল শিক্ষাকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছেন এবং কুরআনী যিন্দিগীর নমুনা স্থাপন করেছেন।

কুরআন মজীদ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর কালাম। তার ভাব ও ভাষা, শব্দ ও অর্থ সবই তাঁর নিজস্ব। কুরআন মজীদ ফেরেশতা-শ্রেষ্ঠ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নাযিল হয়। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা করা অতি কঠিন কাজ। কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা কুরআন শরীফের ভেতরই রয়েছে। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট অন্য আয়াতে পাওয়া যায়। আবার হাদীস শরীফেও অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরামের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতেও কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা দান করেছেন। সাহাবা কিরামের আমলেও কিছু সাহাবী কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। এমনিভাবে তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের যুগ পারি দিয়ে এখন পর্যন্ত এই ব্যাখ্যা বা তাফসীরের কাজ অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা ভাষায় যুগে যুগে মুফাস্সির বা ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ তাঁদের সারা জীবনের সাধনায় এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ কুরআন মজীদের ভাষাকে আপন করে এবং মাতৃভাষায় তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআন মজীদের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীরের ইতিহাস সুপ্রাচীন নয়। বিস্তারিত ও মৌলিক তাফসীর প্রণয়নের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক। আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমতে এই অধম জাতির সামনে বাংলা ভাষায় তাফসীরে নূরুল কুরআন নামে একখানা মৌলিক, প্রমাণ্য ও বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছে। তাফসীরে নূরুল কুরআন ইনশাআল্লাহ্ ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। আলহামদু লিল্লাহ্, ইতিমধ্যে ১৭ (১৭ পারা) খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, গত সোয়া শ' বছর যাবত মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা প্রকাশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু সর্বাংগীন সার্থক এবং সুন্দর অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন তাফসীরকারই পূর্ণ তাফসীর প্রকাশে সক্ষম হননি। অবশ্য উর্দূ ভাষায় রচিত কিছু তাফসীরের বাংলা অনুবাদ হয়েছে।

'তাফসীরে তাবারী' ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিশাল তাফসীর। এটি মধ্যযুগীয় প্রচলিত আরবী ভাষায় রচিত। এর রচয়িতা তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। এতে তিনি কুরআন মজীদের প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ একটি ব্যতিক্রমধর্মী নির্ভরযোগ্য তাফসীর। এই তাফসীর গ্রন্থখানা তৎকালীন প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রণীত হয়েছিলো। এর পূর্ণ নাম "আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন", সংক্ষেপে "তফসীরে তাবারী" নামে সমধিক পরিচিত।

এই তাফসীরের বাংলায় রূপান্তর নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এই কঠিন কাজটি হাতে নিয়ে এক মহৎ উদ্যমের পরিচয় দিয়েছে। এই কাজটি সম্পাদনার জন্য একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়। যাঁরা অনুবাদের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরাও এক বিশাল কাজ করেছেন। কেননা পূর্বেই বলেছি, এ কাজ সহজসাধ্য নয়।

অনুবাদকর্মকে ঢেলে সাজানো সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব। তাঁরা দায়িত্ব সচেতন থেকে নিয়মিত কর্মরত আছেন। কাজটি দুরূহ। বাস্তবক্ষেত্রে না আসা পর্যন্ত এই বিষয়ে সঠিক ধারণা করাও সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থে দেশের জ্ঞানী-গুণী সবার নিকট আমরা দোআপ্রার্থী।

আল্লাহ্ তাআলা জাল্লা শানুহুর মহান দরবারে মুনাজাত করি, তিনি যেন এ মহতি উদ্যোগকে কবূল করেন এবং একাজকে আমাদের সকলের নাজাতের ওসিলা করেন। আরো দুআ করি, বাংলা ভাষাভাষী সবাই যেন আগ্রহ সহকারে এ কিতাব পাঠ করে নিজেদের জীবনে জান্নাতের অমিয় সুধা লাভ করতে পারেন।

আমীন! সুম্মা আমীন!!

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ২২৪/২২৫ হিজরী মুতাবিক ৮৩৮/৮৩৯ খৃষ্টাব্দে অষ্টম আব্বাসী খলীফা মুতাসিম বিল্লাহ্‌র শাসনামলে ইরানের কাস্পিয়াস সাগরের তীরবর্তী পাহাড়ঘেরা তাবারিস্তানের আমূল শহরে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জারীর, দাদার নাম ইয়াযীদ, পরদাদার নাম কাছীর এবং তিনি গালিবের পুত্র। তাবারিস্তানের অধিবাসী হিসেবে পরিচয়সূচক 'তাবারী' শব্দটি তাঁর নামের শেষে সংযোজন করা হয়েছে। ইমাম তাবারী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআনুল করীম মুখস্ত করেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানের ইতিহাস তিনি ছেলেবেলায় স্বগৃহে অবস্থানকালেই অধ্যয়ন করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কাজেই নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই তিনি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে যাতায়াত করতে থাকেন। প্রথমত রায় এবং তার নিকটস্থ শহরসমূহে সফর করেন। তারপর হযরত ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট হাদীস শরীফ অধ্যয়নের জন্য বাগদাদ গমন করেন। তিনি বাগদাদে পৌছার মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই হযরত ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন। অবশেষে তিনি বসরা ও কুফাতে কিছুকাল অবস্থানের পর আবার বাগদাদ ফিরে আসেন। বাগদাদে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি মিসরে চলে যান। মিসরের পথে সিরিয়ার বিভিন্ন শহরেও তিনি কিছুদিন অবস্থান করে হাদীসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মিসরে অবস্থানকালেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পুনরায় বাগদাদে ফিরে জীবনের শেষ দিনগুলোতে সেখানেই অবস্থান করেন। বাগদাদ থেকে জন্মভূমি তাবারিস্তানে তিনি দুইবার মাত্র স্বল্পকালীন সফরে গিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাগদাদে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তর্কবিদ্যা ও ভূতত্ত্বে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি মক্কা মুয়াযযামাতে কয়েক বছর অবস্থান করে কুরআন মজীদের বিশদ তাফসীর ও হাদীস অধ্যয়ন করেন। পরে মিসর সফর করেন। সফরের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন স্থানের খ্যাতিমান পণ্ডিতগণের সাহচর্যে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করা। কুরআন মজীদের তাফসীর, হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসের তথ্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনে তাঁর

সুকঠিন সাধনার কথা জগতে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর অদম্য জ্ঞানস্পৃহার জন্য তাঁকে জীবনে বহু দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহুদিন তাঁকে অর্ধাহারে-অনাহারে কাটাতে হয়েছে। এক সময় পর পর কয়দিন অনাহারে অতিবাহিত করার পর নিজের জামার হাতা বিক্রি করেও জঠরজ্বালা নিবৃত্ত করতে হয়েছে।

প্রথমত তিনি আরব ও মুসলিম বিশ্বের মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী সময় অধ্যাপনা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারও নিকট থেকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য, এমনকি সরকারী উচ্চ পদমর্যাদা লাভের সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণে সম্মত হননি। তাঁর সৃজনশীল এবং বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল তাঁর অমর গ্রন্থসমূহে। কিরাআত (কুরআন পাঠ পদ্ধতি), তাফসীর, ফিক্‌হ, ইতিহাস, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন।

মিসর থেকে ফেরার পর প্রায় দশ বছর কাল তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। এক পর্যায়ে তাঁর চিন্তাধারা থেকে "জারীরিয়া মাযহাব" নামে একটি মাযহাব বিকশিত হয়। তাঁর পিতার নামে এই নামকরণ হয়েছিল। সামান্য কয়েকটি মাসআলা ব্যতীত শাফিঈ মাযহাবের সাথে এ মাযহাবের তেমন কোন মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই জারীরিয়া মাযহাবের বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তী কালে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হানাফী মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

ইসলামের ইতিহাসে আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সিরুল কুরআন এবং ইতিহাসবেত্তা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাঁরা মানবে-তিহাস রচনা করে গেছেন, তাঁদের অগ্রপথিক ছিলেন ইমাম তাবারী (র)। যুগের প্রভাব সম্যক-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার বাস্তব জ্ঞান এবং যুগ-প্রভাবে জীবনধারার ক্রমগতিকে বিবর্তনের ধারায় অনুভব করার গভীর অন্তরদৃষ্টি নিয়েই তিনি তাঁর অমর কীর্তি ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত কুরআন মজীদের তাফসীর এবং পনের খণ্ডে প্রকাশিত মানবজাতির ইতিহাস রচনা করেন। তিনি মানবে-তিহাসকে কুরআন মজীদে বর্ণিত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার সাথে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থের নাম রেখেছেন "আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন" (الجامع البيان فى تفسير القران) এবং ইতিহাস গ্রন্থের নাম রেখেছেন "আখবারুর রুসুল ওয়াল মুলূক" (اخبار الرسل والملوك)। তিনি তাঁর মাযহাবের সমর্থনে কিছু কিতাবাদি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। মোটামুটিভাবে তাফসীর আর ইতিহাস প্রণয়নেই তাঁর সারা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তাফসীর প্রণয়নে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি ও সুদূরপ্রসারী অন্তরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের লেখক ও

পণ্ডিতগণের মাঝে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অধ্যবসায় সুবিদিত। তাঁর মনন–শীলতা, একাগ্রতা, বাকসমৃদ্ধি, বাচনভঙ্গি ও বর্ণনাশৈলী অন্যনসাধারণ, বিস্ময়কর ও প্রশংসার দাবিদার। এ সবের বিচারে তিনি সবার শীর্ষে। তাঁর তাফসীর ও ইতিহাস পাঠে মনোযোগ দিলে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি আজীবন কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সত্যিকার জ্ঞানের অনুশীলনে তাঁর জীবনকে কিভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি একাধারে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত দৈনিক চল্লিশ পাতা করে মৌলিক রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। মূলত তিনি ইতিহাস রচনা করেছিলেন একশত পঞ্চাশ খণ্ডে। ছাত্রগণ তা অধ্যয়নে অক্ষমতা প্রকাশ করায় তিনি দুঃখিত হন এবং অতিশয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধার্থে মাত্র পনের খণ্ডে তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। তার দ্বারাই বুঝা যায়, হযরত ইমাম আবূ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা কতো বিস্তৃত ও বিশদ ছিলো এবং তাঁর জ্ঞানের বিশলতা কতো প্রসারিত ছিলো। আরবী ভাষায় তাঁর আগে কেউ এতো বড় বিশাল ইতিহাস রচনা করেনি। তিনি সৃষ্টির আদিকাল থেকে হিজরী সনকে কেন্দ্র করে কালানুক্রমিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি ৩০২ হিজরী/৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সত্য তত্ত্ব উদ্ধার ও সঠিক তথ্য বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষ হাতের তুলনা মেলে না। পরবর্তী কালে তাঁর অনুসরণে বিখ্যাত ঐতিহাসিক, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক মিসকাওয়াহ্ (র) (ওফাত ১০৩০ খৃ.), ইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর (র) (জীবনকাল ১১৬০ খৃ.–১২৩৪ খৃ.) ও যাহাবী (র) (জীবনকাল ১২৭৪–১৩৪৮ খৃ.) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। আল্লামা ইবনুল আছীর (র) তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "আল–কামিল ফিত্–তারীখ" (চূড়ান্ত ইতিবৃত্ত) ইমাম আবূ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুবৃহৎ ইতিহাসকে সংক্ষেপ করে ১২৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পর্যালোচনা করেছেন। তাফসীর, ইতিহাস উভয় গ্রন্থ রচনায় ইমাম আবূ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসের ইসনাদের (বর্ণনা সূত্রের) খেয়াল রেখেছেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) (ওফাত ১৫১ হিজরী), কালবী (র), ওয়াকিদী (র) (ওফাত ৩১০ হিজরী), ইব্‌ন সাদ (র), ইবনুল মুকাফফা (র) প্রমুখের গ্রন্থসমূহ থেকে তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে নানা দেশ সফর করে তিনি অনেক গাথা ও কাহিনী থেকে ইতিহাসের মাল–মসলা, তথ্য ও উপাদান যোগাড় করেছেন। কুরআন মজীদের সুবিশাল তাফসীর প্রণয়নের জন্যই তিনি সারা বিশ্ব জগতের শ্রদ্ধা কুড়াতে সমর্থ হয়েছেন। ১৩৩১ হিজরী সনে মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে তাঁর সুবিশাল তাফসীর ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 'তারীখুর রিজাল' নামে তিনি মহৎ ব্যক্তি–গণের জীবনেতিহাস এবং 'তাহযীবুল আছার' নামে হাদীসের একটি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন।

কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহার করায় মুসলিম জাহানে তাঁর তাফসীর বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী তাফসীরকারগণ তাঁর তাফসীর

থেকেই বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মতানুসারেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তাঁর সুবিশাল তাফসীরখানাই তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুধী ও চিন্তানায়কের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ আজো তাঁর গ্রন্থাদি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ এবং তাত্ত্বিক সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাফসীরে তাবারীর প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রকাশনা উৎসবে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাভাষীগণের ন্যায় বাংলা ভাষাভাষীগণও এই জগদ্বিখ্যাত তাফসীরের বাংলা তরজমার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ জাতির সেই চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যেই দেশের স্বনামখ্যাত বিজ্ঞ উলামায় কিরামের দ্বারা তার তরজমা ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিয়ে জাতিকে কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে।

প্রায় ১১শ' বছর আগে ৩১০ হিজরী মুতাবিক ৯২৩ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ আব্বাসী খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্র আমলে মুসলিম জাহানের এ অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ইমাম বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মানবজাতির ইতিহাস জ্ঞাত এক বিজ্ঞ ঐতিহাসিক ছিলেন।" আবুল লাইছ ইব্ন জুরায়জ রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিক্হ শাস্ত্রের মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যেমন ইল্মে কিরাআত, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ ও ইতিহাস।"

ইব্ন খাল্লিকান (র), শায়খ আবূ ইসহাক শীরাজী (র), আস–সুবকী (র), হাফিয আহমাদ ইব্ন আলী সুলায়মানী (র), ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র), ইমাম নববী (র), ইব্ন তাইমিয়াহ (র), আবূ হামিদ আল–ফারাইদী (র), মুকাতিল (র), কাল্বী (র), ইবনে খুযায়মা (র) প্রমুখ মুসলিম পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিজ্ঞজনের মতে ইমাম আবূ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইল্মে তাফসীর ও ইসলামের ইতিহাসের জনক। তিনি ছিলেন এক অনন্য ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব।

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে বহু সংখ্যক হাদীস উধৃত করেছেন। তিনি প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত মারফূ হাদীছই তাঁর নিকট সম্পূর্ণ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের অভিমতকে তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কুরআন মজীদে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে তিনি সে যুগের আরবী সাহিত্যের নিরিখে বিশ্লেষণ

করেছেন। কোন্ শব্দ কোন্ সময় কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও তিনি আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে দুইটি বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন ঃ (১) প্রামাণ্য হাদীসের উদ্ধৃতি ও (২) পাঠরীতি সম্পর্কে কুফা ও বসরার আরবী ব্যাকরণবিদগণের মতামত।

তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহাবায় কিরামের মতামত বর্ণনা করেছেন, বিশেষত হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাবিঈগণের মতামতও উদ্ধৃত করেছেন। বসরার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত আবূ উবায়দা (ওফাত ২০১ হি./ ৮২৪ খৃ.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রণীত তাফসীর 'মাজাজুল কুরআন' অতি প্রাচীন ও বিশুদ্ধ। কুফার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত 'আল্–ফাররাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রসিদ্ধ তাফসীর 'মাআনিউল–কুরআন' প্রণয়ন করেন।

তৃতীয় যে বিষয়ে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে সন্নিবেশিত করেছেন, তা হলো কুরআন মজীদের বিভিন্ন পাঠ–পদ্ধতি। এ বিষয়ে তিনি 'কিতাবুল্ কিরাআত' নামে আলাদাভাবে কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তিনি 'তাফসীর' ও 'কিরাআত–কে দুইটি আলাদা বিষয়রূপে গণ্য করেছেন।

তিনি সংগৃহীত সকল হাদীসই অবিকল বর্ণনা করেছেন। তাতে পরবর্তী কালে এসব হাদীছের বরাত দিতে কোন তাফসীরকার ও ব্যাখ্যাকারের কষ্ট করতে হয়নি। তাঁরা ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনাকে প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ ইমাম আবূ হামিদ আল–ফারাইদী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সে যুগে বাগদাদ ছিলো শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। বাগদাদের মসজিদে ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান–সমূহে সুচারুরূপে শিক্ষা দেয়া হতো। সারা বিশ্বের জ্ঞান–পিপাসু মানুষ এখানে বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান শিক্ষকগণের নিকট পড়াশোনা করতে আসেন। তাঁরা সংখ্যায়ও ছিলেন অনেক।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন ইমামের যুগ থেকেই তাফসীর চর্চা শুরু হয়। ইমাম তাবারী খুলাফায়ে রাশিদীনের ও হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে উধৃতি দিয়েছেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এ ব্যাপারে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা রাদিআল্লাহ তাআলা আনহা তাঁর ফুফু ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের যথেষ্ট সুযোগ পান। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইল্‌মের তরক্কীর জন্য এবং কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দানের জন্য দুআ

করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তিনি ১৩/১৫ বছরের কিশোর ছিলেন। যেসব কথাবার্তা ও কার্যকলাপ তাঁর জানা ছিল না, তা তিনি প্রবীণ সাহাবায় কিরামের নিকট থেকে নেবার জন্য তাঁদের খিদমতে হাজির হতেন। তাঁকে 'হিবরুল উম্মাত' (উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) উপাদিতে ভূষিত করা হয়। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'বাহ্রুল-উলুম' (বিদ্যাসাগর বা জ্ঞানের সমুদ্র)-ও বলা হয়। তিনি কুরআন মজীদ ও তাঁর তাফসীর সাহিত্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞান সঞ্চার করেন। জাহিলী যুগের ইতিহাস বিষয়ে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহান আল্লাহ্র পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সীরাত' (জীবনচরিত) ও ইল্মে ফিক্হ্-এ তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমনকি জাহিলী যুগের কাব্য সাহিত্যেও তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এ সকল বিষয়ে তিনি নিয়মিত শিক্ষকতা করতেন। অনেকেই কুরআন মজীদ ও ফিক্হ বিষয়ক জটিল ব্যাপারে তাঁর মতামত গ্রহণ করতেন। সবাই তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ইজতিহাদ করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। হযরত ইব্ন আব্বাস রাদিআল্লাহ তাআলা আনহুর সুচিন্তিত অভিমতসমূহ ইসনাদসহ (সূত্র পরম্পরা) তাঁর ছাত্র ও সঙ্গীগণ কর্তৃক বহু কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি তাঁর তাফসীরের সমর্থনে প্রায়ই সেকালের কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন, যা ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এ সব কবিতার উদ্ধৃতি ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির তাফসীরের এক বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীছসমূহ থেকেও তিনি তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আলকামা ইব্ন কায়স হযরত কাতাদা হযরত হাসান বসরী হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাঈন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাদিআল্লাহ তাআলা আনহুর কূফাতে অবস্থানকালে তাঁর কাছে তালীম গ্রহণ করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু মক্কা মুকাররমায়, হযরত ইব্ন মাসউদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু কূফাতে এবং হযরত উবায় ইব্ন কা'ব রাদিআল্লাহ তাআলা আনহু মদীনা মুনাওয়ারায় তাফসীর শিক্ষা করেন।

হযরত আবুদুল্লাহ ইব্ন উমার (ওফাত ৭৩ হিজরী), হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (ওফাত ৪৫ হিজরী), হযরত আনাস ইব্ন মালিক (ওফাত ৯১ হিজরী), হযরত আবূ মূসা আশআরী (ওফাত ৪২ হিজরী), হযরত আবূ হুরায়রা (ওফাত ৪৮ হিজরী) রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুম থেকেও ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। কুরআন মজীদের কোন্ আয়াত কোন্ ঘটনা বা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, তা তিনি সাহাবায় কিরামের বর্ণনানুসারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাকের সংকলন থেকেও তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আমরা অনুবাদ ও সম্পাদনার বেলায় হাদীছসমূহের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সনদের শেষ রাবী (বর্ণনাকারী)-এর নাম বর্ণনা করেছি। অধিক আগ্রহী পাঠক প্রয়োজনে তাফসীরে তাবারীর মূল কিতাব দেখে নেবেন। আমরা কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছি।

তাফসীরে তাবারী শরীফ বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে প্রকাশ করার কাজে আমাদের সুযোগ মেলায় আমরা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শোকরগুজারী করছি। পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ মহৎ কাজের সাথে জড়িত আলিম-উলামা, সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আমাদের বিশেষ দুআ রইলো। আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাদের সবার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষায় আলোকিত হওয়ার এবং তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন!

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
সভাপতি
তাফসীরে তাবারী সম্পাদনা পরিষদ

সূচীপত্র

তাফসীরে তাবারী শরীফ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

৩০৬ হিজরীতে 'আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবুন জারীর আল-তাবারী (রহ)-এর সামনে কুরআন মজীদ পাঠ করা হলে তিনি বলেন ঃ

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ্‌র জন্য যাঁর অভিনব হুকুম বুদ্ধিমান লোকদের উপর বিজয়ী, যাঁর সূক্ষ্ম প্রমাণসমূহ জ্ঞান-বুদ্ধিকে অপারগ করে দেয়, যাঁর সৃষ্টি রহস্য ধর্মদ্রোহীদের 'ওযর-আপত্তি খণ্ডন করে দেয় এবং যাঁর যুক্তি-প্রমাণের মনোমুগ্ধকর ভাষা বিশ্ব-মানবের কর্ণকুহরে ঝংকৃত হয়, আর সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তাঁর সমতুল্য ন্যায় বিচারক কেউ নেই এবং তাঁর সমকক্ষও নেই। তাঁর অংশীদার হওয়ার মত কোন সত্তা নেই। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। কেউ তাঁর স্ত্রীও নয় এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি এমন এক পরাক্রমশালী সত্তা যাঁর অসীম শক্তিমত্তার সামনে শক্তিধরদের শক্তি-সামর্থ্য অবদমিত হয়ে যায়। তিনি এমন এক মহা পরাক্রমশালী সত্তা—যাঁর সম্মান ও মর্যাদার সামনে প্রতিপত্তিশালী রাজা-বাদশার সম্মান তুচ্ছ ও ম্লান হয়ে যায়। তাঁর দুর্দমনীয় ভীতির প্রভাবে প্রতাপশালী ব্যক্তির অন্তরাত্মাও কেঁপে উঠে। তাঁর সামনে সমগ্র সৃষ্টিলোক ইচ্ছার হোক আর অনিচ্ছায় আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝

"আসমান-যমীনের সব কিছু ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কেবল আল্লাহ্‌কে সিজদা করে থাকে। আর এদের ছায়াসমূহও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরই সামনে নত হয়"—(সূরা রা'দ ঃ ১৫)।[১]

অতএব, বিশ্বের অস্তিত্বমান সব কিছুই তাঁর একত্বের দিকে আহ্বান জানায়, প্রতিটি অনুভবযোগ্য জিনিস তাঁর রবুবিয়্যাত ও সার্বভৌমত্বের দিকে হিদায়েত দান করে। তাঁর সৃষ্টির যা কিছু পূর্ণাংগ এবং যা কিছু অপূর্ণাংগ (ত্রুটিপূর্ণ), কোনটি দুর্বল, অক্ষম, কোনটি (অপরের সাহায্যের) মুখাপেক্ষী, বিপদ-মুসীবতের আগমন, যুগের পরিক্রমায় নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব—এ সব কিছুই তাঁর একত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ।

অন্তরাত্মাকে আলোকিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিতকারী এসব নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণের সাথে যুগপতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির নিকট নবী-রসূলও পাঠিয়েছেন। তাঁরা এসব জিনিসের যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত প্রমাণ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে গ্রথিত করেন। যেন রসূলগণের পাঠানোর পর লোকদের নিকট আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে এবং বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকেরা যেন উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তিনি তাঁদের সরাসরি সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের সত্যতার প্রমাণ বহনকারী দলীলসমূহের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির

১. এই আয়াত পাঠ করে সিজদা দিতে হবে।

মধ্যে তাঁদেরকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন। প্রকৃত সত্যভিত্তিক যুক্তি প্রমাণ ও মু'জিযাপূর্ণ আয়াত দান করে তাঁদের সাহায্য করেছেন। যেন তাঁদের কোন ব্যক্তি একথা বলতে না পারে যে,

مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝ وَلَئِنْ أَطَعْتُم

بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۝

"ইনি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও তিনি তাই খান। তোমরা যা পান কর তিনিও তাই পান করেন। এখন তোমরা যদি নিজেদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্তই হলে"— (সূরা মু'মিনূন ঃ ৩৩-৩৪)।

মহান আল্লাহ্ নবী-রসূলগণকে তাঁর এবং তাঁর বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে নিয়োগ করেছেন, নিজের অহীর বিশ্বস্ত ধারক ও বাহক বানিয়েছেন, তাঁদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন এবং নিজের রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণের জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁদের যে নিয়ামত দিয়েছেন এবং যে অনুগ্রহে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন তাতে তাঁদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য করেছেন। তিনি তাঁদের কাউকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন, আবার কাউকে বিশেষ দানে ভূষিত করেছেন এবং একের উপর অন্যজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি কারো সাথে সরাসরি এবং একান্তে কথা বলার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আবার কাউকে পবিত্র আত্মার (জিবরাঈল) মাধ্যমে সাহায্য করেছেন, মৃতকে জীবিত করার এবং জন্মান্ধ ও দুরারোগ্য রোগীদের সুস্থ করার শক্তি দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন।

আর তিনি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি তাঁকে বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের অসীম অনুগ্রহ ও সম্মান দান করে তাঁর প্রতি বিশেষ মহব্বতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁকে পূর্ণাংগ নবুওয়াত ও রিসালাত দানের জন্য মনোনীত করেছেন। তাঁর অনুসারী ও সহচরদের দ্বারা তাঁকে সৌভাগ্যবান করেছেন। তাঁকে পূর্ণাংগ দাওয়াত পরিপূর্ণ ও বিশ্বব্যাপী রিসালাত সহ পাঠিয়েছেন। তাঁকে স্বৈরাচারী জালিম ও অভিশপ্ত শয়তানের হীন ষড়যন্ত্র থেকে বিশেষভাবে হিফাজত করেছেন। অবশেষে তাঁর মাধ্যমে তিনি নিজের দীনকে বিজয়ী করেছেন, সত্য ও সঠিক পথ সমুজ্জ্বল করেছেন এবং সত্যপথের চিহ্নসমূহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর দ্বারা শিরকের স্তম্ভসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছেন, বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করেছেন, পথভ্রষ্টতা, শয়তানের প্রতারণা ও পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ করেছেন। কেননা তিনি দীন ইসলামকে আবহমান কাল ধরে টিকিয়ে রাখতে চান, মাস বছর ও যুগযুগ ধরে তা চালু রাখতে চান এবং কালের পরিক্রমায় এই নূরকে আরও জ্যোতির্ময় করতে চান।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রসূলের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। নবীগণকে স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী বিভিন্ন-ভাবে নির্যাতন করেছে এবং পাপিষ্ঠ দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায় নানাভাবে অপমানিত করেছে। এসব পাপিষ্ঠের মৃত্যুর পর তাদের স্মৃতিসমূহ বিলীন হয়ে গেছে, কালের আবর্তনে তাদের স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে গেছে। সাধারণভাবে, বা বিশেষভাবে, ব্যাপকভাবে বা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে সাধারণভাবে যে সমস্ত নবী প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের কিছু স্মৃতি ইতিহাসে এখনও

রক্ষিত আছে। এ সব নবী-রসূল নির্দিষ্ট কোন এলাকা, বা বিশেষ কোন জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের কোন একজনকেও গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়নি। অতএব যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। তিনি শেষ নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করে নেয়ার কারণে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাঁর আনুগত্য করার জন্য আমাদের মর্যাদাবান করেছেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বানিয়েছেন, তিনি যে বিষয়ের দিকে আহবান করেছেন এবং যা কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন আমাদেরকে তা স্বীকার করার এবং তাতে ঈমান আনার সৌভাগ্য দান করেছেন। সেই প্রিয় নবী (স)-এর উপর পবিত্রতম সালাত, সর্বোৎকৃষ্ট সালাম এবং তাঁর পূর্ণাংগ ও পরিপূর্ণ সম্মান ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মাতকে যে বিশেষ এবং বিরাট জিনিসের মাধ্যমে মর্যাদা দান করেছেন, অন্য সব জাতির তুলনায় সম্মানের অতি উচ্চ স্তরে উন্নীত করেছেন, তাদেরকে উন্নত মর্যাদা দানের জন্য পছন্দ করেছেন, তাদের নিরাপত্তা ও হিফাজতের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদের নামকে মর্যাদাবান করেছেন তা হল ওহী, আল-কুরআন। এই কুরআনকে তিনি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতার স্বপক্ষে প্রমাণ এবং তাঁর বিশেষ মর্যাদার স্পষ্ট নিদর্শন ও চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে বানিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দানকারীদের থেকে পবিত্র করেছেন এবং তাঁর উম্মাতকে কাফিরদের থেকে স্বতন্ত্র করেছেন। যদি গোটা বিশ্বের মানুষ, জিন এবং ছোট বড় সকলে একত্র হয়ে এই কুরআনের অনুরূপ একটা সূরা রচনা করতে সচেষ্ট হয়—তবে অনুরূপ সূরা রচনা করা তাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না—"যদি তারা পরস্পরের সাহায্যকারীও হয়।"

আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরআনকে তাদের জন্য অন্ধকারের আলো বানিয়েছেন। তা সন্দেহ-সংশয়ের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল উল্কা, পথহারা ব্যক্তির জন্য পথ প্রদর্শক এবং সত্য ও মুক্তির পথের দিশারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সচেষ্ট, আল্লাহ্ তাকে এই কুরআনের মাধ্যমে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং সহজ সরল পথের দিকে ধাবিত করেন। তিনি নিদ্রাহীন চোখ দিয়ে এই কিতাবের হিফাজত করেছেন এবং এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। কালের আবর্তনে তা পরিবর্তিত হয় না এবং যুগের পরিক্রমায় তা বিলুপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি এই কিতাবের যুক্তি-প্রমাণ অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে কখনও পথচ্যুত হয় না এবং এই কুরআনের সহচর কখনো সরল পথ থেকে ভ্রান্ত পথে নিক্ষিপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করে সে কৃতকার্য হয় এবং হিদায়াত লাভ করে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে পশ্চাৎপদ হয় সে গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়। যারা মতবিরোধের সময় এই কুরআনের ফয়সালার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তা তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, বিপদের সময় যে ব্যক্তি এই কুরআনের কাছে আশ্রয় নেয় তা তার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। শয়তানের যাবতীয় প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার নিমিত্তে এই কিতাব তাদের জন্য এক মজবুত দুর্গ। যারা আল্লাহ্‌র দেয়া হিকমাত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণ করে কুরআন তাদের জন্য সেই জ্ঞান-ভাণ্ডার। যারা নিজেদের বিবাদ মীমাংসার জন্য কুরআনের কাছে ফিরে আসে তা তাদের চূড়ান্ত ফয়সালা দান করে।

এর রশি যারা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে, তারা ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।

হে আল্লাহ! তোমার এই কিতাবের মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াত, হালাল-হারাম ও আম (সাধারণ)-খাস (বিশেষ) নির্দেশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার তওফিক আমাদের দান কর। আমাদেরকে

এই কুরআনের মুজমাল (সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক) ও বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত আয়াত এবং এর নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিতকৃত) আয়াতসমূহও সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করার যোগ্যতা দান কর; আমাদেরকে এই কুরআনের বাহ্যিক ও গোপন তত্ত্ব এবং এর মুশকিল আয়াতসমূহের নির্ভুল ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা দান কর। হে আল্লাহ! এই কুরআন ও তার নির্দেশসমূহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার তওফিক আমাদের দান কর, এর মুতাশাবিহ্ আয়াতসমূহ মেনে নেয়ার অবিচল মনোবৃত্তি দান কর, তা সংরক্ষণের ও তার যাবতীয় জ্ঞান লাভের যে নিয়ামত তুমি আমাদের দান করেছ তার শোকর আদায় করার অনুপ্রেরণা দাও। তুমিই দোয়া শ্রবণকারী ও কবুলকারী। আমাদের প্রিয়নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আল্লাহ্ সকলের প্রতি অনুগ্রহ করুন। যে জ্ঞান অর্জনের প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ দেয়া উচিৎ এবং যার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটনে যথাসাধ্য মনোনিবেশ করা উচিৎ, যে জ্ঞান অর্জনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং যে জ্ঞান আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে—সেই জ্ঞানের পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব—কুরআন মজীদ, যার মধ্যে কোন সন্দেহপূর্ণ বক্তব্য নেই। তা যে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এ সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ○

"এর মধ্যে বাতিল সামনের দিক থেকেও আসতে পারে না এবং পেছন দিক থেকেও নয়। তা এক মহাজ্ঞানী ও সুপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত"—(সূরা হা-মীম সিজদা ঃ ৪২)।

আমরা এই কিতাবের ব্যাখ্যা ও ভাব সম্প্রসারণের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী এমন একটি সুবৃহৎ ও বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব রচনার কাজ শুরু করতে চাই, লোকেরা যার প্রয়োজন অনুভব করে। এই গ্রন্থখানিই হবে তাদের জন্য যথেষ্ট, এরপর অন্য সব গ্রন্থের প্রয়োজন আর অনুভব করবে না। আলেমগণ যেসব যুক্তি-প্রমাণের উপর ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন এবং যেসব ক্ষেত্রে মত-বিরোধ করেছেন, আমি তাও এখানে উল্লেখ করব। প্রতিটি মাযহাবের দলীল-প্রমাণও আমি এখানে তুলে ধরব এবং আমাদের কাছে যে মাযহাবের মত অধিকতর সঠিক মনে হবে—তাও পরিষ্কারভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরব। আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর তওফিক কামনা করি যা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির কাছাকাছি নিয়ে যাবে এবং তাঁর ক্রোধ থেকে দূরে রাখবে। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মহানবী (স) এবং তাঁর পরিবার বর্গের উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

সূচনাতেই আমি এমন কতগুলো বিষয়ের উপর আলোকপাত করব যা প্রথমেই আলোচিত হওয়া উচিৎ এবং অন্য বিষয়ের আলোচনার পূর্বে ঐসব বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করাই যুক্তিযুক্ত। তা হচ্ছে কুরআন মজীদের এমন সব আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করা—যে সম্পর্কে আরবী ভাষায় অপারদর্শী ব্যক্তি সন্দেহে পতিত হতে পারে।

কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থগত অখণ্ডতা, যাঁর ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, কুরআন পরিপূর্ণ জ্ঞানের উৎস এবং যাবতীয় কথার উপর কুরআনের কথার প্রাধান্য ও মর্যাদা

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং মহান অনুগ্রহ হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের বাকশক্তি দান করেছেন। এর সাহায্যে তারা নিজেদের অন্তরের

ভাব প্রকাশ করে এবং নিজেদের সংকল্প ব্যক্ত করে। তিনি তাদের বাকশক্তির মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি করেছেন এবং কঠিন বিষয়কে সহজ করে দিয়েছেন। এই ভাষার সাহায্যে তারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সাক্ষী দেয়, তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে, পরস্পর ভাব বিনিময় করে, পরিচিতি লাভ করে এবং কাজকর্ম সম্পাদন করে।

এই ভাষার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন, এক দলকে অপর দলের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দান করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ অনলবর্ষী বক্তা, কেউ মার্জিত ভাষার অধিকারী। আবার কেউ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম। এরই ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে কাউকে অধিক মর্যাদার অধিকারী করেছেন, একজনকে অপরজনের তুলনায় দক্ষ ভাষাবিদ বানিয়েছেন এবং নিজেদের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার যোগ্যতা দান করেছেন।

অতঃপর তিনি তাদেরকে নিজের কিতাবের সাথে এবং তার নির্দেশ জ্ঞাপক আয়াতসমূহের সাথে পরিচিত করেছেন। তিনি যাদের পছন্দ করেছেন তাদেরকে এই কিতাবের ভাষাগত দক্ষতা দান করে সেই লোকদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান করেছেন যারা নিজেদের বক্তব্য পরিষ্কার করে তুলে ধরতে অক্ষম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝

"এরা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয়, আর তর্কবিতর্কে নিজেদের বক্তব্যও পূর্ণ মাত্রায় স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে না?"—(সূরা যুখরুফ ঃ ১৮)।

অতএব প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের জন্য একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যেসব লোকের নিজেদের কথা ব্যক্ত করার ক্ষমতা আছে তাদের সম্মান ও মর্যাদা এই গুণ থেকে বঞ্চিত লোকদের তুলনায় অধিক। কারণ যে ব্যক্তি নিজের মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারে তার মর্যাদা ঐ ব্যক্তির তুলনায় অধিক যে নিজের মনের ভাব পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে অক্ষম। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, একজন অপর— জনের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান হওয়ার পেছনে যে কারণ রয়েছে তা হচ্ছে এই বর্ণনা শক্তি। অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে সম্মানিত এবং সে যার উপর মর্যাদাবান তাকে বলা হয় মাফদূল مفضول (যার উপর মর্যাদা বিস্তার করা হয়েছে)। মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে লোকেরা বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। কেউ পরিষ্কার ভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে পারে, আবার কারও বক্তব্য পেশের মধ্যে জড়তা লক্ষ্য করা যায়। এজন্য উভয়ের মধ্যে মানগত দিক থেকে পার্থক্য হয়ে যায়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, ভাব প্রকাশের এই ক্ষমতা ও দক্ষতারও একটা সীমা আছে যা অতিক্রম করা কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু এই মান ও সীমা যদি কোন ব্যক্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হন এবং গোটা মানব জাতি সম্মিলিত ভাবেও ঐ সীমায় পৌঁছতে সক্ষম না হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রসূল—এটা তারই নিদর্শন ও প্রমাণ। যেমন তাঁদের আরও কতিপয় নিদর্শন ও প্রমাণ রয়েছে ঃ মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠরোগ হাতের স্পর্শে নিরাময় করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টি শক্তি দান করা —যা একান্ত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ চিকিৎসকদের পক্ষেও সম্ভব নয়। শুধু চিকিৎসক কেন সমগ্র পৃথিবীবাসীর পক্ষেও তা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে এক রাতে (কোন যানবাহনের সাহায্য ছাড়াই) দুই মাসের পথ অতিক্রম

করা নবীদের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ মানুষের জন্য তা কোন দিন সম্ভব হয়নি, যদিও তারা সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম ছিল। ইহাও নবুওয়াতের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ।

আমরা উপরে এমন ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছি যাঁর বক্তব্যের কোন তুলনা নেই, যাঁর কর্মকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই, যাঁর কথার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কথা নেই, যাঁর বাণীর চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কারও বাণী হতে পারে না। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থাপিত বাণীর মাধ্যমে জাতির সমকালীন নেতৃবৃন্দ, বক্তা, কবি, ছন্দবিদ সবাইকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এর সামনে তাদের প্রজ্ঞা মূর্খতায় পরিণত হয়েছে এবং তাদের জ্ঞানের দৈন্যদশা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ তারা ছিল সমকালীন জাতির সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা, বাগ্মী, খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক। এই ব্যক্তি নির্ভীক চিত্তে তাদের ধর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন এবং তাদের সবাইকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে, তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য মেনে নিতে ও সত্য বলে স্বীকার করতে এবং তিনি যে তাদের প্রতি-পালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে রসূল হিসেবে আগমন করেছেন তা স্বীকার করে নিতে আহবান জানালেন। তিনি তাদের অবহিত করলেন যে, তাঁর বক্তব্যের সত্যতা ও তাঁর নবুওয়াতের স্বপক্ষে দলীল হচ্ছে তাদের সামনে তাঁর পেশকৃত হক-বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশকারী ও হিকমাতে পরিপূর্ণ বিধান। তা তাদের নিজস্ব ভাষায় হওয়া সত্ত্বেও তারা অনুরূপ বক্তব্য রচনা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

তারা অকপটে তাদের অক্ষমতা ও অপারগতা স্বীকার করেছে এবং নিজেদের জ্ঞানের ত্রুটি ও অপূর্ণতার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে। অবশ্য হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহংকারে অন্ধ হয়ে যাওয়া কিছু সংখ্যক লোক কুরআনের অনুরূপ বক্তব্য রচনার হীন চেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু তাদের রচিত বক্তব্যই তাদের দৈন্যদশার সাক্ষী হয়ে আছে। যেমন এই নির্বোধ ও মূর্খ লোকেরা রচনা করেছিল ঃ

والطاحنات طحنا - والعاجنات عجنا - فالخابزات خبزا - و الثاردات ثردا - واللاقمات لقما -

এই হল তাদের নির্বোধ সুলভ, মূর্খতা প্রসূত মিথ্যা রচনার প্রয়াস।

ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তির কথা ও বক্তব্যের মধ্যে মর্যাদাগত ও মানগত পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জ্ঞানীর চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সর্বাধিক প্রজ্ঞার অধিকারী। সুতরাং তাঁর বক্তব্যও সমস্ত লোকের বক্তব্যের তুলনায় অধিক সুস্পষ্ট, তাঁর কথা সমস্ত কথার তুলনায় অধিক মর্যাদাবান, গোটা সৃষ্টির উপর তাঁর যেমন মর্যাদা, সমস্ত কথার উপর তাঁর কথারও অনুরূপ মর্যাদা।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, এমন ভাষায় লোকদেরকে সম্বোধন করা উচিৎ নয়—যা তারা বোঝে না। তাই মহান আল্লাহ্ও তাঁর বান্দাদের এমন ভাষায় সম্বোধন করেন নি যা তারা বুঝতে অক্ষম। তিনি কোন জাতির হিদায়াতের জন্য তাদের নিকট যখনই কোন নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তা তাদের ভাষাভাষী লোকদের নবী করে পাঠিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি তাদের জীবন বিধানও তাদের ভাষায় পাঠিয়েছেন। কেননা এর বিপরীত করা হলে লোকেরা যেমন নবীর কথা বুঝতে পারত না, তদ্রূপ তাঁর সাথে প্রেরিত কিতাবের বক্তব্যও হৃদয়ংগম করতে পারত না। ফলে নবুওয়াত, রিসালাত ও কিতাব তাদের জন্য নিষ্ফল প্রমাণিত হত। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য এবং তাদের প্রতি সহজতা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতির মধ্য থেকেই নবী-রসূল পাঠিয়েছেন এবং তাদের ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন ঃ

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ○

"আমরা আমাদের বাণী পেঁছাবার জন্য যখনই কোন রসূল পাঠিয়েছি, তার জাতির ভাষাভাষী করেই পাঠিয়েছি—যেন তিনি তাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝাতে পারেন"—(সূরা ইবরাহীম : ৪)।

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ○

"আমরা এই কিতাব আপনার প্রতি এজন্য নাযিল করেছি, যেন আপনি তাদের সামনে তাদের যাবতীয় মতবিরোধের মূলকথা প্রকাশ করে দেন—যার মধ্যে এরা নিমজ্জিত হয়ে আছে। এই কিতাব হিদায়াত ও রহমাত হিসেবে নাযিল হয়েছে সেই লোকদের জন্য—যারা তা মেনে নিবে"— (সূরা আন-নাহল : ৬৪)।

অতএব এটা মোটেই সমীচীন নয় যে, যে ব্যক্তি এই কিতাবসহ মানব জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট হবেন—তিনি এই কিতাবের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবেন। বিষয়টি আমরা কুরআনের আলোকে পরিষ্কার করে দিয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা যখনই কোন জাতির হিদায়াতের জন্য নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাদের ভাষাভাষী লোকদের মধ্য থেকেই পাঠিয়েছেন এবং কিতাবও তাদের ভাষায় নাযিল করেছেন। এ কথা সুস্পষ্ট যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তা তাঁর নিজের ভাষায়ই নাযিল করেছেন।

আরবী ভাষা যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাতৃভাষা ছিল, তাই এ কথাও সুস্পষ্ট যে, কুরআন মজীদও আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন :

انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ○

"আমি একে কুরআন হিসেবে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি—যেন তোমরা (আরববাসীরা) একে ভালোভাবে বুঝতে পার"— (সূরা ইউসুফ : ২)।

وانه لتنزيل رب العلمين - نزل به الروح الامين - على قلبك لتكون من المنذرين - بلسان عربي مبين ○

"কুরআন রব্বুল 'আলামীনের নাযিলকৃত কিতাব। তা নিয়ে আপনার অন্তরে বিশ্বস্ত রূহ (জিবরাঈল) অবতরণ করেছে, যেন আপনি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যারা (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য) সাবধানকারী। তা পরিষ্কার আরবী ভাষায় নাযিলকৃত"— (সূরা আশ-শু'আরা : ১৯২-১৯৫)।

করা নবীদের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ মানুষের জন্য তা কোন দিন সম্ভব হয়নি, যদিও তারা সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম ছিল। ইহাও নবুওয়াতের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ।

আমরা উপরে এমন ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছি যাঁর বক্তব্যের কোন তুলনা নেই, যাঁর কর্মকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই, যাঁর কথার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কথা নেই, যাঁর বাণীর চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কারও বাণী হতে পারে না। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থাপিত বাণীর মাধ্যমে জাতির সমকালীন নেতৃবৃন্দ, বক্তা, কবি, ছন্দবিদ সবাইকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এর সামনে তাদের প্রজ্ঞা মূর্খতায় পরিণত হয়েছে এবং তাদের জ্ঞানের দৈন্যদশা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ তারা ছিল সমকালীন জাতির সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা, বাগ্মী, খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক। এই ব্যক্তি নির্ভীক চিত্তে তাদের ধর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন এবং তাদের সবাইকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে, তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য মেনে নিতে ও সত্য বলে স্বীকার করতে এবং তিনি যে তাদের প্রতি-পালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে রসূল হিসেবে আগমন করেছেন তা স্বীকার করে নিতে আহবান জানালেন। তিনি তাদের অবহিত করলেন যে, তাঁর বক্তব্যের সত্যতা ও তাঁর নবুওয়াতের স্বপক্ষে দলীল হচ্ছে তাদের সামনে তাঁর পেশকৃত হক-বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশকারী ও হিকমাতে পরিপূর্ণ বিধান। তা তাদের নিজস্ব ভাষায় হওয়া সত্ত্বেও তারা অনুরূপ বক্তব্য রচনা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

তারা অকপটে তাদের অক্ষমতা ও অপারগতা স্বীকার করেছে এবং নিজেদের জ্ঞানের ত্রুটি ও অপূর্ণতার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে। অবশ্য হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহংকারে অন্ধ হয়ে যাওয়া কিছু সংখ্যক লোক কুরআনের অনুরূপ বক্তব্য রচনার হীন চেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু তাদের রচিত বক্তব্যই তাদের দৈন্যদশার সাক্ষী হয়ে আছে। যেমন এই নির্বোধ ও মূর্খ লোকেরা রচনা করেছিল ঃ

والطاحنات طحنا - والعاجنات عجنا - فالخابزات خبزا - و الثاردات ثردا - واللاقمات لقما -

এই হল তাদের নির্বোধ সুলভ, মূর্খতা প্রসূত মিথ্যা রচনার প্রয়াস।

ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তির কথা ও বক্তব্যের মধ্যে মর্যাদাগত ও মানগত পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জ্ঞানীর চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সর্বাধিক প্রজ্ঞার অধিকারী। সুতরাং তাঁর বক্তব্যও সমস্ত লোকের বক্তব্যের তুলনায় অধিক সুস্পষ্ট, তাঁর কথা সমস্ত কথার তুলনায় অধিক মর্যাদাবান, গোটা সৃষ্টির উপর তাঁর যেমন মর্যাদা, সমস্ত কথার উপর তাঁর কথারও অনুরূপ মর্যাদা।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, এমন ভাষায় লোকদেরকে সম্বোধন করা উচিৎ নয়—যা তারা বোঝে না। তাই মহান আল্লাহ্ও তাঁর বান্দাদের এমন ভাষায় সম্বোধন করেন নি যা তারা বুঝতে অক্ষম। তিনি কোন জাতির হিদায়াতের জন্য তাদের নিকট যখনই কোন নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তা তাদের ভাষাভাষী লোকদের নবী করে পাঠিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি তাদের জীবন বিধানও তাদের ভাষায় পাঠিয়েছেন। কেননা এর বিপরীত করা হলে লোকেরা যেমন নবীর কথা বুঝতে পারত না, তদ্রূপ তাঁর সাথে প্রেরিত কিতাবের বক্তব্যও হৃদয়ংগম করতে পারত না। ফলে নবুওয়াত, রিসালাত ও কিতাব তাদের জন্য নিষ্ফল প্রমাণিত হত। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য এবং তাদের প্রতি সহজতা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতির মধ্য থেকেই নবী-রসূল পাঠিয়েছেন এবং তাদের ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন্ ঃ

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ○

"আমরা আমাদের বাণী পৌঁছাবার জন্য যখনই কোন রসূল পাঠিয়েছি, তার জাতির ভাষাভাষী করেই পাঠিয়েছি—যেন তিনি তাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝাতে পারেন"—(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪)।

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ○

"আমরা এই কিতাব আপনার প্রতি এজন্য নাযিল করেছি, যেন আপনি তাদের সামনে তাদের যাবতীয় মতবিরোধের মূলকথা প্রকাশ করে দেন—যার মধ্যে এরা নিমজ্জিত হয়ে আছে। এই কিতাব হিদায়াত ও রহমাত হিসেবে নাযিল হয়েছে সেই লোকদের জন্য—যারা তা মেনে নিবে"—(সূরা আন-নাহল ঃ ৬৪)।

অতএব এটা মোটেই সমীচীন নয় যে, যে ব্যক্তি এই কিতাবসহ মানব জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট হবেন—তিনি এই কিতাবের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবেন। বিষয়টি আমরা কুরআনের আলোকে পরিষ্কার করে দিয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা যখনই কোন জাতির হিদায়াতের জন্য নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাদের ভাষাভাষী লোকদের মধ্য থেকেই পাঠিয়েছেন এবং কিতাবও তাদের ভাষায় নাযিল করেছেন। এ কথা সুস্পষ্ট যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তা তাঁর নিজের ভাষায়ই নাযিল করেছেন।

আরবী ভাষা যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাতৃভাষা ছিল, তাই এ কথাও সুস্পষ্ট যে, কুরআন মজীদও আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ○

"আমি একে কুরআন হিসেবে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি—যেন তোমরা (আরববাসীরা) একে ভালোভাবে বুঝতে পার"—(সূরা ইউসুফ ঃ ২)।

وانه لتنزيل رب العلمين - نزل به الروح الامين - على قلبك لتكون من المنذرين - بلسان عربي مبين ○

"কুরআন রব্বুল 'আলামীনের নাযিলকৃত কিতাব। তা নিয়ে আপনার অন্তরে বিশ্বস্ত রূহ (জিবরাঈল) অবতরণ করেছে, যেন আপনি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যারা (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য) সাবধানকারী। তা পরিষ্কার আরবী ভাষায় নাযিলকৃত"—(সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১৯২-১৯৫)।

অতএব, আমরা যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করে দিয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর যে কুরআন নাযিল করেছেন তা আরবী ভাষায়। আরবী ভাষার সাথে তাঁর বক্তব্য ও ভাষার পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। আরবী ভাষার ব্যাকরণরীতির সাথে তাঁর ব্যাকরণরীতির পূর্ণ মিল রয়েছে। তার মর্যাদা সমস্ত কথার উপর পরিব্যাপ্ত। যেমন তা আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি। আরবী ভাষার ব্যাকরণরীতিতে যেমন সংক্ষেপে বক্তব্য তুলে ধরার রীতি আছে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গোপনে অথবা প্রকাশ্যভাবে কথা বলার প্রচলন আছে, কখনও সংক্ষেপে কখনও বিস্তারিতভাবে, কখনও একই কথার পুনরাবৃত্তি, কখনও তা পরিহার, কখনো সরাসরিভাবে, আবার কখনো পরোক্ষভাবে বক্তব্য পেশের রীতি আছে, কখনও কথাটি বিশেষভাবে উপস্থাপন করে তা থেকে সাধারণ অর্থ গ্রহণ এবং সাধারণভাবে তুলে ধরে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করার নিয়ম আছে, কখনও পরোক্ষভাবে কথা বলে প্রত্যক্ষ অর্থ এবং প্রত্যক্ষভাবে কথা বলে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা হয়, কখনও বিশেষ্য (الموصوف) পদ ব্যবহার করে বিশেষণ (الصفة)-কে বুঝানো হয়, আবার কখনও বিশেষণ ব্যবহার করে বিশেষ্যকে বুঝানো হয়, কখনও বক্তব্য আগে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু অর্থ পরে আসে। অনুরূপভাবে বক্তব্য পরে আসে, কিন্তু অর্থ আগে আসে। কখনো আংশিক বক্তব্য পেশ করাই যথেষ্ট মনে করা হয়, কখনও প্রকাশ্যে না বলে উহ্য করা হয়। আবার কখনও উহ্য রাখার স্থানে প্রকাশ্যে কথা বলা হয়। আরবী ভাষার ব্যাকরণরীতিতে এই যে সব বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাবের ব্যাকরণরীতিতেও ঐসব বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। এসব বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ্।

কুরআন মজীদে ব্যবহৃত আরবী ভাষায় প্রচলিত অনারব সম্প্রদায়ের শব্দাবলী

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদের জিজ্ঞেস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁর কোন বান্দাকে তার অবোধগম্য ভাষায় সম্বোধন করা অথবা তার কাছে ভিন্ন ভাষাভাষী রসূল প্রেরণ করা তাঁর জন্য ঠিক নয়, তাহলে আপনি মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদের নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে কি বলবেন ?

(ক) তিনি নিজস্ব সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেছেন, يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ (তোমাদের দ্বিগুণ রহমত দেয়া হবে) আয়াতে كِفْلَيْنِ শব্দের অর্থ দ্বিগুণ সওয়াব, শব্দটি হাবশী (আবিসিনীয়) ভাষা থেকে উদগত।

(খ) 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ আয়াতে نَاشِئَةَ হচ্ছে হাবশী ভাষার শব্দ। কোন ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করলে আবিসিনীয়রা তার সম্পর্কে বলে, نَشَأَ (নাশা'আ)।

(গ) আবূ মাইসারা (রা) বলেন, يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ আয়াতে أَوِّبِي শব্দটি হাবশী ভাষার, এর অর্থ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা কর (سَبِّحِي)।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, এ গ্রন্থের যেখানে আমি (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) حدثكم (তিনি তোমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন) শব্দ ব্যবহার করেছি—সে সব জায়গায় তার মর্ম হবে, حدثونا بـه (তাঁরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

(ঘ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট فرت من قسورة আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, قسورة শব্দটি হাবশী ভাষার; আরবী ভাষায় এর অর্থ اسد। ফারসী ভাষায় شير নিবতী ভাষায় اريا। (এবং বাংলা ভাষায় সিংহ)।

(ঙ) সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কুরাইশ মুশরিকরা বলল, যদি না এই কুরআন সম্মিলিতভাবে একজন আরব ও একজন অনারবের উপর নাযিল করা হত! তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت ايته - ءاعجمى وعربى - قل هو للذين امنوا هدى و شفاء -

"আমরা যদি একে আজম (অনারব) দেশীয় কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম, তবে এই লোকেরা বলত, এর আয়াতসমূহ কেন স্পষ্ট করে বলা হল না? কি আশ্চর্যের ব্যাপার, কালাম বলা হচ্ছে আজম দেশীয় (ভাষায়), আর শ্রোতা হচ্ছে আরব দেশীয়! এদের বল, এই কুরআন ঈমানদার লোকদের জন্য হিদায়াত ও নিরাময়"—(সূরা হা-মীম সিজদা ঃ ৪৪)।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা অনেক ভাষার শব্দ সম্বলিত আয়াত নাযিল করেছেন। এর মধ্যে حجارة من سجيل ও অন্তর্ভুক্ত। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের বলেন, ফারসী ভাষার سنگ ও گل (সং ও গিল) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে আরবী سجيل শব্দ বানানো হয়েছে (অর্থাৎ যে পাথর কাদামাটি থেকে বানানো হয়েছে, অতঃপর আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়েছে)।

(চ) আবূ মাইসারাহ্ (রা) আরও বলেন, কুরআন মজীদে অন্যান্য ভাষার শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসসমূহেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে। তার উল্লেখ করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। এসব হাদীস থেকে জানা যায়, কুরআন মজীদে আরবী ভাষার সাথে অন্য ভাষার শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্নকারীর উল্লিখিত প্রমাণসমূহের জবাবে বলা যেতে পারে যে, যেসব লোক এ ধরনের কথা বলেছেন—তা আমাদের বক্তব্য বা আমাদের গৃহীত অর্থের পরিপন্থী নয়। কেননা তাদের কেউই দাবী করেন নি যে, উল্লিখিত শব্দগুলো এবং অনুরূপ শব্দসমূহ (আপাত দৃষ্টিতে

২—

অনারব ভাষার শব্দ মনে হলেও) আরবী ভাষায় পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল না, কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার পূর্বে তা আরবদের কথাবার্তায় ব্যবহৃত হত না এবং তারা কুরআন নাযিলের পূর্বে এসব শব্দের সাথে পরিচিত ছিল না। তারা যদি অনুরূপ দাবী করতেন তবেই তাদের কথা আমাদের কথার বিপরীত বা পরিপন্থী হত। বরং তাদের কেউ বলেন, শব্দটি হাবশী ভাষার এবং আরবী ভাষায় তার অর্থ এই, অমুক শব্দটি অনারব ভাষার এবং তার অর্থ এই...... ইত্যাদি। এ কথা কখনও অস্বীকার করা হয়নি যে, সংশ্লিষ্ট শব্দটি আরবদের কথাবার্তায় ব্যবহৃত হত না। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, গোটা মানব জাতির মধ্যে প্রচলিত ভাষাসমূহের শব্দ-সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তার অর্থ একই। অতএব একথা বলা যায় না যে, কুরআন শরীফ দ্বিবিধ ভাষায় নাযিল হয়েছে। যেমন দিরহাম, দীনার, কলম, দোয়াত, কিরতাস (কাগজ) ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ রয়েছে যার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়—এই শব্দগুলো আরবী এবং ফারসী উভয় ভাষায় ব্যবহৃত হয় এবং এর অর্থ সম্পর্কেও উভয় ভাষার মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। আরও অনেক ভাষায় (শব্দের এরূপ আন্তমিল) রয়েছে যা আমরা ভাষাগত ব্যবধানের কারণে বুঝতে পারি না।

আরবী ও ফারসী ভাষায় কোন শব্দের অভিন্ন অর্থে ব্যবহার প্রসংগে এই দীর্ঘ আলোচনার পরও কেউ যদি বলে যে, ঐ শব্দগুলো ফারসী ভাষার, আরবী ভাষার নয়, অথবা তা আরবী ভাষার শব্দ, ফারসী ভাষার নয়, অথবা তার কতকগুলি আরবী ভাষার এবং কতকগুলি ফারসী ভাষার, অথবা শব্দটি আরবী ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, অতঃপর ফারসী ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং তারা নিজেদের কথাবার্তায় তা ব্যবহার করেছে, অথবা তা ফারসী ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, অতঃপর আরবী ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে আরবীরূপে পরিগ্রহ করেছে—তবে তা হবে একটা নির্বোধসুলভ কথা। কেননা কোন শব্দের উৎপত্তিস্থল আরবী ভাষাকে নির্ধারণ করে অনারব ভাষায় তার প্রবেশ করার কারণে অনারব ভাষার উপর আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না। অনুরূপ ভাবে কোন অনারব ভাষাকে কোন শব্দের উৎপত্তি স্থল নির্ধারণ করে আরবী ভাষার মধ্যে তার প্রবেশ করানোর ফলে আরবী ভাষার উপর অনারব ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না। কেননা উভয় ভাষার মধ্যে যদি সংশ্লিষ্ট শব্দটি বর্তমান থাকে তবে এক ভাষাভাষী অপর ভাষাভাষীর উপর এই দাবী করতে পারে না যে, তারাই তাদের প্রতিপক্ষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শব্দটির উৎপত্তিগত উৎস নিয়ে এরূপ দাবী করা হলে তা হবে অযৌক্তিক। তবে যদি এর স্বপক্ষে এমন প্রমাণ পেশ করা যায় যার দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়—তাহলে অনুরূপ দাবী মেনে নেয়া যেতে পারে।

বরং আমাদের মতে সঠিক কথা এই যে, এ জাতীয় শব্দকে আরবী-হাবশী, অথবা হাবশী-আরবী উভয় ভাষার শব্দ বলা যেতে পারে। কেননা উভয় জাতিই নিজেদের বক্তব্য ও কথোপ-কথনে এই শব্দ সমভাবে ব্যবহার করে আসছে। এদের কোন এক জাতির সাথে এই শব্দকে সংযুক্ত করে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া যায় না। প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে এই একই অবস্থা। মূলগত ভাবে একই শব্দ বিভিন্ন জাতি একই অর্থে ব্যবহার করে থাকে। অতএব তা যে কোন জাতির সাথে সংযুক্ত হতে পারে। যেমন দিরহাম, দীনার, দোয়াত, কলম ইত্যাদি শব্দ ফারসী ও আরবী ভাষায় (এমন কি বাংলা ভাষায়ও) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যা আমরা উপরেও বলে এসেছি। প্রত্যেক জাতিই তা স্বতন্ত্রভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে নিজেদের ভাষার শব্দ বলে দাবী করতে পারে।

এসব শব্দের কথাই আমরা অনুচ্ছেদের শুরুতে বলে এসেছি যে, কেউ এর কোন শব্দকে হাবশী ভাষার সংগে যুক্ত করেছেন, আবার কেউ এর কোন শব্দকে ফারসী ভাষার সাথে যুক্ত করেছেন,

আবার কেউ এর কোন শব্দকে রোমান ভাষার শব্দ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তবে তাদের কেউই একটি শব্দকে কোন একটি ভাষার সাথে যুক্ত করার পর একথা বলেন নি যে, তা অন্য ভাষার শব্দ হওয়া অসম্ভব। বরং তারা বলেছেন, সংশ্লিষ্ট শব্দটি ভিন্ন ভাষারও হতে পারে, বিভিন্ন ভাষাভাষীরাও শব্দটির দাবীদার হতে পারে। অতএব কিছু শব্দ আরবী ভাষার, কিছু শব্দ ফারসী ভাষার এবং কিছু শব্দ হাবশী ভাষার হওয়া অসম্ভব নয়। যেহেতু কোন নির্দিষ্ট শব্দ উভয় জাতি ব্যবহার করে আসছে তাই তা কোন এক জাতির সাথে অথবা উভয় জাতির সাথে সংযুক্ত করা যায়।

অবশ্য কোন স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যদি মনে করে যে, একই শব্দ উভয় ভাষা থেকে হতে পারে না, যেমন মানব জাতির বংশ পরিচয় একই সময় দুই বংশের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না—তবে তার এই ধারণা হবে মূর্খতা প্রসূত। কেননা মানব বংশ দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের সাথে সম্পৃক্ত অপর পক্ষের সাথে নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ -

"তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে সম্পর্ক সূত্রে ডাক। এটাই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক ইনসাফের কথা"—(সূরা আহযাব ঃ ৫)।

কিন্তু ভাষার ব্যাপারটি এরূপ নয়। কেননা কথা ও বক্তব্য তার সাথে সংযুক্ত হয়, যে তার সাথে পরিচিত এবং তা ব্যবহার করে।

যদি কোন শব্দ এক অথবা দুই অথবা ততোধিক ভাষায় একই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কথা জানা যায়, তবে তা সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলোর শব্দ বলেই বিবেচিত হবে। অন্য ভাষাকে বাদ দিয়ে এর কোন একটি ভাষা এককভাবে তার দাবীদার হতে পারে না। যেমন, এক খণ্ড জমি যদি সমতল ভূমি ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হয় এবং তাতে সমতল ভূমির বাতাস ও পাহাড়ী বাতাস প্রবাহিত হয়, তবে তাকে একই সময় পাহাড়ী ও সমতল ভূমির জমি বলা হবে, কেবল পাহাড়ী, অথবা কেবল সমতল ভূমির জমি বলা হবে না। অনুরূপ ভাবে কোন জমি যদি স্থল ও জলভাগের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত হয় এবং তাতে স্থলভাগ ও জলভাগের বায়ু প্রবাহিত হয়—তবে তাকে একই সময়ে জল ও স্থল ভাগের জমি বলা হয়।

কেউ যদি একটি শব্দের জন্য তার দুইটি বৈশিষ্ট্যের কোন একটিকে নির্দিষ্ট করে এবং অন্য বৈশিষ্ট্যকে বাদ না দেয়—তবে সে সত্যবাদী, হকপন্থী। সে এই অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উল্লিখিত শব্দ-সমূহের ক্ষেত্রে সত্যবাদী ও সঠিক পন্থার অধিকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বলে যে, কুরআনে সব ভাষার শব্দ আছে—তার এ-কথার অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্-ই ভালো জানেন। কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র কুরআনকে স্বীকার করেন, কুরআন পাঠ করেন এবং আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তার জন্য এরূপ আকীদা পোষণ করা জায়েয নয় যে, কুরআনের কিছু অংশ ফারসী ভাষায়, আরবী ভাষায় নয়, কিছু অংশ নাবাতী ভাষায়—আরবী ভাষায় নয়, কিছু অংশ আরবী ভাষায়—ফারসী ভাষায় নয়, কিছু অংশ হাবশী ভাষায়—আরবী ভাষায় নয়। কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, তিনি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন। অতএব এরপর আর বলা যায় না যে, কুরআন আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় নাযিল হয়েছে।

সুতরাং যেসব লোক বলেছেন যে, কুরআনে সব ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে—আল্লাহ্‌র বাণী দ্বারা তাদের এরূপ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। এজন্য কুরআনকে অন্য ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট করা জায়েয নয়।

আমি যা বলেছি তা যারা সমর্থন করতে প্রস্তুত নন এবং যারা ধারণা করেন যে, অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উল্লিখিত শব্দগুলো ভিন্ন ভাষা থেকে এসেছে—তা আরবী ভাষার শব্দ নয়, তাকে আরবী ভাষাভাষী লোকেরা গ্রহণ করে আরবী বানিয়ে নিয়েছে—তাহলে তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তার বক্তব্যের বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে কি প্রমাণ আছে—যার ভিত্তিতে তার কথা সমর্থন করা যায় ? অথচ সে জানে যে, তার বিরোধী পক্ষ তার কথার বিপরীত কথা বলেছে, তাহলে তার বক্তব্য ও বিরোধীদের বক্তব্যের মধ্যে কি পার্থক্য আছে ? সে উত্তরে বলে যে, ঐ জাতীয় শব্দগুলোর উৎপত্তি হয়েছে আরবী ভাষায়, অতঃপর তা অপরাপর জাতির ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং তারা এর কোন কোন শব্দ নিজেদের কথোপকথন ও বক্তব্যে ব্যবহার করেছে। এই কারণে তার এই কথা স্বীকার করে নিতে হয়। জবাবে সে যদি এরূপ কথাই বলে তাহলে তার এই কথার দ্বারাই তার বিরোধী পক্ষের বক্তব্যও সঠিক বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কুরআন মজীদ আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় নাযিল হয়েছে

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, পূর্বের আলোচনা থেকে একথা নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন, অন্য কোন ভাষায় নয়। আর যে ব্যক্তি মনে করে যে. কুরআন আরবদের ভাষায় নাযিল হয়নি, তার কথাও বাতিল প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে সঠিক কথা অনুধাবন করার তৌফিক দান করেছেন—তার জন্য এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট।

কুরআন আরবদের ভাষায় নাযিল হয়েছে—একথা যখন প্রমাণিত, তখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে—তা আরবদের কোন এলাকার ভাষায় নাযিল হয়েছে ? আরবে প্রচলিত সব আঞ্চলিক ভাষায়, না কোন একটি আঞ্চলিক ভাষায় তা নাযিল হয়েছে ? কেননা সমগ্র আরবের লোকেরা আরবী ভাষাভাষী এবং আরবী নামে পরিচিত হলেও তাদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যাপার যখন তাই এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অবহিত করেছেন যে, তিনি কুরআন মজীদ আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন (بلسان عربى مبين), তদুপরি কুরআনের বাহ্যিক দিকটা সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক অথবা বিশেষ অর্থ জ্ঞাপকও হতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলা কি তা সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন, না বিশেষ অর্থে—তা আমাদের জানার কোন পথ নেই। অবশ্য যাঁকে কুরআনের ধারক, বাহক ও ভাষ্যকার বানানো হয়েছে তাঁর মাধ্যমেই কেবল আমরা নিশ্চিত ভাবে তা জানতে পারি। আর এই ভাষ্যকার হচ্ছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)। যেমন আমরা নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানতে পারি ঃ

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزل القران على سبعة احرف - فالمراء فى القران كفر ثلاث مرات - فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى عالمه -

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ "কুরআন সাত রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। কুরআন সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান করে কিছু বলা কুফরী, (রসূলুল্লাহ (স) এ কথাটি) তিনবার (বলেছেন)। অতএব তোমরা কুরআন সম্পর্কে যা জানতে পেরেছ তদনুযায়ী আমল কর। আর কুরআনের যে অংশ সম্পর্কে তোমরা অজ্ঞ—তা বুঝার জন্য কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তির শরণাপন্ন হও।"

عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم انزل القران علی سبعة احرف عليم حكيم غفور رحيم -

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ "কুরআন সাত রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। (নাযিলকারী মহান আল্লাহ্) সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, ক্ষমাশীল এবং দয়াময়।"

অপর একটি সূত্রে ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم انزل القران علی سبعة احرف لكل حرف منها ظهر و بطن و لكل حرف حد ولكل حد مطلع -

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কুরআন সাত হরফে (রীতিতে) নাযিল করা হয়েছে। এর প্রতিটি হরফের বাহ্যিক এবং গোপন অর্থ রয়েছে। আর প্রতিটি হরফের একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। প্রতিটি সীমার একটি উৎস রয়েছে।"

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে অপর একটি সূত্রেও নবী করীম (স)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

عن عبد الله قال اختلف رجلان في سورة - فقال هذا اقرأني النبي صلى الله عليه وسلم - و قال هذا اقرأني النبي صلى الله عليه و سلم - فاتى النبي صلى الله عليه وسلم - قال فتغير وجهه وعنده رجل فقال اقرءوا كما علمتم - فلا ادرى ابشيء امر ام بشيء ابتدعه من قبل نفسه فانما اهلك من كان قبلكم اختلافهم على انبيائهم - قال فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه نحو هذا ومعناه -

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি কোন একটি সূরার পাঠ নিয়ে মতবিরোধ করল। তাদের একজন বলল, নবী (স) আমাকে তা এভাবে শিখিয়েছেন। অপরজনও বলল, নবী (স) তা আমাকে এভাবেই পড়িয়েছেন। তাদের একজন নবী (স)-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করল। এতে তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। অপর লোকটিও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন: তোমরা যেভাবে জান—সেভাবেই (আমাকে) পড়ে শুনাও। জানিনা আমি কোন্ জিনিসের নির্দেশ দিয়েছিলাম, অথবা সে নিজেই তা আবিষ্কার করে নিয়েছে! তোমাদের পূর্বের যুগের লোকেরা নিজেদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর আমাদের প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে কিরাত পাঠ করল, কিন্তু একজনের সঙ্গে অপরের পাঠের কোন সামঞ্জস্য ছিল না।

عن زر بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود تمارينا في سورة من القرآن فقلنا خمس وثلاثون او ست وثلاثون آية ـ قال فانطلقنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه ـ قال فقلنا انا اختلفنا في القراءة ـ قال فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم ـ قال ثم امر الى علي شيئا فقال لنا علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم ان تقرءوا كما علمتم ـ

যিরর্ ইব্‌নে হুবাইশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) বলেছেন, আমরা কুরআনের কোন একটি সূরাকে কেন্দ্র করে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা বলছিলাম, সূরাটিতে ৩৫ অথবা ৩৬টি আয়াত রয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আলী (রা) তাঁর সাথে গোপন আলাপ করছেন। আমরা বললাম, আমরা কিরাআত সম্পর্কে মতভেদ করেছি। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন: তোমাদের পূর্বেকার যুগের লোকেরা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর তিনি 'আলী (রা)-কে গোপনে কিছু কথা বললেন। আলী (রা) আমাদের বললেন, রসূলুল্লাহ (স) তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে জান, সেভাবে পড়।

عن زيد بن ارقم قال كنا معه في المسجد فحدثنا ساعة ثم قال جاء رجل الى

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأني عبد الله بن مسعود سورة اقرأنيها
أبي بن كعب فاختلفت قراءتهم - فبقراءة ايهم آخذ؟ قال فسكت رسول الله
صلى الله عليه وسلم - قال وعلي الى جنبه فقال علي ليقرأ كل انسان كما علم كل
حسن جميل ○

(যায়েদ আল-কিনার বলেন,) আমরা যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-র সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ আমাদের সাথে কথাবার্তা বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) আমাকে একটি সূরা শিখিয়েছেন। যায়েদ (ইব্‌ন সাবিত) এবং উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) ও তা আমাকে পড়িয়েছেন। কিন্তু তাদের পঠন রীতিতে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এখন আমি তাঁদের মধ্যে কার কিরাআত গ্রহণ করব? (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (স) নীরব থাকলেন। 'আলী (রা) তাঁর পাশেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি (আলী) বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেভাবে শিখানো হয়েছে---সে ভাবেই পাঠ করবে। সবই উত্তম এবং সুন্দর।

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان
في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرؤها على حروف
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت اساوره في الصلوة فتصبرت
حتى سلم - فلما سلم لببته بردائه فقلت من اقرأك هذه السورة التي سمعتك
تقرؤها؟ قال اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقلت كذبت فوالله ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم لهو اقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها - فانطلقت به
اقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقلت يارسول الله اني سمعت هذا يقرأ سورة
الفرقان على حروف لم تقرئنيها وانت اقرأني سورة الفرقان - قال فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم ارسله يا عمر اقرأ ياهشام - فقرأ عليه القراءة التى
سمعته يقرؤها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت - ثم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر - فقرأت القراءة التى اقرأنى رسول الله صلى
الله عليه وسلم - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت - ثم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرءوا ما تيسر منها.

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় হিশাম ইবন হাকীম (রা)-কে (নামাযের মধ্যে) সূরা ফুরকান পাঠ করতে শুনলাম। আমি মনোযোগ দিয়ে তার কিরা'আত শুনছিলাম। কিন্তু তিনি এমন অনেক শব্দ সংযোজন করে তা পড়লেন যা রসূলুল্লাহ (স) আমাকে শিখান নি। আমি নামাযের মধ্যেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম, কিন্তু তাঁর সালাম ফিরানো পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করলাম। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, আমি তাঁর চাদর টেনে মনোযোগ আকর্ষণ করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, কে শিখিয়েছে এই সূরা, যা আপনাকে পাঠ করতে শুনলাম? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (স) তা আমাকে শিখিয়েছেন। আমি বললাম, আপনি মিথ্যা বললেন। আল্লাহ্‌র শপথ! আপনাকে যে সূরা পাঠ করতে শুনলাম তা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) আমাকে পড়িয়েছেন। আমি তাঁকে টানতে টানতে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে এলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি একে সূরা ফুরকান এমন কতগুলো শব্দ সহকারে পাঠ করতে শুনলাম যা আপনি আমাকে কখনও শিখান নি। অথচ আপনিই আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "হে উমার! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম! তুমি পড় তো দেখি। অতএব তিনি তা ঠিক সেভাবে পাঠ করলেন যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছিলাম। (তার পড়া শেষ হলে) রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "এভাবে তা নাযিল হয়েছে।" অতঃপর রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "হে উমার! তুমিও পড় দেখি।" অতএব আমি তা পাঠ করলাম যেভাবে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "এভাবেও তা নাযিল হয়েছে।" তিনি আরও বললেনঃ "বস্তুত এই কুরআন সাত ধরনের পঠন পদ্ধতিতে নাযিল করা হয়েছে। অতএব তোমরা যেভাবে সহজ হয় সেভাবে পড়।"

আবূ তালহা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র উপস্থিতিতে কুরআন পাঠ করল। তিনি তার কিরাআতটি সংশোধন করে দিলেন। সে বলল, আমি তা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এভাবেই পড়েছি। কিন্তু তিনি তা পরিবর্তন করেন নি। তাঁরা উভয়ে নিজেদের বিরোধ নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। ঐ লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কি আমাকে অমুক অমুক আয়াত শিখিয়ে দেন নি? তিনি বললেনঃ "হাঁ।"। রাবী বলেন, এতে উমারের মনে খটকার সৃষ্টি হল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। তিনি

তার বুকে আঘাত করে বললেনঃ "শয়তানকে দূরে নিক্ষেপ কর।" কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ "হে উমার! নিশ্চয়ই কুরআনের সবটাই সঠিক এবং নির্ভুল যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি রহমাতের আয়াতকে আযাবের আয়াতে এবং আযাবের আয়াতকে রহমাতের আয়াতে পরিণত না করবে।"

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) এক ব্যক্তিকে কুরআন পাঠ করতে শুনলেন। তিনি একটি আয়াত নবী (স)-এর কাছে যেভাবে শুনেছেন সে তা ভিন্নরূপে পাঠ করল। উমার (রা) তাঁকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই ব্যক্তি একটি আয়াত এভাবে পাঠ করেছে। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে। এর প্রতিটি রীতিই যথেষ্ট।"

'আলকামাহ্ আন-নাখ'ঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) যখন কূফা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিলেন তখন তাঁর গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা এসে তাঁর কাছে সমবেত হল। তিনি তাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বললেন, কুরআন নিয়ে বিবাদ করোনা। কেননা অত্যধিক বাদানুবাদে তা পরস্পর বিরোধী হয় না এবং বিলীন বা পরিবর্তিতও হয় না। কারণ ইসলামী শরীআত, এর সীমা ও বিধিবিধানের মধ্যে অখণ্ডতা রয়েছে। যদি দুই বিপরীতমুখী বক্তব্য থাকে যার একটি কোন কাজ করার নির্দেশ দেয় এবং অপরটি তা করতে নিষেধ করে, তবে তাই হচ্ছে মতবিরোধ। কিন্তু কুরআনের গোটা বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ঐক্য ও অখণ্ডতা বর্তমান রয়েছে। ইসলামের সীমারেখা, বিধিবিধান ও শরীআতের কোন বিষয়ে কুরআনে পরস্পর-বিরোধী কোন বক্তব্য নেই। আমরা দেখেছি যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে কুরআন পাঠ নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলে তিনি আমাদের তা পড়ে শুনানোর নির্দেশ দিতেন এবং আমরা তা তাঁকে পড়ে শুনাতাম। তিনি আমাদের বলতেন যে, আমাদের সকলের পাঠই সুন্দর। আমি যদি জানতে পারতাম যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলের উপর যা নাযিল করেছেন—সে সম্পর্কে কোন ব্যক্তি আমাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী তবে আমি তা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতাম এবং তার জ্ঞানের সাহায্যে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করতাম। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) আমাকে সত্তরটি সূরা শিখিয়েছেন! আমি একথাও জানতাম যে, প্রতি বছর রমযান মাসে তাঁর সামনে কুরআন পেশ করা হতো। তাঁর ইন্তেকালের বছর তা দুইবার তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল। তিনি যখন পাঠ শেষ করতেন, তখন আমি তাঁকে তা পড়ে শুনাতাম। তিনি আমার পাঠকেও উত্তম বলেছেন! অতএব যে ব্যক্তি আমার পাঠ অনুযায়ী কিরাআত পাঠ করে, সে যেন বিমুখ হয়ে তা পরিত্যাগ না করে। আর যে ব্যক্তি ভিন্ন রীতিতে পাঠ করে সেও যেন তা বিমুখ হয়ে পরিত্যাগ না করে। কেননা যে ব্যক্তি কুরআনের কোনও একটি আয়াতকে মিথ্যা মনে করল, সে গোটা কুরআনকেই মিথ্যা মনে করল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَحَرَامٍ.

الله صلى الله عليه وسلم ارسله يا عمر اقرأ ياهشام - فقرأ عليه القراءة التي
سمعته يقرؤها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت - ثم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر - فقرأت القراءة التي اقرأني رسول الله صلى
الله عليه وسلم - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت - ثم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان هذا القران انزل على سبعة احرف فاقرءوا ما تيسر منه.

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় হিশাম ইবন হাকীম (রা)-কে (নামাযের মধ্যে) সূরা ফুরকান পাঠ করতে শুনলাম। আমি মনোযোগ দিয়ে তার কিরা'আত শুনছিলাম। কিন্তু তিনি এমন অনেক শব্দ সংযোজন করে তা পড়লেন যা রসূলুল্লাহ (স) আমাকে শিখান নি। আমি নামাযের মধ্যেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম, কিন্তু তাঁর সালাম ফিরানো পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করলাম। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, আমি তাঁর চাদর টেনে মনোযোগ আকর্ষণ করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, কে শিখিয়েছে এই সূরা, যা আপনাকে পাঠ করতে শুনলাম? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (স) তা আমাকে শিখিয়েছেন। আমি বললাম, আপনি মিথ্যা বললেন। আল্লাহর শপথ! আপনাকে যে সূরা পাঠ করতে শুনলাম তা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) আমাকে পড়িয়েছেন। আমি তাঁকে টানতে টানতে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে এলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একে সূরা ফুরকান এমন কতগুলো শব্দ সহকারে পাঠ করতে শুনলাম যা আপনি আমাকে কখনও শিখান নি। অথচ আপনিই আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "হে উমার! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম! তুমি পড় তো দেখি। অতএব তিনি তা ঠিক সেভাবে পাঠ করলেন যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছিলাম। (তার পড়া শেষ হলে) রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "এভাবে তা নাযিল হয়েছে।" অতঃপর রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "হে উমার! তুমিও পড় দেখি।" অতএব আমি তা পাঠ করলাম যেভাবে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "এভাবেও তা নাযিল হয়েছে।" তিনি আরও বললেনঃ "বস্তুত এই কুরআন সাত ধরনের পঠন পদ্ধতিতে নাযিল করা হয়েছে। অতএব তোমরা যেভাবে সহজ হয় সেভাবে পড়।"

আবু তালহা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র উপস্থিতিতে কুরআন পাঠ করল। তিনি তার কিরাআতটি সংশোধন করে দিলেন। সে বলল, আমি তা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এভাবেই পড়েছি। কিন্তু তিনি তা পরিবর্তন করেন নি। তাঁরা উভয়ে নিজেদের বিরোধ নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। ঐ লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে অমুক অমুক আয়াত শিখিয়ে দেন নি? তিনি বললেনঃ "হাঁ।"। রাবী বলেন, এতে উমারের মনে খটকার সৃষ্টি হল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। তিনি

তার বুকে আঘাত করে বললেনঃ "শয়তানকে দূরে নিক্ষেপ কর।" কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ "হে উমার! নিশ্চয়ই কুরআনের সবটাই সঠিক এবং নির্ভুল যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি রহমাতের আয়াতকে আযাবের আয়াতে এবং আযাবের আয়াতকে রহমাতের আয়াতে পরিণত না করবে।"

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) এক ব্যক্তিকে কুরআন পাঠ করতে শুনলেন। তিনি একটি আয়াত নবী (স)-এর কাছে যেভাবে শুনেছেন সে তা ভিন্নরূপে পাঠ করল। উমার (রা) তাঁকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই ব্যক্তি একটি আয়াত এভাবে পাঠ করেছে। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে। এর প্রতিটি রীতিই যথেষ্ট।"

'আলকামাহ্ আন-নাখ'ঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) যখন কূফা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিলেন তখন তাঁর গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা এসে তাঁর কাছে সমবেত হল। তিনি তাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বললেন, কুরআন নিয়ে বিবাদ করোনা। কেননা অত্যধিক বাদানুবাদে তা পরস্পর বিরোধী হয় না এবং বিলীন বা পরিবর্তিতও হয় না। কারণ ইসলামী শরীআত, এর সীমা ও বিধিবিধানের মধ্যে অখণ্ডতা রয়েছে। যদি দুই বিপরীতমুখী বক্তব্য থাকে যার একটি কোন কাজ করার নির্দেশ দেয় এবং অপরটি তা করতে নিষেধ করে, তবে তাই হচ্ছে মতবিরোধ। কিন্তু কুরআনের গোটা বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ঐক্য ও অখণ্ডতা বর্তমান রয়েছে। ইসলামের সীমারেখা, বিধিবিধান ও শরীআতের কোন বিষয়ে কুরআনে পরস্পর-বিরোধী কোন বক্তব্য নেই। আমরা দেখেছি যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে কুরআন পাঠ নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলে তিনি আমাদের তা পড়ে শুনানোর নির্দেশ দিতেন এবং আমরা তা তাঁকে পড়ে শুনাতাম। তিনি আমাদের বলতেন যে, আমাদের সকলের পাঠই সুন্দর। আমি যদি জানতে পারতাম যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলের উপর যা নাযিল করেছেন—সে সম্পর্কে কোন ব্যক্তি আমাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী তবে আমি তা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতাম এবং তার জ্ঞানের সাহায্যে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করতাম। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) আমাকে সত্তরটি সূরা শিখিয়েছেন। আমি একথাও জানতাম যে, প্রতি বছর রমযান মাসে তাঁর সামনে কুরআন পেশ করা হতো। তাঁর ইন্তেকালের বছর তা দুইবার তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল। তিনি যখন পাঠ শেষ করতেন, তখন আমি তাঁকে তা পড়ে শুনাতাম। তিনি আমার পাঠকেও উত্তম বলেছেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার পাঠ অনুযায়ী কিরাআত পাঠ করে, সে যেন বিমুখ হয়ে তা পরিত্যাগ না করে। আর যে ব্যক্তি ভিন্ন রীতিতে পাঠ করে সেও যেন তা বিমুখ হয়ে পরিত্যাগ না করে। কেননা যে ব্যক্তি কুরআনের কোনও একটি আয়াতকে মিথ্যা মনে করল, সে গোটা কুরআনকেই মিথ্যা মনে করল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَحَرَامٍ.

৩—

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত,। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন: "জিবরাঈল (আ) আমাকে এক রীতিতে কুরআন পড়ালেন। আমি তাঁকে ফেরত পাঠালাম এবং আল্লাহ্‌র নিকট এর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতে থাকলাম। তিনি আমার জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকলেন। অবশেষে তা সাত রীতি পর্যন্ত পৌঁছল।" (অধঃস্তন রাবী) ইব্‌ন শিহাব বলেন, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, এই সাত রীতি অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে এক ও অভিন্ন, হালাল হারামে বিভিন্ন নয়।

عن ام ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل القران على سبعة احرف ايها قرأت اصبت.

উম্মে আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন: "কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে। তুমি এর যে রীতিতেই তা পাঠ করবে সঠিক হবে।" অপর এক সূত্রেও উম্মে আইউব থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

عن سليمان ابن صرد يرفعه قال اتاني ملكان فقال احدهما اقرأ - قال على كم ؟ قال على حرف - قال زده حتى انتهى به الى سبعة احرف.

সুলাইমান ইব্‌ন সারাদ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন: আমার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাদের একজন বললেন: পড়ুন। রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন: কয় রীতিতে? তিনি বললেন, এক রীতিতে। তিনি বললেন, বাড়িয়ে দিন। শেষ পর্যন্ত তা সাত রীতি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأني جبريل القران على حرف فاستزدته فزادني ثم استزدته فزادني حتى انتهى الى سبعة احرف.

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন: জিবরীল আমাকে এক নিয়মে কুরআন পাঠ করান। আমি তাকে তা বাড়িয়ে দিতে বললাম। তিনি বাড়িয়ে দিলেন। আমি পুনরায় তাকে তা বাড়িয়ে দিতে বললাম। তিনি তা আরও বাড়িয়ে দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সাত রীতি পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন।

عن ام ايوب انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل القران على سبعة احرف - فما قرأت اصبت.

উম্মে আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন: কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে। তুমি যে রীতিতেই তা পড়বে—শুদ্ধ হবে।

عن ابي بن كعب قال رحت الى المسجد فسمعت رجلا يقرأ فقلت من اقرأك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت استقرئ هذا - قال فقرأ - فقال احسنت - قال فقلت انك اقرأتني كذا وكذا - فقال وانت قد احسنت. قال فقلت قد احسنت قد احسنت - قال فضرب بيده على صدري ثم قال اللهم اذهب عن ابي الشك - قال ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا - ثم قال ان الملكين اتياني فقال احدهما اقرء القران على حرف وقال الآخر زده - قال فقلت زدني - قال اقرأه على حرفين حتى بلغ سبعة احرف فقال اقرأ على سبعة احرف.

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে গেলাম এবং এক ব্যক্তিকে কুরআন পড়তে শুনলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে কে কুরআন পড়িয়েছে? সে বলল, রসূলুল্লাহ (স)। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, এই ব্যক্তিকে কুরআন পড়তে বলুন। অতএব সে তা পাঠ করল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন: তুমি সঠিক পড়েছ। তখন আমি বললাম, আপনি তো আমাকে এভাবে এভাবে পড়িয়েছেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন: তুমিও উত্তমরূপে পড়েছ। রাবী বলেন, আমি তখন বললাম, তুমিও উত্তমরূপে পড়েছ, তুমিও উত্তমরূপে পড়েছ! একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) আমার বুকে আঘাত করে বললেন: হে আল্লাহ! উবাইর মনের সন্দেহ-সংশয় দূর করে দাও। রাবী বলেন, আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম এবং ভয়ে আমার পেট ভরে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন: আমার নিকট দুজন ফেরেশতা এসেছিলেন। তাদের একজন বললেন, আপনি এক রীতিতে কুরআন পাঠ করুন। অপরজন বললেন, তাঁকে আরও বাড়িয়ে দিতে বলুন। অতএব আমি বললাম, আমার জন্য আরও বাড়িয়ে দিন। ফেরেশতা বললেন, তাহলে আপনি দুই রীতিতে তা পাঠ করুন। অবশেষে তা সাত রীতি পর্যন্ত পৌঁছল এবং ফেরেশতা বললেন, আপনি সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করুন।

عن ابي بن كعب قال ما حاك في صدري شئ منذ اسلمت الا اني قرأت اية فقرأها رجل غير قراءتي فقلت اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل اقرأنيها

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اقرأتني
اية كذا وكذا ؟ قال بلى - قال الرجل الم تقرأني اية كذا وكذا ؟ قال بلى - ان جبريل
وميكائيل عليهما السلام أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري - فقال
جبريل اقرأ القران على حرف واحد - وقال ميكائيل استزده قال جبريل اقرأ القران
على حرفين - فقال ميكائيل استزده - حتى بلغ ستة او سبعة. الشك من ابي كريب.

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে কোন জিনিস আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারেনি, কিন্তু আমি কতিপয় আয়াত যেভাবে পড়তাম অপর এক ব্যক্তি তা ভিন্নরূপে পড়ল (এটা আমার মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে)। আমি তাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স) তা আমাকে এভাবে পড়িয়েছেন। ঐ লোকটিও বলল রসূলুল্লাহ (স) তা আমাকে এভাবে পড়িয়েছেন। তখন আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি কি অমুক অমুক আয়াত এভাবে শিখাননি? তিনি বললেন: "হাঁ।" ঐ লোকটিও বলল, আপনি কি অমুক অমুক আয়াত আমাকে এভাবে পড়াননি? তিনি বললেন: "হাঁ। জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ) আমার নিকট এলেন। জিবরাঈল (আ) আমার ডান পাশে এবং মীকাঈল (আ) বাঁ পাশে বসলেন। জিবরাঈল (আ) আমাকে বললেন: আপনি এক রীতিতে কুরআন পাঠ করুন। মীকাঈল (আ) বললেন, আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করুন। জিবরাঈল (আ) বললেন, তাহলে আপনি দুই রীতিতে কুরআন পাঠ করুন। মীকাঈল (আ) বললেন, আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করুন। অবশেষে তা ছয় অথবা সাত রীতি পর্যন্ত পৌঁছল।" অধঃস্তন রাবী আবূ কুরাইব সন্দেহে পতিত হয়েছেন যে, তাঁর উর্ধ্বতন রাবী (মুহাম্মাদ ইব্‌ন মায়মূন) ছয় রীতির কথা বলেছেন না সাত রীতির কথা বলেছেন।

কিন্তু অধঃস্তন রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শারের বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে সাত রীতির কথা উল্লেখ আছে এবং তাতে আরও উল্লেখ আছে, "এর যে কোন রীতি যথেষ্ট।" কিন্তু উপরে বর্ণিত হাদীসের মূল পাঠ আবূ কুরাইবের।

অপর একটি সূত্রেও উবাই (রা) থেকে উপরের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে, "শেষ পর্যন্ত তিনি ছয় রীতি পর্যন্ত পৌঁছলেন। তিনি বললেন, তা সাত রীতিতে পাঠ করুন। এর যে কোন রীতিই যথেষ্ট।"

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন: 'কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে।"

عن ابي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند احجار المراء فقال اني بعثت

إلى أمة أميين - منهم الغلام والخادم والشيخ الفاني والعجوز. فقال جبريل فليقرؤوا القرآن
على سبعة أحرف واللفظ الحديث لأبي أسامة.

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) 'আহজারুল মিরা' নামক স্থানে জিবরীল (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বললেন : আমি একটি নিরক্ষর উম্মাতের নিকট প্রেরিত হয়েছি। এদের মধ্যে রয়েছে কিশোর, খাদেম, প্রবীণ বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা। তখন জিবরীল (আ) বললেন, তারা সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করতে পারে। হাদীসের মতন (মূলপাঠ) আবূ উসামার।

عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه -
ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه. فدخلنا جميعا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال فقلت يارسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه - ثم دخل
هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه - فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرآ -
فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهما - فوقع في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت
في الجاهلية - فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب في صدري ففضت
عرقا كأنما أنظر إلى الله فرقا - فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف -
فرددت عليه أن هون على أمتي - فرد علي في الثانية أن اقرأ القرآن على حرف -
فرددت عليه أن هون على أمتي - فرد علي في الثالثة أن اقرأه على سبعة أحرف
ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها - فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي -
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام.

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নববীতে) ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়তে লাগল। সে এমন এক পাঠরীতিতে কুরআন পড়ল, যা আমার জানা ছিল না। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করল। সে পূর্বোক্ত

ব্যক্তি থেকে ভিন্নতর পাঠ-রীতিতে কুরআন পড়ল। আমরা সকলে (নামায শেষ করে) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এই ব্যক্তি এমন এক পঠন-পদ্ধতিতে কিরাআত পড়েছে—যা আমার অজ্ঞাত। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে প্রথম ব্যক্তি থেকে ভিন্নতর পদ্ধতিতে কিরাআত পাঠ করে। রসূলুল্লাহ (স) তাদের নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তারা কিরাআত পাঠ করল। তিনি উভয়ের পাঠকেই শুদ্ধ বললেন। ফলে আমার মনে রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি এমন এক সন্দেহের সৃষ্টি হল, যা জাহিলী যুগেও আমার মনে উদয় হয়নি। রসূলুল্লাহ (স) যখন লক্ষ্য করলেন—আমাকে কোন জিনিস আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তখন তিনি আমার বক্ষদেশে হাত দিয়ে কষাঘাত করলেন। এতে আমি ঘামে ভিজে গেলাম এবং এতটা ভীত হয়ে পড়লাম যেন আমি আল্লাহ্‌কে দেখছি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন: "হে উবাই! আমার নিকট ওহী পাঠানো হয়েছিল যে, কুরআন এক রীতিতে পাঠ করুন। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন করলাম, আপনি আমার উম্মাতের প্রতি আরও সহজ করে দিন। তিনি দ্বিতীয় বারে উত্তর দিলেন, কুরআন এক রীতিতে পাঠ করুন। আমি পুনরায় আবেদন করলাম, আপনি আমার উম্মাতের প্রতি আরও সহজ করে দিন। তৃতীয় বারে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, তবে সাত রীতিতে পাঠ করুন। কিন্তু আপনার প্রত্যেক বারের আবেদন প্রত্যাখানের পরিবর্তে এক একটি বিষয়ে আমার নিকট চাইতে পারেন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিন। আর তৃতীয়টি আমি এমন এক দিনের জন্য স্থগিত রাখলাম—যেদিন সমগ্র সৃষ্টি আমার সুপারিশের আশায় থাকবে, এমনকি ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামও।"

অধঃস্তন রাবী ইবন বাইয়ানের বর্ণনায় আছে, "নবী করীম (স) তাদের বললেন: তোমরা শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে পাঠ করেছ।" এই বর্ণনায় ففضت عرقا-এর পরিবর্তে فارفضضت عرقا উল্লেখ আছে।

ইসমাঈল ইবন আবি খালিদের বর্ণনায় উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে হাদীসের কিছু অংশ এভাবে বর্ণিত আছে:

وقال قال لى اعيذك بالله من الشك والتكذيب - وقال ايضا ان الله امرنى ان اقرأ القران على حرف - فقلت اللهم رب خفف عن امتى - قال اقراه على حرفين - فامرنى ان اقرأه على سبعة احرف من سبعة ابواب من الجنة كلها شاف كاف.

উবাই (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন: "সন্দেহ ও মিথ্যাবাদিতা থেকে তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" তিনি আরও বললেন: "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এক রীতিতে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিন। তিনি বললেন, তাহলে আপনি তা দুই রীতিতে পাঠ করুন। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দিলেন। এ হচ্ছে বেহেশতের সাতটি দরওয়াজাহ। এর সবগুলো রীতিই যথেষ্ট।"

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়ালাম এবং তাতে সূরা নাহ্‌ল পাঠ করলাম। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে আমার থেকে ভিন্নতর পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করল। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি এসে আমাদের উভয়ের থেকে ভিন্নতর রীতিতে কুরআন পাঠ করল। ফলে আমার মনে সন্দেহ ও মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটল। তা ছিল জাহিলী যুগের সংশয় ও মিথ্যাচারের চেয়েও মারাত্মক। আমি তাদের উভয়ের হাত ধরে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে এলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এদের উভয়কে কুরআন পাঠ করতে বলুন। তাদের একজন কিরাআত পাঠ করল। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তুমি বিশুদ্ধ পড়েছ। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিও পাঠ করল। তিনি এবারও বললেনঃ তুমি ঠিক পড়েছ। এর ফলে আমার মনে জাহিলী যুগের তুলনায়ও মারাত্মক সন্দেহ ও মিথ্যাচার প্রবেশ করল। রসূলুল্লাহ (স) আমার বুকে করাঘাত করলেন এবং বললেনঃ "আল্লাহ্ তোমাকে সংশয় থেকে মুক্তি দিন এবং তোমার থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করুন।" (অধঃস্তন রাবী) ইসমাঈলের বর্ণনায় আছে (উবাই বলেন), 'এর ফলে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে পড়লাম।' কিন্তু ইব্‌ন আবী লাইলার বর্ণনায় তা নেই। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আমার নিকট জিব্‌রীল (আ) এসে বললেন, আপনি এক রীতিতে কুরআন পড়ুন। আমি বললামঃ আমার উম্মাত তা এক রীতিতে পড়তে সক্ষম হবে না। এভাবে একাধারে সাতবার কথোপকথন চলল। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে বললেন, তাহলে সাত রকমের পঠন-পদ্ধতিতে তা পাঠ করুন। আর আপনার আবেদনের পরিবর্তে যা আপনাকে দান করলাম, তদতিরিক্ত এক একটি আবেদন প্রত্যাখ্যানের পরিবর্তে এক একটি বিষয়ে দু'আ করতে পারেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ (কিয়ামতের দিন) সমগ্র সৃষ্টিকুল আমার (সুপারিশের) মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে, এমনকি ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামও (তখন আমি আমার ঐ অধিকার কাজে লাগাব)।

অপর একটি সূত্রেও উবাই (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

عن أبي بن كعب قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أضاة بني غفار فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ.

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরীল (আ) নবী (স)-এর কাছে আসলেন। তখন তিনি বানু গিফার-এর কূপের নিকট ছিলেন। জিবরীল বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে সাত ধরনের পঠন-পদ্ধতিতে কুরআন পড়া শিখাবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এর যে কোন একটি রীতিতে তা পাঠ করবে, সে যথার্থই পড়বে।

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) গিফার গোত্রের কূপের পাশে ছিলেন। তাঁর নিকট জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে এক রীতিতে কুরআন পড়াবেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ক্ষমা ও উদারতা লাভের জন্য প্রার্থনা করি। আমার উম্মাত এক রীতিতে কুরআন পড়তে সক্ষম হবে না। দ্বিতীয় বার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে দুই প্রকারের পঠন-পদ্ধতিতে কুরআন পড়াবেন।

এবারও রসূলুল্লাহ (স) বললেন : আমি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা লাভের জন্য প্রার্থনা করি। আমার উম্মাত তাতেও সমর্থ হবে না। তৃতীয় বার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে তিন রীতিতে কুরআনের পাঠ শিখাবেন। রসূলুল্লাহ (স) আবারও বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতার প্রার্থী। আমার উম্মাত তাতেও সমর্থ হবে না। চতুর্থবার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে অনুমতি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে সাত রীতিতে কুরআন পড়াবেন। তারা এর যে রীতিতেই তা পাঠ করবে, তাদের পাঠ বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

আরও দু'টি সূত্রে উপরের হাদীসটি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে সূরা নাহ্‌ল থেকে আমার জানা রীতির বিপরীত পাঠ করতে শুনলাম। অপর এক ব্যক্তিকেও একই সূরা থেকে প্রথম ব্যক্তির (অথবা আমার) রীতির বিপরীত পাঠ করতে শুনলাম। তাদের উভয়কে নিয়ে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, আমি এই দুই ব্যক্তিকে সূরা নাহ্‌ল পাঠ করতে শুনলাম। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কে তোমাদের এই সূরার পাঠ শিখিয়েছেন ? তারা বলল, রসূলুল্লাহ (স)। তখন আমি বললাম, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়কে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাব। কেননা আমি লক্ষ্য করেছি যে, তিনি আমাকে যে রীতিতে কিরাআত পড়িয়েছেন তোমরা তার বিপরীত পড়েছ। রসূলুল্লাহ (স) তাদের একজনকে বললেন : "পড়।" সে তা পাঠ করল। তিনি বললেন : "তুমি উত্তম পড়েছ।" অতঃপর তিনি অপরজনকে বললেন : "তুমিও পড়ে শুনাও।" অতএব সেও পড়ে শুনাল। নবী করীম (স) বললেন : "তুমিও উত্তম পড়েছ।" উবাই (রা) বলেন, তখন আমি হৃদয়ে শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করলাম। এমনকি আমার চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। রসূলুল্লাহ (স) আমার মুখমণ্ডল দেখেই তা অনুভব করলেন। তিনি নিজের হাত দিয়ে আমার বুকে সজোরে করাঘাত করলেন এবং বললেন : "হে আল্লাহ্ ! উবাইর কাছ থেকে শয়তানকে দূরে সরিয়ে দিন। হে উবাই ! এক আগন্তুক (ফেরেশতা) আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার কাছে এসে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি এক রীতিতে কুরআন পাঠ করবেন। তখন আমি বললাম : হে প্রতিপালক ! আরও সহজ এবং হালকা করে দিন। আগন্তুক দ্বিতীয় বার এসে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনি যেন এক রীতিতে কুরআন পাঠ করেন। আমি (আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলাম), প্রভু ! আমার উম্মাতের জন্য আরও সহজ এবং হালকা করে দিন। আগন্তুক তৃতীয়বার এসে একই কথা জানালেন। আমিও আবার অনুরূপ প্রার্থনা করলাম। তিনি চতুর্থবার এসে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে অনুমতি দিয়েছেন—আপনি যেন সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করেন। আর আপনার প্রতিবার চাওয়ার বিনিময়ে অতিরিক্ত একটি করে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হল। আমি বললাম, হে প্রতিপালক ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন, তৃতীয় আবেদনটি আমার উম্মাতের শাফাআতের উদ্দেশ্যে কিয়ামতের দিনের জন্য স্থগিত রাখলাম।

'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী লাইলা থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতের পাঠ নিয়ে মতভেদ করল। তাদের উভয়ের দাবী ছিল রসূলুল্লাহ (স) তাদের এ আয়াত শিখিয়েছেন। তারা উভয়ে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে নিজ নিজ কিরাআত পাঠ করে শুনাল। উবাই (রা)-ও তাদের সাথে মতবিরোধ করেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (স)—কে নিজ নিজ

কিরাআত পড়ে শুনানোর জন্য তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কুরআনের একটি আয়াতের পাঠ নিয়ে মতবিরোধ করছি। আমাদের স্ব স্ব দাবী এই যে, আপনিই তা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (স) তাদের একজনকে বললেন: তুমি পড়ে শুনাও। অতএব তিনি তাঁকে আয়াত পাঠ করে শুনালেন। নবী করীম (স) বললেন: তুমি যথার্থই পড়েছ। তিনি দ্বিতীয়জনকে বললেন: তুমিও পড়ে শুনাও। তিনি প্রথম ব্যক্তি থেকে ভিন্নতর রীতিতে তা পাঠ করলেন। নবী করীম (স) বললেন: তুমিও ঠিক পড়েছ। তিনি উবাই (রা)-কেও বললেন: তুমিও পড়ে শুনাও। অতএব তিনি পূর্বের দুই ব্যক্তির চেয়ে ভিন্নতর রীতিতে তা পাঠ করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন: তুমিও নির্ভুল পড়েছ। উবাই (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর এই আচরণে আমার মনে এমন সন্দেহের উদ্রেক হল যে, জাহিলী যুগেও তেমনটি আমার মনে কখনও সৃষ্টি হয়নি। নবী করীম (স) আমার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পারলেন। তিনি নিজের হাত উত্তোলন করে আমার বক্ষদেশে আঘাত করে বললেন: অভিশপ্ত শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। উবাই (রা) বললেন, আমি ঘামে ভিজে গেলাম এবং মনে হল আমি যেন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে আছি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন: আমার রবের নিকট থেকে আমার কাছে একজন আগন্তুক (ফেরেশতা) এসে বললেন, আপনার রব আপনাকে এক রীতিতে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আমি বললাম, প্রভু! আমার উম্মাতের জন্য আরও হালকা এবং সহজ করে দিন। আগন্তুক পুনরায় ফিরে এসে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে এক রীতিতে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি (আল্লাহ্‌র নিকট) আবেদন করলাম, প্রভু! আমার উম্মাতের জন্য আরও সহজ ও হালকা করে দিন। আগন্তুক তৃতীয়বার এসে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে এক রীতিতে কুরআন পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি আবার প্রার্থনা করলাম, প্রভু! আমার উম্মাতের জন্য সহজ ও হালকা করে দিন। আগন্তুক চতুর্থবার এসে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দিয়েছেন এবং প্রতিবারের দোয়ার পরিবর্তে আপনাকে একটি করে প্রার্থনা করার অধিকারও দেয়া হয়েছে। আমি বললাম: হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে ক্ষমা কর। তৃতীয় আবেদনটি আমার উম্মাতের শাফাআতের উদ্দেশ্যে কিয়ামতের দিনের জন্য স্থগিত রেখেছি, যেদিন আল্লাহ্‌র খলীল (প্রিয়-বন্ধু) ইবরাহীম (আ)-ও আমার শাফাআতের জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করবেন।

عن عبد الرحمن بن ابى بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل اقرءوا القرآن على حرف - فقال ميكائيل استزده - فقال على حرفين حتى بلغ ستة او سبعة احرف - فقال كلها شاف كاف مالم يختم اية عذاب برحمة او اية رحمة بعذاب كقولك هلم وتعال.

'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বাকরাহ্ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন: জিবরীল (আ) বললেন, আপনারা এক রীতিতে কুর'আন পাঠ করুন। মীকাঈল

(আ) বললেন, আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করুন। জিবরাঈল (আ) বললেন, তাহলে দুই রীতিতে পাঠ করুন। এভাবে তিনি ছয় অথবা সাত রীতি পর্যন্ত বর্ধিত করলেন। তিনি বললেন, এর প্রতিটি রীতিই যথেষ্ট—যতক্ষণ পর্যন্ত আযাবের আয়াতকে রহমাতের অথবা রহমাতের আয়াতকে আযাবের আয়াতে পরিণত না করা হবে। (এই রীতিগুলোর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ) যেমন هلم (আস) এবং تعال (আস)। (শব্দ ভিন্ন হলেও অর্থ একই)।

عن بشر بن سعيد ان ابا جهيم الانصارى اخبره ان رجلين اختلفا فى اية من القران فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القران انزل على سبعة احرف فلا تماروا فى القران فان المراء فيه كفر.

বিশর ইবনে সা'ঈদ থেকে বর্ণিত। আবু জাহম আল-আনসারী (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, দুই ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে মতবিরোধ করল। তাদের একজন বলল, আমি নবী করীম (স)-এর নিকট তা শিখেছি। অপরজনও বলল, আমি তা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট শিখেছি। তখন উভয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট এসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : কুরআন মজীদ সাত রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। তোমরা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করো না। কেননা তা নিয়ে বিতর্ক করা কুফরী।

'আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন : কুরআন সাত রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। এর প্রত্যেক রীতিই যথেষ্ট।

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমাকে সাত রীতিতে কুরআন পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তা সবই সঠিক ও যথেষ্ট।

আবুল 'আলিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একে একে পাঁচ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে কুরআন পাঠ করল। ভাষাগত দিক থেকে তাদের পাঠে পার্থক্য পরিলক্ষিত হল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) তাদের সকলের পাঠ অনুমোদন করলেন। তামীম গোত্রের লোকেরা ছিল অধিক মার্জিত ভাষার অধিকারী।

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا القران انزل على سبعة احرف فاقرءوا ولا حرج ولكن لاتختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : এই কুরআন সাত রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। অতএব তোমরা (এর যে কোন এক রীতিতে তা) পড়, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমরা রহমাতের আলোচনাকে আযাবের আলোচনায় এবং আযাবের আলোচনাকে রহমাতের আলোচনায় পরিবর্তিত কর না।

উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরীল (আ) নবী করীম (স)-এর নিকট আসলেন। তখন তিনি গিফার গোত্রের কূপের কাছে ছিলেন। জিবরীল (আ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে এক রীতিতে কুরআন পাঠ করাবেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতার জন্য প্রার্থনা করি। আপনিও তাঁর কাছে আবেদন করুন—তিনি যেন আরও সহজ করে দেন। কেননা তারা এক রীতিতে কুরআন পড়তে সক্ষম হবে না। জিবরীল (আ) চলে গেলেন। অতঃপর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে দুই রীতিতে কুরআন শিক্ষা দিন। রসূলুল্লাহ (স) পুনরায় বললেন : আমি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা লাভের জন্য আবেদন করছি। তারা এতেও সক্ষম হবে না। আপনি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সহজ করে দেয়ার প্রার্থনা করুন। জিবরীল (আ) ফিরে গেলেন। পুনরায় তিনি এসে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে তিন রীতিতে কুরআন পড়ান। তিনি বললেন : আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ক্ষমা ও উদারতার জন্য প্রার্থনা করি। তারা এতেও সক্ষম হবে না। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সহজ করে দেয়ার প্রার্থনা করুন। জিবরীল (আ) চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই অনুমতি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে সাত রীতিতে কুরআন শিখান। যে ব্যক্তি এর কোন এক রীতির অনুসরণ করবে—সে সঠিকই পড়বে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদ আরবে প্রচলিত বিভিন্ন (আঞ্চলিক) ভাষার মধ্যে যে কোন একটি (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল করেছেন, সবগুলো (আঞ্চলিক) ভাষায় নয়। কেননা এটা পরিষ্কার যে, আরবে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষার সংখ্যা সাত-এর অধিক—যা গণনা করে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যদি কেউ বলে যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী "কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে" এবং "আমাকে সাত হরফে কুরআন পাঠের অনুমতি দেয়া হয়েছে"—এর যে অর্থ আপনি দাবী করেছেন—তার স্বপক্ষে আপনার কি যুক্তি আছে ? রসূলুল্লাহ (স)-এর উল্লিখিত বাণীর অর্থ তো এও হতে পারে—যা আপনার বিরোধী পক্ষ দাবী করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা দাবী করেন যে, এই সাত হরফের তাৎপর্য হচ্ছে, কুরআন মজীদ আদেশ, নিষেধ, তিরষ্কার, উৎসাহ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন, কিস্সা-কাহিনী ও উপমা-দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বিষয় সহ নাযিল হয়েছে। আর আপনারও জানা আছে যে, সালফে সালেহীন ও উম্মাতের সর্বোত্তম লোকেরা এই শেষোক্ত মতের প্রবক্তা।

তার আপত্তির জবাবে বলা যায়, যে সব আলেম হাদীসের উক্তরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন তাঁরা কখনও এ দাবী করেননি যে, আমার গৃহীত ব্যাখ্যা ভুল। যদি তাঁরা এইরূপ কথা বলতেন, তবে আমার ব্যাখ্যা তাদের ব্যাখ্যার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হত। বরং তাঁরা "কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে"—এর ব্যাখ্যায় তাদের উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে সাত হরফ-এর অর্থ কুরআনের বক্তব্যের সাতটি দিক রয়েছে। তাদের এমতের সমর্থনেও রসূলুল্লাহ (স)-এর

হাদীস ও সাহাবাগণের বক্তব্য রয়েছে। এর কতিপয় হাদীস আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং সংক্ষেপে কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করব। যেমন এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

امرت ان اقرأ القران على سبعة احرف من سبعة ابواب الجنة.

"আমাকে সাত হরফে কুরআন পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তা বেহেশতের সাতটি দরজার অন্তর্ভুক্ত।"

এখানে 'সাত হরফ'-এর অর্থ আমরা বলেছি 'সাতটি আঞ্চলিক ভাষা'। আর 'বেহেশতের সাত দরজার'-র তাৎপর্য হচ্ছে কুরআনের বক্তব্যের মধ্যে আদেশ, নিষেধ, অনুপ্রেরণা দান, ভয় প্রদর্শন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, উপমা ও দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি কুরআনের এই বিষয়বস্তুর উপর যথাসাধ্য আমল করবে, তার জন্য বেহেশ্ত অবধারিত হয়ে যাবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। পূর্ববর্তী আলেমগণ যে মত প্রকাশ করেছেন তা আমার বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। বরং তা আমার বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করে। অর্থাৎ আমি বলেছি যে, সাত হরফ-এর অর্থ সাতটি আঞ্চলিক ভাষার সমন্বয়ে কুরআন নাযিল হয়েছে। এর সমর্থনে আমি প্রামাণ্য হাদীসসমূহও উপস্থাপন করেছি। এগুলো নবী করীম (স)-এর নিকট থেকে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), উবাই ইব্ন কা'ব (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন। সাহাবাগণ কুরআনের পাঠ-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন, কিন্তু তার অর্থ নিয়ে বিরোধ করেননি, তাঁরা নিজেদের এই বিতর্কের ফয়সালার জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছেন। তিনি প্রত্যেককে কুরআনের মূল পাঠ তাঁকে পড়ে শুনানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের পরস্পরের পাঠের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রত্যেকের পাঠ যথার্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এতে কোন কোন সাহাবীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তাঁদের সন্দেহ দূর করার জন্য বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সাত রীতিতে কুরআন পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।"

আর একথা সুস্পষ্ট যে, তাদের পাঠের এই মতবিরোধ যদি হালাল-হারাম, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি, ভয়-ভীতি এবং অনুরূপ কোন বিষয় নিয়ে হত, তাহলে তাঁদের সকলের পাঠকে শুদ্ধ এবং যথার্থ বলা নবী করীম (স)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পঠন-পদ্ধতির অনুসরণ করার অনুমতি দেয়াও তাঁর জন্য অসম্ভব ছিল। কেননা তিনি যদি তাঁদের ঐরূপ মতবিরোধ অনুমোদন করতেন তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কালামে মজীদে পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ এক ধরনের পাঠ কোন জিনিসকে বৈধ করে দিত যা আল্লাহ্ অবৈধ করেছেন। একই ভাবে তা এমন একটি জিনিসকে অবৈধ করে দিত যা আল্লাহ্ তা'আলা বৈধ করেছেন। এর ফলে কোন ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে চাইলে করতে পারত, আর কোন ব্যক্তি তা বর্জন করতে চাইলেও তা বর্জন করতে পারত।

এই মত গ্রহণ করা হলে তার ফল এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে যে জিনিস নিষিদ্ধ করেছেন তা বৈধ বলে প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

"তারা কি গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পড়ে না ? তা যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসত তবে এতে তারা অনেক কিছুই বর্ণনা বৈপরীত্য দেখতে পেত"-(সূরা নিসা ঃ ৮২)।

আয়াতের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ভাষায় তাঁর উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে কোনরূপ বৈপরিত্য বা স্ববিরোধিতা নেই, এর নির্দেশ এক এবং অখণ্ড, গোটা মানব জাতির জন্য একই নির্দেশ বর্তমান, কোন জনগোষ্ঠীর জন্য ভিন্নতর নির্দেশ বর্তমান নেই।

আমাদের বক্তব্য যে সঠিক এবং আমাদের প্রতিপক্ষের বক্তব্য যে ভ্রান্ত তা নবী করীম (স)-এর কথা (কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে)—থেকেও প্রমাণিত হয়। সাহাবাগণ পরস্পরের কিরাআত (পাঠ) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে অভিযোগ করেছেন এবং তিনি তাঁদের প্রত্যেকের পাঠকে যথার্থ বলেছেন এবং প্রত্যেককে নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআন পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।

অর্থের পার্থক্যের প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ (স) যদি তাঁদের প্রত্যেকের পাঠকে অনুমোদন করতেন তাহলে নবী করীম (স)-এর কথা "কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে"-এর অর্থ এই দাঁড়াত যে, কুরআন মজীদ সাতটি পরস্পর বিরোধী অর্থ ও দৃষ্টিকোণ সহকারে নাযিল করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা যে বলেছেন, তার কিতাবে কোন স্ববিরোধী বক্তব্য নেই, তা পরস্পর বিরোধী অর্থ প্রদান করে না এবং এর আয়াতগুলোও পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ—রসূলুল্লাহ (স) যেন তা অস্বীকার করলেন। সুতরাং এধরনের অর্থ গ্রহণ সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অবৈধ।

অতএব দলীল-প্রমাণের দ্বারা একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) একই সময়ে এবং একই বিষয়ে দুটি পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দেননি। তিনি তাঁর উম্মাতকেও এরূপ অর্থ গ্রহণ করার অনুমতি দেননি—যা কুরআন মজীদ সরাসরি অবৈধ ঘোষণা করেছে। অতএব কুরআনের সাহায্যে উপকৃত হতে চাইলে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য "কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে"—যে অর্থ করেছি তা-ই সঠিক এবং যথার্থ বলে গ্রহণ করতে হবে এবং এর বিপরীত ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত মনে করতে হবে। সাহাবাগণ কুরআনের মূলে পাঠকে কেন্দ্র করেই সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন এবং তা নিরসনের জন্যই রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি তাঁদের কারও পাঠ-পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা যে তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর কিতাবে কোন জিনিস করার নির্দেশ দিয়েছেন, কোন কাজ না করতে বলেছেন, তাদেরকে তাঁর অনুগত্য করার আহবান জানিয়েছেন, তাঁর রসূলকে যুক্তি-প্রমাণ দান করেছেন, বান্দাদের জন্য উপমা ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন—তাদের পাঠের পার্থক্যের কারণে উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। বরং তাঁদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল পাঠ-পদ্ধতি সংক্রান্ত এবং ভাষাগত।

এরপর আমাদের কথার যথার্থতা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এর সমর্থনে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্তমান রয়েছে। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি এক রীতিতে কুরআন পাঠ করুন। মীকাঈল (আ) বললেন, তাকে আরও বাড়িয়ে দিতে বলুন। জিবরাঈল (আ) বললেন, তাহলে দুই রীতিতে পাঠ করুন। এভাবে তিনি ছয় অথবা সাত রীতি পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি আরও বললেন, এর প্রতিটি রীতিই যথেষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত আযাবের আয়াতকে রহমাতের আয়াতে এবং রহমাতের আয়াতকে আযাবের আয়াতে পরিবর্তিত না করা হবে।

এ হাদীসের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সাত রীতির পার্থক্য ছিল মূলত সমার্থবোধক শব্দের ব্যবহারগত পার্থক্য। যেমন هلم (আস) ও تعال (আস) ভিন্ন দুটি শব্দ হলেও উভয়টির অর্থ একই। অর্থের পার্থক্য না হওয়ায় নির্দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত হয়নি।

عن عبد الله بن مسعود قال انى قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرءوا
كما علمتم واياكم والتنطع فانما هو كقول احدكم هلم وتعال.

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআনের পাঠ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পাঠ শুনেছি। তাঁদের পাঠকে আমি প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখেছি। অতএব তোমাদের যেভাবে শিখানো হয়েছে, সেভাবেই পাঠ কর। কিন্তু সাবধান! বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে। কেননা (পাঠের মধ্যেকার এই পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে,) তোমাদের কেউ বলল, هلم অথবা تعال (দুটি ভিন্ন শব্দ হলেও উভয়ের অর্থ একই)।

ইব্‌ন মাসঊদ (রা) আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে (অনুমোদিত) রীতিতে কুরআন পাঠ করছে, সে যেন তা পরিত্যাগ করে অন্য রীতি গ্রহণ না করে। আমি যদি জানতে পারি যে, কোন ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক বেশী জানে—তাহলে আমি তার নিকট (জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে) যাই।

ইব্‌ন মাসঊদ (রা) আরও বলেন, যে ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট রীতিতে কুরআন পাঠ করে—সে যেন তা পরিত্যাগ করে ভিন্নতর রীতি গ্রহণ না করে।

অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সাত হরফের এই অর্থ করেননি যে, যে ব্যক্তি কুরআনে আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করে সে যেন তা পরিত্যাগ করে ওয়াদা ও শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতে চলে না যায়, অথবা যে ব্যক্তি ওয়াদা ও শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করে সে যেন তা পরিত্যাগ করে কিসসা-কাহিনী ও দৃষ্টান্ত-উপমা সম্পর্কিত আয়াতে চলে না যায়। বরং তিনি সাত হরফের অর্থ করেছেন—সাত রীতিতে কুরআনের পঠন, অর্থাৎ সাত কিরাআত। যেমন আরবের লোকেরা কোন ব্যক্তির কিরাআতকে বলে থাকে অমুকের হরফ (পাঠ)। অর্থাৎ হরফ-এর অর্থ তারা 'কিরাআত' করে থাকে। তারা আরবী ভাষার অক্ষরগুলোকে 'হরফ' বলে থাকে, যেমন তারা কারও কবিতাকে বলে থাকে অমুকের কলেমা (বক্তব্য)। অতএব কুরআন পাঠের এক রীতির প্রতি বিরক্ত হয়ে অন্য রীতি গ্রহণ করা ঠিক নয়।

যে ব্যক্তি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-র পঠন-রীতি, অথবা যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-র পঠন-রীতি, বা রসূলুল্লাহ (স)-এর অপরাপর সাহাবীর পঠন-রীতি, অর্থাৎ সাতটি পঠন-রীতির যে কোন একটি রীতিতে কুরআন পাঠ করে—সে যেন তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অন্য রীতি গ্রহণ না করে। কেননা এর কোন রীতির অস্বীকৃতি এর সবকটি রীতির প্রতি অস্বীকৃতির নামান্তর।

عن الاعمش قال قرأ انس بن مالك هذه الاية : "ان ناشئة الليل هى اشد

وطأ و أصوب قيلا". فقال له بعض القوم يا أبا حمزة انما هي "وأقوم". فقال أقوم وأصوب وأهدى واحد.

আ'মাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) সূরা মুয্‌যাম্মিল-এর ৬নং আয়াতের أقوم শব্দের পরিবর্তে أصوب শব্দ যোগে কিরাআত পাঠ করতেন। কোন কোন লোক তাঁকে বলল, হে আবু হামযাহ! শব্দটিতো أقوم হবে। তিনি বললেন, أقوم - أصوب ও أهدى সমার্থবোধক শব্দ।

লাইছের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মুজাহিদ পাঁচ রীতিতে কুরআন পাঠ করতেন। সালিম থেকে বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইব্‌নে জুবায়র দুই রীতিতে কুরআন পাঠ করতেন।

মুগীরাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনুল ওয়ালীদ তিন রীতিতে কুরআন পাঠ করতেন।

"কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে"—এর অর্থ সাতটি দিক অর্থাৎ, আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা, সতর্কবাণী, বিতর্ক, কাহিনী উপমা-দৃষ্টান্ত—ইত্যাদি মনে করা ঠিক নয়। এই রকম যার ধারণা হয় সে কি মনে করে যে, মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌নে জুবায়র সাত রীতির মধ্যে দুই অথবা পাঁচ রীতিতে পড়তেন না, বরং তাঁরা উল্লিখিত দিকগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন পড়তেন? ঐ ব্যক্তি যদি তাঁদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করে তবে তাঁদের সম্পর্কে অমূলক ধারণা করা হবে।

মুহাম্মাদ বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, নবী করীম (স)-এর নিকট জিবরীল (আ) এবং মীকাঈল (আ) আসলেন, জিবরীল (আ) তাঁকে বললেন, আপনি দুই রীতিতে কুরআন পাঠ করুন। মীকাঈল (আ) রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, আপনি তাঁকে আরও বাড়িয়ে দিতে বলুন। তখন জিবরীল (আ) বললেন, আপনি তিন রীতিতে কুরআন পড়ুন। মীকাঈল (আ) রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, আপনি তাঁকে আরও বাড়িয়ে দিতে বলুন। এভাবে সাত রীতি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হল।

রাবী মুহাম্মাদ বলেন, হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। সাত রীতির ব্যাপারটি হচ্ছে এরূপ هلم - تعال - أقبل শব্দ ভিন্ন হলেও অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। তিনটি শব্দেরই অর্থ হচ্ছে "আস"। যেমন আমরা পড়ে থাকি, ان كانت الا صيحة واحدة কিন্তু ইব্‌নে মাসউদ (রা)-র কিরাআত হচ্ছে ان كانت الا زقية واحدة (সূরা ইয়াসীন ঃ ২৯)।

শু'আইব ইবনুল হাব্‌হাব্ বলেন, আবুল 'আলিয়ার সামনে কেউ কুরআন পাঠ করলে তিনি একথা বলতেন না, "সে যেরূপ পড়েছে তদ্রূপ নয়," বরং তিনি বলতেন, "তবে আমি এই রীতিতে পড়ে থাকি"।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর কালামে মজীদে উল্লেখ করেছেন ঃ

ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه اعجمى وهذا لسان عربى مبين ○

"আমরা জানি, এই লোকেরা আপনার সম্পর্কে বলে যে, এই লোকটিকে এক ব্যক্তি কুরআন শিখিয়ে দেয়। অথচ তারা যে লোকটির কথা বলছে, তার ভাষা অনারব, আর এই কুরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়-" (নাহল : ১০৩)। আর জনৈক অহী লেখক অহী লিখত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু-আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের শেষে তাকে سميع عليم অথবা عزيز حكيم ইত্যাদি লেখার জন্য বলে দিতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী গ্রহণের জন্য মনোনিবেশ করতেন। পরে সে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করত শব্দটি কি عزيز حكيم বা سميع عليم অথবা عزيز عليم - ? তখন রসূলুল্লাহ (স) তাকে বলতেন, তুমি যা লিখেছ তাই। এই কথাটি তার জন্য ফিতনার কারণ হয় এবং সে বলে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব আমি যা চাই তাই লিখে দেই। ইবনে শিহাব বলেন, এই তারতম্য সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সাত হরফ (পঠন পদ্ধতি) বলে উল্লেখ করেছেন।

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের কোন একটি পঠন পদ্ধতি অস্বীকার করে সে যেন কুরআনের সবগুলো পঠন পদ্ধতি অস্বীকার করল।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বর্তমানে বিদ্যমান মাসহাফে (লিখিত কুরআন) অবশিষ্ট ছয়টি রীতি বর্তমান নাই কেন ? অথচ রসূলুল্লাহ (স) নিজে তা তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তদনুযায়ী পাঠ করার অনুমতি দিয়েছেন এবং আল্লাহু তা'আলা তাঁর নবীর উপর তা নাযিল করেছেন। তা কি মানসূখ (রহিত) করে দেয়া হয়েছে এবং তার পাঠ প্রত্যাহার করা হয়েছে ? তাহলে মানসূখ হওয়া বা প্রত্যাহৃত হওয়ার স্বপক্ষে কি প্রমাণ আছে ? অথবা উম্মাত কি তা ভুলে গেছে ? তাহলে তাদেরকে কুরআন সংরক্ষণ করে রাখার জন্য যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা তারা পালন করেনি। এ সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাপার কি ?

জওয়াবে বলা যেতে পারে, তা মানসূখও হয়ে যায়নি, অতঃপর তার পাঠও প্রত্যাহার করা হয়নি, উম্মাত তা বিলুপ্তও করেনি। বরং আসল ব্যাপার হচ্ছে তাদেরকে কুরআন মজীদ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে—সাত হরফের যে কোন হরফে, তাদের ইচ্ছা মত। যেমন কাফ্‌ফারার ব্যাপারটি। তিনটি জিনিসের যে কোন একটি দিয়ে কাফফারা আদায় করার ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বাধীন। সে ইচ্ছা করলে ক্রীতদাস মুক্ত করার মাধ্যমে, অথবা দরিদ্রকে আহার, অথবা কাপড় দানের মাধ্যমে কাফফারা আদায় করতে পারে। যদি এই তিনটি জিনিস দিয়েই যুগপৎভাবে কাফফারা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হত তবে তা একটা কঠিন নির্দেশে পরিণত হত। কুরআন সংরক্ষণ ও তা পাঠের ব্যাপারটিও তদ্রূপ। এ ব্যাপারে উম্মাতকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তারা সাত হরফের যে কোন হরফে কুরআন পাঠ ও সংরক্ষণ করতে পারে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, উম্মাত ছয় হরফ বাদ দিয়ে মাত্র এক হরফে কুরআন সংরক্ষণ করল—এর কারণ কি ?

যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রা) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে রসূলুল্লাহু (স)-এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী শহীদ হওয়ার পর হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু বাক্‌রসিদ্দীক (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, কীট-পতংগ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ন্যায় ইয়ামামার যুদ্ধে নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ নিহত হয়েছেন। আমার আশংকা হচ্ছে ভবিষ্যতেও এরূপ যুদ্ধ সমূহে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং শহীদ হবেন ফলে কুরআনের বহু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, কারণ তাঁরা হচ্ছেন কুরআনের হাফিয। অতএব আপনি যদি তা একত্রে সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যবস্থা করতেন

(তবে ভালোই হত)। হযরত আবূ বাক্‌র (রা) এতে দ্বিমত পোষণ করে বললেন, যে কাজ রসূলুল্লাহ্ (স) করেননি তা আমি কি ভাবে করতে পারি? তাঁরা উভয়ে এ ব্যাপারে মতবিনিময় করছিলেন। অতঃপর আবূ বাক্‌র (রা) যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। যায়েদ (রা) বলেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন উমার (রা) ইতস্তত অবস্থায় ছিলেন। আবূ বাক্‌র (রা) বললেন, এই ব্যক্তি আমাকে একটি কাজ করার আহবান জানাচ্ছে, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি। আপনি হচ্ছেন ওহী লেখক সাহাবী। যদি আপনি তাঁর সাথে একমত হন তবে আমি আপনাদের অনুসরণ করব। আর যদি আপনি আমার সাথে একমত হন তবে আমি তা করব না। যায়েদ (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমার কাছে উমার (রা)-র বক্তব্য তুলে ধরলেন এবং উমার (রা) নীরব থাকলেন। আমিও তাঁর কথায় দ্বিমত পোষণ করে বললাম, যে কাজ রসূলুল্লাহ্ (স) করেননি তা কি আমরা করতে পারি? এর পরিপ্রেক্ষিতে উমার (রা) বললেন, তা করলে আপনাদের কি ক্ষতি হবে? যায়েদ (রা) বলেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বললাম, কোন ক্ষতি নাই। আল্লাহ্‌র শপথ! এ কাজে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। যায়েদ (রা) বলেন, আবূ বাক্‌র (রা) আমাকে তা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী আমি তা চামড়া, কাঁধের হাড় এবং গাছের বাকলে লিপিবদ্ধ করি।

হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-র ইন্তিকালের পর হযরত উমার (রা) গোটা কুরআন মজীদ একটি গ্রন্থের আকারে লিখে নেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় এটা তাঁর নিকটেই থাকে। তাঁর ইন্তিকালের পর এই সংকলনটি তাঁর কন্যা এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী হযরত হাফসা (রা)-র নিকট সংরক্ষিত থাকে। অতঃপর হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) আরমেনিয়ার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেই হযরত উসমান (রা)-র বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই উম্মাতকে রক্ষা করুন। উসমান (রা) বললেন, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, আমি আরমেনিয়া বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছি। ইরাক ও সিরিয়ার লোকেরাও তাতে অংশ গ্রহণ করে। সিরিয়ার লোকেরা উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর কিরাআত অনুযায়ী কুরআন পড়ে, যা ইরাকবাসীদের নিকট অজ্ঞাত। অতএব ইরাকের লোকেরা এই পাঠ অস্বীকার করে। অপর দিকে ইরাকবাসীরা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-র কিরাআত অনুযায়ী কুরআন পড়ে, যা সিরিয়াবাসীরা কখনও শুনেনি। অতএব তারা ইরাক-বাসীদের পাঠ প্রত্যাখ্যান করে।

যায়েদ (রা) বলেন, হযরত উসমান ইব্‌ন 'আফফান (রা) তাঁর জন্য আমাকে কুরআনের একটি সংকলন তৈরী করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, আমি একজন দক্ষ ভাষাবিদকেও আপনার সাথে দিচ্ছি। অতএব যে আয়াত সম্পর্কে আপনারা উভয়ে একমত হবেন তা লিপিবদ্ধ করবেন। আর যে আয়াত নিয়ে দ্বিমত পোষণ করবেন তা আমার নিকট পেশ করবেন। অতএব তিনি আবান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আসকে তাঁর সহযোগী করলেন।

তাঁরা উভয়ে যখন إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت আয়াতে পৌঁছিলেন, তখন যায়েদ (রা) বললেন, শব্দটি التابوه হবে এবং আবান (রা) বললেন, التابوت হবে। অতএব বিষয়টি হযরত উসমান (রা)-র নিকট পেশ করা হলে তিনি আবানের পক্ষে রায় দিলেন এবং তদনুযায়ী التابوت লেখা হল।

৫—

যায়েদ (রা) বলেন, যখন একাজ থেকে অবসর হলাম, এর মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াত পেলাম না :

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ

مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ○ (الاحزاب ٢٣)

আমি এ সম্পর্কে মুহাজির সাহাবীদের নিকট জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা কিছুই বলতে পারলেন না। অতঃপর আমি আনসারদের নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাদের কারও কাছে তা পেলাম না। অবশেষে আমি তা খুযাইমা ইব্‌ন সাবিত আল-আনসারী (রা)-র নিকট পেয়ে গেলাম এবং সংকলনে শামিল করে নিলাম। এক্ষেত্রে আমি আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হলাম। প্রণীত সংকলনে নিম্নোক্ত আয়াত দুটিও খুঁজে পেলাম না :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ... ... (الى

اخر السورة) - التوبة

এ আয়াত সম্পর্কেও আমি মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের নিকট খোঁজ নেই, কিন্তু তাঁদের কারও কাছে পাইনি। অবশেষে খুযাইমা আনসারী (রা)-র নিকট তা পেয়ে যাই। অতএব আয়াত দুটি আমি সূরা বারাআতের শেষে লিপিবদ্ধ করি। যদি আয়াত সংখ্যা তিন হত তবে আমি তা ভিন্ন সূরা হিসাবে লিপিবদ্ধ করতাম। আমি পুনর্বার আমাদের সংকলিত পাণ্ডুলিপি যাচাই করি কিন্তু তাতে বাদ পড়েছে এমন কিছু আর পাইনি।

অতঃপর হযরত উসমান (রা) হাফসা (রা)-র নিকট রক্ষিত কুরআনের পূর্বোক্ত সংকলন চেয়ে পাঠান এবং তাঁকে শপথ করে বলেন যে, তা অবশ্যই তাঁকে ফেরত দেয়া হবে। হাফ্‌সা (রা) তাঁর নিকট সংকলনটি পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর দুটি সংকলন পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করা হল। উভয়টির মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত হাফসা (রা)-র সংকলনটি তাঁকে ফেরত দেয়া হল। উসমান (রা) খুবই আনন্দ বোধ করলেন এবং লোকদেরকে এই সংকলন থেকে নিজ নিজ কপি লিখে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত হাফসা (রা)-র ইন্তিকালের পর তাঁর কাছে রক্ষিত মাসহাফ (সংকলন) তাঁর ভাই 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা)-র নিকট রক্ষিত থাকে। অতঃপর তাঁর নিকট থেকে তা চেয়ে নিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে অক্ষরগুলো মুছে ফেলা হয়।

আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা)-র খিলাফতকালে এক একজন শিক্ষক ছাত্রদেরকে এক একজন কারীর কিরাআত অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা দিত। ফলে ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে কিরাআত নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা শিক্ষকদের পর্যন্ত পৌঁছে। আইউব বলেন, তাদের ঝগড়া এই পর্যন্ত পৌঁছে যে, তারা একে অপরের কিরাআতকে অস্বীকার করে বসে। ব্যাপারটি হযরত 'উসমান (রা)-র কানে পৌঁছল। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, তোমরা আমার সামনে কুরআনের পাঠ নিয়ে মতবিরোধ করছ। আমার থেকে দূরে বিভিন্ন শহরে যেসব জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে আরও তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। হে মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবিগণ! তোমরা সম্মিলিতভাবে লোকদের জন্য একটি সংকলন প্রস্তুত কর।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, যাঁদের দিয়ে কুরআন নকল করানো হত আমি ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কখনো কখনো তাঁরা কোন আয়াতের পাঠ নিয়ে মতবিরোধ করতেন তখন কোন ব্যক্তির বরাত দিয়ে বলা হত যে, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে আয়াতটি শিখেছেন। অথচ তাকে হয়ত তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত পাওয়া যেতনা, অথবা তিনি হয়তো সে সময় গ্রামাঞ্চলে বসবাস করছেন। অতএব তাঁরা আয়াতের পূর্বেরটুকু এবং পরেরটুকু লিখে নিতেন এবং বিতর্কিত স্থানটুকু খালি রাখতেন। অতঃপর সেই লোক ফিরে আসলে অথবা তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে তা জেনে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে তা লিখে দেয়া হত। যখন মাসহাফ (গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলন) তৈরী হয়ে গেল, তখন উসমান (রা) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিঠি লিখে জানালেন, আমি কুরআনের এরূপ একটি সংকলন প্রস্তুত করেছি এবং নিজের কাছের পূর্বেকার যা কিছু, ছিল তা বিলুপ্ত করে দিয়েছি। অতএব, তোমরাও নিজেদের কাছেরগুলো বিলুপ্ত করে দাও।

আনাস ইব্ন মালিক আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আযারবাইজান ও আর্মেনিয়ার যুদ্ধে সিরিয়া ও ইরাকের লোকেরা অংশগ্রহণ করেছিল। তারা পরস্পর কুরআন নিয়ে আলোচনা করে এবং মতবিরোধে লিপ্ত হয়। এমনকি এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ-বিশৃংখলার উপক্রম হয়। কুরআনকে কেন্দ্র করে তাদের এই মতবিরোধ লক্ষ্য করে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) হযরত 'উসমান (রা)-র নিকট এসে উপস্থিত হন এবং বলেন, লোকেরা কুরআন নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! আমার আশংকা হচ্ছে, তারা ইহুদী-খৃস্টানদের মত মতবিরোধ করে বিপদে পতিত হবে। রাবী বলেন, 'উসমান (রা)-ও ভীষণভাবে শংকিত হয়ে পড়লেন। আবু বাক্র (রা) যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা)-কে নির্দেশ দিয়ে কুরআনের যে সংকলন তৈরী করিয়েছিলেন তা তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-র নিকট থেকে চেয়ে নিলেন। অতঃপর তা থেকে কয়েকটি কপি তৈরী করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেন।

ইমাম যুহরী (র) বলেন, নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের সময় কুরআন মজীদ গ্রন্থাকারে একত্রে সংকলিত ছিল না। তা খেজুর গাছের বাকল ও হাড়ের উপর লিপিবদ্ধ ছিল।

সা'সা'আহ (صعصعة) বলেন, আবু বাক্র (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি সন্তানহীন ও পিতামাতাহীন ব্যক্তির (كلالة) ওয়ারিস নির্ধারণ করেন এবং কুরআন মজীদ গ্রন্থাকারে সংকলন করেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, 'উসমান (রা) কুরআনের যে সংকলন তৈরী করিয়েছিলেন এবং তার অনেকগুলো কপি প্রস্তুত করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়েছিলেন—এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস রয়েছে। মুসলিম উম্মাতের প্রতি এটা ছিল তাঁর একটা বিরাট অবদান। কুরআনের মূল পাঠ-কে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, এতে তিনি তাদের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করার আশংকা করছিলেন। সমসাময়িক কালে দীনের জন্য এটাকে তিনি সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ বলে মনে করলেন। কুরআন এক রীতিতে পাঠ ও এক রীতিতে সংকলন করার জন্য এবং অবশিষ্ট রীতিভিত্তিক মাসহাফ-গুলো পুড়ে ফেলতে ঐ সমূহ বিপদই তাঁকে বাধ্য করেছিল। তিনি গোটা দেশবাসীকে তাদের কাছে রক্ষিত সংকলন পুড়ে ফেলারও নির্দেশ দেন। উম্মাতের জন্য এটা ছিল একটা কঠিন নির্দেশ। এভাবে অবশিষ্ট ছয় রীতি পরিত্যক্ত হয়। যুগের পরিক্রমায় তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমান কালে (হিঃ ৩০৬) তা অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে আজকার গোটা মুসলিম উম্মাত কোন মতবিরোধ ছাড়াই একই মাসহাফ পাঠ করছে। তাদের

পাঠের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মুসলিম জাতির জন্য এটা ছিল হযরত উসমান (রা)-র এক অতুলনীয় অবদান।

এখন কোন স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নবী করীম (স) যে কিরআত পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পরিত্যাগ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? এর জওয়াবে বলা যায়, তিনি উম্মাতকে সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর নির্দেশ বাধ্যতামূলক নির্দেশের পর্যায়ভুক্ত ছিল না, বরং তা ছিল ঐচ্ছিক নির্দেশ। কেননা সাত রীতিতে কুরআন পাঠের এই নির্দেশ যদি বাধ্যতামূলক হত তাহলে সবগুলো রীতিই আয়ত্ত করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ত এবং সাতটি রীতিতেই গোটা কুরআন সংরক্ষণ করতে হত। এ ব্যাপারে তাঁদের কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হত না।

আবার কুরআনের মধ্যে কোন শব্দের উপর স্বরচিহ্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অথবা কোন শব্দের কাঠামো ঠিক রেখে অক্ষর বিশেষের পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। তাহলে নবী করীম (স)-এর নিম্নোক্ত বাণী কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

امرت ان اقرأ القرآن على سبعة احرف بمعزل

"আমাকে পৃথক পৃথক ভাবে সাত রীতিতে কুরআন পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

একথা পরিষ্কার যে, স্বরচিহ্ন কুরআনে ব্যবহৃত অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত নয়, অর্থাৎ এগুলো অক্ষর হিসাবে গণ্য নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মতপার্থক্য কোন একজন আলেমের মতেও কুফরীর পর্যায়ে পড়ে না।

এখন যদি কেউ বলে যে, যে সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে—এ সম্পর্কে কি আপনার কিছু জানা আছে? তা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, অবশিষ্ট যে ছয়টি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন নাযিল করা হয়েছে—এখন আর আমাদের জন্য তা জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা সেগুলো জ্ঞাত হওয়া গেলেও সেই ভাষায় এখন আর আমরা কুরআন পাঠ করব না। তার কারণসমূহ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে কথিত আছে যে, এর পাঁচটি আঞ্চলিক ভাষা হাওয়াযিন গোত্রের পাঁচটি শাখা ব্যবহার করত এবং দুটি কুরাইশ ও খুযা'আ গোত্র ব্যবহার করত। এ সম্পর্কিত হাদীস হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে। এ হাদীসের সনদে দেখা যায় যে, কাতাদা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। অথচ তাঁর সাথে কাতাদার সাক্ষাতও হয়নি এবং তিনি তাঁর নিকট থেকে কিছু শুনেন নি। অতএব এ হাদীস প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عن قتادة عن ابن عباس قال نزل القرآن بلسان قريش ولسان خزاعة - وذالك
ان الدار واحدة ○

"ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, কুরআন কুরাইশ ও খুযাআ গোত্রের ভাষায় নাযিল হয়েছে। অবশ্য উভয়ের উৎস একই।"

অপর এক বর্ণনায় আছে, "আবুল আসওয়াদ আদ-দায়লী বলেন, কুরআন কা'ব ইবন 'আমর ও সা'দ ইবন বাকর এই গোত্রদ্বয়ের ভাষায় নাযিল হয়েছে। খালিদ ইবন সালামা এ হাদীস প্রসংগে সা'দ ইবন ইবরাহীমকে বললেন, "আপনি কি এই অন্ধের কথায় আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন যে, সে বলছে—কুরআন বানু কা'বের দুই উপগোত্রের ভাষায় নাযিল হয়েছে ! অথচ তা কুরাইশদের ভাষায় নাযিল হয়েছে।"

আর নবী (স)-এর বাণী, "কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে", তার প্রতিটি রীতিই যথেষ্ট (شاف كاف) এ সম্পর্কে যেমন মহান আল্লাহ্‌র কিতাবে উল্লেখ আছে ঃ

يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ○

"হে মানব জাতি ! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নসীহত এসেছে, তা অন্তরের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময় দানকারী। আর মুমিনদের জন্য তা পথপ্রদর্শক ও রহমাতের বাহন"—(সূরা ইউনুস ঃ ৫৭)

অতএব হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদকে মুমিনদের জন্য নিরাময় দানকারী বানিয়েছেন। শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে তাদের অন্তরে যে সব মনস্তাত্ত্বিক রোগের সৃষ্টি হয়, কুরআন মজীদের উপদেশসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে তারা এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে। অন্য সব কিছুর মোকাবিলায় এই কুরআনের উপদেশাবলী তাদের জন্য যথেষ্ট।

কুরআন বেহেশতের সাত দরজায় নাযিল হয়েছে

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর যেসব হাদীস বর্ণিত আছে তার মধ্যে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স) বলেন ঃ

كان الكتاب الاول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد ○ ونزل القران من سبعة ابواب وعلى سبعة احرف ؛ زجر وامر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال ○ فاحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما امرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بامثاله واعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه وقولوا امنا به كل من عند ربنا ○

"পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এক অধ্যায় এবং এক রীতিতে নাযিল হয়। কিন্তু কুরআন মজীদ সাত অধ্যায় ও সাত রীতিতে নাযিল হয় ঃ সতর্কবাণী, আদেশ, হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ ও দৃষ্টান্ত। অতএব তোমরা এর হালালকে হালাল হিসাবে গ্রহণ কর, এর হারামকে হারাম জ্ঞানে বর্জন কর, যে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কর, যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত

থাক, এর উপমা-দৃষ্টান্ত থেকে উপদেশ গ্রহণ কর, এর মুহকাম আয়াত অনুযায়ী আমল কর, এর মুতাশাবিহ আয়াতের উপর ঈমান আন এবং বল, আমরা এর উপর ঈমান আনলাম, সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।"

অপর একটি মুরসাল হাদীস থেকে আবু কিলাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, নবী করীম (স) বলেছেন :

"انزل القرآن على سبعة احرف امر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل "

"কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে : আদেশ, সতর্কবাণী, উৎসাহব্যঞ্জক বাণী, ভীতিমূলক বাণী, যুক্তিপ্রমাণ, কিসসা-কাহিনী ও উপমাসমূহ সহকারে।"

উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স) আমাকে বলেছেন :

ان الله امرني ان اقرأ القران على حرف واحد فقلت رب خفف عن امتي قال اقرأه

على حرفين فقلت رب خفف عن امتي فامرني ان اقرأه على سبعة احرف من سبعة

ابواب من الجنة كلها شاف كاف ○

"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এক হরফে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দেন। আমি বললাম, প্রভু! আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিন। তিনি বললেন, তাহলে দুই হরফে তা পাঠ করুন। আমি আবার বললাম, প্রভু! আমার উম্মাতের প্রতি সহজ করুন। তিনি আমাকে সাত হরফে কুরআন পড়ার নির্দেশ দেন। তা হচ্ছে বেহেশতের সাতটি দরজার অন্তর্ভুক্ত। এর প্রতিটি হরফই (পাঠরীতি) নিরাময় বিধানকারী এবং যথেষ্ট।"

অপর একটি সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

ان الله انزل القرآن على خمسة احرف حلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال - فاحل

الحلال وحرم الحرام واعمل بالمحكم وامن بالمتشابه واعتبر بالامثال ○

"আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ হরফে কুরআন নাযিল করেছেন : হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ ও উপমাসমূহ সহকারে। অতএব হালালকে হালাল বিশ্বাসে গ্রহণ কর, হারামকে বর্জন কর, মুহকাম আয়াত অনুযায়ী আমল কর, মুতাশাবিহ আয়াতের প্রতি ঈমান আন এবং উপমা-দৃষ্টান্তসমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর।"

উল্লিখিত হাদীসসমূহ আমরা রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছি। এর অর্থের মধ্যে মোটামুটি সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তির নিম্নোক্ত কথা একই অর্থ বহন করে :

فلان متقدم على باب من أبواب هذا الأمر -

وفلان متقدم على وجه من وجوه هذا الأمر -

وفلان متقدم على حرف من هذا الأمر -

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন একদল বান্দা সম্পর্কে বলেন যে, তারা কোন এক পদ্ধতিতে তাঁর 'ইবাদত করে। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা এক পন্থায় তাঁর ইবাদত করে। তিনি বলেছেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ -

"লোকদের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্তি রয়েছে যারা এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহ্র 'ইবাদত করে" —(সূরা হজ্জ : ১১)। অর্থাৎ, তারা দ্বিধা-সংকোচ ও সন্দেহ-সংশয় সহকারে তাঁর ইবাদত করে, তাঁর নির্দেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং তা সর্বান্তঃকরণে মেনে না নিয়ে তাঁর 'ইবাদত করে। অতএব নবী করীম (স)-এর বাণী :

نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ এবং نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَبْوَابٍ

একই অর্থ বহন করে। এর ব্যাখ্যা এক ও অভিন্ন। এসব হাদীসে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মাতের বিশেষত্ব ও তাদের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়েছে, যা অপর কোন নবীর উম্মাতকে দান করা হয়নি। অর্থাৎ আমাদের কিতাবের পূর্বে যেসব কিতাব নবী-রসূলদের উপর নাযিল হয়েছিল তা একটি মাত্র পঠন পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। যখন তাকে ভাষান্তরিত করা হবে তখন তা হবে একটি অনূদিত গ্রন্থ, তখন আর তাকে মূল কিতাব বলা যায় না এবং তার পাঠ-কেও মূল গ্রন্থের পাঠ বলা যায় না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কিতাব (আরবের) সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল করেছেন। এর যে কোন একটি ভাষায় পাঠক ইচ্ছা করলে তা পাঠ করতে পারে এবং তার এ পাঠ আল্লাহ্র নাযিলকৃত ভাষায় তাঁর কিতাবের পাঠ বলে গণ্য। তা এর অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গণ্য হবে না। অতঃপর যদি এই সাতটি আঞ্চলিক ভাষা থেকে কুরআন মজীদকে ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয় তাহলে এর ভাষান্তরকারীকে এর অনুবাদক বলা হবে এবং এর পাঠ মূল কিতাবের অনুবাদ পাঠ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন কোন কোন আসমানী কিতাব আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন এক ভাষায়, কিন্তু তা পঠিত হচ্ছে ভিন্ন ভাষায় (অনূদিত ভাষায়)। "পূর্বেকার কিতাব এক ভাষায় নাযিল করা হয়েছে এবং কুরআন সাত (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে—" নবী করীম (স)-এর এই বাণীর অর্থও তাই।

"পূর্বেকার কিতাব এক দরজায় নাযিল হয়েছে এবং কুরআন মজীদ সাত দরজায় নাযিল হয়েছে"— নবী করীম (স)-এর এই বাণীর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেকার যুগের নবীদের উপর যেসব কিতাব নাযিল করেছেন তাতে শরী'আতের সীমারেখা, নির্দেশাবলী ও হালাল হারামের উল্লেখ ছিল না। যেমন হযরত দাউদ (আ)-এর উপর নাযিলকৃত যাবূর কিতাব, তাতে কেবল উপদেশ ও ওয়ায-নসীহত স্থান পেয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত 'ঈসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত ইঞ্জীল কিতাব, তাতে কেবল প্রশংসা, গুণগান, ক্ষমা ও উদারতার কথাই বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু

শরী'আতের নির্দেশাবলী ও এ জাতীয় কিছু বিবৃত হয়নি। এছাড়া অন্যান্য যেসব আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল তার সমস্ত শিক্ষা সংক্ষিপ্ত আকারে কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী উম্মাতগণ কেবল একটি মাত্র পন্থায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারত। কারণ তাদের কিতাব একটি পন্থায় নাযিল করা হয়েছে, আর তা হচ্ছে জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর উম্মাতকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের কিতাব সাতটি দিক ও বিভাগ সহ নাযিল করেছেন। তারা এই বিভাগগুলোর যথাযথ অনুসরণ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও বেহেশত অর্জন করতে পারে। কুরআন মজীদের এই সাতটি বিভাগ বেহেশতের সাতটি দরজার সাথে তুলনীয়। কোন ব্যক্তি এর যে কোন একটিকে বাস্তবায়িত করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে এবং এর প্রতিটি বিভাগ বেহেশতের এক একটি বিভাগের সমতুল্য। আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তদনুযায়ী আমল করা বেহেশতের একটি দরজা, তিনি যা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পরিহার করা বেহেশতের অপর একটি দরজা, তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল হিসাবে গ্রহণ করা বেহেশতের তৃতীয় দরজা, তিনি যা হারাম করেছেন তা বর্জন করা বেহেশতের চতুর্থ দরজা, মুহকাম আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনা বেহেশতের পঞ্চম দরজা, মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ—যার প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ্র নিকট এবং তিনি এর জ্ঞানকে সৃষ্টির নিকট গোপন রেখেছেন এবং তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলে স্বীকার করা বেহেশতের ষষ্ঠ দরজা এবং উপমা, দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা বেহেশতের সপ্তম দরজা। অতএব কুরআন মজীদের সাত রীতি এবং সাতটি বিষয় এসব কিছুকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় বানিয়েছেন এবং তাদেরকে বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শনকারী বানিয়েছেন। "কুরআন বেহেশতের সাত দরজায় নাযিল হয়েছে"— নবী করীম (স)-এর এই কথার অর্থ তাই।

"প্রতিটি রীতির একটি সীমা নির্দিষ্ট আছে"— নবী করীম (স)-এর একথার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সাতটি বিষয় সহ কুরআন নাযিল করেছেন তার প্রতিটির সীমাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই সীমা অতিক্রম করা কারও জন্য জায়েয নয়।

"প্রতিটি সীমার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে"— নবী করীম (স)-এর এ কথার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা হালাল, হারাম এবং শরী'আতের অন্যান্য সব বিষয়ে যে নির্দিষ্ট সীমা ধার্য করেছেন তার সওয়াব ও শাস্তিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা বান্দা আখেরাতে জানতে পারবে এবং কিয়ামতের দিন এর ফল লাভ করবে। যেমন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, "দুনিয়ার সমস্ত সোনা-রূপা ও ধন সম্পদ যদি আমার মালিকানাধীন হত তাহলে আমি তা আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা লংঘনের বিনিময় হিসাবে দিয়ে দিতাম।" নবী করীম (স)-এর বাণী "এর প্রতিটি হরফের একটি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে"— বাহিক্য দিক বলতে মূল পাঠের বাহ্যিক দিক এবং আভ্যন্তরীণ দিক বলতে এর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বুঝানো হয়েছে।

কুরআন ব্যাখ্যার জন্য সহায়ক কতিপয় পূর্বকথা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, আমি "গ্রন্থের শুরুতে" উল্লেখ করেছি যে, পুরো কুরআন শরীফের ভাষা হচ্ছে আরবী। তবে তা আরব দেশীয় সকল গোত্রের ভাষায় নাযিল হয়নি, বরং নাযিল হয়েছে কেবল কতিপয় আরব গোত্রের ভাষায়। বর্তমানে পবিত্র কুরআনের

পাঠরীতি ঐ কতিপয় রীতিতেই আছে, যে রীতিতে তা নাযিল হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তুতে রয়েছে নূর, বুরহান, হিকমাত এবং বয়ান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, বেহেশতের সুসংবাদ এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শন, মুহকাম-মুতাশাবিহ্[১] আয়াত ও তাঁর হুকুম-আহকামের মর্মকথা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে 'বয়ান' সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। যা আলোচনা করেছি, তা পবিত্র কুরআন বুঝতে সমর্থ ব্যক্তিদের জন্য যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

কুরআন ব্যাখ্যার মূল তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনায় আমাদের বক্তব্য

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু তাঁর প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

"এবং তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে; যেন তারা চিন্তা করে—" (সূরা নাহ্ল : ৪৪)।

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

"আমি তো তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি শুধুমাত্র যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও দয়া স্বরূপ—" (সূরা নাহ্ল : ৬৪)।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ج فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ○

"তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, এইগুলি কিতাবের মূল বুনিয়াদ; অন্যগুলি অস্পষ্ট। অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্না এবং

১. মুহকাম' ঐ সব আয়াতকে বলা হয় যার অর্থ সুস্পষ্ট, আর মুতাশাবিহ ঐসব আয়াত যার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কেউ অবগত নয়।

৬—

ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত; এবং বুদ্ধিমানগণ ব্যতীত অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না"—(সূরা আলে-ইমরান : ৭)।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থ আল-কুরআনের মধ্যে এমন কিছু আয়াত আছে যার ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আর এ আয়াতসমূহে রয়েছে ফরয, ওয়াজিব, আদেশ, উপদেশ, আল্লাহ্র হক এবং বান্দার হক, নিষিদ্ধ কাজ-সমূহ, শাস্তির বিধানসমূহ, উত্তরাধিকারের বিধান সম্বলিত আয়াত—যার জ্ঞান লাভ করা উম্মাতের পক্ষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা ব্যতীত কখনো সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে রসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও ইংগিত ব্যতীত নিজ থেকে কারো জন্য কোন মতামত প্রকাশ করা জায়েয নয়।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এমন কতিপয় আয়াতও রয়েছে যার ব্যাখ্যা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেন না; ঐ আয়াতসমূহের মধ্যে রয়েছে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনা, ইসরাফীলের শিঙ্গায় ফুঁক, মারয়াম তনয় ঈসা (আ)-এর পুনরাগমন এবং অনুরূপ আরো বহু ঘটনাবলী। কারণ এ সমস্ত ঘটনার সময়কাল ও নির্দিষ্ট তারিখ কারো জানা নেই এবং এ সবের নিদর্শন ব্যতীত এগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সম্পর্কেও কেউ অবহিত নয়। কেননা এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই মাখসুস বা নির্ধারিত, মানুষের পক্ষে এগুলো সম্পর্কে জানার কোন অবকাশ নেই। আল-কুরআনে অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে :

يسئلونك عن الساعة ايان مرسها قل انما علمها عند ربي لايجليها لوقتها الا هو
ثقلت في السموت والارض لاتاتيكم الا بغتة يسئلونك كانك حفي عنها قل
انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لايعلمون ٥

"(হে রসূল) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন ঘটবে? বল, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথা সময়ে উহা প্রকাশ করবেন। তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে। আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, এই বিষয়ের জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহ্রই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না"—(সূরা আ'রাফ: ১৮৭)।

তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয়ের আলামত ও নিদর্শন বর্ণনা করা ব্যতীত কখনো এর সময়-কাল নির্ধারণ করে কোন কিছু বলেন নি। যেমন রসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, দাজ্জালের আলোচনাকালে তিনি তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি সে আসে তাহলে আমিই তাকে প্রতিহত করব। আর যদি সে আমার ইনতিকালের পর আসে তাহলে তোমাদের

জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন হেফাযতকারী। অনুরূপ আরো বহু হাদীস যা একত্রিত করলে কিতাব দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে, সেগুলোর দ্বারা পরিষ্কারভাবে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামত এবং এ ধরনের বিষয়গুলোর নির্ধারিত কোন সন-তারিখ রসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল না। বিশ্ব প্রতিপালক মহান রব্বুল আলামীন শুধু মাত্র তাঁকে নির্দশন এবং ইংগিতের মাধ্যমেই এ সব বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেছেন।

আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনে এমন কতিপয় আয়াতও রয়েছে যার ব্যাখ্যা কালামে পাকের ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল প্রতিটি মানুষের নিকটই বোধগম্য। তা হল যথাযথ ভাবে শব্দের মাঝে اعراب (স্বরচিহ্ন) প্রয়োগ করা এবং দ্ব্যর্থবোধক নয় এমন কতিপয় নামের দ্বারা নামকরণকৃত বস্তুর পরিচয় লাভ করা এবং বিশেষ গুণের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সত্তাসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। কারণ এ কাজটি কুরআনের ভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির নিকটই দুর্বোধ্য নয়। যেমন কুরআনের ভাষা সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের থেকে যখন কোন শ্রোতা, কোন পাঠককে নিম্ন বর্ণিত আয়াতখানা পাঠ করতে শোনে:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ○ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ○

["তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কর না, তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না"— সূরা বাকারাঃ ১১,১২] তখন তার নিকট আর অস্পষ্ট থাকে না যে افساد (অশান্তি) এর অর্থ হ'ল এমন ক্ষতিকর কাজ যা বর্জন করা একান্তভাবে অপরিহার্য এবং اصلاح (সংস্কার-সংশোধন) —এর অর্থ হ'ল এমন লাভজনক কাজ যা অবশ্য করনীয়, যদিও সে اصلاح (শান্তি) ও افساد (অশান্তি) শব্দদ্বয়ের আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থসমূহ থেকে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত। সুতরাং কুরআনের ভাষা সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কুরআনের তাবীল বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বুঝতে পারে, তা হ'ল দ্ব্যর্থবোধক নয় এমন কতিপয় নামের দ্বারা নামকরণকৃত বস্তুর পরিচয় এবং বিশেষ গুণের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সত্তা সমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। কিন্তু এ সব বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয় হুকুমসমূহ এবং এগুলোর বিস্তারিত অবস্থা সম্বন্ধে অবগতি লাভ করা, (যার ইল্‌মকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর জন্য খাস করে দিয়েছেন)—সম্ভব নয়।

সুতরাং আল্লাহ্‌র খাস ইল্‌ম ব্যতীত অন্য বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা জানা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়ান ও বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

অনুরূপ বর্ণনা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, তাফসীর চার প্রকার—

এক: যার ইল্‌ম আরবগণ তাদের নিজেদের প্রচলিত কথাবার্তার ভিত্তিতে অর্জন করতে সক্ষম।

দুই: যার অজ্ঞতা কারো পক্ষ হতেই ওজর হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

তিন : যা বিদগ্ধ আলেমগণই জানেন।

চার : যা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেন না।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাফসীর সম্পর্কে দ্বিতীয় যে প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ "এমন তাফ্‌সীর যার অজ্ঞতা কারো পক্ষ হতেই ওজর হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়" এর অর্থ হল, কুরআনের ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্যসমূহ প্রকাশ করতে সমর্থ না হওয়া। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই বলে একথাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, কুরআন ব্যাখ্যার এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং জিহালাত কারো জন্যই জায়েয নয়। আমাদের এ দাবীর সমর্থনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। অবশ্য হাদীসের সনদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু আপত্তি রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (স) বলেছেন : চার ধরনের বিষয়ে কুরআন নাযিল হয়েছে—

এক : হালাল-হারাম সম্পর্কিত নির্দেশাবলী, যার সম্বন্ধে অজ্ঞতা কারো পক্ষ হতেই ওজর হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই : এমন তাফ্‌সীর যা আরবগণ করে থাকে।

তিন : এমন তাফ্‌সীর যা 'উলামায়ে কেরাম করে থাকেন।

চার : মুতাশাবিহ্ আয়াত যার ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। আল্লাহ ব্যতীত যদি কেউ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত হওয়ার দাবী করে তাহলে সে মিথ্যাবাদী।

কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্বলিত কতিপয় হাদীস

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে অথবা কুরআনের ব্যাখ্যায় এমন সব কথা বলে যা সে জানে না, তাহলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি না জেনে কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।

হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বলেছেন, হে যমীন! তুমি আমাকে গ্রাস করে নিও হে আকাশ! তুমি আমাকে আচ্ছাদিত করে নিও, যদি আমি কুরআন সম্পর্কে এমন কথা বলি, যা আমি জানি না।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (রা) বলেছেন, হে যমীন, তুমি আমাকে
গ্রাস করে নিও, হে আকাশ, তুমি আমাকে আচ্ছাদিত করে নিও—যদি আমি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা
করি অথবা এমন কথা বলি যা আমি জানি না।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, উল্লিখিত হাদীসসমূহ আমাদের দাবী সর্বতোভাবে
সমর্থন করছে। অর্থাৎ কুরআনের যে সব আয়াতের ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ এবং তাঁর নির্ধারিত পথ-নির্দেশনা ব্যতীত অনুধাবন করা সম্ভব নয়, এ
বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করা কারো জন্যে জায়েয নয়।

অধিকন্তু মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানকারী ব্যক্তি যদিও এ ব্যাখ্যায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তথাপি
সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ তার এ সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা তার নিজের হক্কানিয়্যাতের
(দৃঢ়বিশ্বাসের) ভিত্তিতে নয়; বরং এতো কেবল ধারণা এবং অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত মাত্র। আর দীনের
বিষয়ে যে অনুমান করে কথা বলে সে আল্লাহ্ তা'আলার উপর এমন কথাই আরোপ করছে যা সে
জানে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এ বিষয়টিকে তার বান্দাদের জন্য হারাম করে
দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق
وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ٥

"বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত
বিরোধিতা—এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা যার কোন দলীল তিনি নাযিল করেন নি
এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই"—(সূরা আ'রাফ : ৩৩)।

সুতরাং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়ান, যাকে আল্লাহ্ পাক নিজ
বয়ান বলে অভিহিত করেছেন, এ বয়ান ও বিশ্লেষণ ব্যতীত যে সব আয়াতের ব্যাখ্যা-জ্ঞান হাসিল করা
যায় না—নিজ থেকে এধরনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানকারী ব্যক্তি অজানা বিষয়েরই এক নতুন প্রবক্তা
মাত্র—যদিও তার এ মনগড়া ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না কেন।
কেননা কুরআনের ব্যাপারে না জেনে যে কোন কথা বলে সে মূলতঃ আল্লাহ্‌র উপর এমন কথাই
আরোপ করে যা সে জানে না।

ঠিক এ কথাটিই হযরত জুনদুব (রা) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে
বর্ণনা করেছেন, তিনি (স) বলেছেন : যদি কেউ কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে আর তা নির্ভুলও
হয়, তথাপি সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে।

উল্লিখিত হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ একথাই বলেছেন
যে, মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করার ফলে উক্ত ব্যক্তি নিজ কর্মের মাঝে অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হবে,
যদিও তার এ ব্যাখ্যা হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নির্ভুল ব্যাখ্যার সাথে। কারণ
কুরআন ব্যাখ্যার ব্যাপারে তার এ মনগড়া বিশ্লেষণ আলিম বা বিদগ্ধ জনের বিশ্লেষণ নয়। তাই
কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হক ও নির্ভুল তথ্য যা সে পরিবেশন করল বস্তুতঃ এতে সে আল্লাহ্‌র উপর

এমন কথাই আরোপ করল যা সে জানে না। অতএব আল্লাহ কর্তৃক সতর্ককৃত ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে অবশেষে সে হ'ল একজন অপরাধী।

কুরআনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ইল্‌ম এবং মুফাসসির সাহাবীগণ সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে যখন কেউ দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি এগুলোর অর্থ এবং এগুলোর উপর 'আমল করা ব্যতীত সামনের দিকে অগ্রসর হতেন না।

আবু 'আবদির রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে যাঁরা কুরআন শিক্ষা দিতেন তাঁরা বলেছেন যে, তাঁরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কুরআনের পাঠ গ্রহণ করতেন, দশখানা আয়াত শিক্ষা করার পর এগুলোর মাঝে 'আমলের যেসব কথা আছে সেগুলো অনুশীলনে না আনা পর্যন্ত তাঁরা কখনো সেগুলোর পাঠ বন্ধ করতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, কুরআনের তিলাওয়াত ও তদনুযায়ী আমলের প্রশিক্ষণ আমরা একসাথেই গ্রহণ করেছি।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই! কুরআনের কোন্ আয়াত—কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে—কোথায় এবং কখন নাযিল হয়েছে এ বিষয়ে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কুরআন সম্পর্কে আমার থেকে অধিক বিজ্ঞ কোন ব্যক্তির সন্ধান যদি আমি পাই, যিনি এমন স্থানে অবস্থান করছেন যথায় সাওয়ারী হাঁকিয়ে পেঁছিতে হয়, তবুও আমি তথায় পেঁছিব।

মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ (রা) প্রথমতঃ আমাদের সামনে সূরা পাঠ করতেন, এরপর তিনি দিনের এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উক্ত সূরার উপর পর্যালোচনা এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন।

শাকীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক সময় হযরত আলী (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে হজ্জের দায়িত্বে নিয়োগ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের সামনে একটি সারগর্ভ ভাষণ দিলেন, যদি তা তুর্কী ও রূমী লোকেরা শুনতো, তাহলে তারা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করত। অতঃপর তিনি সূরা নূর পাঠ করে এর তাফসীর করতে আরম্ভ করলেন।

আবু ওয়াইল শাকীক ইব্‌ন সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূরা বাকারা পাঠ করে এর তাফসীর শুরু করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, যদি এ সূরাটি কুর্দী লোকেরা শুনতো, তারা অবশ্যই মুসলমান হয়ে যেত।

হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এর ব্যাখ্যা করল না, সে একজন মরুবাসীর অথবা একজন অন্ধ ব্যক্তির সমতুল্য।

আবু ওয়াইল বলেছেন, এক সময় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হজ্জের মৌসুমে হজ্জের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। অতঃপর তিনি লোকদের সামনে খুৎবা প্রদান করতঃ মিম্বারে বসে সূরা নূর পাঠ করেন। আল্লাহ্‌র কসম! যদি এ সূরাটি তুর্কী লোকেরা শুনতো তাহলে তারা অবশ্যই মুসলমান হয়ে যেত।

শাকীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন আমি হজ্জের তত্ত্বাবধায়ক হযরত ইব্‌ন

আব্বাস (রা)-র নিকট গেলাম, অতঃপর তিনি মিম্বারে বসে সূরা নূর পাঠ করে এর তাফসীর করলেন। যদি তা রূমীগণ শুনতো তাহলে অবশ্যই তারা মুসলমান হয়ে যেত।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, কুরআন শরীফের তাফ্সীর এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জোর সমর্থন কালামে পাকের মধ্যেও আমরা বিদ্যমান দেখতে পাই। কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ্ পাক নবী করীম (স)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন :

كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب ۝

"এক কল্যাণময় কিতাব আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে"—(সূরা সাদ : ২৯)।

ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ۝

"আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে"—(সূরা যুমার : ২৭)।

قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ۝

"এই কুরআন আরবী ভাষায় বক্রতামুক্ত যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে"—(৩৯ : ২৮)।

অনুরূপ আরো বহু আয়াত যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কুরআনের উপমা ও নসীহত থেকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ প্রদান ও অনুপ্রাণিতকরণ সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, কুরআনের যে সব আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই—সে সব আয়াতের তাবীল এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা কুরআনের ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে অক্ষম এবং এর খেতাব বা সম্বোধন বুঝতে অসমর্থ ব্যক্তিকে উপদেশ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া বেমানান। তবে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার নির্দেশ দেয়ার অর্থ এই হতে পারে যে, মানুষ প্রথমে কুরআন বুঝবে এবং এর মর্ম অনুধাবন করবে, অতঃপর এ নিয়ে গবেষণা করবে এবং এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। উল্লিখিত প্রক্রিয়াকে বর্জন করে কুরআনের অর্থের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তিকে কুরআন নিয়ে গবেষণা করার নির্দেশ দেয়া একেবারেই অবাস্তব এবং অবান্তর। যেমন অবান্তর হ'ল উপমা, উপদেশ, হিকমত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সম্বলিত আরব কবিদের কোন কবিতা আবৃত্তি করে আরবী ভাষা বুঝতে অক্ষম ও অসমর্থ ব্যক্তিদেরকে এ কথা বলা যে, তোমরা এর উদাহরণ এবং উপদেশ গ্রহণ কর। তবে এ নির্দেশসূচক কথাকে প্রথমে আরবী ভাষা বুঝা ও এই সম্পর্কে অবগতি লাভ করা এবং পরে এর মাঝে উল্লিখিত হিকমত থেকে উপদেশ গ্রহণ করার নির্দেশপূর্ণ বাণী হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অজ্ঞ ব্যক্তিকে কবিতার মাঝে বিদ্যমান উপমা ও উদাহরণ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া একটি অবাস্তব কাণ্ড, বরং এ অবস্থায় মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি নির্দেশ প্রদান একই বরাবর। হ্যাঁ, আরবী বচনের অর্থ এবং এর বাগধারা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পরই মানুষের প্রতি এ নির্দেশ কার্যকর হতে পারে।

এমনিভাবে হিকমত, নসীহত, উপদেশ এবং উদাহরণপূর্ণ গ্রন্থ আল কুরআনের আয়াতের ব্যাপারটিও তাই। অর্থাৎ কুরআনের অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আরবী ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যতীত অপর কাউকে উপদেশ গ্রহণ করার আদেশ করা কোন ক্রমেই জায়েয নয়। তবে উল্লিখিত বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিকে উপদেশ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়ার অর্থ এই হতে পারে যে, প্রথমে সে আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করবে এবং পরে এ নিয়ে গবেষণা করে এর বিভিন্নমুখী জ্ঞানগর্ভ উপদেশমালা থেকে নসীহত গ্রহণ করবে।

সুতরাং আল্লাহ্‌র তরফ হতে বান্দাদের প্রতি কুরআন নিয়ে গবেষণা এবং এর উপমাসমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান পরিষ্কারভাবে এ কথাই বুঝাচ্ছে যে, কুরআনের অর্থ ও মতলব সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ কখনো এ কাজের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন নি। 'আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে যেহেতু এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া জায়েয নেই তাই নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে, তারা কুরআনের ঐ সব আয়াতের ব্যাখ্যা-জ্ঞান সম্বন্ধে অবশ্যই পারদর্শী যে সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জানার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় নেই। এ বিষয়ে পূর্বেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ কথাটির বিশুদ্ধতা মেনে নেয়ার পর কুরআনের যে সব আয়াতের তাবীল ও তাফসীরের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য কোন অন্তরায় নেই এসব আয়াতের তাফ্‌সীর ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাফ্‌সীর অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের অহেতুক উক্তিটিও পূর্ণাঙ্গভাবে নাকচ হয়ে যায়।

কুরআনের তাফসীর এবং কতিপয় হাদীসের ব্যাখ্যায় তাফসীর অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তিকর উক্তির পর্যালোচনা

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ)-এর শিক্ষা দেয়া নির্দিষ্ট কতিপয় আয়াত ব্যতীত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালামে পাকের কোন আয়াতেরই তাফ্‌সীর করতেন না। হযরত আয়েশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ)-এর শিক্ষা দেয়া নির্দিষ্ট কয়েকটি আয়াত ব্যতীত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন শরীফের কোন আয়াতেরই তাফসীর করতেন না। উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে-'উমার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ফিক্‌হশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ মদীনার বহু ফাকীহ্‌কে আমি পেয়েছি। তাঁরা সকলেই তাফসীর সংক্রান্ত কোন কথা বলাকে অত্যন্ত ক্লেশজনক মনে করতেন। সালিম ইব্‌নে 'আবদিল্লাহ, কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এবং নাফি' হলেন তাঁদের অন্যতম।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবকে প্রশ্ন করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, কুরআন সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলব না।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরআন শরীফের কোন একটি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর বলেছেন, আমি কুরআন সম্পর্কে কোন কথাই বলব না।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরআন শরীফের সুস্পষ্টভাবে জানা বিষয়টি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে কখনো কোন আলোচনা করতেন না।

ইব্‌ন সীরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত 'উবায়দাতুস্‌ সালমানী (র)-কে কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সরলতা, সত্যবাদিতা

এবং বিশুদ্ধপন্থা অবলম্বন কর। কারণ কুরআন নাযিলের প্রেক্ষিত সম্বন্ধে বিজ্ঞ 'আলেমদের কেউ এখন আর বেঁচে নেই।

মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি একদা হযরত 'উবায়দা (রা)-কে কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কুরআন নাযিলের প্রেক্ষিত সম্বন্ধে প্রজ্ঞাবান উলামায়ে কেরাম সকলেই এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সততা ও সরলতা অবলম্বন কর।

ইব্‌ন আবী মুলায়কা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে কুরআনের এমন একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, যদি এ সম্পর্কে অন্য কাউকে প্রশ্ন করা হত, তাহলে অবশ্যই তিনি উত্তর দিতেন, কিন্তু হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) (উক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে) বিষয়টি সম্পর্কে নিজের অস্বীকৃতি ব্যক্ত করলেন।

হযরত তালক ইব্‌ন হাবীব (রা) হযরত জুনদুব ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা)-র নিকট এসে তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তুমি একজন মুসলিম, আমি কি তোমাকে আমার নিকট থেকে উঠে যাওয়ার সময় অথবা আমার কাছে বসে থাকার সময় কোন অন্যায় কাজে জড়িয়ে দিতে পারি?

য়াযীদ ইব্‌ন আবী য়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি হযরত সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র)-কে আমরা সর্বদা হালাল হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। কিন্তু একদা যখন আমরা তাঁকে কুরআনের কোন একটি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি চুপ করে রইলেন, যেন তিনি প্রশ্নটি শোনেন নি।

হযরত 'আমর ইব্‌ন মুররাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিবকে কুরআন শরীফের কোন একটি আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর তিনি বল্‌লেন, কুরআন শরীফের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাকে কোন প্রশ্ন করবে না। এ বিষয়ে তোমরা এমন ব্যক্তিকে প্রশ্ন কর যিনি মনে করেন যে, কুরআনের কোন বিষয়ই তার নিকট অস্পষ্ট নেই। অর্থাৎ এসম্পর্কে তোমরা ইক্‌রামাকে জিজ্ঞেস কর।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবিস্ সফর ইমাম শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এমন কোন আয়াত নেই যার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করিনি, কিন্তু হাদীসে কুদ্‌সী সম্পর্কে আমি কোন প্রশ্ন করিনি।

শা'বী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন আছে যে সম্বন্ধে আমি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন কথা বলব না। তা হ'ল কুরআন, রূহ এবং কিয়াস, এ ধরনের আরো বহু হাদীস।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী বলেন, যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, উল্লিখিত হাদীসসমূহে সম্পর্কে আপনাদের কি রায়? উত্তর: "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট কতিপয় আয়াত ব্যতীত কুরআন শরীফের কোন তাফসীর করেন নি"। এই বর্ণনাটি অতীত অধ্যায়ে বর্ণিত আমাদের বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গভাবে সমর্থন করছে। অর্থাৎ কুরআন শরীফের এমন ব্যাখ্যাও রয়েছে যে সম্বন্ধে ইল্‌ম হাসিল করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্লেষণে

ব্যতীত সম্ভব নয়। তা হচ্ছে এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতের মাঝে বিদ্যমান আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, হুদূদ-ফরায়েয এবং দীন ও শরীআতের অর্থসমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে দিবেন যা আল কুরআনে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে।

সর্বোপরি তাফসীর সংক্রান্ত ইলম্ হাসিল করা মানুষের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। তবে তাফসীর এবং বিভিন্ন হুকুম-আহকাম সম্বলিত আয়াত যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে বয়ান স্বরূপ প্রদান করেছেন, ইত্যাদি বিষয়গুলো মানুষ আল্লাহ্র তরফ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌখিক বর্ণনা ব্যতীত আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়।

তাই বুঝা যাচ্ছে যে, এ সব আয়াতের ব্যাখ্যা মানুষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনার মাধ্যমে জেনেছেন আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেনেছেন ওহী তথা আল্লাহ্ কর্তৃক দেয়া তা'লীম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, তাই তা হযরত জিবরীল (আ) অথবা অন্য কোন দূত প্রেরণের মধ্যস্থতায়ই হউক না কেন।

সুতরাং যে সব আয়াতের তাফ্সীর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরীল (আ) থেকে প্রাপ্ত তা'লীমের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের নিকট বর্ণনা করেছেন এগুলোর সংখ্যা একেবারেই কম। (অতএব এ-সব আয়াতের স্বল্পতা হেতু তাফসীর অস্বীকার) করার পক্ষে বুলি আওড়ানো কোনক্রমেই সমীচীন নয়।)

'পূর্বে আমরা এ কথাও উল্লেখ্য করেছি যে, কুরআন শরীফে এমন কতিপয় আয়াতও রয়েছে যার তাফসীর সংক্রান্ত ইলম আল্লাহ্র নিজস্ব সত্তার সাথে মাখসূস, কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা এবং আল্লাহ্র প্রেরিত নবীগণ পর্যন্ত যে বিষয়ে অবহিত নন। তবে তাঁরা বিশ্বাস রাখেন যে, এগুলো আল্লাহ্র পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে এবং এ-গুলোর ব্যাখ্যা কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

কুরআনের তাবীল এবং তাফ্সীর সংক্রান্ত ইল্ম যা মানুষের জন্য অপরিহার্য, তা আল্লাহ্র তরফ হতে হযরত জিবরীল (আ)-এর মারফত প্রাপ্ত অহীর ভিত্তিতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের নিকট বয়ান করে দিয়েছেন।

উম্মাতের নিকট কালামে পাকের তাফসীর পেশ করার নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ্ পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ: এবং আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা নাহ্ল: ৪৪)।

অতএব "কতিপয় আয়াত ব্যতীত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন শরীফের কোন তাফসীর করেন নি' বর্ণনাটির ব্যাখ্যা যদি এই হয় যে, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল আয়াতাংশ এবং শব্দাংশেরই ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা মনে করেছে, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের উপকারার্থে তা রেখে যাওয়ার জন্য, মানুষের

নিকট তা বয়ান করার জন্য নয়। (উল্লিখিত আয়াত ও এ কথার মাঝে চরম বৈপরিত্য তাই এ কথাটি কোন ক্রমেই গ্রহণ যোগ্য নয়)।

উপরন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন পেঁৗছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া, لتبين للناس ما نزل اليهم বলে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পয়গাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ হতে যথাযথ ভাবে হক আদায় করে পেঁৗছিয়ে দেয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা অর্থাৎ "আমাদের কোন ব্যক্তি কুরআনের দশটি আয়াত শিখে নিয়ে আয়াতসমূহের অর্থ এবং 'আমল উভয় বিষয়কে আয়ত্বে না এনে কখনো সামনে অগ্রসর হতেন না" ইত্যাদি বিষয়গুলো ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের মূর্খতা সম্বন্ধেই পরিষ্কার ইংগিত করছে যারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে বর্ণিত হাদীস "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় আয়াত ব্যতীত কালামে পাকের কোন তাফসীর করেন নি"—টির এ ব্যাখ্যা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতের জন্য কালামে পাকের একেবারে কম আয়াতেরই ব্যাখ্যা করেছেন, অধিক নয়। এতদ্ব্যতীত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র বর্ণিত হাদীসের সনদে এমন ইল্লত ও ত্রুটি রয়েছে যে ত্রুটি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ধর্মীয় ব্যাপারে অশুদ্ধ বিশুদ্ধ সনদের মাঝে পার্থক্য বিধান-কারী ব্যক্তিদের থেকে কারো নিকটই এ হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা জায়েয নয়। কেননা হাদীসের রাবী জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয-যুবায়রী হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ নন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অস্বীকৃতি মূলক তাবিঈনদের যে সব বর্ণনা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, এ সব বর্ণনার ব্যাপারে আমার মতামত হ'ল এই যে, তাঁদের এ ধরনের কথা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ও ভয়াবহতার সময় সঠিক ফতোয়া দেয়া থেকে অস্বীকৃতি প্রকাশ করারই নামান্তর। অথচ তাঁরা স্বীকার করেন যে, মানুষের জন্য দীন পরিপূর্ণ না করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে মৃত্যু দেন নি এবং নিশ্চিত ভাবে তারা এ কথাও বিশ্বাস করেন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কোন না কোন হুকুম অবশ্যই বিদ্যামান রয়েছে। চাই তা সুস্পষ্ট বর্ণনার ভিত্তিতে হোক অথবা ইংগিতময় বর্ণনার ভিত্তিতে হোক। সুতরাং তাফসীরের ব্যাপারে তাদের এ অস্বীকৃতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তির অস্বীকৃতির মত নয় এবং কুরআনের তাফসীর নিষিদ্ধ ও অবৈধ এ মানসিকতার প্রেক্ষিতে তাদের এ অস্বীকৃতি ছিল না। বরং তাফসীরের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার ব্যাপারে আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে না পারার আশংকাই ছিল বস্তুতঃ পূর্বসূরি আলিমগণের অস্বীকৃতির মূল কারণ।

ইল্‌মে তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং অপ্রশংসিত প্রাচীন তাফসীরকারদের সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা

মুসলিম আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) কুরআন শরীফের কতই না সুন্দর ব্যাখ্যাদাতা।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কুরআন শরীফের কতই না সুন্দর ব্যাখ্যাদাতা।

মাসরূক—'আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন আবী মুলায়কা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি মুজাহিদকে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট কুরআন শরীফের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি। এ সময় তাঁর নিকট অপর এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। তখন হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) তাকে বললেন, লিখ। বর্ণনাকারী বলেন, এমনি করে তিনি তাকে গোটা কুরআন শরীফের তাফসীর সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করে নিলেন।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে পুরো কুরআন শরীফ তিনবার শুনিয়েছি। এ সময় আমি প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করতাম এবং এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম।

আবু বাক্র আল-হানাফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি সুফইয়ান ছওরী (রা)-কে বলতে শুনেছি মুজাহিদের সূত্রে যদি কোন তাফসীর তোমার নিকট পৌঁছে, তাহলে এ-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

'আবদুল মালিক ইব্ন মায়সারা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, দাহ্হাক কখনো হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন নি। তিনি সাক্ষাত করেছেন হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবায়রের সাথে রায় নামক স্থানে এবং তথায়ই তিনি তাঁর থেকে তাফসীর শিক্ষা লাভ করেছেন।

মাশ্শাশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি দাহ্হাককে বললাম, তুমি কি হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে কোন কথা শুনেছ ? তিনি বললেন না।

যাকারিয়্যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "বাযান" নামক স্থানে অবস্থানকালে হযরত আবু সালিহ (র)-এর নিকট দিয়ে একদিন ইমাম শা'বী (র) যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর কান ধরে টেনে বললেন, তাফসীর করছ ? অথচ তুমি কুরআন পড়তে জান না।

হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, "وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ" (সূরা মু'মিন : ২০) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুণ্যের বিনিময়ে পুণ্য ও পাপের বিনিময়ে শাস্তি প্রদানে সক্ষম। নিঃসন্দেহে তিনি সব শোনেন সব দেখেন। বর্ণনাকারী হুসায়ন বলেন, আমি আ'মাশকে বললাম যে, এ হাদীসটি আমাকে কালবীও বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি "আল্লাহ্ তা'আলা পাপের বিনিময়ে শাস্তি ও পুণ্যের বিনিময়ে দশগুণ পুণ্য প্রদানে সক্ষম" এরূপ বর্ণনা করেছেন। এ কথা শুনে আ'মাশ বললেন, কালবীর নিকট যা আছে তা যদি আমার নিকট থাকত তাহলে আমার থেকে একটি নগণ্য বিষয় ও ছুটত না।

সালেহ্ ইব্ন মুসলিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন সুদ্দী (র) তাফসীররত অবস্থায় ইমাম শা'বী তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন বললেন, তোমার পিঠে আঘাত করা তোমার এ মজলিশে বসার চেয়ে উত্তম।

মুসলিম ইব্ন আবদির রহমান আন-নাখ্'ঈ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি ইবরাহীম (র)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি সুদ্দীকে দেখে বললেন, এ-তো সাধারণ মানুষের মত তাফসীর করছে।

কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাফসীরের ক্ষেত্রে কালবী (র)-এর সমমর্যাদা সম্পন্ন কোন মানুষ আমি দেখিনি।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, আমি পূর্বেই কুরআন ব্যাখ্যা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনায় এ **কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছি** যে, কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা মৌলিকভাবে তিন প্রকার **ঃ**

এক ঃ এমন ব্যাখ্যাজ্ঞান যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য খাস করে মানুষের থেকে গোপন **করে** রেখেছেন। সে পর্যন্ত পেঁছা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তা হচ্ছে কিয়ামত লগ্নে সংঘটিত **হবার মত** ঘটনাবলীর সময়সূচী। যেমন মারয়াম তনয় 'ঈসার অবতরণ, পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়, **ইসরাফীলের** শিংগায় ফুঁক এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্ধারিত সময়সূচী ইত্যাদি।

দুই ঃ এমন ব্যাখ্যাজ্ঞান যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী করীম (স)-এর জন্য নির্ধারিত করে দিয়ে **ছেন। উম্মাতের** জন্য নয়। তা হচ্ছে ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলির ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগতি মানুষের জন্য **একান্তভাবে** জরুরী। কিন্তু সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষ নবী করীম (স)-এর বর্ণনা ব্যতীত **এগুলোর** 'ইল্ম হাসিল করতে অক্ষম।

তিন ঃ এমন কতিপয় আয়াত যেগুলোর তাফসীর সম্পর্কিত ইল্ম সম্বন্ধে কুরআনের **ভাষায়** বিজ্ঞ প্রতিটি মানুষই অবগত আছেন। এ যোগ্যতার মাপ কাঠি হচ্ছে এই যে, আরবী **ভাষা** এবং যথাযথভাবে اعراب (স্বরচিহ্ন) প্রয়োগে সমর্থ হওয়া, যা ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আরব **লোকদের** সহযোগিতা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়।

তারাই সঠিক তাফসীর করতে অধিক যোগ্য যারা নিজেদের কৃত তাফসীরে হাদীসের আলোকে **সুস্পষ্ট** প্রমাণাদি পেশ করতে সক্ষম। চাই তা মশহূর হাদীসের ভিত্তিতে হোক কিংবা ন্যায়পরায়ণ, **নির্ভরযোগ্য** বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভিত্তিতে হোক অথবা এর বিশুদ্ধতার উপর ইংগিত বিদ্যমান **থাকার** কারণে হোক।

এমনিভাবে তাফসীর শাস্ত্রে তারাই হলেন অগ্রগণ্য যারা নিজেদের কৃত তাফসীরকে প্রমাণাদি সহ **সহজ** ও সরলভাবে পেশ করতে সক্ষম। তা ভাষার প্রাঞ্জলতা, সুপ্রসিদ্ধ কবিতার মাধ্যমে প্রমাণাদি **পেশ** করা, এবং সাবলীলতা ও শব্দের বহুল প্রচলনের কারণেই হোক না কেন। এই গুণের অধিকারী **প্রতিটি** ব্যক্তিই হলেন ব্যাখ্যাকার এবং মুফাস্সির। তাদের জন্য তাফসীর করা বৈধ এ শর্ত সাপেক্ষে **যে, তাদের এই** তাফসীর যেন সাহাবা, আইম্মা, তাবিঈন এবং উলামাদীনের তাফসীরের সীমা **অতিক্রম** করে চলে না যায়।

কুরআন, সূরা এবং আয়াতের নামসমূহের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আলোচনা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ **গ্রন্থ** আল-কুরআনের চারটি নাম আল্লাহ্ তাআলা কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন। ঃ

এক ঃ আল কুরআন। যেমন তিনি ইরশাদ করছেন ঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ - وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۔

"আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি—ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এ-কুরআন প্রেরণ **করে**, যদিও তুমি এর পূর্বে ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত"— (সূরা ইউছুফ ১২ ঃ ৩)

إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون -

"এ কুরআন বনী ইসরাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে তার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাদের নিকট বিবৃত করে" (আন্‌নামল ২৭ : ৭৬)

দুই : আল-ফুরকান। আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী করীম (স)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে আল-ফুরকান বলে নামকরণ করে বলছেন :

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا -

"কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে" (আল-ফুরকান ২৫ : ১)

তিন : আল-কিতাব। যেমন আল্লাহ্ পাক কালামে পাককে আল-কিতাব বলে নামকরণ করে বলছেন :

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما -

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনি এতে কোন অসংগতি রাখেন নি, বরং ইহাকে করেছেন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

(আলকাহফ ১৮ : ১)

চার : আয-যিক্‌র। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এই পবিত্র গ্রন্থকে আয-যিক্‌র বলে অভিহিত করে বলছেন :

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون -

"আমিই যিক্‌র নাযিল করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব" (আল হিজ্‌র ১৫ : ৯)

পবিত্র কালামে পাকের উল্লিখিত চারটি নামের প্রত্যেকটি নামেরই এমন অর্থ ও ব্যাখ্যা রয়েছে যা অন্যটির মাঝে নেই। ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হ'ল :

আল-কুরআন : শব্দটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র মতানুসারে এর অর্থ হ'ল তিলাওয়াত এবং কিরাআত এই শব্দটি হ'ল قرأت القرآن বাক্যের মাঝে বর্ণিত قرأت ক্রিয়ার مصدر বা শব্দমূল। যেমন الغفران - الفرقان - الكفران - كفرتك ক্রিয়ার এবং غفر الله لك - الغفران ক্রিয়ার, خسرت ক্রিয়ার, فرق الله بين الحق والباطل ক্রিয়ার مصدر বা শব্দমূল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র বর্ণনাটি হ'ল এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী (আল কিয়ামা ৭৫ : ১৮) সম্পর্কে বলতেন যে, فاذا قرأناه অর্থ হ'ল بيناه এবং فاتبع قرآنه অর্থ হ'ল

فاذا بيناه بالقراءة فاعمل بما بيناه لك بالقراءة হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা)-র এ কথার তাৎপর্য হ'ল اعمل به (যখন আমি তোমার নিকট কুরআনের কিরাত বর্ণনা করে দিব, তখন তুমিও আমল করবে ঐ বিষয়ের উপর যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করেছি কিরাতের সাথে।)

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা)-র হাদীসের ব্যাখ্যায় আমরা যা বলেছি এর বিশুদ্ধতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাসের অপর একটি বর্ণনার দ্বারা অধিকতর সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তা হ'ল এই যে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌নে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

(ان علينا جمعه وقرآنه) قال ان نقرئك فلا تنسى (فاذا قرأناه) عليك (فاتبع قرآنه)

يقول اذا تلى عليك فاتبع مافيه ـ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন যে, হযরত ইব্‌নে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এ রেওয়ায়েত পরিষ্কারভাবে এ কথাই প্রমাণ করছে যে, হযরত ইব্‌নে 'আব্বাস (রা)-র নিকট القرآن -এর অর্থ হ'ল القراءة কেননা এ শব্দটি হ'ল قرأت ক্রিয়ার مصدر বা শব্দমূল।

তবে প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত কাতাদা (র)-এর মতানুসারে এ শব্দটি হ'ল (একটি বস্তুর সাথে অপর একটি বস্তুকে একত্র করার সময় বক্তা যে বাক্যটি বলে থাকেন তথা) قرأت الشيئ ক্রিয়ার مصدر বা শব্দমূল। যেমন তোমরা বল, ماقرأت هذه الناقة سلاقط এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য হ'ল, উষ্ট্রীটি সন্তানের সাথে নিজের গর্ভাশয়কে কখনো মিলায় নি। যেমন আমর ইব্‌নে কুলছূম আত-তাগলাবী তার নিম্ন বর্ণিত।ঃ

تريك اذا دخلت على خلاء ـ وقد امنت عيون الكاشحينا

ذراعى عيطل ادماء بكر ـ هجان اللون لم تقرأ جنينا ـ

কবিতার মাঝে বর্ণিত لم تقرأ جنينا থেকে لم تضمم رحما على ولد (সে তার গর্ভাশয়কে সন্তানের সাথে মিলায়নি) অর্থ নিয়েছেন।

হযরত কাতাদার বর্ণনাটি এই,

عن قتادة فى قوله تعالى (ان علينا جمعه وقرآنه) يقول ؛ حفظه وتاليفه

(فاذا قرأناه فاتبع قرآنه) يقول ؛ اتبع حلاله واجتنب حرامه ـ

হযরত কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি কুরআন সংকলন করাকেই কুরআনের তাবীল বলে মনে করতেন।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন যে, হযরত ইব্‌নে 'আব্বাস (রা) এবং হযরত কাতাদা (র)-এর পূর্বোল্লিখিত উভয় মতের বিশুদ্ধতার পক্ষেই রয়েছে আরবী ভাষায় একটি যুক্তিযুক্ত কারণ, তবে আল্লাহ্‌র বাণী

إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه

(ইহা সংরক্ষণ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই, সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর)-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা)-র মতই সর্বাধিক উত্তম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে একাধিক আয়াতে তার নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশর অনুসরণ করে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কুরআন সংকলন করা পর্যন্ত অবতীর্ণ আয়াতের অনুসরণ বর্জন করার ক্ষেত্রে তাঁকে কোথাও অনুমতি দেয়া হয়নি। অতএব আল্লাহ্‌র বাণী فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ও অন্যান্য আয়াতের মাঝে বিদ্যমান হুকুমের মতই যথায় আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশের অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

এখন যদি فإذا قرأناه فاتبع قرآنه-এর অর্থ فإذا ألفناه فاتبع ما ألفنا لك فيه (যখন উহাকে আমি সংকলন করব তখন তুমি এ সংকলনকৃত কিতাবের মাঝে বিদ্যমান হুকুমের অনুসরণ করবে) ধরে নেয়া হয়, তাহলে اقرأ باسم ربك الذي خلق (অর্থঃ পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) এবং يا أيها المدثر قم فأنذر (অর্থঃ হে বস্ত্রাচ্ছাদিত: উঠ সতর্ক-বাণী প্রচার কর) ইত্যাদি ধরনের অপরিহার্য নির্দেশগুলোও সংকলনের প্রতিটি আয়াতের পূর্বে অপরিহার্য না হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এ কথা ঠিক নয়, বরং কুরআনে অনুসরণ এবং এর বাস্তবায়ন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অপরিহার্য ছিল। চাই তা সংকলিত হোক বা অসংকলিত হোক। সুতরাং فإذا قرأناه فاتبع قرآنه-এর সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা "فإذا بيناه لك بقراءتنا فاتبع ما بيناه لك بقراءتنا" পেশ করেছেন তাই হ'ল সহীহ এবং নির্ভুল। ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যা নয় যিনি বলেন যে. উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা হ'ল "فإذا ألفناه فاتبع ما ألفناه" যেমনি ভাবে নিম্ন বর্ণিত কবিতা :

ضحوا بأشمط عنوان السجود به + يقطع الليل تسبيحا وقرآنا

এর মাঝে বর্ণিত– تسبيحا وقرآنا থেকে تسبيحا وقراءة অর্থ নেয়া হয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, قرآن শব্দটি কি করে قراءة-এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ? এ তো مقروء-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ? তবে এর উত্তর : كتاب الكاتب এর অর্থে যেমনিভাবে مكتوب কে كتاب বলে অভিহিত করা যায় এমনিভাবে مقروء-কে قرآن বলে অভিহিত করা যায়, যেমনিভাবে কোন এক কবি স্ত্রীর প্রতি লিখিত তালাকনামার বিশ্লেষণ করে বলেছেন,

تؤمل رجعة مني وفيها — كتاب مثل ما لصق الغراء

উল্লিখিত কবিতায় কবি كتاب বলে مكتوب অর্থ নিয়েছেন।

আলফুরকান : তাফসীরকারগণ এ শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তবে অর্থের দিক থেকে এগুলো এক এবং অভিন্ন।

হযরত 'ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, الفرقان শব্দের অর্থ হ'ল النجاة বা মুক্তি। হযরত সুদ্দী (র) শব্দটি অনুরূপ ব্যাখ্যা করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলতেন, الفرقان!

শব্দের অর্থ হ'ল المخرج (বাচার পথ)। মুজাহিদও শব্দটির ব্যাখ্যায় অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। অধিকন্তু মুজাহিদ (র) আল্লাহ্‌র বাণী يوم الفرقان -এর ব্যাখ্যায় বলতেন, يوم الفرقان হ'ল ঐ দিন—যে দিনে আল্লাহ্‌ তা'আলা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে দেবেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, الفرقان শব্দের এ সব ব্যাখ্যার শব্দগত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অর্থের দিক থেকে এগুলোর মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই। বরং এগুলো একে অপরের খুবই নিকটবর্তী। কেননা যার জন্য কোন পথ আছে তার জন্য অবশ্যই এ পথের দ্বারা نجاة বা মুক্তির ও ব্যবস্থা আছে। আর যার জন্য نجاة-এর ব্যবস্থা আছে তাকে অবশ্যই অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা কল্পে সহযোগিতা করা হবে এবং পার্থক্য করে দেয়া হবে অকল্যাণ অন্বেষণকারী দুরাচার ও দুষ্টসত্তার মাঝে।

সুতরাং الفرقان -এর অর্থ সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা আমি পূর্বে পেশ করেছি, সবগুলোই হ'ল অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং অতীব নির্ভরযোগ্য। কেননা এসব শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন।

আমার মতে মূলতঃ الفرقان শব্দের অর্থ হ'ল পরস্পর দুটি বস্তুর মাঝে পার্থক্য এবং ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয়া। এ কাজটি বিচার, নাজাত, প্রমাণাদি পেশ, বলপ্রয়োগ এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী বিষয়ের দ্বারাও সম্পাদিত হয়ে থাকে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে, কুরআন যেহেতু তার নিজস্ব প্রমাণাদি দিয়ে, করণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলীর নির্দেশনা দিয়ে এবং হক-পন্থীকে সহযোগিতা আর বাতিলপন্থীকে লাঞ্ছিত করে হক এবং বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছে তাই আল-কুরআনকে আল-ফুরকান বলে নামকরণ করা হয়েছে।

আল-কিতাব : الكتاب শব্দটি كتبت كتابا ক্রিয়ার শব্দমূল। যেমন তোমরা বল, قمت قياما এবং حسبت الشئ حسابا - الكتاب হ'ল লেখকের লিখা কতিপয় বর্ণমালা। তাই তো সমষ্টিগতভাবে হোক বা বিচ্ছিন্নভাবে হোক এগুলো مكتوب (লিখিত) হওয়া সত্ত্বেও এগুলোকে كتاب বলে নামকরণ করা হয়েছে। যেমনি ভাবে কবি كتاب مثل ما لصق الغراء পংক্তিতে كتاب বলে مكتوب অর্থ নিয়েছেন।

আয্-যিক্র (الذكر) : এ শব্দের মাঝে মূলতঃ দুটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে।

(এক) কুরআন শরীফের দ্বারা যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর জায়েয-নাজায়েয, ফরায়েয এবং অন্যান্য হুকুম-আহ্‌কাম সম্পর্কে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন তাই কুরআনকে الذكر (স্মরণ) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(দুই) আল-কুরআনে বিশ্বাসী মানুষের জন্য কুরআন যেহেতু সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা আল-কুরআনকে الذكر (সম্মানের বস্তু) বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : وانه لذكر لك ولقومك "কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু"—(সূরা যুখরুফঃ ৪৪)।

হযরত ওয়াসিলাহ্‌ ইব্‌নুল আসকা' (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে

বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে তাওরাতের বিনিময়ে আস্-সাবউত-তুয়াল (السبع الطوال), যাবূরের বিনিময়ে "আল-মীঈন" (المئين) এবং ইঞ্জীলের বিনিময়ে আল্-মাছানী (المثانى) প্রদান করে আল-মুফাস্সালের (المفصل) মাধ্যমে (অন্যদের উপর) শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে।

হযরত আবূ কিলাবা (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে তাওরাতের বিনিময়ে "আস্-সাবউত-তুয়াল", যাবূরের বিনিময়ে "আল-মাছানী" এবং ইঞ্জীলের বিনিময়ে "আল-মীঈন" দান করে আল-মুফাস্সালের মাধ্যমে (অন্যদের উপর) শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।

খালিদ বলেন, লোকেরা মুফাস্সাল সূরাগুলোকে "আরাবী" বলত। তবে কেউ কেউ বলেছেন, আরাবী সূরাগুলোর মধ্যে কোন সিজদা নেই।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আত্-তুয়াল হ'ল তাওরাতের মত, আল-মীঈন হ'ল ইঞ্জীলের মত এবং আল-মাছানী হ'ল যাবূরের মত, তবে এর পরবর্তী অন্যান্য সূরাগুলোর দ্বারাই কুরআনকে অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।

হযরত ওয়াসিলাহ ইব্নুল আস্কা' (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে আমার প্রভু তাওরাতের বিনিময়ে "আস্-সাবউত্-তুয়াল", ইঞ্জীলের বিনিময়ে "আল-মাছানী" এবং যাবূরের বিনিময়ে "আল-মীঈন" প্রদান করে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আল-মুফাস্সালের মাধ্যমে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, আল-বাকারাহ, আল-ইমরান, আন-নিসা, আল-মায়িদাহ, আল-আনআম, আল-আ'রাফ এবং ইউনুস প্রভৃতি সূরা হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-এর মতানুসারে আস্-সাবউত-তুয়ালের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ একটি কথা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, একদিন আমি হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মাছানীর সূরা আল্-আনফাল এবং মীঈনের সূরা বারাআহ্ (তওবা)-কে আপনি কেন একত্র করে ফেলেছেন এবং এ দু'টি সূরার মাঝে بسم الله الرحمن الرحيم না লিখে তাদের আস্-সাবউত-তুয়ালের মধ্যে সন্নিবেশিত করে নিয়েছেন? কোন জিনিস আপনাকে এ কাজ করার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে? হযরত উসমান (রা) বললেন, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বহু আয়াত বিশিষ্ট বড় বড় সূরা নাযিল হয়। সাধারণতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অভ্যাস ছিল যে, যখনই তাঁর প্রতি কোন কিছু নাযিল হ'ত, তখনই তিনি ওহী লেখককে ডেকে বলতেন, এই আয়াতটি অমুক সূরার মাঝে শামিল করে নাও যথায় এই এই কথা আলোচিত হয়েছে। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মাঝে প্রথম পর্যায়ের সূরা হ'ল আল-আনফাল এবং শেষ পর্যায়ের সূরা হ'ল সূরা-বারাআহ। সূরা দুটির ঘটনাবলী পরস্পর সামঞ্জস্য-পূর্ণ। তাই আমি মনে করেছি যে, সূরা বারাআহ আল-আনফালেরই অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন, অথচ এ কথাটি তিনি আমাদের নিকট বলে যাননি। এ কারণেই সূরা দুটির মাঝে بسم الله الرحمن الرحيم না লিখে উহাদেরকে একত্রে উল্লেখ করে আস্-সাবউত-তুয়ালের" অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছি।

হযরত 'উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত এ রিওয়ায়েত সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রকাশ করছে যে, "সূরা আল্‌-আন্‌ফাল্‌ এবং সূরা বারাআহ আস্‌-সাবউত-তুয়ালের অন্তর্ভুক্ত"। হযরত উছমান গনী (রা)-কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি বলে যাননি এবং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি উহাদের আস-সাবউত-তুয়ালের" অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন না।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, উল্লিখিত সূরাগুলো কুরআনের অন্যান্য সূরাসমূহ থেকে দীর্ঘ হওয়ার কারণে উহাদেরকে "আস্‌-সাবউত-তুয়াল" বলে নামকরণ করা হয়েছে।

আল-মীঈন (المـئـين) : শতাধিক কিংবা একশত অথবা এর থেকে সামান্য কম আয়াত সম্বলিত সূরাসমূহকে আলা-মীঈন বলা হয়।

আল-মাছানী (المـثـانى) : মীঈনের সাথে সংশ্লিষ্ট সূরাগুলো হ'ল আল-মাছানী। মীঈন হ'ল প্রথম পর্যায়ের এবং মাছানী হ'ল দ্বিতীয় পর্যায়ের। কেউ কেউ বলেছেন, আল-মাছানীর মাঝে যেহেতু আল্লাহ্‌তাআলা খবর, নসীহত এবং উদাহরণসমূহ বারংবার উল্লেখ করেছেন তাই এ ধরনের কতগুলো সূরাকে আল-মাছানী (যা পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াত করা হয়) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ ধরনের উক্তি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।

হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, এ সমস্ত সূরার মধ্যে যেহেতু ফারায়েয এবং শরীআতের বিধান বারংবার আলোচিত হয়েছে তাই উহাদেরকে আল-মাছানী বলে নামকরণ করা হয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবন জুবায়ের (রা) বলেছেন, সংখ্যায় অধিক এক জামাআত লোক বলেছেন, সম্পূর্ণ কুরআন শরীফই হল আল-মাছানী।

অপর একদল লোক বলেছেন, সূরা ফাতিহা হ'ল আল-মাছানী। কেননা প্রত্যেক নামাযে সূরা ফাতিহাই বারংবার তিলাওয়াত করা হয়। সামনে তাদের নাম ও এর কারণগুলো বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা এবং এ নিয়ে যে মতপার্থক্য হয়েছে—এর সঠিক ও সহীহ তথ্য ولـقـد اتـيـنـاك سـبـعا من المثانى ("আমি তো তোমাকে দিয়েছি সূরা ফাতিহার সাত আয়াতঃ"—সূরা হিজর : ৮৭) আয়াতের ব্যাখ্যার পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ তা'আলা।

কুরআনের সূরাসমূহের নামের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে রিওয়ায়েত বিবৃত হয়েছে অনুরূপ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে জনৈক কবির কবিতায় মাঝে। কবি বলেছেন :

حلـفـت بالسبع اللواتى طولت — وبمئين بعدها قد امئيت

وبمثان ثنيت فكررت — وبالطواسين قد ثلثت

وبالحواميم اللواتى سبعت — وبالمفصل اللواتى فصلت

(শপথ করছি আমি সাতটি বড় সূরার, তৎপরবর্তী মীঈনের যার মাঝে আছে একশত আয়াত, মাছানীর যার মধ্যে (বিষয় বস্তু) পুনঃ পুনঃ আলোচিত হয়েছে, তোয়া-সীনের যার সংখ্যা তিনটি, হামীমের যার সংখ্যা সাতটি এবং মুফাস্‌সালের যাকে পৃথক করা হয়েছে بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা)।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, উল্লিখিত নামের ব্যাপারে আমরা যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে পেশ করেছি এর বিশুদ্ধতার উপর পূর্বোক্ত কবিতাগুলো পরিষ্কার ইংগিত করছে।

আল-মুফাস্‌সাল (المفصل) ঃ যেসব সূরাকে بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা ঘন ঘন ফাসল বা পৃথক করা হয়েছে এগুলোকেই মুফাস্‌সাল বলা হয়।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, কুরআনের প্রতিটি সূরাকে سورة বলা হয়। سورة-এর বহুবচন হ'ল سور যেমন خطبة-এর বহুবচন خطب এবং غرفة-এর বহুবচন غرف হামযা ব্যতীত سور البلد। السورة শব্দের অর্থ হ'ল المنزلة من منازل الارتفاع (স্তরসমূহের অন্যতম স্তর)। سور البلد (নগর প্রাচীর) শব্দটিকে এর থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। শহর ঘেরা প্রাচীর ও যেহেতু বেষ্টিত বস্তু থেকে সাধারণত একটু উঁচু তাই উহাকে سور البلد বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে سور المدينة থেকে السورة শব্দটির বহুবচন سور-এর ওজনে আসে না, যেমনি ভাবে سورة من القرآن-এর বহুবচন سور-এর ওজনে ব্যবহৃত হয়। শহর ঘেরা প্রাচীরের জন্য ব্যবহৃত শব্দ السورة-এর বহুবচন নির্ধারণ করে কবি আজ্জাজ (عجاج) বলেছেন :

فرب ذى سرادق محجور — سرت اليه فى اعالى السور –

(অনেক শহর ঘেরা প্রাচীরের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বদ্ধ তাঁবুর দিকে আমি ভ্রমণ করেছি)। উল্লিখিত পংক্তিতে কবি السورة শব্দের বহুবচন بسرة ও اسرة-এর বহুবচনের মতই ব্যবহার করেছেন। কেননা উল্লিখিত শব্দদ্বয়ের বহুবচন সাধারণতঃ بسر ও اسر-এর ওজনেই ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে سورة من القرآن-এর বহুবচন কখনো سور-এর ওজনে গোচরীভূত হয়নি। যদি এর বহুবচন অনুরূপ হ'ত তাহলে سور শব্দের দ্বারা সমগ্র কুরআন মুরাদ নেয়ার সময় قياس-এর মাঝে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'ত না। অথচ আরবগণ অনুরূপ (বহুবচন প্রকাশক) শব্দের দ্বারা সমগ্র কুরআন মুরাদ নেয়াকে সর্বদাই পরিহার করেছেন। কেননা সাধারণতঃ যে (বহুবচন قصب - شعير - بسر ইত্যাদির মত لفظا واحد مذكر-এর ওজনে ব্যবহৃত হয় এর বহুবচন অন্য শব্দের একবচন-এর মতই হয়। কেননা এর واحد-এর হুকুম مفرد মত নির্ধারণ করা ঠিক নয়। সুতরাং এর جمع (বহুবচন)-কে অন্যান্য শব্দের واحد-এর মত ব্যবহার করা হয় এবং এর واحد (একবচন)-কে جمع (বহুবচন)-এর একটি অংশ বিশেষ ধরে নিয়ে বলা হয় بسرة - شعير এবং قصبة উদ্দেশ্য হ'ল উল্লিখিত বস্তুসমূহের অংশ বিশেষ। কিন্তু سور القرآن (কুরআনের সূরাগুলো) شعير - بسر এবং سور المدينة-এর মত একত্রিত নয় বরং এর প্রত্যেকটি সূরা হ'ল غرفة من الغرف (কামরা-সমূহের একটি কামরা) এবং خطبة من الخطب (বক্তৃতাসমূহের মধ্যে একটি বক্তৃতা)-এর মত আলাদা ও বিচ্ছিন্ন। তাই سورة القرآن-এর جمع (বহুবচন) غرف ও خطب -এর ওজনে ব্যবহৃত হতে বাধ্য যেগুলোকে বানান হয়েছে তার واحد (একবচন) থেকে। السورة-এর বহুবচন المنزلة من الارتفاع (উচুস্থান) এ হ'ল যিবয়ান গোত্রের ন্যাবিগাহ্ নামক কবির কথা। তিনি বলছেন ঃ

الم تر ان الله اعطاك سورة — ترى كل ملك دونها يتذبذب

(আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কি মর্যাদা দান করেছেন তুমি কি তা দেখছ না? এ মর্যাদার নীচে অবস্থিত প্রত্যেকটি বাদশাহকে তুমি দেখবে হতবুদ্ধি এবং কিংকর্তব্য বিমূঢ়)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এমন মর্যাদা দান করেছেন, যে মর্যাদার সামনে বাদশাহদের মর্যাদাও তুচ্ছ।

কেউ কেউ سور من القرآن-কে হামযার সাথেও পড়েছেন। হামযার সাথে যদি শব্দটিকে পড়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে,

القطعة التي قد أفضلت من القرآن عماسواها وابقت

(সমগ্র কুরআনের এমন একটি অংশ যাকে এ অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করে বাকী রাখা হয়েছে)। এ হিসাবেই কুরআনের সূরাকে سور বলা হয়। কেননা প্রতিটি বস্তুর বাকী অংশটিই হল ঐ বস্তুর জন্য سور (উচ্ছিষ্ট)। এ জন্যই পানীয় বস্তু থেকে কোন ব্যক্তির পান করার পর বরতনে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট পানিকে سور (উচ্ছিষ্ট) বলা হয়। এ অর্থের প্রতিই ইংগিত করে ছা'লাবা গোত্রের আ'শা নামক কবি তার বিচ্ছেদকৃত স্ত্রী (যার প্রতি গভীর প্রেম এখনো তার হৃদয়ের মণিকোঠায় অবশিষ্ট রয়ে গেছে)-কে লক্ষ্য করে যা বলেছেন ঃ

فبانت وقد اسارت في الفؤاد — صدعا على نأيها مستطيرا

সে তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অথচ তার বিরহ ব্যথায় আমার অন্তরে বিক্ষিপ্ত ক'টি দাগ অবশিষ্ট রয়ে গেল। কবি আ'শা অনুরূপ আরো বলেছেন ঃ

بانت وقد اسارت في النفس حاجتها — بعد ائتلاف وخير الود ما نفعا ـ

শুভ মিলনের পর আমার থেকে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেল, অথচ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে তার প্রতি আমার হৃদয়ে শুভেচ্ছা ও গভীর ভালবাসা। আর সর্বোত্তম ভালবাসা হলো যা কল্যাণকর।

আল-আয়াত (الآية) ঃ পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত الآية শব্দ দু'টো অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ঃ

এক ঃ কোন বস্তুর প্রতি ইংগিত বহনকারী নিদর্শন দ্বারা যেমনিভাবে ঐ বস্তুর পরিচিতির জন্য প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় এমনিভাবে কুরআনের আয়াতের দ্বারাও যেহেতু আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা যায়, তাই আয়াতকে—আয়াত (নিদর্শন) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন জনৈক কবি বলেছেন,

ألكني اليها عمرك الله يا فتى - بآية ماجاءت الينا تهاديا

"হে যুবক, আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। তার নিকট তুমি আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও, ঐ নিদর্শনের দ্বারা যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে উপঢৌকন স্বরূপ।" দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নবর্ণিত আয়াতটি পেশ করা যেতে পারে ঃ

ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك

— اى علامة منك لاجابتك دعاءنا واعطائك ايانا سؤلنا ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করুন। তা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য হবে আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং আপনার নিকট হতে নিদর্শন"।—(সূরা মায়িদাহ ঃ ১১৪)।

অর্থাৎ তা যেন হয় আপনার পক্ষ হতে আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা ও আমাদের দু'আ গৃহীত হওয়ার একটি আলামত বা নিদর্শন স্বরূপ।

দুই : আয়াত (الآية)-এর দ্বিতীয় অর্থ হ'ল قصة বা খবর ও ঘটনা। যেমন কা'ব ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবি সালামা নামক কবি বলেছেন,

الا ابلغا هذا المعرض آية — ايقظان قال القول اذ قال ام حلم

"শোন, তোমরা উভয়ে পেঁাছে দাও এই দ্ব্যর্থবোধক কথককে আমার পক্ষ থেকে এই খবর। এ কথাটি কি সে জাগ্রত অবস্থায় বলেছে না স্বপ্ন?" উল্লিখিত কবিতায় কবি آية বলে رسالة منى এবং خبرا عنى অর্থ নিয়েছেন। সুতরাং এই স্থানে الآيات অর্থ হচ্ছে القصص অর্থাৎ এমন ঘটনা যার পরে রয়েছে আরো ঘটনা। তা একত্রিত ভাবে হোক অথবা বিচ্ছিন্ন ভাবে হোক।

সূরা ফাতিহার নামসমূহের ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : এ সূরাটির নাম উম্মুল-কুরআন, (ام القرآن), ফাতিহাতুল-কিতাব (فاتحة الكتاب) এবং আস-সাবউল-মাছানী (السبع المثانى)।

এক : ফাতিহাতুল-কিতাব, এ সূরাটি দ্বারা কুরআন শরীফ লিখা আরম্ভ করা হয় এবং প্রত্যেক নামাযে পাঠ করা হয়, তাই লিখন ও পঠনে এ সূরাটি হ'ল কুরআনের অন্যান্য সূরাসমূহের জন্য মুখবন্ধ এবং ভূমিকা স্বরূপ। এ কারণে সূরাটিকে ফাতিহাতুল-কিতাব বলা হয়।

দুই : উম্মুল-কুরআন, লিখন ও পঠনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি যেহেতু কুরআনের অন্যান্য সূরা-সমূহ হতে প্রথমে এবং অন্যান্য সূরাগুলো হ'ল এর পরে তাই এ সূরাটিকে উম্মুল-কুরআন বলে অভিহিত করা হয়েছে। উম্মুল-কুরআন বলে উহাকে আখ্যায়িত করার উল্লিখিত কারণটি উহাকে ফাতিহাতুল-কিতাব বলে নামকরণ করার কারণের সাথে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এ নামে উহাকে নামকরণ করার অন্য একটি কারণ এ-ও দেখান হয় যে, আরবগণ কোন সর্বব্যাপ্ত এবং এমন বস্তু যা তার পেছনে আগত বস্তুর অগ্রে অবস্থান করে তা-কে ام (উম্মুন) বলে থাকে। এ কারণে আরবগণ মস্তিষ্ক পরিবেষ্টনকারী চামড়াকে ام الرأس এবং সৈন্য দলের পতাকা যার নীচে সৈন্যগণ সমবেত হয় তাকে ও ام বলে।

তাই যুর-রুম্মাহ্ (ذو الرمة) কবি বর্শার মাথায় উড়ান পতাকার প্রশংসা করে বলেছেন, যার নীচে তিনি ও তার সাথীগণ সমবেত আছেন :

واسمر قوام اذا نام صحبتى — خفيف الثياب لاتوارى له ازرا

على رأسه ام لنا نقتدى بها — جماع امور لانعاصى لها امرا

اذا نزلت قيل انزلوا واذا غدت — غدت ذات ترزيق فنال بها فخرا -

"আমার সংগীগণ যখন শুয়ে যায়, তখন পিঠও আবৃত হয় না এ ধরনের হালকা কাপড় পরি-হিত তীরন্দাজ আমীরের বর্শার মাথায় থাকে আমাদের একটি ঝাণ্ডা যার আমরা অনুসরণ করি, যা সর্ব বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। আমরা এর বিরুদ্ধ মাত্রও বরখেলাপ করি না। যখন তা নেমে যায় তখন

বলা হয় (আমাদেরকে) তোমরা নেমে যাও। যখন প্রভাত হয়—তখন প্রভাত হয় ক্ষুদ্রাকৃতির একটি বর্শার ন্যায়, যার দ্বারা আমরা গৌরব অর্জন করি।" উল্লিখিত কবিতায় কবি ام لنا على رأسه বলে

على رأس الرمح راية يجتمعون لها النزول والرحيل وعند لقاء العدو -

(বর্শার মাথায় থাকে একটি পতাকা যার নীচে তারা সমবেত হয় অভিযান চলাকালে, অবতরণ করা কালে এবং শত্রুর মোকাবিলা করার সময়)-এ অর্থটিই বুঝাতে চেয়েছেন।

কেহ কেহ বলেছেন, পবিত্র মক্কা নগরীর উত্থান যেহেতু অন্যান্য নগরসমূহের পূর্বে হয়েছে, তাই উহাকে ام القرى বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আবার এ কথাও কেউ কেউ বলেছেন যে, পৃথিবীর সম্প্রসারণ যেহেতু পবিত্র মক্কা নগরী থেকেই হয়েছে, তাই উহাকে ام القرى বলে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন হুমায়দ ইবনে ছাওর আল-হিলাল নামক কবি বলেছেন,

اذا كانت الخمسون امك لم يكن — لدائك الا ان تموت طبيب

(যদি পঞ্চাশজন ডাক্তার তোমার মা হয় তবুও মৃত্যু ব্যতীত তোমার রোগের কোন চিকিৎসা নেই)। উক্ত কবিতার মাঝে خمسون (পঞ্চাশ) সংখ্যাটি তার নিম্নের সংখ্যার তুলনায় ব্যাপক হওয়ার ফলে خمسون সংখ্যায় উপনীত ব্যক্তির জন্য উহাকে ام আখ্যা দেয়া হয়েছে।

তিন ঃ আস-সাবউল মাছানী ঃ সূরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা যেহেতু সাত তাই উহাকে সাবউল-মাছানী বলা হয়। সূরা ফাতিহার আয়াত যে সাতটি, এ ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞ আলিমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তবে যেসব আয়াতের দ্বারা সাতের কোটা পূর্ণ হয় এ নিয়ে সাধারণত একটি মত পার্থক্য রয়েছে।

কুফার মহান তত্ত্বজ্ঞানিগণ বলেছেন, সূরা ফাতিহার সাত আয়াত بسم الله الرحمن الرحيم-এর মাধ্যমেই পূর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী এবং তাবিঈদের থেকেও এ কথাটি বর্ণিত হয়েছে।

উলামায়ে কিরামের অপর একদল বলেছেন, সূরা ফাতিহার মাঝে আয়াতের সংখ্যা সর্বমোট সাতটি, এর মাঝে بسم الله الرحمن الرحيم অন্তর্ভুক্ত নয়। انعمت عليهم হ'ল এর সপ্তম আয়াত। এ বর্ণনাটি হ'ল মদীনা শরীফের বিখ্যাত কারীগণের এবং এটা তাদের ঐক্যবদ্ধ অভিমত।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, এ সম্পর্কে সহীহ এবং বিশুদ্ধ মতামতের বর্ণনা আয়াতের সূক্ষ্ম আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ في احكام شرائع الاسلام-এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে পেশ করেছি। এ স্থানে আমাদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ في احكام شرائع الاسلام-এ বর্ণিত সাহাবা, তাবিঈ এবং পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি আলিমদের মতামতের বিবরণ পেশ করেই ইনশা আল্লাহ বিষয়টি সমাপ্ত করব।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সূরা ফাতিহার আয়াত সাতটি। এ সূরাটি যেহেতু নফল এবং ফরয নামাযে বারংবার পঠিত হয় তাই তা মাছানীর অন্তর্ভুক্ত। হযরত হাসান বসরী (র) ও সাব'উল-মাছানীর এ ব্যাখ্যাই করতেন।

আবূ রাজা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহ্র বাণী ولقد اتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم (আমি তো তোমাকে দিয়েছি সূরা ফাতিহার সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহান আল-কুরআন) সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, সাব'উল-মাছানী বলে সূরা ফাতিহাকেই বুঝান হয়েছে। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি الحمد لله رب العالمين থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সূরাটি তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সূরাটি প্রত্যেক কিরাত অথবা প্রত্যেক নামাযে বারংবার পঠিত হয়ে থাকে।

কবি আবূন্-নাজ্ম আল-আজালী তাঁর স্বরচিত কবিতায় পূর্বোক্ত অর্থের প্রতিই ইংগিত করে বলেছেন,

الحمد لله الذى عافانى — وكل خير بعده اعطانى
من القرآن ومن المثانى -

"সর্বপ্রকার প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি আমাকে নিরাপদ রেখেছেন, এরপর আমাকে সর্বপ্রকার কল্যাণসহ দান করেছেন কুরআন এবং মাছানী তথা ফাতিহা।"

অনুরূপভাবে কবি রাজিয বলেছেন,

نشدتكم بمنزل الفرقان - ام الكتاب السبع من مثانى -
ثنين من اى من القرآن — والسبع سبع الطول الدوانى -

"ফুরকান নাযিলকারী সত্তার কসম দিয়ে আমি তোমাকে বলছি, উম্মুল-কিতাব হল সূরা ফাতিহার সাত আয়াত যা দাওয়ানীর সাবউত-তুয়াল এবং কুরআনের আয়াতের (মূল কথাগুলোর) সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেয়।"

ইমাম আবূ জাফ'র তাবারী (রঃ) বলেন, সূরা ফাতিহাকে সাবউল-মাছানী নামকরণ করার ফলে পুরো কুরআন শরীফকে এবং মাছানী নামে অভিহিত সূরাসমূহকে মাছানী বলে আখ্যা দেয়ার মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা এ সবের প্রত্যেকটিরই এমন একটি দিক এবং তাৎপর্য রয়েছে যে, এর প্রত্যেকটিকে মাছানী বলে নামকরণ করায় কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না।

মাঈনের সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের সূরাসমূহকে মাছানী বলে নামকরণ করার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফকে মাছানী বলে নামকরণ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সূরাতুয-যুমারের শেষ পর্যায়ে ইনশা আল্লাহ্ আমি আলোচনা করব।

আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় চাওয়ার ব্যাখ্যা

اعوذ (আউযু) ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, الاستعاذة শব্দের অর্থ হ'ল الاستجارة (আশ্রয় চাওয়া)। من الشيطان ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রাঃ) বলেন, সকল অবাধ্য জিন, ইনসান এবং বিচরণশীল প্রাণী ও বস্তুকে আরবী ভাষায় شيطان বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

"এমনি ভাবে বানিয়েছি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু মানব এবং জিনদের মধ্যে শয়তানদেরকে" (সূরা আল-আনআম : ১১২)। উল্লিখিত আয়াতে যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় মানুষকে শয়তান বলে ঘোষণা দিয়েছেন তেমনিভাবে কতিপয় জিনকেও তিনি শয়তান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি একটি তুর্কী ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলেন এটা তাকে নিয়ে অত্যধিক লাফালাফি আরম্ভ করল। তিনি ঘোড়াটিকে প্রহার করতে শুরু করলেন। এতে তার লাফালাফি আরো বেড়ে গেল। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি এর পিঠ থেকে অবতরণ করে বললেন, তোমরা তো আমাকে একটি শয়তানের পিঠে চড়িয়ে দিয়েছিলে, আমার অস্বস্তিবোধ হওয়ায় এর পিঠ থেকে আমি নেমে গেলাম।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, প্রতিটি অবাধ্য বস্তুর আচার-আচরণ যেহেতু একই প্রজাতির অন্যান্য বস্তুর স্বাভাবিক আচার-আচরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এ যেহেতু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত তাই প্রতিটি অবাধ্য বস্তুকেই শয়তান বলে নামকরণ করা হয়েছে। কথাটি আরবী বাক্য شطنت داری من دارك (আমি আমার বাড়ীকে তোমার বাড়ী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছি) থেকে উদগত। এখানে شطنت শব্দটি بعدت অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যুবয়ান গোত্রের কবি নাবিগার কবিতাটি আমাদের দাবীর জোর সমর্থন করছে :

نَأَتْ بِسُعَادَ عَنْكَ نَوًى شَطُوْنُ — فَبَانَتْ وَالْفُؤَادُ بِهَا رَهِيْنُ -

(দূরে সরে যাওয়ার ইচ্ছা করে সে সু'আদকে নিয়ে তোমার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে এবং দূরে চলে গিয়েছে। অথচ তার সাথে তোমার হৃদয় একই সূত্রে গ্রথিত)। উক্ত কবিতায় বর্ণিত نوى শব্দের অর্থ হ'ল এমন বিষয় যার সে ইচ্ছা করেছে এবং الشطون শব্দের অর্থ হ'ল البعيد (দূরবর্তী)। সুতরাং এ ব্যাখ্যা অনুসারে شيطان শব্দটি شطن ক্রিয়া থেকে গঠিত একটি اسم বা বিশেষ্য।

"شيطان শব্দটি شطن ক্রিয়া থেকে নির্গত হয়েছে" উমায়্যা ইব্ন আবিস্ সাল্‌তের কবিতা এ কথার প্রমাণ করে :

اَيُّمَا شَاطِنٍ عَصَاهُ عَكَاهُ — ثُمَّ يُلْقٰى فِي السِّجْنِ وَالْاَكْبَالِ -

(যদি কোন বিতাড়িত ব্যক্তি কোমর বেঁধে তার অবাধ্যতা প্রদর্শন করে তাহলে সে লৌহ-বন্ধনী ও শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হবে)। সুতরাং এতে বুঝা যাচ্ছে যে, فعلان-এর ওজনে ব্যবহৃত شيطان শব্দটি যদি شاط - شيط থেকে নির্গত হত তবে কবি অবশ্যই شائط বলতেন। অথচ তিনি বলেছেন, شاطن যা নির্গত হয়েছে شطن يشطن فهو شاطن থেকে।

الرجيم শব্দের ব্যাখ্যা : فعيل-এর ওজনে আগত الرجيم শব্দটি এস্থলে مفعول-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন كف خضيب - لحية دهين - رجل لعين প্রভৃতি শব্দগুলো مخضوبة - مدهونة এবং ملعون-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯—

الرجيم। শব্দের অর্থ হ'ল الملعون (অভিশপ্ত) এবং المشتوم। (নিন্দিত)। সুতরাং অধিক অশালীন বাক্য প্রযুক্ত প্রতিটি مشتوم (তিরস্কৃত) ব্যক্তিই হ'ল مرجوم বা অভিশপ্ত।

বস্তুত الرجم শব্দের মূল অর্থ হ'ল নিক্ষেপ করা, চাই তা কথার মাধ্যমে হোক অথবা কাজের মাধ্যমে হোক। لئن لم تنته لا رجمنك (যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই) বলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পিতা স্বীয় সন্তান ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে যা বলেছিলেন তা হ'ল কথার মাধ্যমে পাথর মারার রূপক বর্ণনা।

অতএব শয়তান নামের সাথে رجيم (অভিশপ্ত) শব্দের ব্যবহার অতীব ন্যায় এবং যুক্তিসম্মত। কেননা আল্লাহ তাআলা তার প্রতি شهاب ثاقب (জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড) নিক্ষেপ করে তাকে আকাশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত জিবরীল আলাইহিস্‌সালাম প্রথমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাঁকে استعاذة (আশ্রয় প্রার্থনা) শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন; হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রথমত ওহী বাহক ফিরিশ্‌তা হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ (স), আপনি বলুন: আমি বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর তিনি বললেন, আপনি বলুন: পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। তারপর তিনি বললেন, পাঠ করুন, প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন, এ সূরাটিই হ'ল কুরআন শরীফের প্রথম সূরা যা আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালামের যবানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করেছেন এবং তাঁকে সৃষ্টজীবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা না করে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, মহান ও পবিত্র সত্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নবী হযরত মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল কাজের পূর্বে তাঁর সুন্দরতম নামসমূহকে উল্লেখ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রারম্ভে এ সব সুন্দরতম নামের দ্বারা তাঁর গুণাবলী প্রথমে প্রকাশ করার তা'লীম দিয়ে এক অনুপম আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন। সমগ্র সৃষ্টি জগতকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে আদব এবং যে ইল্‌ম শিক্ষা দয়েছেন তা হ'ল এমন একটি পথ ও এমন একটি তরীকা যার অনুসরণ করবে মানুষ তার বলা, পড়া, লিখা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিটি কাজ আরম্ভ করার পূর্বে। তাই بسم الله পাঠকারী ব্যক্তির এ পাঠের জাহিরী দিকটির, এর বাতিনী দিকের উপর যে দালালাত ও নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে তাতে এর উহ্য উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করতে আর কোন কিছু বাকী থাকে না। তা হচ্ছে এই যে, بسم الله শব্দের با একটি فعل বা ক্রিয়াকে চায় যার সাথে এই অক্ষরটি যুক্ত হবে। কিন্তু বাহ্যত এস্থানে কোন فعل বা ক্রিয়া নেই। সুতরাং بسم الله তিলাওয়াতকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রোতাকে অবহিত করার জন্য—কথার মাধ্যমে শ্রোতার নিকট তার নিজের উদ্দেশ্যকে তুলে ধরার কোন প্রয়োজন

নেই। কারণ بسم الله পাঠকারী প্রত্যেকটি মানুষই মূলত কাজ আরম্ভ করার সময়ই بسم الله পাঠ করে থাকে—চাই তা কাজ আরম্ভ করার সাথে সাথে হোক অথবা কাজ আরম্ভ করার কিছুক্ষণ পূর্বে হোক। তা শ্রোতাকে বোধগম্য করে দিবে, পাঠক কেন بسم الله পাঠ করল।

অতএব بسم الله-এর পূর্বে محذوف বা উহ্য বস্তুটি প্রকাশ করা থেকে শ্রোতার ঐ বোধগম্যতা ঐ مع سا-এর মতই যিনি ما اكلت اليوم (আজ তুমি কি খেয়েছ ?) জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে طعاما (খানা) বলে উত্তর দিতে শুনেছেন, যা তাকে طعاما-এর সাথে اكلت ক্রিয়াটিকে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা ভক্ষণ করা বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নকারীর প্রশ্নটি পূর্বে উল্লেখ থাকার কারণে এ বাক্যের অর্থ শ্রোতার নিকট সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত। কারণ بسم الله الرحمن الرحيم বলে পাঠক যখন নতুন কোন সূরা তিলাওয়াত করেন তখন بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ-এর اقرأ বলার প্রয়োজন হয় না।

অনুরূপ ভাবে উঠা-বসা ও অন্যান্য কাজের শুরুতে بسم الله বললে اقوم بسم الله এবং اقعد بسم الله। ইত্যাদি স্পষ্ট ভাবে বুঝায়।

এ যাবৎ (بسم) শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা যা বললাম তা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতেরই অনুবাদ মাত্র।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরিশতা জিবরীল (আ) সর্বপ্রথম এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (স), আপনি বলুন: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم (আমি বিতাড়িত এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। এরপর জিবরাঈল (আ) আরও বললেন, আপনি বলুন بسم الله الرحمن الرحيم (করুণাময় এবং পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি)। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন, জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (স)-কে আবার বললেন, হে মুহাম্মাদ (স), আপনি বিসমিল্লাহ বলুন, আপনার প্রতিপালক আল্লাহর নামে পড়ুন এবং তাঁর নাম নিয়ে উঠাবসা করুন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, কেউ আমাকে এ প্রশ্ন করলে بسم الله-এর ব্যাখ্যা যদি তা হয় যা আপনি বর্ণনা করেছেন এবং যদি بسم الله-এর باء-এর সম্পর্কে তাই হয় যা আপনি উল্লেখ করেছেন তাহলে কিভাবে বলা যাবে যে, بسم الله শব্দটি اقرأ بسم الله অথবা اقوم او اقعد بسم الله এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ? নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে, কুরআন শরীফের প্রত্যেক পাঠকই আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং তাঁর দেওয়া তৌফীকের উপর ভরসা করেই কুরআন শরীফ পাঠ করে থাকে। অনুরূপভাবে উঠা-বসা ও প্রতিটি কাজ মানুষ তাঁর সাহায্যেই সম্পাদন করে। তাই কেন بسم الله না বলে بالله الرحمن الرحيم বলা হবে না ? কারণ বক্তার কথা اقوم او اقعد بالله الرحمن الرحيم এবং اقرأ بالله বাক্যগুলো শ্রোতার নিকট بسم الله থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট। কেননা কথকের কথা اقوم او اقعد بسم الله শ্রোতার মনে এ ধারণার সৃষ্টি করে যে, তার উঠা, বসা প্রভৃতি কাজ غير الله অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সহযোগিতায় না হয়ে اسم-এর সহযোগিতায় সম্পন্ন হচ্ছে।

উত্তর: প্রশ্নকর্তা যা ধারণা করেছেন মূলতঃ بسم الله-এর অর্থ তা নয়, বরং بسم الله-এর অর্থ হ'ল ابدأ بتسمية الله او اقرأ بتسمية الله - او اقوم واقعد بتسمية الله و ذكره قبل كل شئ

—আমি আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখসহ শুরু করছি, বা দাঁড়াচ্ছি বা বসছি অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের পূর্বে আল্লাহ্‌র উল্লেখ করে শুরু করছি, اسم-এর সহযোগিতায় শুরু করছি-এর অর্থ তা নয়। যদি তাই হ'ত তবে اقرأ باسم الله এবং اقوم واقعد باسم الله বলা بسم الله থেকে উত্তম হ'ত।

যদি কেউ বলে, ব্যাপারটি যদি তাই হয় যা আপনি বলেছেন—তবে আমি বলব যে, এখানে بسم الله শব্দের প্রয়োগ ঠিক হয়নি। কেননা الاسم শব্দটি হ'ল একটি বিশেষ্য এবং تسمية শব্দটি এর মাছদার (মূল)। সুতরাং নাম اسم দ্বারা নামকরণ (تسمية) বুঝানো সমীচীন হবে না। এর উত্তরে বলা যায়, আরবগণ কখনো কখনো বিভিন্ন নামের অস্পষ্ট উৎস (مصدر) ব্যবহার করে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে, اكرمت فلانا كرامة। (অমুককে আমি সম্মান করেছি) এবং اهنت فلانا هوانا (অমুককে আমি অপমান করেছি)। উল্লিখিত বাক্যদ্বয়ে كرامة ও هوانا যেহেতু باب افعال-এর ক্রিয়ার পর বর্ণিত হয়েছে তাই এরা হ'ল باب افعال-এর مصدر (মূল)। এমনিভাবে আরবদের কথা كلمته كلاما (আমি তার সাথে কথা বলেছি) বাক্যে বর্ণিত كلاما শব্দটি এর মূল উৎস। সুতরাং اسم বলে تسمية মুরাদ নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন কোন এক কবি বলেছেন,

اكفرا بعد رد الموت عني — وبعد عطائك المائة الرتاعا —

"আমার থেকে মৃত্যুকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর এবং সুজলা-সুফলা চারণভূমিতে উট চরানোর জন্য একশত রাখাল দান করার পর আমি কি তোমার অকৃতজ্ঞ হতে পারি?" আলোচ্য পংক্তিতে কবি عطائك শব্দটিকে এর মূল উৎসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন।

অপর এক কবি বলেছেন,

فوان كان هذا البخل منك سجية — لقد كنت في طولي رجائك اشعبا —

(এই কৃপণতা যদি তোমার স্বভাবগত অভ্যাস হয় তাহলে তোমার কাছে আমার সুদীর্ঘ আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত)। এই কবিতার দ্বিতীয় পংক্তিতে শব্দটিকে এর মূল উৎস اطالي শব্দটির অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে অন্য এক কবি বলেছেন,

اظلوم ان مصابكم رجلا — اهدى السلام تحية ظلم

(যিনি অভিবাদন স্বরূপ সালাম পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতি অসদাচরণ করা কি জুলুম নয়)? এখানেও কবি مصابكم বলে اصابتكم। বুঝিয়েছেন। এ বিষয়ে আরো বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, যা আমাদের দাবী সমর্থন করে। তবে আমি যা আলোচনা করেছি তা বুদ্ধিমান মাত্রের জন্য যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

এ যাবত আমি যা বর্ণনা করেছি বিষয়টি যেহেতু এমনিই, অর্থাৎ আরবগণ কখনো কখনো افعل সমূহের مصدر গুলোকে فعل-এর ওজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার না করে اسم-এর ওজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার করেন—তাই কোন কাজ আরম্ভ করা এবং কোন কথা শুরু করার পূর্বে بسم الله পাঠকারী ব্যক্তির কি উদ্দেশ্য—এ বিষয়ের বর্ণনায় ابدأ بتسمية الله قولى فعلى او قولى (আমার কাজ ও কথার পূর্বে, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুরু করছি) আমি যে ছিল, পূর্বোল্লিখিত আলোচনায় এ বিষয়টি অতীব সুন্দরভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। ব্যাখ্যা পেশ হয়।

এমনিভাবে কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শুরু করার প্রাক্কালে যে ব্যক্তি بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ করেন, তার এভাবে পাঠ করার অর্থ হ'ল ابتدئ قراءتى بتسمية الله او اقرأ مبتدئا بتسمية الله (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে পাঠ আরম্ভ করছি)। এ ক্ষেত্রে اسم শব্দটিকে تسمية-এর স্থলে ব্যবহার করা হয়েছে যেমনিভাবে كلام শব্দটিকে تكليم-এর স্থলে এবং عطاء শব্দটিকে اعطاء-এর স্থলে ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, بسم الله-এর বিশ্লেষণে আমি যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি এ মর্মে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীসও বর্ণিত রয়েছে।

তিনি বলেছেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রথমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি বলুন, استعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم (আমি বিতারিত ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। অতপর তিনি বললেন, বলুন بسم الله الرحمن الرحيم (দয়াময় ও পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি)। বর্ণনাকারী ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ (স)-কে بسم الله পড়তে বলে একথাই বলতে চেয়েছেন যে, يا محمد اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله (হে মুহাম্মাদ (স), আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে পাঠ করুন এবং উঠা বসায় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করুন)।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা আমাদের আলোচনার বিশুদ্ধতার প্রতিই জোর সমর্থন করছে। অর্থাৎ—কিরাআত আরম্ভ করার সময় যে ব্যক্তি প্রথমে بسم الله الرحمن الرحيم পড়ে নেয় তার উদ্দেশ্য হ'ল এই কথা বলা :

اقرأ بتسمية الله و ذكره وافتتح القراءة بتسمية الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى

(আল্লাহ্‌র নাম স্মরণে পাঠ করুন, আল্লাহ পাকের সুন্দর নামসমূহ ও উচ্চতম গুণাবলী দ্বারা পাঠ আরম্ভ করুন)। এই ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ সমস্ত লোকদের ভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যাঁরা বলেন — بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ করে তিলাওয়াত আরম্ভকারী ব্যক্তির এ পাঠের উদ্দেশ্য হ'ল فى كل شئ بالله الرحمن الرحيم বলা। কারণ বান্দাগণ تسمية الله-এর সাথে নিজ নিজ কাজ আরম্ভ করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে। তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে খবর দেয়ার ব্যাপারে তারা নির্দেশিত হয়নি। যেমনিভাবে বান্দাগণ কুরবানীর জানোয়ার, শিকারী জন্তু, পানাহার, কুরআন তিলাওয়াত, বই পুস্তক পাঠ এবং অন্যান্য সকল কাজ আরম্ভ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছে।

সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহ্‌র বিদগ্ধ আলিমগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই যে, কেউ যদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় بسم الله না বলে শুধু بالله বলে তবে সে অবশ্যই বর্জন করল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যবেহ করার সময়ের সুন্নাতকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, بسم الله-এর অর্থ بالله নয় যেমন প্রশ্নকারী ব্যক্তি মনে করেন। আল্লাহ্‌র বাণী بسم الله الرحمن الرحيم-এর মাঝে উল্লিখিত اسم الله বলে الله-ই হ'ল উদ্দেশ্য। কেননা ব্যাপার যদি তাই হ'ত যেমন প্রশ্নকারী ব্যক্তি মনে করেন তাহলে যবেহ করার সময় بالله উচ্চারণকারী ব্যক্তির অবশ্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যেত। অথচ সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি যবেহ করার সময় بسم الله না বলে بالله বলল অবশ্যই সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পদ্ধতি বর্জন করল। এ কথা ঐ সমস্ত লোকদের

ভ্রান্তির উপর সুস্পষ্ট দলীল যাঁরা বলেন যে, بسم الله বলে بالله এবং اسم الله বলে الله-ই হ'ল উদ্দেশ্য। الاسم বলে مسمى অর্থাৎ নামকরনকৃত বস্তুকে বুঝানো হয়েছে না অন্য কিছুকে এবং এ শব্দটি আল্লাহ্‌র গুণবাচক শব্দ কিনা— এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। বরং ক্ষেত্রটি হল اسم مضاف الى الله অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রতি ইস্‌ম শব্দটি সম্বন্ধকৃত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা-ক্ষেত্র। অন্যভাবে বলা যায়, এ শব্দটি কি اسم (বিশেষ্য) না مصدر (শব্দমূল) যা تسمية-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—তা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্র।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, বিখ্যাত কবি লাবীদ ইবন রবীয়ার নিম্নের কবিতাটি সম্পর্কে আপনাদের মত কি ?

الى الحول ثم اسم السلام عليكما — ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

(এক বছর পর্যন্ত তোমরা মৃতের জন্য কাঁদ, এরপর তোমাদের উপর বিদায়ী সালাম। যে ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করে সে ক্ষমার্হ')। এ কবিতার মাঝে বর্ণিত ثم اسم السلام عليكما সম্পর্কে আরবী অভিধানে পারদর্শী এবং এ বিষয়ে অগ্রগামী লোকেরা বলেছেন যে, এর অর্থ হল ثم السلام عليكما আর اسم السلام বলে السلام বুঝানো হল কবির একমাত্র উদ্দেশ্য।

উত্তর ঃ ইমাম তাবারী বলেন যে যদি ব্যাখ্যাতার এ ব্যাখ্যা সহীহ্ হয় তাহলে رأيت اسم زيد শরিবত اسم الشراب এবং اكلت اسم الطعام বলাও শুদ্ধ হওয়া উচিত। অথচ আরবী ভাষায় এরূপ বলার অবকাশ নেই। উল্লিখিত বাক্য সমূহ অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আরবী ভাষাবিদদের ঐকমত্য ঐ সমস্ত মানুষের ভ্রান্তির কথাই পূর্ণাঙ্গ ভাবে প্রকাশ করছে যারা কবি লাবীদের কথা ثم اسم السلام عليكما-এর অর্থ ثم السلام عليكما বলেছেন, আর দাবী করছেন যে, السلام عليكما -এর পূর্বে اسم শব্দটির ব্যবহার এবং পরে তাকে السلام-এর দিকে اضافت (সম্পর্কযুক্ত) করা শুধু ঐ সময়ই শুদ্ধ হবে যখন اسم المسمى (বস্তুর নাম) ও مسمى (বস্তু) হুবহু একই জিনিস হয়।

অধিকন্তু ইমাম তাবারী (র) প্রশ্নকারী লোকদেরকে উল্টো প্রশ্ন করে বলেন যে, যেমনিভাবে তোমরা اسم السلام عليك বলে السلام عليك বুঝান শুদ্ধ মনে কর তেমনিভাবে তোমরা اكلت اسم العسل বলে اكلت العسل বুঝান শুদ্ধ মনে কর কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি তারা বলে ঃ হাঁ, তাহলে তো তারা আরবী ভাষারীতি বর্জন করে এমন বিষয়ের অনুমতি দিল যা আরবদের মতে ভুল। আর যদি তারা বলে ঃ না, তাহলে তাদেরকে এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্যকরণের কারণ জিজ্ঞেস করা হবে। এ প্রশ্নের জবাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া ব্যতীত তারা কোন কথা বলতে সক্ষম হবে না।

প্রশ্নকারী যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আপনার নিকট কবি লাবীদের ঐ কথার অর্থ কি ?
উত্তর ঃ এ কথার মাঝে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উভয় অর্থই হ'ল উল্লিখিতঅর্থের পরিপন্থী।

এক ঃ السلام শব্দটি আল্লাহ্‌র নামসমূহের একটি নাম। এই হিসাবে লাবীদের কথা ثم اسم السلام عليكما-এর অর্থ হ'ল অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র নামকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর ও তাঁর কথা স্মরণ কর এবং উত্তেজিত হয়ে আমার আলোচনা ও আমার জন্য ক্রন্দন করা বর্জন কর। এ সময় اسم শব্দটি مرفوع (পেশ বিশিষ্ট) হবে এবং সামনে আগত আখেরী হরফটি اغراء (উত্তেজনা

সৃষ্টি)-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। اغراء পরে এবং مغرى به পূর্বে ব্যবহৃত হলে আরবগণ এমনটি করে থাকেন। আর যদি مغرى به পরে ব্যবহৃত হয় তাহলে আরবগণ তাকে منصوب (যবর বিশিষ্ট) পড়ে থাকেন। যেমন কবি বলছেন,

يا أيها المائح دلوى دونكا — انى رأيت الناس يحمدونكا

"হে অঞ্জলী দিয়ে পানি উত্তোলনকারী! আমার বালতি তোমার সামনে। আমি লোকদেরকে তোমার প্রশংসা করতে দেখেছি।"

এ কবিতার মধ্যে دونكا-এর দ্বারা اغراء করা হয়েছে এবং শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে পঙতির শেষ পর্যায়ে। আর دلوى دونك-এর অর্থ হ'ল دونك دلوى। এমনিভাবে লাবীদের কবিতা الى الحول ثم اسم السلام عليكما এর অর্থ হ'ল عليكما اسم الله। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণ করাকে মযবুত ভাবে আকড়িয়ে ধর এবং আমার আলোচনা এবং আমার বিষয়ে দুঃখিত হওয়া বর্জন কর। কেননা যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির প্রতি এক বছর ক্রন্দন করে সে ক্ষমাহর্ এ। কবিতার দু'টি অর্থের একটি অর্থ ছিল এই।

দুই : ثم اسم السلام عليكما-এর অর্থ হ'ল ثم تسمية الله عليكما অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য, যেমনিভাবে বিস্ময়কর বস্তু দেখে اسم الله عليك বলে মানুষ এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তেমনিভাবে লাবীদের কথিত ثم اسم السلام عليكما-এর অর্থ হল ثم اسم الله عليكما من السوء অর্থাৎ "অতঃপর এর অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের কর্তব্য হ'ল আল্লাহ্‌র নাম নেয়া।" এ দু'টি অর্থের মধ্যে প্রথমটি লাবীদের কথার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যারা লাবীদের কথিত ثم اسم السلام عليكما-এর অর্থ ثم السلام عليكما করেন, তাদের নিকট জিজ্ঞাস্য, এ দু'টি অর্থই কি ঠিক না যে কোন একটি, নাকি কোনটিই ঠিক নয় ? যদি বলেন, না, তাহলে তো সে আরবী ভাষার বিভিন্ন রূপান্তর সম্পর্কে নিজের ইলমের গভীরতা কতটুকু তাই আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিল এবং বিতর্ক থেকে বিবাদী পক্ষকে বাঁচিয়ে দিল। আর যদি বলেন, হাঁ, তাহলে তাদেরকে বলা হবে যে, আপনাদের এ দাবীর যথার্থতার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ আছে কি—যা এ কথা প্রমাণ করবে যে, আপনাদের কথাই ঠিক, আমরা যা বলেছি তা ঠিক নয় ? বস্তুত এ ধরনের প্রমাণ পেশ করতেও তারা অক্ষম।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মারয়াম তনয় ঈসা আলাইহিস্ সালামকে ইলম হাসিল করার জন্য একদিন তাঁর আম্মা মক্তবে পাঠালেন। উস্তাদ তাঁকে بسم লিখার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি উস্তাদকে বললেন بسم কি ? উস্তাদ বললেন, আমি জানি না। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, ب দ্বারা البهاء بهاء الله (আল্লাহর সৌন্দর্য), س দ্বারা السين سناؤه আল্লাহর উচ্চমর্যাদা এবং م দ্বারা الميم مملكته (আল্লাহর রাজত্ব) বুঝান হয়েছে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ-রিওয়ায়েত সম্পর্কে হাদীস ব্যাখ্যাতার পক্ষ হতে আমি চরম ভ্রান্তির আশংকাবোধ করছি। সম্ভবত তিনি আরবী বর্ণমালা ب - س - م যা কিতাবের মাঝে প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়, এ সম্পর্কে ভ্রান্তিতে পতিত হয়ে

অক্ষরগুলোকে একত্র করে بسم বলে ফেলেছেন। কেননা بسم الله الرحمن الرحيم পড়ে কারী সাহেব যখন কুরআন পাঠ আরম্ভ করবেন তখন এ ধরনের মর্ম এবং ব্যাখ্যার কোন অর্থই হয় না। কারণ আরবী ভাষাভাষী লোকদের নিকট উল্লিখিত বর্ণনার মূলে মাফহুম থেকে এ অর্থটি গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

الله **শব্দের ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ হলেন এমন সত্তা—সমগ্র সৃষ্টি যাঁর ইবাদত করে। অর্থাৎ সারা বিশ্বের মা'বুদ হলেন আল্লাহ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ হলেন ঐ সত্তা যাঁর উলুহিয়্যাত ও মা'বুদিয়্যাত সমস্ত সৃষ্টি জগতের ইবাদাতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাক।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, فعل يفعل থেকে এ শব্দটির কোন মূল আছে কি—যার থেকে এ اسم -টিকে গঠন করা হয়েছে?

উত্তর ঃ আরবদের কাছ থেকে সামাঈর (শোনার) ভিত্তিতে এরূপ পাওয়া না গেলেও বাস্তবে তা প্রমাণিত।

প্রশ্ন ঃ উলুহিয়্যাতের অর্থ ইবাদত, ইলাহ অর্থ মা'বুদ এবং فعل يفعل থেকে এ শব্দের একটি মূল রয়েছে, এ কথাটি আপনারা কিভাবে বুঝতে পারছেন?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির ইবাদতের প্রশংসা করে এবং আল্লাহর নিকট যাচ্ঞা করতে গিয়ে বলে যে, অমুক আল্লাহওয়ালা হয়েছে এ কথার صحت ও বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আরবদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই এবং কোন মতবিরোধ ও নেই। যেমন রুবা ইবনুল আজ্জাজ বলেছেন,

لله در الغانيات المده — سبحن واسترجعن من تالهي

(প্রশংসাকারিণী গায়িকাদের সৌকর্য একমাত্র আল্লাহর জন্য যারা ইবাদতের জন্য আমার নির্জনে চলে যাওয়া এবং আমলের দ্বারা আল্লাহর নিকট যাচ্ঞা করার কারণে প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহ পড়েছে)।

اله — تاله — التاله —থেকে تفعل-এর প্রথমে ঘটিত এবং مصدر শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয় এর দ্বারা عبد الله (আল্লাহকে মা'বুদ-এর অর্থ বুঝায়। اله-এর অর্থ হ'ল عبد الله এবং এর থেকে এমন مصدر ও ব্যবহৃত হয় যাদ্বারা বুঝা যায় যে, আরবগণ কোন বাহুল্য ব্যতিরিকেই উহাকে باب فعل يفعل হতেও ব্যবহার করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি—ويذرك والاهتك (যে তোমাকে এবং তোমার ইবাদত করাকে বর্জন করে) পাঠ করে বলেছেন, এই অর্থ হলে الاهتك অর্থ عبادتك কারণ ফিরআওনের ইবাদত করা হত, সে নিজে কারো ইবাদত করত না, তাই الاهتك-এর অর্থ عبادتك হওয়া উচিত।

যেহেতু ফিরআওনের ইবাদত করা হত, সে নিজে কারো ইবাদত করত না, তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ويذرك والاهتك পড়তেন। আবদুল্লাহ এবং মুজাহিদের কিরাতও অনুরূপ ছিল।

মুজাহিদ থেকে আল্লাহর বাণী ويذرك والاهتك বাক্যে এর والاهتك এর অর্থ وعبادتك বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী الالاهة। শব্দটি—الالاهة الالاهة الاهة الله الها বাক্য থেকে নেওয়া একটি مصدر বিশেষ। যেমন বলা হয় যে, عبد الله عبادة এবং عبر الرؤيا عبارة সুতরাং হযরত ইবন আব্বাস এবং মুজাহিদের কথার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, اله অর্থ عبد এবং الالاهة হ'ল এর مصدر (শব্দমূল)।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদের ব্যাখা অনুসারে যদি من عبد الله তথা আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী ব্যক্তিকে اله বলা জাইয হয়, তাহলে আল্লাহ যে বান্দার উপর ইবাদতের অধিকার রাখেন এ সম্পর্কে যখন কোন সংবাদদাতা সংবাদ দেয়ার ইচ্ছা করে, তখন তা এ শব্দের দ্বারা কিভাবে প্রকাশ করতে হবে? উত্তরে বলা যায়, এ সম্পর্কে আমাদের নিকট কোন রিওয়ায়েত নেই। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস আছে:

ان عيسى اسلمته امه الى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم اكتب الله

فقال له عيسى اتدرى ما الله ؟ الله اله الالهة

(হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আম্মা তাঁকে ইল্‌ম হাসিল করার জন্য মক্তবে পাঠালেন। শিক্ষক তাঁকে বললেন, তুমি الله লিখ। হযরত ঈসা তাকে বললেন, আপনি কি জানেন আল্লাহ কি? অতঃপর তিনি নিজেই বললেন, আল্লাহ হলেন সকল মা'বুদের মাবুদ)। এর উপর কিয়াস করে এ কথা বলা যায় যে, الله اله العبد والعبد الهه অর্থাৎ আল্লাহ হলেন বান্দার ইলাহ্ এবং বান্দা হল ঐ ব্যক্তি যে তাঁর ইবাদত করে। আরবী ভাষায় الله শব্দটির মূল হল الاله।

যদি কেউ বলে, الله এবং الاله শব্দদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও الاله থেকে কি করে الله শব্দটি গঠন করা বৈধ হতে পারে? উত্তরে বলা যায়, যেমনি ভাবে لكن انا هو الله ربى-কে تعليل করে لكن هو الله ربى বানানো হয়েছে তেমনি ভাবে الاله ও تعليل করে الله বানানো হয়েছে। নিম্নেবর্ণিত কবিতার মাঝেও এর উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে:

وترمينني بالطرف اى انت مذنب — وتقلينني لكن اياك لا اقلى

(আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর হে পাপী, তুমি আমাকে ঘৃণা কর, কিন্তু আমি তোমাকে ঘৃণা করব না)। কেননা لكن اياك لا اقلى মূলতঃ لكن انا لا اقلى ছিল। انا-এর হামযাকে বাদ দেয়ার পর انا-এর نون এবং لكن-এর ساكن نون একত্রিত হওয়ার ফলে একটিকে অপরটির মাঝে ادغام করার পর لكن (نون مشدد-এর সাথে) হয়েছে। الله শব্দের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কেননা الله শব্দটি মূলতঃ الاله ছিল। শব্দের فاكلمة-তে অবস্থিত হামযাটি ফেলে দেয়ার পর এর পরিবর্তে শব্দের প্রথমে الف و لام যোগ করা হয়েছে। ফলে দুই لام-এর মাঝে

দু'টি ساكن একত্র হয়েছে। তাই প্রথম لام-কে দ্বিতীয় لام-এর মাঝে ادغام করে الله বানানো হয়েছে— যেমনি ভাবে لكن هو الله ربى-এর মধ্যে বানান হয়েছে।

الرحمن الرحيم **শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা**ঃ ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, الرحمن শব্দটি رحم ক্রিয়া থেকে فعلان-এর ওজনে গঠিত একটি শব্দ এবং الرحيم শব্দটিও رحم ক্রিয়া থেকে فعيل-এর ওজনে গঠিত একটি শব্দ। কেননা আরবগণ অনেক সময় فعل يفعل থেকে فعلان-এর ওজনে اسم সমূহ গঠন করে থাকে। যেমন তারা غضب থেকে غضبان — سكر থেকে سكران — عطش থেকে عطشان বলে থাকে তেমনি ভাবে তারা رحم থেকে رحمن ও ব্যবহার করে থাকে, কেননা رحم ধাতু থেকে فعل (ক্রিয়া) رحم يرحم-এর ওজনেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কেউ কেউ বলেছেন, رحيم শব্দটি যেহেতু প্রশংসামূলক শব্দ তাই এর فعل-এর عين كلمة যদিও كسره (যের) বিশিষ্ট তথাপি শব্দটি এই ওজনেই ব্যবহৃত হয়। কেননা আরবদের অভ্যাস যে, তারা তিরস্কারমূলক اسم গুলোকে সাধারণত فعيل-এর ওজনেই ব্যবহার করে থাকে, চাই এর فعل-এর عين كلمة كسره (যের) বিশিষ্ট হোক অথবা فتحة (যবর) বিশিষ্ট হোক। যেমন তারা علم থেকে عليم ও عالم এবং قدر থেকে قدير ও قادر ব্যবহার করে থাকে। তবে এই দু'টি ওজনের কোন ওজনই এই فعل-এর فاعل اسم-এর ওজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ فعل يفعل এবং তা থেকে اسم فاعل সাধারণত فاعل এর ওজনেই আসে। সুতরাং الرحمن এবং الرحيم শব্দদুটো যদি তাদের নিজ فعل-এর فاعل اسم-এর ওজনে হত, তাহলে অবশ্যই তারা الراحم-এর ওজনেই ব্যবহৃত হ'ত।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, الرحمن এবং الرحيم শব্দ দুটো رحمة ধাতুমূল থেকে নির্গত হয়ে থাকলে তা مكرر (পুনঃ পুনঃ) উল্লেখ করার কারণ কি? অথচ একটি শব্দ অপর শব্দের অর্থ প্রকাশ করতে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সক্ষম। উত্তরে বলা যায়, ব্যাপারটি মূলত তা নয়। বরং শব্দদ্বয়ের প্রতিটির এমন একটি স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে যা অন্যটি আদায় করতে সক্ষম নয়।

পুনরায় যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, শব্দদুটোর এমন কি অর্থ রয়েছে যা অপরটি আদায় করতে সক্ষম নয়? দুই দিক থেকে এর জবাব দেয়া যেতে পারে।

(এক) আরবী ভাষার দিক থেকে তা হচ্ছে এই যে, ভাষাবিদ মাত্রই জানেন যে, فعل يفعل হতে যে সমস্ত ওজনে اسم ব্যবহৃত হয় এর মধ্যে الرحمن শব্দটি الرحيم-এর তুলনায় অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু ভাষাবিদগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, فعل يفعل-এর মাঝে যে সমস্ত اسم-এর اصل আছে এবং তা ঐ اصل থেকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এ ধরনের গুণ প্রকাশক শব্দের দ্বারা গুণান্বিত সত্তা সাধারণত শ্রেষ্ঠ হল ঐ সত্তা থেকে যিনি গুণান্বিত এমন اسم দ্বারা যাকে বানান হয়েছে فعل يفعل থেকে তার নিজ اصل-এর উপর। তবে তা এ اصل থেকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয় না। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, الرحمن এবং الرحيم শব্দ দুটো এক নয় এবং একটি অন্যটির অর্থ প্রকাশ করতেও সক্ষম নয়। এ ব্যাখ্যানুসারে আমাদের কণ্ঠ ঐ বক্তার কণ্ঠের সাথেই মিলে যাচ্ছে, যিনি বলেছেন যে, আভিধানিক ভাবে الرحيم-এর তুলনায় الرحمن এর অর্থের মাঝে আধিক্য রয়েছে।

(দুই) হাদীস এবং রিওয়ায়েতের দিক থেকে, তা হচ্ছে এই যে, হযরত উসমান ইবনে যুফার (র)

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি 'আযরামী (র) কে একথা বলতে শুনেছি যে, الرحمن। সকল সৃষ্টি জগতের জন্য এবং الرحيم। শুধুমাত্র মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মারয়াম তনয় হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বলেছেন, الرحمن অর্থ হ'ল ইহ ও পরকালের দয়াময় এবং الرحيم-এর অর্থ হ'ল পরকালের দয়াময়।

উল্লিখিত হাদীস দু'টো আল্লাহ তাআলাকে রহমান ও রাহীম বলে নামকরণ করার পার্থক্য এবং উভয় শব্দের অর্থের বিভিন্নতার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত করছে। একটি ইহকালে দয়ালু হওয়ার কথা বুঝাচ্ছে এবং অপরটি পরকালে দয়ালু হওয়ার কথা বুঝাচ্ছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, এ দু'টি ব্যাখ্যার কোনটিকে আপনি সঠিক মনে করছেন ? উত্তরে বলা যায়, এর প্রত্যেকটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারেই আমার নিকট এক একটি যথার্থ কারণ রয়েছে। সুতরাং এর মাঝে কোনটি বিশুদ্ধ এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার কোন কারণ নেই। কেননা আল্লাহ্‌র রহমান নামের মাঝে এমন অর্থ রয়েছে যা রহীম নামের মাঝে নেই।

অর্থাৎ তিনি رحمن নামের সাথে সকল সৃষ্টি জগতের প্রতি ব্যাপক রহমাতের গুণের দ্বারা গুণান্বিত এবং رحيم নামের সাথে তিনি কতিপয় সৃষ্টির প্রতি বিশেষ রহমাতের গুণের দ্বারা গুণান্বিত, চাই তা সকল অবস্থার জন্য পরিব্যাপ্ত হোক অথবা কোন কোন অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হোক।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, রাহীম নামের মাঝে আল্লাহ্‌র যে বিশেষ রহমাত রয়েছে যা কতিপয় মানুষের ভাগ্যেই নসীব হয় তা দুনিয়াতেও হতে পারে, আখিরাতেও হতে পারে অথবা উভয় জগতেও হতে পারে। কারণ এ পার্থিব জগতে আল্লাহ তাআলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ তথা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, ইবাদত করা, তার নির্দেশ পালন করা এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার তওফীক দান করে বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে এবং তাঁর নির্দেশের খেলাফ করে গুনাহর কাজে জড়িয়ে পড়েছে তারা এ রহমাত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এ ছাড়াও যে সমস্ত মু'মিন বান্দা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে ইখলাসের সাথে আমল করেছে আল্লাহু তাআলা বেহেস্তের মাঝে তাদের জন্য রেখে দিয়েছেন চিরস্থায়ী শান্তি এবং প্রকাশ্য সফলতা। কিন্তু যারা শির্‌ক করে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে তাদের জন্য নয়। এতে সুস্পষ্ট ভাবে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানে আল্লাহ তাআলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের প্রতি বিশেষ রহমাত দান করেছেন।

তবে দুনিয়াবী নিয়ামত তথা রিযিক সম্প্রসারণ করা, বৃষ্টির জন্য মেঘকে অনুগত করা, যমীন থেকে গাছ গাছালি উৎপাদন করা, বুদ্ধিমত্তা এবং শারীরিক সুস্থতা দান করা ইত্যাকার অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামতের ক্ষেত্রে মু'মিন এবং কাফির সকলেই সমান। অতএব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, ইহ এবং পরকালে আল্লাহু তাআলা সকল সৃষ্টির জন্য হলেন রহমান এবং দুনিয়া ও আখিরাতে শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্য তিনি হলেন রাহীম।

আল্লাহ তাআলার যে রহমাত দুনিয়ার মাঝে সকল মানুষের প্রতি ব্যাপক, যার ফলে তিনি হলেন

সকল মানুষের জন্য রহমান। এ সম্পর্কে যে উদাহরণসমূহ আমি পূর্বে পেশ করেছি, পক্ষান্তরে এর পূর্ণ পরিসংখ্যান দেয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

وان تعدوا نعمت الله لاتحصوها ـ

"যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও তা কখনোও গুণে শেষ করতে পারবে না" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৪, সূরা নাহল ঃ ১৮)।

আখিরাতে সকল মানুষের প্রতি যে ব্যাপক রহমাতের ফলে আল্লাহ হলেন সকল মানুষের জন্য রহমান—তা হল ন্যায় ও ইনসাফের ক্ষেত্রে সকল মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং কারো প্রতি কোন জুলুম না করা। এ দিকে ইংগিত করেই কুরআন ঘোষণা করছে ঃ

ان الله لايظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما ـ

"আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেক আমল হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর নিজের তরফ থেকে দান করেন মহান পুরস্কার" (সূরা নিসা ঃ ৪০)। অর্থাৎ যে যা অর্জন করেছে তা তাকে পুরোপুরি দেওয়া হবে, আখিরাতে সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রহমাত ব্যাপক হওয়ার অর্থ এটাই এবং এ কারণেই আল্লাহ হলেন আখিরাতে—রহমান।

এই পার্থিব জগতে যে রহমতকে মু'মিনদের জন্য খাস করে দেয়ার ফলে আল্লাহ তাদের জন্য হলেন رحيم। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ وكان بالمؤمنين رحيما "তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু"—সূরা আহযাব ঃ ৪৩)।

এ গুলো হচ্ছে ঐ সমস্ত ধর্মীয় বিষয়াদি যা আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। লাঞ্ছিত কাফিরদের এ বিষয়ে কোন অধিকার নেই।

পরকালে আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে যে খাস রহমাত দান করবেন তা হ'ল ঐ সমস্ত নিয়ামত যা তিনি জান্নাতে তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন, যার সঠিক ধারণা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এর ফলেই আল্লাহ হলেন মু'মিনদের জন্য رحيما।

الرحمن এবং الرحيم-এর অপর একটি ব্যাখ্যা দাহ্‌হাক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আর-রহমান শব্দটি রহমাত শব্দ থেকে নির্গত فعلان-এর ওজনে ব্যবহৃত একটি আরবী শব্দ।

الرحمن এবং الرحيم শব্দদ্বয়ের অর্থ হ'ল الرقيق الرفيق بمن احب ان يرحمه والبعيد الشديد على من احب ان يعنف عليه অর্থাৎ "এমন করুণাময় সত্তা তিনি, যার প্রতি দয়া করতে চান, তার জন্য অতীব দয়ালু এবং যার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করতে চান তার জন্য অতীব কঠোর"। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র এ ব্যাখ্যা পরিষ্কার ভাবে এ কথাই প্রকাশ

করতে চাচ্ছে যে, যে গুণের ফলে আমাদের প্রতিপালক رحمن সে গুণের দ্বারা তিনি رحيم ও বটে। যদিও رحمن নামের মাঝে এমন অর্থ রয়েছে যা رحيم নামের মাঝে নেই। কেননা তার নিকট الرحمن এর অর্থ হ'ল الرفيق بمن رفق به এবং الرحيم-এর অর্থ হ'ল الرفيق على من رفق عليه।

ইমাম আবু জাফর বলেন, الرحمن এবং الرحيم-এর ব্যাখ্যায় 'আযরামী এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি যে রিওয়ায়েত পূর্বে উল্লেখ করেছি তা হযরত ইবুন আব্বাস (রা)-র এ ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও হযরত ইবুন আব্বাস (রা) এ ব্যাখ্যা ঐ তথ্যের অধিক অনুকূলে তবুও رحمن শব্দের মাঝে এমন অর্থ রয়েছে যা رحيم শব্দের মাঝে নেই।

'আতা আল খুরাসানী (র) থেকে الرحمن ও الرحيم শব্দদ্বয়ের তৃতীয় একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে। তিনি বলেছেন, আল্লাহুর নাম ছিল رحمن কিন্তু এ নাম যখন পরিবর্তন করা হ'ল তখন তাঁর নাম হল الرحمن الرحيم।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, 'আতা যে কথা ব্যক্ত করার ইরাদা করেছেন তার মর্ম হ'ল এই যে, رحمن আল্লাহুর নামসমূহের একটি নাম ছিল কোন মানুষ এ নামে নিজেদের নাম রাখত না। কিন্তু নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামা যখন এ নামে নিজের নাম রাখল (ঐটাই হ'ল আল্লাহুর নামের অশোভনীয় পরিবর্তন) তখন আল্লাহ তাআলা জাল্লা শানুহু এ মর্মে সংবাদ দিলেন যে, তাঁর নাম হল الرحمن - الرحيم এ সংবাদের মূল উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের নিকট স্বীয় নামকে, এ নামের দ্বারা নামকরণ কৃত ব্যক্তির নামের থেকে পার্থক্য করে দেয়া। যাতে মানুষ এ নামের দ্বারা নিজেদের নামকরণ না করে। অতএব এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ দু'টি নাম একত্রিত ভাবে কেবল তাঁর জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে। অন্য কারো জন্য নয়।

কোন মানুষ যদি তার নাম رحمن অথবা رحيم রাখে তবে তা জাইয আছে। তবে رحمن ও رحيم একত্রিত করে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা জাইয নেই। এ হিসাবে 'আতা আল-খুরাসানীর বক্তব্যের অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা رحمن-এর সাথে رحيم শব্দটিকে যোগ করে তাঁর নিজের নামকে অন্যের নাম থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। বরং সম্ভাবনা আছে যে, আল্লাহ তাঁর নিজের নামকে মাখলুকের নাম থেকে আলাদা করার জন্য উল্লিখিত শব্দদ্বয়ের সাথে নিজের নামকে খাস করে নিয়েছেন, যাতে মানুষ শব্দ দুটোকে একত্রিত ভাবে প্রয়োগ করার ফলে বুঝতে পারে যে, এ শব্দ দুটোর দ্বারা আল্লাহ তাআলাকেই বুঝানো হয়েছে, কোন মানুষকে নয়। যদিও উভয় শব্দের মাঝে অর্থগত আধিক্যের দিক থেকে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, কতিপয় স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন লোক মনে করে যে, আরবের লোকেরা رحمن শব্দের সাথে পরিচিত ছিল না এবং এ শব্দটি তাদের অভিধানেও বিদ্যমান ছিল না। এ কারণেই আরব মুশরিকরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে وما الرحمن (রহমান কে)? انسجد لما تامرنا (আমরা কি সিজদা করব তাকে যার সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে হুকুম করছেন)? যেন তারা শব্দটিকে চিনছেই না, এ যেন তাদের নিকট একেবারে দুর্বোধ্য। ইমাম আবু জাফর তাবারী (রা) এ-সব বিবেকহীন লোকদের লক্ষ্য করে বলেন যে, মুশরিকগণ তো সঠিক বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিল না। সুতরাং وما الرحمن বলে প্রশ্ন করাতে এ কথা কি করে বুঝা যেতে পারে যে, শব্দটি তাদের নিকট অপরিচিত ছিল? অধিকন্তু আপনারা কি নিম্নবর্ণিত আয়াত-খানা কখনো তিলাওয়াত করেন নি? তাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

الـذيـن اتـيـنـا هم الـكـتـاب يـعـرفـونـه كما يـعـرفـون ابـنـاءهم -

(আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে [মুহাম্মদ (স)-কে] এমন ভাবে চিনে যেমন নিজেদের সন্তান দেরকে চিনে।) এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা তাদের নিকট প্রমাণিত এবং সুপরিচিত বাস্তব বিষয়কে নির্দ্বিধায় অস্বীকার করত এবং এটাই ছিল তাদের সাধারণ অভ্যাস। তাই তাদের এ অস্বীকৃতি উল্লিখিত শব্দটি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দুর্বোধ্যতার দলীল হতে পারে না। কতিপয় অজ্ঞ ব্যক্তি এক অজ্ঞ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যে, কবিতাটি পাঠ করেছিল তাতেও رحمن শব্দটি যে তাদের নিকট পরিচিত ছিল এ কথারই জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

الا ضربت تلك الفتاة هجينها — الا قضب الرحمن ربى يمينها -

(কেন এই যুবতী মহিলা ঐ অসভ্যকে প্রহার করল না, আমার প্রভু রহমান কেন তার ডান হাতটিকে টুকরা টুকরা করে দিলেন না ?)

অনুরূপভাবে সালামা ইবন জানদাল আত-তাহুবী বলেছেন,

عجلتم علينا عجلتينا عليكم — وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق -

(তড়িঘড়ি করেছ তোমরা আমাদের ব্যাপারে যেমন তড়িঘড়ি করছি আমরা তোমাদের ব্যাপারে। মূলতঃ গ্রন্থিবন্ধন করা ও খোলা (দয়াময়) রহমানের ইচ্ছাতেই হয়।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রা) বলেন, "তাফসীরকারদের তাফসীর সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী এবং পূর্বসূরি তাফসীরকারদের থেকে যাদের রিওয়ায়েত খুব কম এ ধরনের কতিপয় লোক মনে করেন যে, الرحمن শব্দের রূপক অর্থ হল ذو الرحمة এবং الرحيم শব্দের রূপক অর্থ হ'ল الراحم। তাদের ধারণা হ'ল আরবী ভাষায় যেহেতু যথেষ্ট ব্যাপকতা বিদ্যমান তাই আরবগণ কখনো কখনো এক শব্দ থেকে একার্থবোধক দুটি শব্দ গঠন করে থাকেন এবং এ নিয়মের অনুসরণ করেই তারা বলেন, ندمان ندیم এ দাবীর সমর্থনে তারা বারাজ ইব্‌ন মুস্‌হির আত-তায়ী-এর নিম্ন বর্ণিত পংতিটি উল্লেখ করেন ঃ

وندمان يزيد الكاس طيبا — سقيت وقد تغورت النجوم -

(এমন অনেক বন্ধু আছে যারা পানপাত্রকে মধুময় করে তোলে। আমি তাদের মদ পান করালাম তারাগুলো যখন ডুবে গেছে)। এ ক্ষেত্রে তারা نديم ও ندمان সম্বলিত পংতির মত আরো কতিপয় পংতি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেছেন। الرحمن এবং الرحيم এর অর্থের ব্যাখ্যায় পার্থক্য বর্ণনা করে- তারা বলেছেন যে, الرحمن-এর অর্থ হ'ল ذو الرحمة এবং الرحيم-এর অর্থ হ'ল الراحم শব্দ দুটোর ব্যাখ্যায় মূলতঃ তারা সহীহ অর্থ বলা ত্যাগ করেছেন। তারা উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে চেয়েছেন এমন দুটো শব্দের—যা ব্যবহৃত হয় একই অর্থের জন্য। কিন্তু তারা এমন শব্দের উল্লেখ করেছেন যা নির্ধারণ করা হয়েছে দুই অর্থের জন্য। অথচ ঐটিকে তারা উদাহরণ পেশ করেছেন এমন বিষয়ের যা একাধিক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও একই অর্থে ব্যবহৃত।

এ কথা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য যে, ذو الرحمة মূলত রহমাত ও করুণার অধিকারী সত্তাকেই বলা হয়। বস্তুত এই রহমাত ও করুণা হল তাঁর একটি বিশেষ গুণ, الراحم শব্দটি হল موصوف (গুণান্বিত সত্তা)—এই হিসাবে যে, তিনি ভবিষ্যতেও রহমাত বর্ষণ করবেন, অতীতেও করেছেন এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। তবে ذو الرحمة-এর মাঝে "রহমাত আল্লাহ্র একটি বিশেষ গুণ" এ কথার প্রতি যেমনি ভাবে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে الراحم শব্দের মাঝে এমনটি নেই।

رحمن এবং رحيم এমন দুটো শব্দ যা বানানো হয়েছে একটি শব্দ থেকে, মাঝে শব্দগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অর্থগত দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ মিল রয়েছে" এ কথা আর বলা যেতে পারে কি?

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, তাদের উল্লিখিত মতামত যেহেতু কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাই তাদের অজ্ঞতাই এতে ধরা পড়েছে অবশেষে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, الله শব্দটিকে কেন الرحمن-এর পূর্বে এবং الرحمن শব্দটিকে কেন الرحيم-এর পূর্বে উল্লেখ করা হ'ল? এর উত্তরে বলা যায় আরবদের অভ্যাস হ'ল যখন তারা কারো সম্পর্কে কোন খবর দিতে ইচ্ছা করেন, তখন তারা প্রথমে তাঁর মূল নামকে প্রয়োগ করেন এবং পরে এর গুণাবলীকে প্রকাশ করেন। কার সম্পর্কে খবর দেয়া হচ্ছে শ্রোতা যাতে একথাটি পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারে এ উদ্দেশ্যে গুণাবলীর পূর্বে নাম উল্লেখ করা আরবদের নিকট একটি অপরিহার্য বিষয়। তাই আল্লাহ্র নাম সমূহের ক্ষেত্রে এ নীতির অনুসরণ করেই الله শব্দটিকে الرحمن-এর পূর্বে এবং الرحمن-কে الرحيم-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকন্তু আল্লাহ তাআলার নামগুলো সাধারণত দুই প্রকার। এক ঃ এমন কতিপয় নাম যা আল্লাহ্র জন্য খাস। এ নামে কোন মাখলূকের (সৃষ্টির) নামকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন, আল্লাহ রহমান খালেক ইত্যাদি। দুই ঃ এমন কতিপয় নাম যদ্বারা কোন মাখলূকের নামকরণ করা অবৈধ নয়, বরং মুবাহ। যেমন রহীম, সামী, বাসীর ও কারীম ইত্যাদি। সুতরাং যে নাম আল্লাহ্র জন্য খাস এবং মাখলূকের জন্য হারাম এ নামকেই প্রথমে উল্লেখ করা উচিত। যাতে শ্রোতা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে যে, এটা হামদ ও মহত্ব বর্ণনা করার জন্য। অতঃপর উল্লেখ করা হবে ঐ সমস্ত নাম যার দ্বারা মাখলূকের নামকরণ করা হল মুবাহ বা বৈধ।

আল্লাহ তাআলাও তাঁর সত্তাগত নাম তথা আল্লাহ শব্দের দ্বারাই আরম্ভ করেছেন। কারণ 'উলূহিয়্যাত' অর্থের দিক থেকে এবং নামকরণ করার দিক থেকে তা কোন ভাবেই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ব্যবহৃত হয় না এবং হতে পারে না। কেননা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ শব্দের অর্থ হল মা'বূদ, আর আল্লাহ ব্যতীত যেহেতু অন্য কোন মা'বূদ নেই, তাই এ নাম তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। এ নামের দ্বারা কোন মাখলূকের নামকরণ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। যদিও এ নামের দ্বারা নামকরণকারী ব্যক্তি এমন অর্থের ইচ্ছা করে—যে অর্থের ইচ্ছা করে কোন দুষ্ট লোক سعد বলে নিজের নামকরণ করে এবং কোন খারাপ আকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি حسن (সুন্দর) বলে নিজের নামকরণ করে।

তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তাআলা একাধিক আয়াতে ইলাহ্তে বিশ্বাসী ও স্বীকৃতি দানকারী ব্যক্তির নিকট নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে বলেছেন, أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ (আল্লাহ্র সাথে শরীক কি কোন ইলাহ্ রয়েছে)?

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা الله এবং رحمن নামের সাথে নিজের বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করেছেন :

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

"বল, তোমরা আল্লাহ্ নামে ডাক বা রহমান নামে ডাক তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁর"। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১১০)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর সত্তাগত নামের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রহমান শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কেননা এ নামের সাথেও মাখলুকের নামকরণ করা নিষিদ্ধ। যদিও অর্থের দিক থেকে আংশিকভাবে হলেও কোন মানুষ এ নামে নিজের নামকরণ করার প্রবণতা দেখায়। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মানুষের জন্য উপাসনার উপযোগী হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না—তবে রহমাত গুণের অধিক সমাবেশ কোন মানুষের মাঝে ঘটতে পারে এবং এর যথেষ্ট সম্ভাবনাও রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ নামের পর রহমান নামটিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে।

ইমাম আবু জাফর (র) বলেন, আল্লাহ্‌র রহীম নামটি সম্পর্কে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর লোকও এ গুণে গুণান্বিত হতে পারে। তবে রহমত হল আল্লাহ্‌রই এক বিশেষ গুণ।

সুতরাং আমাদের পূর্ব আলোচনা অনুপাতে একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, রহীম নামটি ঐ সমস্ত গুণবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত যা সত্তাগত নামের পর ব্যবহৃত হয়। এ জন্যই রব্বুল আলামীন الله শব্দটিকে رحمن-এর পূর্বে এবং رحمن শব্দটিকে رحيم-এর পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত হাসান বসরী (র) رحمن শব্দের ব্যাখ্যায় আমাদের অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলতেন, رحمن নামটি আল্লাহ্‌র ঐ সমস্ত নামের অন্তর্ভুক্ত যার দ্বারা কোন মানুষের নামকরণ করা সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে উম্মাতের ইজমাও রয়েছে। হাসান বসরী এবং অন্যান্যদের বাণী আমাদের পূর্বোল্লিখিত আলোচনার সত্যতা প্রমাণ করে।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরা ফাতিহা

سُورَةُ الفَاتِحَة ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ١
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢
الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ٧

وَآيَاتُهَا سَبْعٌ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরা ফাতিহা

৭ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

১. প্রশংসা জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য,

২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু,

৩. কর্মফল দিবসের মালিক।

৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি,

৫. আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর,

৬. তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ,

৭. যারা ক্রোধ নিপতিত নয়, পথভ্রষ্টও নয়।

সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা

الحمد لله رب العالمين

"প্রশংসা জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।"

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, الحمد لله—এর অর্থ হল সকল কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহ জাল্লা শানুহূর জন্য, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যের জন্য নয় এবং সৃষ্টি জগতের অন্য কোন বস্তুর জন্যও নয়—যাদেরকে ইলাহ বলে ধারণা করা হয়। এই প্রশংসা তাঁর ঐ সমস্ত অসংখ্য ও অগণিত অনুগ্রহের বিনিময়ে যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন, যার সংখ্যা তিনি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। যেমন ইবাদতের জন্য উপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা, ফরয কাজগুলো যথাযথ ভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাস্থানে কায়েম রাখা, সাথে সাথে এ পার্থিব জগতে তাদের জীবিকার সম্প্রসারণ করা ও জীবন ধারণ করার জন্য উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা, আল্লাহ্‌র উপর তাদের কোন হক বা অধিকার না থাকা সত্ত্বেও এমনিভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সতর্কীকরণ এবং স্থায়ী আবাস ভূমি জান্নাতের মাঝে সুখ-সাচ্ছন্দের সাথে থাকার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁর উদাত্ত আহবান জানান প্রভৃতি তাঁর মহান দানের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ সমস্ত অনুগ্রহের কারণেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীনের বাণী الحمد لله সম্পর্কে আমরা যা কিছু পূর্বে আলোচনা করেছি, এ মর্মে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং অপরাপর সাহাবী থেকেও কতিপয় রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি বলুন الحمد لله (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই)। অতঃপর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, الحمد لله-এর অর্থ হল সকল কৃতজ্ঞতা ও তাবেদারী আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। এ কথা বলার পাশাপাশি তার নিয়ামত, হিদায়াত এবং উৎপত্তিকরণ প্রভৃতি বিষয়ের স্বীকৃতি প্রদান করা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হযরত হাকাম ইব্‌ন উমায়র (রা) রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যখন তুমি বললে, الحمد لله رب العالمين তখন তুমি আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে। সুতরাং তিনি তোমার প্রতি তাঁর নিয়ামতকে বাড়িয়ে দেবেন।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, কেউ কেউ বলেন যে, الحمد لله বলে আল্লাহ্‌র নাম ও তাঁর সুন্দর গুণাবলীর দ্বারা তাঁর প্রতি প্রশংসা নিবেদন করা হয় এবং الشكر لله বলে আল্লাহ্‌র নিয়ামত এবং তাঁর অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি প্রশংসা নিবেদন করা হয়।

কা'ব আল-আহবার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, الحمد لله হল আল্লাহ্‌ পাকের প্রশংসা-সূচক শব্দ। তবে তা কি ধরনের প্রশংসা এ সম্পর্কে তিনি কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেন নি।

সালূলী হযরত কা'ব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কারো الحمد لله বলাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা।

আসওয়াদ ইব্‌নে সারী' (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন জিনিসই আল্লাহ্‌র নিকট الحمد لله থেকে অধিক প্রিয় নয়। এ কারণেই তিনি তাঁর নিজের প্রশংসায় الحمد لله বলেছেন।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন যে, আরবী ভাষা সম্পর্কে পারদর্শী লোকদের নিকট শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে الحمد لله বলার যথার্থতার ব্যাপারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বকতা নেই। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, حمد শব্দটিকে شكر-এর স্থলে এবং شكر শব্দটিকে حمد-এর স্থলে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেননা যদি ব্যাপারটি এরূপ না হ'ত তাহলে الحمد لله شكرا বলা জায়েয হ'ত না। অতএব বলা যেতে পারে যে, الحمد لله হল أشكر ক্রিয়ার مصدر বা শব্দমূল। কারণ شكر যদি حمد -এর অর্থে ব্যবহৃত না হ'ত, তাহলে ভিন্ন অর্থ এবং ভিন্ন শব্দের দ্বারা حمد ক্রিয়ার مصدر ব্যবহার করা অবশ্যই ঠিক হ'ত না।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, حمد الله رب العالمين না বলে الحمد শব্দের সাথে الف ও لام কেন যুক্ত করা হয়েছে এবং এর মূল কারণ কি ?

উত্তর : الحمد-এর সাথে الف ও لام যুক্ত করার ফলে এর এমন একটি অর্থ সৃষ্টি হয়েছে যা الف ও لام ব্যতীত حمد শব্দ প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। কেননা الحمد-এর সাথে الف ও لام যোগ করার ফলে এর অর্থ হয়েছে সকল প্রশংসা এবং সার্বিক কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র জন্য। যদি এর থেকে الف ও لام-কে ফেলে দেয়া হয়, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে, বক্তার এ প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। সকল প্রশংসা বুঝাবে না। কেননা الف ও لام ব্যতীত حمد-এর অর্থ হ'ল حمد الله অথবা حمد الله বা الحمد الله। তবে সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় যে ব্যক্তি الحمد لله رب العالمين পাঠ করে, তার এ পাঠের অর্থ احمد الله নয় বরং এর অর্থ তাই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, তাঁর উলূহিয়্যাতের কারণে এবং যে সমস্ত নিয়ামত তিনি তাঁর বান্দাদের দান করেছেন তার জন্য, যার দৃষ্টান্ত দীন দুনিয়া ইহকাল ও পরকালে কোথাও নেই। এ কারণেই উম্মাতের উলামায়ে কেরাম ও কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের কিরাআত ধারাবাহিক ভাবে الحمد لله رب العالمين-এর الحمد-এর د অক্ষরে رفع (পেশ)-এর সাথেই চলে আসছে, نصب তথা যবরের সাথে নয়। ফলে উল্লিখিত বাক্যের অর্থ হবে الحمد لله حمدا।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, যদি কোন কারী সাহেব জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে الحمد শব্দটিকে যবরের সাথে পড়ে, তবে সে হবে আমার নিকট অর্থ বিকৃতকারী পাঠক এবং এজন্য শাস্তির উপযোগী। যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, এ ক্ষেত্রে الحمد لله কি হিসাবে বলা হয়েছে ? এতে কি আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে নিজের প্রশংসা করে আমাদেরকে এ ভাবে বলার জন্য তা'লীম দিয়েছেন, যেমন বলা হয়েছে ووصف به نفسه (আল্লাহ্ এর দ্বারা নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন) ? যদি ব্যাপারটি তাই হয়, তাহলে اياك نعبد واياك نستعين-এর অর্থ কি দাঁড়াবে ? অথচ আল্লাহ্ তাআলা হলেন মা'বূদ, আবেদ নন। নাকি এ বাক্যটি হযরত জিবরাঈল (আ) অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ? যদি তাই হয় তবে তো এই বাক্য আল্লাহ্‌র কালাম হতে পারে না।

উত্তর : এর কোনটিই নয় বরং এ হ'ল আল্লাহ্‌র কালাম। তবে এ আয়াতের মাঝে আল্লাহ তাআলা তাঁর হাম্‌দ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সেইসব গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন যার তিনি

যোগ্য। অতঃপর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে এ বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এর তিলাওয়াতকে তাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন, অতঃপর বলেছেন, বল, তোমরা الحمد لله رب العالمين এবং বল তোমরা اياك نعبد واياك نستعين আল্লাহ্‌র বাণী اياك نعبد (আমরা শুধু তোমারই বন্দেগী করি) ঐ সমস্ত বিষয়সমূহ থেকেই যা আল্লাহ্‌ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে লোকেরা তা পাঠ করে এবং অর্থ মোতাবিক তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। মূলতঃ এ আয়াতটি الحمد لله رب العالمين-এর সাথেই সংশ্লিষ্ট। এই হিসাবে আয়াতদ্বয়ের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যেন বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, قولوا هذا و هذا অর্থাৎ তোমরা এই এই কথা বল। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, قولوا শব্দটি কোথায়, যার ভিত্তিতে আপনি এ ব্যাখ্যা করছেন ?

উত্তর : আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আরবদের অভ্যাস হল, কোন শব্দের স্থান যদি সুপ্রসিদ্ধ হয় এবং যদি শ্রোতা আলোচনার বাহ্যিক শব্দগুলোর দ্বারাই محذوف (উহ্য) শব্দটিকেও বুঝে নিতে পারবে বলে কোন সন্দেহ না থাকে, তখন তারা প্রয়োজন পরিমাণ বাহ্যিক শব্দ রেখে আলোচনা থেকে কিছু শব্দ উহ্য রাখে। বিশেষ ভাবে উহ্যকৃত শব্দগুলো যদি قول (কথা) অথবা تاويل قول (কথার ব্যাখ্যা) হয় তাহলে তারা এগুলোকে অবশ্যই উহ্য রাখে। যেমন কোন এক কবি বলেছেন,

واعلم اننى سأكون رمسا — اذا سار النواعج لا يسير ـ

فقال السائلون لمن حفرتم — فقال المخبرون لهم وزير ـ

(আমি জানি যে, আমি অচিরেই দাফন হয়ে যাবো—যখন ভ্রমণে অনভ্যস্ত গৌরবর্ণা মহিলাগণ ভ্রমণ করবে। প্রশ্নকারীরা জিজ্ঞেস করল, কার জন্য তোমরা কবর খনন করেছ ? তখন সংবাদদাতাগণ তাদেরকে বলল, উযীর)। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, শেষ পংক্তির মূল বাক্য হল فقال المخبرون لهم الميت وزير (সংবাদদাতাগণ বলল, মৃত ব্যক্তি হল উযীর)। এখান থেকে الميت শব্দটিকে লোপ করে দেয়া হয়েছে। কেননা বাক্যের মাঝে এমন শব্দ রয়েছে যা বিলুপ্ত শব্দটির প্রতি ইঙ্গিতবহ। অনুরূপ আরেকটি কবিতা নিম্নে দেয়া হল :

ورأيت زوجك فى الوغى — متقلدا سيفا ورمحا ـ

(তোমার স্বামীকে আমি রণাংগনে দেখেছি গলায় বর্শা ও তলোয়ার ঝুলন্ত অবস্থায়)। এ বিষয়ে আমরা সকলেই অবগত যে, বর্শা ঝুলানো থাকে না। তবে বর্শা ঝুলানোর কথা বলে কবির উদ্দেশ্য হল وحاملا رمحا বুঝানো। কিন্তু কবিতার অর্থ যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট—তাই কবি বিলোপকৃত শব্দটিকে উল্লেখ না করে বক্তব্য দ্বারা যা প্রকাশ পেয়েছে, তাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। এমনি ভাবে আরবের লোকেরা মুসাফির ব্যক্তিকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর সময় سر (ভ্রমণ কর) এবং اخرج (বের হও) শব্দগুলোকে বিলোপ করে বলে, مصاحبا معافى। কেননা এর অর্থ সকলেরই জানা। যদিও শব্দগুলোকে দৃশ্যতঃ উল্লেখ করা হয়নি। এমনিভাবে الحمد لله رب العالمين থেকেও قولوا ক্রিয়াটিকে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে। কারণ اياك نعبد-এর দ্বারাই الحمد لله رب العالمين -এর মূল উদ্দেশ্য তথা বান্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নির্দেশ পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে, যার ফলে বিলোপকৃত শব্দটিকে প্রকাশ করার আর কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত জিবরাঈল (আ)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি পড়ুন الحمد لله رب العالمين (সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র জন্য)। অতঃপর তিনি বললেন, জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে বিষয়টি শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন, তিনি তাই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী الحمد لله رب العالمين সম্পর্কে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা)-র এ বর্ণনা মূলতঃ আমাদের পেশকৃত আলোচনার যথার্থতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

رب শব্দের ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, بسم الله-এর ব্যাখ্যায় الله শব্দটি সম্পর্কেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

رب শব্দের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, শব্দটি আরবী ভাষায় বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) অনুসরণযোগ্য নেতাকেও আরবী ভাষায় رب বলা হয়। যেমন কবি লাবীদ ইব্‌নে রাবীআহ্ বলেছেন,

واهلكن يوما رب كندة وابنه — ورب معد بين خبت وعرعر -

(কিন্দার সর্দার ও তার ছেলেকে এবং মা'আদ্দের সর্দারকে তারা প্রশস্ত নীচু ভূমি ও সাইপ্রাস বৃক্ষের মাঝে হালাক করেছে)। এ কবিতায় رب كندة বলে سيد كندة অর্থাৎ কিন্দার সর্দারকে বুঝান হয়েছে। যুবয়ান গোত্রের কবি নাবিগাহ অনুরূপ বলেছেন ঃ

تخب الى النعمان حتى تناله — فدى لك من رب طريفى وتالدى (১)

(নু'মানকে না পাওয়া পর্যন্ত তার দিকে অগ্রসর হতে থাক, আমার নতুন ও পুরাতন মালের সর্দার তোমার জন্য উৎসর্গ হোক)।

(২) مصلح للشئ তথা সংশোধনকারী ব্যক্তিকেও আরবী ভাষায় رب বলা হয়, যেমন ফারাযদাক ইব্‌ন গালিব বলেছেন ঃ

كانوا كسالئة حمقاء اذ حقنت — سلاءها فى اديم غير مربوب -

[তারা (কবিতায় পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণ) পানিজ উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত এমন তেলের মত যা অপরিশোধিত চামড়ায় আটকে রাখা হয়েছে]। এই পংক্তিতে فى اديم غير مربوب বলে কবি বুঝিয়েছেন فى اديم غير مصلح (অপরিশোধিত)। এমনিভাবে যখন কেউ তার তৈরী করা বস্তুকে ঠিকঠাক করার এবং তা টিকসই বানানোর ইচ্ছা করে তখন বলে, ان فلانا يرب صنيعته عند فلان

আলকামা ইব্‌ন আবদা-এর কবিতাটিও অনুরূপ, তিনি বলেছেন,

فكنت امرأ افضت اليك ربابتى — و قبلك ربتنى فضعت ربوب -

কবিতায় বর্ণিত افضت اليك । অর্থ হল اوصلت اليك[২], অর্থাৎ আমি আমার দায়িত্ব তোমার নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অতঃপর তুমি আমার কাজের প্রতিপালন করতে লাগলে এবং তা সঠিক ভাবে সম্পাদন করতে লাগলে। কেননা আমি বেরিয়ে পড়েছি তুমি ছাড়া অপরাপর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

---

(১) فى نسخة اخرى : "تلدى و طارفى"

(২) فى نسخة اخرى : وصلت

থেকে যারা তোমার প্রবে' আমার উপর নিযুক্ত ছিল। তারা আমার কাজকে নষ্ট করে দিয়েছে এবং তার খোঁজখবর নেয়াও পরিত্যাগ করেছে। অথচ তারা ছিল সংশোধনকারী। ربوب শব্দটির এক বচন হল رب।

(৩) আরবী ভাষায় কোন বস্তুর অধিকারীকেও رب বলা হয়। رب শব্দটির যদিও আরও অনেক অর্থ হয়, তবে তা তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যা হোক আমাদের رب (প্রভু) হচ্ছেন এমন মহান পরিপালক যিনি অতুলনীয় এবং যার কোন উপমা নাই। তিনি এমন মহান সংশোধনকারী যিনি তাঁর স্ৃষ্টি জগতের প্রতি নিয়ামত পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে তাদের সংশোধন করেছেন। আর তিনি এমন পরাক্রমশালী মালিক যে, সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই এবং সকল আদেশও তাঁরই। এ যাবৎ رب العالمين-এর ব্যাখ্যায় আমরা যা বর্ণনা করেছি, অনুরূপ ব্যাখ্যা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ (স), পাঠ করুন الحمد لله رب العالمين। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন, হে মুহাম্মাদ (স)! বলুন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য যাঁর এই তামাম মাখলূক (সৃষ্টি জগৎ), সমস্ত আসমান এবং তাতে যা কিছু রয়েছে, আর সমস্ত যমীন এবং তাতে যা কিছু রয়েছে—জানা, অজানা। জিবরাঈল (আ) বলেন, হে মুহাম্মাদ (স)! জেনে রাখুন নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নাই—তিনি অতুলনীয়।

العالمين শব্দের ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন, العالمون শব্দটি عالم-এর বহুবচন। العالم শব্দটিও অর্থের দিক থেকে বহুবচন। কিন্তু এই শব্দটির কোন একবচন নেই। যেমন আরবী ভাষায় অনুরূপ আরও শব্দ রয়েছে, যথা جيش - انام - رهط ইত্যাদি। এগুলোকে বহুবচন হিসাবেই তৈরি করা হয়েছে। এ শব্দগুলোরও কোন একবচন নেই। সৃষ্টির বিভিন্ন শ্রেণীর সমষ্টিকে عالم বলা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এর কোন একটি শ্রেণীকেও عالم বলা হয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক শ্রেণীকেও ঐ যুগের এবং ঐ সময়ের জন্য عالم বলা হয়। সুতরাং সমগ্র মানব জাতি একটি عالم এবং প্রত্যেক যুগের মানুষই হল ঐ যুগের জন্য عالم। জিন সম্প্রদায়ও একটি স্বতন্ত্র عالم, অনুরূপভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্টিই এক একটি عالم, এ কারণেই শব্দটিকে বহুবচন ব্যবহার করে عالمون বলা হয়েছে। এর একবচনও প্রকৃতপক্ষে বহুবচন। কেননা প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক প্রকারের সৃষ্টিই এক একটি স্বতন্ত্র عالم (আলাম)। যেমন কবি আজ্জাজ বলেছেন,

فخندف هامة هذا العالم অর্থাৎ খিনদাফ এ আলমের কীট পতঙ্গ।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, عالمين সম্পর্কে আমরা পূর্বে যে মতামত ব্যক্ত করেছি, এ সম্পর্কে হযরত ইব্ন আব্বাস, সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারদের মতামতও অনুরূপ।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, الحمد لله رب العالمين-এর অর্থ হল সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক। আসমান-জমীনে যা কিছু আছে এবং এ দুয়ের মাঝে জানা অজানা যা আছে সব কিছুই আল্লাহ পাকের জন্য।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, العالمين বলে সকল মানব ও জিন জাতিকেই বুঝান হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন رب العالمين-এর অর্থ হল সকল মানব ও জিন জাতির প্রভু। হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী رب العالمين-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল মানব ও জিন জাতি। তাঁর থেকে رب العالمين সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আদম সন্তান, সকল মানব ও জিন জাতির প্রতিটি দলই হল পৃথক পৃথক ভাবে একটি عالم। মুজাহিদ থেকে الحمد لله رب العالمين-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন, العالمين-এর অর্থ হল সকল মানব ও জিন জাতি। সুফয়ান থেকে জনৈক ব্যক্তি মুজাহিদের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত কাতাদা (র) رب العالمين-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, প্রত্যেকটি জাতিই হল এক একটি عالم।

হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী رب العالمين-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ইনসান একটি عالم এমনি ভাবে জিনও একটি আলম। এ ছাড়াও (তিনি সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন) যমীনে বিচরণকারী ফিরিশতাদের রয়েছে আঠার বা চৌদ্দ হাযার 'আলম। যমীন চতুর্কোণ বিশিষ্ট, এর প্রতিটি কোণেই রয়েছে সাড়ে তিন হাযার عالم যেগুলোকে আল্লাহ্ পাক তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে رب العالمين-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ মানব ও জিন জাতি।

الرحمن الرحيم-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, بسم الله الرحمن الرحيم-এর ব্যাখ্যায় الرحيم الرحمن সম্পর্কেও আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই দ্বিতীয়বার এ স্থানে এর পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি না এবং এ ক্ষেত্রে কেন শব্দ দু'টিকে পুনরায় উল্লেখ করা হল সে আলোচনাও প্রয়োজন। কেননা আমরা بسم الله الرحمن الرحيم-কে সূরা ফাতিহার অংশ বলে মনে করি না। যদি করতাম তাহলে অবশ্য আমাদের উপর প্রশ্ন হত যে, কেন الرحيم الرحمن-কে এ ক্ষেত্রে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে? অথচ بسم الله الرحمن الرحيم-এর মধ্যে الرحمن الرحيم শব্দদ্বয়ের দ্বারাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজের পবিত্র সত্তার প্রশংসা করেছেন এবং স্থানগত দিক থেকেও আয়াত দুটো একটি অপরটির অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এ কথাটি আমাদের জন্য একটি বিরাট দলীল ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে যারা দাবী করেন যে, بسم الله الرحمن الرحيم হল সূরা ফাতিহার অংশ। কেননা বিষয়টি যদি এমনই হত তবে কোন ফাসিলা বা দূরত্ব ব্যতীতই একটি আয়াত একই অর্থ এবং একই শব্দের সাথে দ্বিতীয় বার উল্লিখিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বিপরীতমুখী অর্থসম্পন্ন নিকটবর্তী এক শব্দ বারবার উল্লেখিত দুটি আয়াত, কুরআন শরীফে কোথাও নেই। তবে পূর্বাপর সম্পর্কহীন কোন বাক্য থাকা অবস্থায় একই সূরায় একই আয়াত বারবার উল্লেখিত হতে পারে প্রয়োজনীয় ব্যবধান রেখে। কিন্তু بسم الله الرحمن الرحيم-এর মধ্যকার الرحمن الرحيم এবং الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم—এর মধ্যেকার الرحمن الرحيم-এর মাঝে তেমন কোন ব্যবধান নেই। সুতরাং بسم الله الرحمن الرحيم সূরা ফাতিহার আয়াত—এ কথা দাবী করা ঠিক নয়।

যদি কেউ বলেন, দুই الرحمن الرحيم-এর মাঝে الحمد لله رب العالمين আয়াতই তো ব্যবধান, তবে এর উত্তরে বলা যায়, الرحمن الرحيم যদিও শব্দগত দিক থেকে পরে এসেছে কিন্তু অর্থগত দিক থেকে তার অবস্থান আগে। অর্থগত দিক থেকে মূল বাক্য হল,

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

এ দাবীর যথার্থতার উপর তারা আল্লাহ্‌র বাণী مالك يوم الدين দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী مالك يوم الدين হল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বান্দার জন্য এই মর্মে একটি শিক্ষা যে, বান্দা আল্লাহ তাআলাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের বিচার দিনের মালিকরূপে বিশ্বাস করবে। এটা ঐ সমস্ত লোকদের পঠন রীতি অনুসারে যাঁরা পড়েন ملك (মালাকা)। অথবা প্রকাশ করবে সে আল্লাহ্‌ তাআলাকে মালিক হওয়ার গুণে গুণান্বিত সত্তা হিসাবে। এটা ঐ সমস্ত লোকের কিরাআত অনুপাতে যারা পড়েন مالك। তারা আরও বলেন যে, ملك 'মুলক' অথবা ملك (মালাকা)-এর সাথে আল্লাহ্‌র ঐ গুণটি মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হওয়াই উত্তম যা এর সাথে যথাযথ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। رب العالمين এমনি একটি শব্দ যা বিশ্বসৃষ্টির উপর আল্লাহ্‌ পাকের একমাত্র মালিকানার সংবাদ বহন করে।

আল্লাহ পাকের গুণাবলী যথা তাঁর মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাবূদ হওয়ার গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তা হল আল্লাহ্‌র বাণী الرحمن الرحيم তাই তারা মনে করে যে, الرحمن الرحيم অবস্থানের দিক থেকে رب العالمين-এর পূর্বে, যদিও বাহ্যত তা পরে এসেছে। সুতরাং উপরোক্ত বাক্য দুটোর মাঝে কোন প্রকার ব্যবধান আছে বলে মনে করা সমীচীন নয়। আর তাঁরা বলেছেন যে, আরবী ভাষায় শব্দকে অর্থের দিক থেকে পূর্বে আনা এবং ব্যবহারের দিক থেকে পরে আনার বা এর বিপরীত করার দৃষ্টান্ত অগণিত। যেমন কবি জারীর ইব্‌ন আতিয়্যা বলেছেন,

طاف الخيال واين منك لماما — فارجع لزورك بالسلام سلاما ـ

মূলতঃ বাক্যটি ছিল طاف الخيال لماما واين هو منك। অর্থাৎ "কল্পনা বিচরণ করে পাগলপারা হয়ে অথচ তুমি কোথায় এবং সে কোথায়? অতএব তোমার সাক্ষাতকারীর জন্য সালামের উত্তরে সালাম দিও।" যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করেছেন ঃ

الحمد لله الذى انزل على عبده الكتب ولم يجعل له عوجا قيما ـ

মূলতঃ আয়াতটি الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب قيما ছিল। অর্থাৎ "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআলারই যিনি তাঁর বান্দার উপর এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং যিনি এতে কোন অসংগতি রাখেননি, বরং একে তিনি করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত" (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১)

কর্মফল বসের দিনমালিক (مالك يوم الدين)

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, مالك শব্দের পাঠ নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধ আছে। কেউ শব্দটিকে ملك (আলিফ ব্যতীত), কেউ مالكِ (যের বিশিষ্ট কাফ-এর সাথে) এবং কেউ مالكَ (যবর বিশিষ্ট কাফ-এর সাথে) ও পড়ে থাকেন। এসব কিরাআত যাঁদের থেকে বর্ণিত আছে তাঁদের রিওয়ায়েতগুলো বিস্তারিত ভাবে আমি কিরাআতের কিতাবে উল্লেখ করেছি। সেখানে আমার মনোনীত কিরাআতের উপর আলোকপাত করার সাথে সাথে এর বিশুদ্ধতার কারণটিও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার কোন প্রয়োজন মনে করছি না।

কারণ এখানে কুরআন শরীফের পাঠ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য হল আল-কুরআনের আয়াতসমূহের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা পেশ করা।

আরবী ভাষায় পারদর্শী সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই এ বিষয়ে একমত যে, مالك (মালিক) শব্দটি ملك (মুল্‌ক) থেকে এবং ملك শব্দটি ملك (মিল্‌ক) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অতএব আয়াতটিকে যারা ملك يوم الدين পড়েন তাদের কিরাআত অনুসারে আয়াতটির ব্যাখ্যা হল, "প্রতিদান দিবসের নিরঙ্কুশ আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার। এতে সৃষ্টি জগতের কারো বিন্দুমাত্র দখল নেই। এই পৃথিবীর বুকে যারা ইতিপূর্বে নিজেদের স্বৈরশাসনকে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল, যারা ক্ষমতার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুঃসাহস করত এবং যারা শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, ক্ষমতা এবং একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে মোকাবিলা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত-অতঃপর কর্মফল দিবসে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত হওয়ার পর নিশ্চিতভাবে তারা উপলব্ধি করবে যে, তারা নিতান্তই হীন-তুচ্ছ এবং ক্ষমতা, শক্তি, শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, তাদের জন্য কিংবা অন্য কারো জন্য আদৌ নয়। যেমন আল্লাহ্‌ পাক কুরআনুল্‌ করীমে ইরশাদ করেছেন :

يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شئ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.

"যেদিন মানুষ (কবর থেকে) বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। আজকের দিনের কর্তৃত্ব কার? আল্লাহ্‌ পাকেরই যিনি এক, পরাক্রমশালী"—(সূরা মু'মিন : ১৬)। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক আমাদেরকে এই মর্মেই সংবাদ দিয়েছেন যে, বিচার দিনে তিনিই হবেন একক ক্ষমতার অধিকারী, দুনিয়ার বাদশাহ্‌গণ নয়, যারা কর্মফল দিবসে দুনিয়া-ছাড়া এবং ক্ষমতাহারা হয়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে চরম ভাবে।

যারা আয়াতটিকে مالك يوم الدين পড়েন, তাদের পঠনরীতি অনুসারে আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, مالك يوم الدين-"কর্মফল দিবসের মালিক" বলে এমন এক দিনকে বুঝান হয়েছে—যে দিনের বিচারকার্যে আল্লাহ্‌র সাথে আর কেউ শরীক থাকবে না— যেমনটি দুনিয়ার বাদশাহদের বেলায় হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি পরপর নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করেন :

(১) لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا—(সেদিন) দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলতে পারবে না এবং যথার্থ বলবে—(সূরা আন্‌-নাবা : ৩৮)।

(২) وخشعت الاصوات للرحمن—দয়াময়ের সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে—(সূরা তহা : ১০৮)।

(৩) ولا يشفعون الا لمن ارتضى—তারা সুপারিশ করে কেবল ঐ সমস্ত লোকের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট (সূরা আল-আম্বিয়া : ২৮)।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের উল্লিখিত দুটো পঠন পদ্ধতি এবং দুটো ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটিকেই আমি সঠিক এবং উত্তম বলে মনে করছি। আর তা হচ্ছে, ঐ সমস্ত লোকদের কিরাআত যারা শব্দটিকে ملك পড়ে থাকেন যা ব্যবহৃত হয় ملك-এর অর্থে। উক্ত কিরাআতকে প্রাধান্য দেয়ার যৌক্তিকতা হচ্ছে এই যে, এ কিরাআতে আল্লাহ্‌র একক কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেয়ার মাঝে আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতিও বিদ্যমান আছে। অধিকন্তু ملك শব্দটি مالك-এর তুলনায় অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কেননা আমরা সকলেই জানি যে, যিনি ملك সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তিনি مالك স্বত্বাধিকারী ও বটে। তবে সব مالك (স্বত্বাধিকারী) ملك সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন, বরং কেউ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হয়েও স্বত্বাধিকারী হতে পারেন।

অতঃপর ইমাম তাবারী বলেন, আল্লাহ তাআলা مالك يوم الدين-এর পূর্ববর্তী আয়াত—তথা الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিই, জগৎ সমূহের মালিক বিশ্বজগতের সর্দার, হিতাকাঙ্ক্ষী, পর্যবেক্ষক এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের প্রতি বিশেষ দয়াময় ও পরম দয়ালু।

যেহেতু আল্লাহ তাআলা رب العالمين-এর দ্বারা তাঁর কর্তৃত্ব আধিপত্য এবং ক্ষমতার কথা বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন পূর্বেই, তাই এখন আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামসমূহের থেকে এমন নামই উল্লেখ করা উচিৎ যা الرحمن الرحيم ও العالمين। رب-এর কাছাকাছি সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও এদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে না। কারণ আল্লাহ্‌র হিকমতই প্রকৃত হিকমত যার কোন নযীর নেই।

رب العالمين-এর পর আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামটিকে যদি مالك يوم الدين-এর দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে (আয়াত দুটো অতি সন্নিকটে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও) এতে رب العالمين-এর মাঝে বর্ণিত পূর্ববং গুণেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে বৈ আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে ملك يوم الدين-এর পূর্ববর্তী আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামগুলো যে অর্থটিকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে না তা হচ্ছে ঐ অর্থ যা ملك يوم الدين-এর মধ্যে আছে। আল্লাহ তাআলাই সকল রাজার রাজা, আধিপত্য একমাত্র তাঁরই এবং সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই হাতে, এ গুণবাচক নামের দ্বারা এ কথাগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, উভয় ব্যাখ্যা এবং উভয় পঠন পদ্ধতির মাঝে সর্বোত্তম পদ্ধতি হল ঐ সমস্ত কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের পদ্ধতি যাঁরা পড়েন ملك يوم الدين—যার অর্থ হল কর্মফল দিবসের নিরংকুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই। مالك يوم الدين কিরাআত বিশেজ্ঞদের কিরআত নয়—যার অর্থ হচ্ছে, কর্মফল দিবসের বিচারের মালিক আল্লাহ্ তাআলাই, অন্য কোন মাখলূক নয়।

যদি কেউ সন্দেহ করে যে, এখানে তো رب العالمين বলে আল্লাহ্‌র ইহকালীন প্রভুত্বকেই বুঝান হয়েছে, পরকালীন প্রভুত্ব নয়—তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে একথা বলে দেয়ার যে, যেমনিভাবে তিনি ইহকালে জগৎসমূহের মালিক তেমনিভাবে পরকালেও তিনি জগৎসমূহের মালিক। আর এ কথাটিই প্রকাশ করেছেন তিনি مالك يوم الدين বলে। কারণ কুরআন, হাদীস এবং বুদ্ধি ভিত্তিক প্রমাণাদি ব্যতীত এহেন সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তির সন্দেহ যদি সঠিক হয় যে, رب العالمين-এর অর্থটি ইহ জগতে আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের সংবাদ দেয়ার মাঝেই সীমিত পর জগতের প্রভুত্বের সংবাদ দেয়া এ বাক্যাংশের মূল উদ্দেশ্য নয়—তাহলে অন্যদের জন্য একথা বলাও ঠিক হবে যে, رب العالمين-এর অর্থ হল, আল্লাহ্ তৎকালিন জগৎসমূহের রব যখন উক্ত বাক্যাংশটি নাযিল হয়েছে। তবে এ

বাক্যাংশটি নাযিল হওয়ার পর যে সব আলমের সৃষ্টি হয়েছে তিনি এগুলোর রব নন। এ কথা অত্যন্ত নির্ভুল এবং সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রত্যেক যুগের সৃষ্টি তার পরবর্তী যুগের সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা থাকে, এতদসত্ত্বেও কোন নির্বোধ ব্যক্তি যদি আমার পূর্ববর্তী বক্তব্যকে বুঝতে না পারে তবে তার মনের রুদ্ধ দরজা উম্মোচিত করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতখানা পেশ করছি। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

"আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলাম, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরন দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর—" (সূরা আল-জাসিয়াহ : ১৬)।

এতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক যুগের সৃষ্টি তার পরবর্তী যুগের সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং স্বতন্ত্র স্বকীয়তা নিয়ে বিদ্যমান থাকে। কেননা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন উম্মাতে মুহাম্মাদীকে পরবর্তী সকল উম্মাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে বলেছেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব (সূরা আল-ইমরান : ১১০)। এতে পরিস্কার ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, বনী ইসরাঈল যেহেতু আমাদের নবীকে তৎকালে অস্বীকার করেছে এবং মিথ্যাবাদী বলেছে, তাই তারা শ্রেষ্ঠ উম্মাত কস্মিনকালেও হতে পারে না। তবে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ উম্মাত তারাই যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথের অনুসারী, তারা নয় যারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং বিচ্যুত হয়েছে তার প্রদর্শিত পথ হতে।

অতএব আল্লাহ তাআলা কেবল আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমসাময়িক বিশ্বের রব, সর্বকাল এবং সকল বিশ্বের জন্য তিনি রব নন—رب العالمين এরূপ ব্যাখ্যার ভ্রান্তি যেমনি ভাবে স্পষ্ট, তেমনি ভাবে স্পষ্ট হল ঐ সমস্ত লোকদের ভ্রান্তিও যারা বলে, رب العالمين-এর অর্থ হল رب عالم الآخرة (পরজগতের রব) رب عالم الدنيا নয়। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্যই مالك يوم الدين-কে এর সাথে যোগ করা হয়েছে। যাতে জানা যায় যে, তিনি যেমনি ভাবে ইহজগতে জগতসমূহের মালিক এবং রব এমনি ভাবে তিনিই থাকবেন পরকালে জগতসমূহের রব ও মালিক। رب العالمين-এর ব্যাখ্যায় যারা বলে যে, আল্লাহ্র রবুবিয়্যাত কেবল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ পর্যন্তই সীমিত, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যুগের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, যেমন কেউ কেউ মনে করে যে, رب العالمين-এর ব্যাখ্যা হল رب عالم الدنيا (পার্থিব জগতের রব), رب عالم الآخرة নয়। তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার সপক্ষে কোন দলীল প্রমাণ আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই।

কেউ যদি মনে করে যে, مالك يوم الدين -এর অর্থ হল انه الذى يملك اقامة يوم الدين (বিচার দিবস অনুষ্ঠানের মালিক একমাত্র তিনিই), তবে رب العالمين -এর উল্লিখিত ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মত এই ব্যাখ্যাও ভ্রান্ত। কারণ اقامة القيامة -এর অর্থ হল সৃষ্টিসমূহকে তাদের ধ্বংস পূর্ব আকৃতিতে এমন স্থানে পুনরুত্থান করা যে স্থান আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। এ স্থানও العالمون -এর অন্তর্ভুক্ত, যে আলমসমূহের রবুবিয়্যাত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অবহিত করেছেন رب العالمين -এর মাঝে।

যারা আয়াতটিকে مالك يوم الدين পড়েন, তারা ডাকা (نداء) এবং দু'আর (دعاء) উদ্দেশ্যেই পড়ে থাকেন। তাদের পঠনরীতি অনুসারে মূল আয়াতটি হবে يا مالك يوم الدين (হে কর্মফল দিবসের মালিক)। যেমন يوسف اعرض عن هذا -কে ব্যাখ্যা করা হয় يا يوسف اعرض عن هذا -এ ভাবে।

আরব কবিদের কবিতায়ও এর অনেক উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন বনী আসাদের জনৈক কবি বলেছেন ঃ

ان كنت از قدتنى بها كذبا - جزء فلا قيت مثلها عجلا

এখানে جزء বলে يا جزء উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমনিভাবে অপর এক কবি বলেছেন ঃ

كذبتم وبيت الله لا تنكحونها - بنى شاب قرناها تصر وتحلب

এখানে بنى شاب قرناها -এর পূর্বে একটি 'يا' সম্বোধন সূচক শব্দ উহ্য আছে। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, পক্ষান্তরে লোকটি مالك يوم الدين -এর ك-এ যবর দিয়ে এক দারুন জটিলতায় নিপতিত হয়েছেন। তিনি মনে করেছেন, مالك يوم الدين -এর ك যবর না দিয়ে যদি যের দিয়ে পড়া হয় তাহলে পূর্বে اياك نعبد واياك نستعين -এর ك-এর যে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে এ ব্যাখ্যার সাথে مالك يوم الدين -এর কোন সামঞ্জস্যই অবশিষ্ট থাকছে না। তাই উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি مالك يوم الدين -এর ك-এ যবর দিয়েছেন—যাতে اياك نعبد সম্বোধন সূচক বাক্য হিসাবে পরিগণিত হয়। তার ধারণামতে পূর্ণ বাক্যটি হ'ল يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين (হে কর্মফল দিবসের মালিক, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য চাই)।

তবে তিনি যদি সূরার প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি অনুধাবন করতে পারতেন এবং জানতেন যে, الحمد لله رب العالمين (থেকে পূর্ণ সূরাটি) তিলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বান্দার প্রতি নির্দেশ রয়েছে, যা আমি পূর্বে হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছি যে, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ

قل يا محمد الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين وقل ايضا يا محمد اياك نعبد واياك نستعين -

(হে মুহাম্মাদ! বলুন, প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, যিনি পরম দয়ালু ও দাতা, কর্মফল দিবসের মালিক। হে মুহাম্মাদ! পুনরায় বলুন, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই)।

অধিকন্তু আরবদের একটি প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে এই যে, যখন তারা কোন কিছু বর্ণনা করেন বা যাকে সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা বর্ণনা করার নির্দেশ দেন তখন তারা বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করেন। যথা خطاب (মধ্যম পুরুষ) থেকে غائب (নাম পুরুষ)-এর দিকে কিংবা غائب (নাম পুরুষ) থেকে خطاب (মধ্যম পুরুষ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। যেমন তারা কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকেন قمت لو قمت এবং لوقام لقمت ইত্যাদি। তাহলে উক্ত ব্যক্তি مالك يوم الدين-এর ك-এ যের দিয়ে পড়াতে কোন প্রকার জটিলতাই অনুভব করতেন না।

مالك يوم الدين-এর ك-এ যের দিয়ে পড়ে পুনরায় اياك نعبد বলে خطاب-এর দিকে ধাবিত হওয়ার দৃষ্টান্ত ও বিরল নয়। আরবী বাক্যে আবু কাবীর হুযালীর কবিতায়ও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে ঃ

يا لهف نفسي كان جلدة خالد — وبياض وجهك للتراب الاعفر -

কবিতার প্রথমাংশে خالد নাম পুরুষ উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কবিতার শেষাংশে وبياض وجهك বলে কবি خطاب বা মধ্যম পুরুষের দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। অনুরূপ ভাবে লাবীদ ইবনু রাবীআ বলেছেন ঃ

باتت تشكي الى النفس مجهشة — وقد حملتك سبعا بعد سبعينا -

এখানেও غائب বা নাম পুরুষ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার পর কবি الى النفس বা মধ্যম পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়ে কাব্য রীতিতে নূতনত্বের সংযোজন করেছেন।

অনুরূপ পাঠ প্রক্রিয়া সর্বাধিক সত্য ও নিখুঁতভাবে প্রমাণিত আল্লাহ পাকের কালামে রয়েছে ঃ

حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة -

"এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং অনুকূল বাতাসে এগুলো যখন তাদের নিয়ে বয়ে চলে..." (সূরা ইউনুস ঃ ২২)।

উল্লেখিত আয়াতে প্রথমে اذا كنتم বলে সম্বোধন সূচক ক্রিয়া ব্যবহার করার পর وجرين بكم-এর স্থলে وجرين بهم বলে غائب বা নাম পুরুষের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। আরবী কবিতা এবং আরবী বাক্যের মাঝে এ ধরনের পাঠ প্রক্রিয়া পরিবর্তনের অসংখ্য ও অগণিত উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। সবগুলো এখানে সন্নিবেশিত করা সম্ভব নয়। তবে বুদ্ধিমান জ্ঞানী জনের জন্য—এ কটি উদাহরণই যথেষ্ট বলে মনে করছি।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, مالك يوم الدين-এর ك-এ যবর দিয়ে পড়া শুদ্ধ নয়। এ বিষয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ও বিদগ্ধ আলেমগণ সকলেই একমত।

يوم الدين-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, الدين শব্দটি এখানে হিসাব-নিকাশ এবং কর্মফল প্রদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত বিধায় আরবের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকও তা ক্ষেত্র বিশেষে এ অর্থেই প্রয়োগ করেছেন। যেমন কবি কা'ব ইবন জুআয়ল বলেছেন,

اذا رماونا رميناهم — ودناهم مثل ما يقرضونا

(যখন তারা আমাদের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করে তখন আমরাও তাদের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করি তারা যেমন আমাদের ঋণ দেয়, আমরাও তেমন তাদের প্রতিদান দেই)। অপর এক কবি বলেছেন ঃ

واعلم وايقن ان ملكك زائل — واعلم بانك ما تدين تدان

(জেনে রাখ এবং বিশ্বাস কর, তোমার ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় এবং এও জেনে নাও, যেমন কর্ম তেমন ফল)। আল-কুরআনেও دين শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

كلا بل تكذبون بالدين (يعني بالجزاء) وان عليكم لحافظين

(يحصون ما تعملون من الاعمال)

"না, কখনো নয়, তোমরা তো কর্মফল দিবসকে অস্বীকার কর। অবশ্যই আছে তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়কগণ (সূরা ইনফিতার ঃ ৯)।" (অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদের কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিসংখ্যান নেয়া হবে)।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন, فلولا ان كنتم غير مدينين "অতঃপর যদি তোমাদের হিসাব-নিকাশ না হবারই হয়"—(সূরা ওয়াকিআ ঃ ৮৬)।

প্রতিদান এবং হিসাব-নিকাশ ব্যতীত الدين শব্দের আরো বহু অর্থ আছে, যথাস্থানে তা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

يوم الدين-এর ব্যাখ্যায় আমি যা কিছু বলেছি পূর্ববর্তী তাফসীরকারদের থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আছার (হাদীস) নিম্নে পেশ করলাম ঃ

عن الضحاك عن عبد الله بن عباس (يوم الدين) قال يوم حساب الخلائق وهو يوم القيامة يدينهم باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر الا من عفا عنه فالامر امره ثم قال (الا له الخلق والامر)۔

"ইমাম দাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি يوم الدين-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, يوم الدين হল সৃষ্টি জগতের হিসাব-নিকাশের দিন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন—যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুপাতে ফল দেয়া হবে। যদি তাদের কাজ কল্যাণকর হয় তাহলে প্রতিদানও হবে কল্যাণকর। আর যদি তাদের কাজ অকল্যাণকর হয় তাহলে প্রতিদানও অকল্যাণকর হবে।

তবে আল্লাহ্ যদি কাউকে ক্ষমা করে দেন—তা স্বতন্ত্র কথা, তাঁর আদেশই চূড়ান্ত আদেশ। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, 'জেনে রাখ, সৃষ্টিও তাঁর, আদেশও চলবে তাঁর।"

عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم مالك يوم الدين هو يوم الحساب -

"হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, مالك يوم الدين বলে বিচার দিবসকেই বুঝানো হয়েছে।"

عن قتادة فى قوله (مالك يوم الدين) قال يوم يدين الله العباد باعمالهم

"হযরত কাতাদা (র) مالك يوم الدين সম্পর্কে বলেছেন, يوم الدين হল ঐ দিন—যেদিন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কাজের বিনিময় দান করবেন।"

عن ابن جريج (مالك يوم الدين) قال يوم يدان الناس بالحساب -

"হযরত ইবনে জুরায়জ (র)-مالك يوم الدين সম্পর্কে বলেছেন, যেদিন হিসাব অনুপাতে মানুষের প্রতিদান দেয়া হবে—ঐ দিনকেই يوم الدين বলে অভিহিত করা হয়েছে।"

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, اياك نعبد-এর ব্যাখ্যা হল - لك اللهم نخشع ونذل ونستكين اقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়, বরং তোমার প্রভুত্বের স্বীকৃতি দেয়ার জন্যই আমরা কেবল তোমারই কাছে বিনীত হই এবং তোমারই কাছে আমাদের দীনতা-হীনতা আর অসহায়তার কথা প্রকাশ করি।"

উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার সমর্থনে ইমাম তাবারী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেছেন :

عن ابن عباس قال قال جبريل لمحمد صلى الله عليه و سلم قل يا محمد اياك نعبد اياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك -

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! বলুন اياك نعبد— আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি। হে আমাদের প্রভু! আমরা একান্ত ভাবে তোমার একত্ব বর্ণনা করি, তোমাকে ভয় করি এবং তোমার (সাহায্য পাওয়ার) আশা রাখি এবং তুমি ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না এবং কারো উপর ভরসাও রাখি না।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই বক্তব্য আমার ব্যাখ্যারই পূর্ণাঙ্গ সমর্থন জ্ঞাপক। তবে আরবদের নিকট ইবাদতের মূল মগয যেহেতু দীনতা, হীনতা এবং বিনতী—তাই আমি نعبد-এর ব্যাখ্যায় نرجوا ونخاف উল্লেখ না করে نخشع ونذل ونستكين

উল্লেখ করেছি অথচ خوف ورجاء—ভয় ও আশা, দীনতা, হীনতা ও যিল্লতীর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এ কারণেই অধিক দলিত পথকে বলা হয় الطريق المذلل।

অনুরূপভাবে আরবের সুপ্রসিদ্ধ কবি ارقة بن العبد বলেছেন,

تبارى عتاقا ناجيات واتبعت - وظيفا وظيفا فوق مور معبد -

এখানে مور অর্থ হল রাস্তা এবং معبد অর্থ হল المذلل الموطوء মথিত, পদদলিত, এ কারণেই প্রয়োজনে বাহন কার্যে ব্যবহৃত مذلل بعير-কে معبد বলা হয়। এমনি ভাবে ক্রীতদাসও যেহেতু মনিব কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়, তাই ক্রীতদাসকেও বলা হয় عبد। মোটকথা হল এ ব্যাপারে আরবী সাহিত্যেও অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। নমুনাস্বরূপ আমি যা উল্লেখ করেছি তা ইনশাআল্লাহ বুদ্ধিমানদের জন্য যথেষ্ট হবে।

و اياك نستعين-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হল ঃ

واياك ربنا نستعين على عبادتنا اياك - و طاعتنا لك و فى امورنا كلها لا احد سواك اذكان من يكفر بك يستعين فى اموره معبوده الذى يعبده من الاوثان دونك و نحن بك نستعين فى جميع امورنا مخلصين لك العبادة؛

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সকল কাজে আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে আমরা শুধু তোমারই সাহায্য চাই। তোমাকে যারা অস্বীকার করে তারা যেহেতু তাদের আরাধ্য প্রতিমাগুলোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তাই একনিষ্ঠভাবে তোমার ইবাদত করতঃ আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই। উপরোক্ত ব্যাখ্যার সপক্ষে ইমাম তাবারী (র) নিম্ন বর্ণিত হাদীসখানা পেশ করেন ঃ

عن عبد الله بن عباس (و اياك نستعين) قال اياك نستعين على طاعتك و على امورنا كلها -

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "و اياك نستعين-এর অর্থ হচ্ছে, আমরা আপনার আনুগত্য করার ক্ষেত্রে এবং আমাদের সকল কাজে একমাত্র আপনারই সাহায্য চাই।" যদি কেউ প্রশ্ন করে – আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে বান্দাদেরকে নির্দেশ দেয়ার অর্থ কি? ইবাদত করার জন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তাদেরকে সহায়তা না করা কি ঠিক হবে? নাকি বক্তা তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বলবে, اياك نستعين على اطاعتك (আমরা বিশেষভাবে আপনার আনুগত্য প্রকাশে সাহায্য চাই)? তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ কথা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেই বলা সম্ভব এবং এটাই হল ইবাদত। সুতরাং প্রাপ্ত বিষয় চাওয়ার অর্থ কি?

উত্তর ঃ ইমাম তাবারী র) বলেন, প্রশ্নকারী আয়াতের ব্যাখ্যায় যে অর্থ গ্রহণ করেছেন মূলত আয়াতের অর্থ তা নয়। কারণ আল্লাহর যথাযথ আনুগত্য করার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাকারী মু'মিন দাঈ মূলতঃ ভবিষ্যত জীবনে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে আঞ্জাম দেয়ার জনাই আল্লাহর নিকট সাহায্য চায়, বিগত জীবনের কার্যাদি এবং কৃত নেক আমলের জন্য নয়। প্রতিপালকের

নিকট এ ধরনের সাহায্য চাওয়া বান্দার জন্য বৈধ, কেননা আল্লাহ্ তাআলা বান্দার উপর যে সমস্ত ফারায়েয নির্ধারণ করেছেন এবং যে সমস্ত ইবাদতের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন এগুলো আদায় করার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যোগ্যতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি বান্দাদেরকে প্রার্থিত বস্তুসমূহ প্রদান করা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ এবং অপরিসীম দয়া। আল্লাহ যদি তাঁর কোন বান্দাকে তাঁর অবাধ্যতা এবং ইলাহীর প্রেম থেকে বিমুখতার ফলে স্বীয় অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত করে দেন অথবা তিনি যদি কারো প্রতি তার আনুগত্য এবং প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের ফলে স্বীয় অনুগ্রহের দ্বার উম্মোচন করে দেন তাহলে এতে তাঁর ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার ত্রুটি এবং নির্দেশনামায় বিন্দু মাত্র অবিচার হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। এসব সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাদেরকে আদেশ করা এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের যথার্থতা অনুধাবনে মূর্খ ব্যক্তিরা অসমর্থও হতে পারে। এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। অধিকন্তু উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে اياك نعبد واياك نستعين বলে ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন এতে প্রশ্নকারী ব্যক্তিদের উত্থাপিত অভিযোগের ভ্রান্তির সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে এবং বিদ্যমান রয়েছে তাফসীরের প্রবক্তা কাদারিয়াদের ভ্রান্ত আকীদার জ্বলন্ত নিদর্শন—যারা কাজ করা বা না করার ব্যাপারে যোগ্যতা এবং সহযোগিতা প্রদান করার পূর্বে আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাদের প্রতি কোন নির্দেশ দেয়া কিংবা কোন দায়িত্ব অর্পণ করাকে অসম্ভব এবং অযৌক্তিক বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি তাই হয়, যেমন তারা বলেছেন, তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নিকট হতে সাহায্য লাভের আকর্ষণ এবং অনুপ্রেরণাটি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তাদের মতানুসারে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আদেশ, নিষেধ এবং দায়িত্ব অর্পণ করার পর—বান্দাকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌র জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, চাই বান্দা সাহায্য প্রার্থনা করুক অথবা না করুক, এমনকি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে সাহায্য না করা জুলুমেরই নামান্তর। তাদের কথানুপাতে যে ব্যক্তি اياك نعبد و اياك نستعين পাঠ করে, তার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাওয়া যেন তিনি তার প্রতি জুলুম না করেন। অথচ পূর্বসূরী মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ اللهم انا نستعينك বাক্যটিকে বিশুদ্ধ এবং اللهم لا تجر علينا বাক্যটিকে অশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষজ্ঞগণের এ দ্ব্যর্থহীন অভিব্যক্তি উপরোক্ত মতবাদের ভ্রান্তির জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ তাদের বক্তব্যানুসারে দ্ব্যর্থহীন বক্তার কথা اللهم انا نستعينك-এর অর্থ হবে اللهم لا تتركنا معونتنا التى تركها جور منك—(হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি সাহায্য বন্ধ করো না, যা বন্ধ করা তোমার পক্ষে জুলুমেরই শামিল)।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, 'ইবাদত' আল্লাহ্‌পাকের সাহায্য দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং عمل ও عبادة معونة-এর উপর مقدم—এসব সত্ত্বেও اياك نستعين-কে পূর্বে উল্লেখ না করে اياك نعبد কে কেন اياك نستعين-এর পূর্বে সংযোজন করা হয়েছে?

উত্তরঃ এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বান্দা ইবাদতের সুযোগ তখনই পায় যখন সে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, এবং বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত আবেদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাহায্য প্রাপ্ত না হয়। আর এ কথাও সত্য যে, ইবাদত সংঘটিত হওয়াকালীন সময়েই সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে। সুতরাং পূর্বাপর সকল অবস্থাই এখানে একই পর্যায়ভুক্ত, تقديم — تاخير-এর ফলে এখানে কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না। যেমন কোন জটিলতা

নেই নিম্নবর্ণিত আরবদের কথিত বাক্যসমূহে, যেমনিভাবে اذا قضى حاجتك فاحسن اليك في قضائها (যখন সে তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিল, তখন সে তোমার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করল) এবং قضيت حاجتي فاحسنت الى (তুমি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে আমার প্রতি এহসান করেছ) বলা জায়েয। অনুরূপভাবে احسان-এর কথা পূর্বে উল্লেখ করে বর্ণনা প্রক্রিয়া পরিবর্তন করে احسنت الى فقضيت حاجتي (তুমি আমার প্রতি ইহসান করে আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছ) বলাও জায়েয। কেননা কেউ তোমার জন্য قاضى حاجات (প্রয়োজন পূরণে সহায়ক) হতে পারবে না যদি সে তোমার প্রতি محسن (উপকারী) না হয় এবং তোমার প্রতি কেউ محسن ও হতে পারবে না—যদি সে قاضى حاجات না হয়।

সুতরাং اللهم ! انا ! اياك نعبد فاعنا على عبادتك (হে আল্লাহ ! নিশ্চতই আমরা তোমার ইবাদত করি, অতএব তোমার ইবাদতে আমাদেরকে সাহায্য কর) এবং اللهم اعنا على عبادتك فانا اياك نعبد (হে আল্লাহ্, আমাদেরকে তোমার ইবাদতে সাহায্য কর, আমরা তোমারই ইবাদতকারী)—উভয়ভাবেই বাক্য ব্যবহার করা ভাষা বিশেষজ্ঞদের নিকট বৈধ।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, কতিপয় অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেছে যে, শব্দগত দিক থেকে যদিও اياك نعبد — مقدم (প্রথমে) কিন্তু অর্থগত দিক থেকে তা হল مؤخر (পরে) যেমন কবি ইমরুউল কায়স বলেছেন ঃ

ولو انما اسعى لادنى معيشة - كفاني ولم اطلب قليل من المال -

কবিতার দ্বিতীয় চরণে মূল عبارت হল كفانى قليل من المال و لم اطلب كثيرا শব্দগত এবং বাহ্যিক দিক থেকে যদিও ولم اطلب — مقدم (প্রথম) কিন্তু অর্থগত দিক থেকে—قليل من المال হল مقدم (প্রথম)। অর্থাৎ تقديم و تاخير-এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত চরণে যেমনটি ঘটেছে اياك نعبد ও واياك نستعين-এর ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটেছে।

এ অহেতুক ধারণা নিরসন কল্পে ইমাম তাবারী(র) বলেন, আয়াতটি একদিকে যেমন تقديم ও تاخير-এর দোষ থেকে মুক্ত, এমনিভাবে কবি ইমরুউল কায়সের কবিতার সাথেও এর কোন সম্বন্ধ নেই। কারণ, স্বল্প সম্পদ মানুষের জন্য যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো সে অধিক সম্পদের অন্বেষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজন পরিমাণ মাল বিদ্যমান থাকার ফলে অধিক উপার্জনে আত্মনিয়োগ করা বর্জনীয় নয়। যদি এমন হত তাহলে উহাকে ঐ ইবাদতের নজীর এবং সদৃশ বলে ধরে নেয়া যেত, যার অস্তিত্বের সাথে معونة-এর অস্তিত্ব এবং معونة-এর অস্তিত্বের সাথে যার অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অধিকন্তু শব্দ দুটো যেহেতু একটি অপরটির জন্য دال বা নির্দেশক নয়, তাই শব্দ দুটো থেকে প্রথমোক্ত শব্দটি যথাস্থানে বর্ণিত আছে—এ কথা মেনে নেয়ার মাঝেই নিহিত আছে বাক্যের বিশুদ্ধতা। সুতরাং ধারণাকারীর এ ধারণা অহেতুক, অবাস্তব এবং অমূলক।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, نعبد-এর সাথে اياك উল্লেখ আছে এতদসত্ত্বেও نستعين-এর সাথে উক্ত

শব্দটিকে পুনরুল্লেখ করার কারণ কি? معبود (উপাস্য) এবং مستعان (সাহায্যকারী) যেহেতু একই সত্তা তাই বাক্যটিতে إياك শব্দটিকে পুনরুল্লেখ না করে কেন বলা হল না إياك نعبد و نستعين?

উত্তর—ইমাম আবু জাফর তাবারী(র) বলেন, إيا-এর সাথে উল্লেখিত كاف অব্যয়টি ঐ كاف যা ক্রিয়া পদের শেষে ব্যবহৃত হলে ক্রিয়া পদের সাথে (এখানে نعبد-এর সাথে) সংযুক্ত থাকে। এবং এ শব্দটি ঐ اسم المخاطب-এর স্থলাভিষিক্ত যা ক্রিয়াপদ কর্তৃক منصوب হয়েছে। اسم مفرد একক অক্ষর বিশিষ্ট হওয়া আরবী ভাষায় নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে অনেক সময় এ كاف অব্যয়টি إيا-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে শব্দের প্রথমেও ব্যবহৃত হয়, إياك-এর كاف অব্যয়টি যেহেতু اسم المخاطب-এর স্থলাভিষিক্ত এবং এককভাবে হলে তা ক্রিয়াপদে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাই كاف অব্যয়টি যখন ক্রিয়াপদের (فعل) পরে ব্যবহৃত হবে তখন তার জন্য সমীচীন হ'ল সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার শেষে পুনরুল্লিখিত হওয়া, তাই اللهم انا نعبدك ونستعينك و نحمدك و نشكرك বাক্যটি اللهم انا نعبدك و نستعين و نحمد বাক্য হতে অধিকতর বিশুদ্ধ, তদ্রূপ اسم المخاطب-এর স্থলাভিষিক্ত كاف অব্যয়টি إيا-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে যখন ক্রিয়াপদের পূর্বে ব্যবহৃত হবে, তখনও তাকে ক্রিয়াপদের সাথে পুনরুল্লেখ করা অধিকতর সমীচীন, যদিও পুনরুল্লেখ না করা জায়েয আছে।

কোন কোন স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি إياك نعبد-এর পর نستعين-এর إياك শব্দটি পুনরুল্লেখ করাকে 'আদী ইবনে যায়দ আল 'আবাদী এবং আলা হামদানীর কবিতাদ্বয়ের সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন যে,

وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به - بين النهار و بين الليل قد فصلا - بين الاشج و بين
قيس باذخ بخ بخ لوالده وللمولود -

উক্ত কবিতাদ্বয়ে যেমনিভাবে بين শব্দটিকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এমনি ভাবেই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে إياك শব্দটিকে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) উক্ত মতকে উপেক্ষা করে বলেন যে, إياك শব্দকে بين-এর সাথে তুলনা করা চরম বোকামী ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ إياك এমন একটি শব্দ যা সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াপদের সাথে পুনরুক্তির দাবী রাখে—যার আলোচনা পূর্বে বিবৃত হয়েছে। তবে بين শব্দের ব্যবহারবিধি হল স্বতন্ত্র। কেননা بين শব্দটি কোথাও এক اسم -এর সাথে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় না; বরং সর্বদাই তা দুই اسم -এর মাঝে ব্যবহৃত হয়। অগত্যা যদি উহা দুই اسم থেকে কোন এক اسم-এর সাথে ব্যবহৃত হয় তাহলে بين ব্যবহৃত বাক্যটি افهام ও تفهيم -এর ক্ষেত্রে দারুণ দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। যেমন কেউ যদি বলে, الشمس قد فصلت بين النهار তাহলে بين যে اسم টির দাবী করে তার অভাবে বাক্যটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ اللهم اياك نعبد বলে তাহলে বাক্যটি পূর্ণ হবে। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত শব্দ اياك نعبد সদৃশ তা نعبد-এর মতই اياك-এর মুখাপেক্ষী। সুতরাং اياك শব্দটি তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া পদের সাথে পুনরুল্লেখ হওয়াই উচিত। উপরোক্ত আলোচনায় আমি اياك এবং بين শব্দদ্বয়ের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য সম্পর্কে সাধ্যানুসারে আলোচনা করেছি।

اهدنا الصراط المستقيم

আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اهدنا الصراط المستقيم এর অর্থ হল وفقنا للثبات عليه (হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সরল পথের উপর অবিচল থাকার তওফীক দিন)। এ মর্মে হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে।

তিনি বলেছেন, "একদা হযরত জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ (স)! বলুন, اهدنا الصراط المستقيم হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ হল الهمنا الطريق الهادى অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে হিদায়াতের পথ বাতলিয়ে দিন। ইলহাম-এর অর্থই হল আল্লাহ্র পক্ষ হতে সামর্থ্য দান করা। যেমন আমি এ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করেছি। আলোচ্য আয়াত উপরোক্ত আয়াত اياك نستعين -এর মতই। অর্থাৎ এ আয়াতে বিশেষভাবে এ কথাই বলা হচ্ছে যে, বান্দা যেন ভবিষ্যত জীবনে আল্লাহ্র আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের উপর 'আমল করার ব্যাপারে অবিচল থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট তওফীক কামনা করে। যেমনিভাবে اياك نستعين-এর মাঝে বান্দাকে ভবিষ্যত জীবনে আল্লাহ্র দেওয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য চাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে - اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم -এর অর্থ হল ঃ

اللهم اياك نعبد وحدك لا شريك لك مخلصين لك العبادة دون ما سواك من الآلهة و الاوثان فاعنا على عبادتك و وفقنا لما وفقت له من انعمت عليه من انبيائك و اهل طاعتك من السبل و المنهاج -

"হে আল্লাহ্! একনিষ্ঠভাবে আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। তোমার কোন শরীক নেই। আমাদের ইবাদত বিশেষ করে তোমার জন্য। তুমি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিমা এবং কল্পিত মা'বূদের জন্য নয়। সুতরাং তোমার ইবাদতের জন্য আমাদেরকে সাহায্য কর এবং আমাদেরকে তওফীক দাও, ঐ কাজের জন্য যে কাজের তওফীক দিয়েছ তুমি তোমার অনুগৃহীত বান্দা নবীগণকে এবং তাঁদের পথ ও মতের অনুসারী পুণ্যবান লোকদেরকে।"

ইমাম তাবারী (র) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আরবী ভাষায় هداية শব্দটি توفيق-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ কথাটি আপনি কোথায় পেয়েছেন?

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে আরবী ভাষায় অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কোন এক কবি বলেছেন,

لا تحرمنى هداك الله مسئلتى - و لا اكونن كمن اودى به السفر -

কবিতার প্রথম পংক্তি هداك الله مسلكى-এর অর্থ হল وفقك الله لقضاء حاجتى এখানে هداية শব্দটি توفيق-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য এক কবি বলেছেন,

وَ لَا تُعَجِّلَنِّى هَدَاكَ الْمَلِيكُ - فَإِنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالًا -

এ কথা সর্বজন জ্ঞাত যে, এখানে কবি هداك الملك বলে وفقك الله لا صابة الحق فى امرى অর্থে ব্যবহার করেছেন।

অনুরূপ অর্থে শব্দটি কুরআনুল কারীমেও বিন্যস্ত হয়েছে বহুবার। যেমন ইরশাদ হয়েছে, وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না)। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সাহায্য করেন না—অর্থাৎ তিনি তাদের উপর আরোপিত فرض সমূহ তাদের নিকট বয়ান করেন না।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, বিধি-নিষেধ সম্বলিত আল্লাহ্‌র ঘোষণা সকল মানুষের জন্যই সমান। তাই আয়াতের উক্ত অর্থ যথাযথ নয়। বরং আয়াতের যথাযথ অর্থ হল الله لا يوفقهم و لا يشرح للحق و الايمان صدورهم সত্যকে বরণ করা এবং ঈমান গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বক্ষকে উন্মুক্ত করেন না এবং তাদেরকে এ কাজের জন্য তওফীকও দান করেন না। কোন কোন তাফসীরকার মনে করেন যে, اهدنا-এর অর্থ زدنا هداية (আমাদের জন্য হিদায়েতকে বাড়িয়ে দিন)। তাবারী (র)-এর মতে এরূপ ব্যাখ্যার পেছনে দুটি কারণের যে কোন একটি অপরিহার্য। এক ঃ হয়তো ব্যাখ্যাকার মনে করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রতিপালকের নিকট الزيادة فى البيان (বর্ণনাশক্তি বৃদ্ধির জন্য) প্রার্থনা করতে আদিষ্ট হয়েছেন; দুই ঃ অথবা তিনি আদিষ্ট হয়েছেন الزيادة فى المعونة و التوفيق (সাহায্য এবং সামর্থ্য) কামনা করার জন্য। ব্যাখ্যাকার যদি ধারণা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রতিপালকের নিকট الزيادة فى البيان-এর জন্য আদিষ্ট হয়েছেন—এহেন ব্যাখ্যা একান্তই অমূলক এবং যুক্তিহীন। কেননা আল্লাহ্ পাক বান্দার নিকট فرائض-এর সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং উপযুক্ত প্রমাণাদি পেশ করা ব্যতীত কখনো বান্দার উপর কোন দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। সুতরাং اهدنا-এর অর্থ যদি الزيادة فى البيان-ই হয়ে থাকে, তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ প্রকাশ করে দেয়ার প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশিত হয়েছেন। অথচ এরূপ দু'আ শরীআত বিরোধী বলে বিবেচিত। এজন্য যে, আল্লাহ্ পাক দায়িত্ব সম্বন্ধে অবগ না করে কখনো কোন ব্যক্তির উপর কোন দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। অথবা এ ব্যাখ্যা অনুপাতে যেহেতু আয়াতের অর্থ এই হয় যে, যে সমস্ত বিধান এখনো তাঁর উপর আরোপ করা হয়নি, তা আরোপ করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করার জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন। তাই উক্ত ব্যাখ্যা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাখ্যার অসাড়তা সম্পর্কে এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট যে, الصراط المستقيم اهدنا-এর অর্থ بين لنا فرائضك و حدودك (অলংঘনীয় আদেশ ও অপরিহার্য বিধানসমূহ) নয়।

আর তাফসীরকার যদি اهدنا-এর অর্থ زدنا هداية এ কারণে বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রতিপালকের নিকট الزيادة فى المعونة و التوفيق কামনা করার জন্য

নির্দেশিত হয়েছেন—তাহলে এ কথাটিও দুই অবস্থা হতে খালি নয়। হয়তো তার এ প্রার্থনা অতীত বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে অথবা সম্পৃক্ত থাকবে তা ভবিষ্যত কার্যকলাপের সাথে। বস্তুতঃ অতীত কার্যকলাপের কার্য আদায় করার সময় نعبد-এর প্রতি বান্দার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরার প্রাক্কালে যদি প্রার্থনাকারী জানে যে, এ আধিক্যের প্রার্থনা মূলতঃ ভবিষ্যত জীবনের জন্যই নির্ধারিত—তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাই সঠিক এবং নির্ভুল। অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হল ভবিষ্যত জীবনে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করার জন্য বান্দার পক্ষ হতে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করা এবং তওফীক কামনা করা। উক্ত ভাষ্যের নির্ভুলতার মধ্য দিয়ে কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তির কথাটিও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তারা মনে করে, প্রতিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আদিষ্ট ব্যক্তিই দায়িত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ফলে তাদের ধারণা মতে কোন فرض কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন বাকী থাকে না বান্দার জন্য। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, কাদারিয়াদের উক্তিকে মেনে নিলে اياك نعبد و اياك نستعين এবং اهدنا الصراط المستقيم আয়াত দুটো অর্থহীন হয়ে পড়ে। অথচ আয়াতদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি এর বিশুদ্ধতার ভিতর দিয়ে কাদারিয়াদের অহেতুক উক্তিটিও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যায়।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে اهدنا الصراط المستقيم-এর অর্থ হল اسلكنا طريق الجنة في المعاد। (অর্থাৎ আমাদেরকে নিয়ে চলুন পরকালীন জান্নাতের পথে এবং সে পথেই আমাদেরকে পরিচালিত করুন)। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, فاهدوهم الى صراط الجحيم (তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে)। هداية-এর এ অর্থটি বহুল প্রচলিত। যেমন আরবগণ বলে থাকেন যে, تهدى المرأة الى زوجها (মহিলা তার স্বামীর সান্নিধ্যে গমন করেছে) تهدى الهدية الى الرجل —(লোকটির নিকট উপঢৌকন এসেছে) এবং تهدى الساق القدم (পদব্রজে ঘাটে অবতরণ করেছে)।

আরব কবি তারফা ইবনুল আবদের কবিতায়ও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

لعمرك بعدي المسول به — و جرى في رزق رهمه -

الفتى عقل يعيش به — حيث تهدى ساقه قدمه -

تهدى ساقه قدمه এর অর্থ হল পদব্রজে ঘাটে অবতরণ করা। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, পূর্বোক্ত আয়াত اياك نعبد و اياك نستعين এবং সমস্ত মুফাস্‌সিরের অভিমত হিসাবে আলোচ্য আয়াতের উক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। কারণ সাহাবা এবং তাবিঈ মুফাস্‌সিরগণ সকলেই একমত যে, আলোচ্য আয়াতে صراط-এর অর্থ তা নয় যা পূর্ববর্তী ব্যক্তি বলেছেন। পক্ষান্তরে اياك نستعين -এর শিক্ষা হল ইবাদতের জন্য বান্দা কর্তৃক আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া। এমনিভাবে اهدنا-এর শিক্ষা হল ভবিষ্যৎ জীবনে হিদায়েতের উপর অটল থাকার জন্য স্বীয় মা'বূদ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। আরবী ভাষায় هداية শব্দটি কোথাও নিজেই متعدى বা সকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন هديت كذا الطريق কোথাও শব্দটি الى-এর সঙ্গে متعدى বা সকর্মক ক্রিয়ারূপে

১৪—

ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন هدیته الی الطریق আবার কোথাও শব্দটি লাম-এর দ্বারা متعدی হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন هدیته الطریق এরূপ ব্যবহার বিধি কুরআনেও বিদ্যমান রয়েছে, ইরশাদ হয়েছে, و قالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا (এবং তারা বলবে, প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ্‌র)—যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন)। তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, اجتباه و هداه الی صراط مستقیم (আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথের দিকে)। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, اهدنا الصراط المستقیم (আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন)। অনুরূপ ব্যবহার রীতি আরবী ভাষায় ব্যাপক এবং আরবী ভাষার সর্বত্রই বিদ্যমান। অনেক কবি বলেছেন,

استغفر الله ذنبا لست محصیه — رب العباد الیه الوجه و العمل -

এখানে استغفر الله ذنبا-এর অর্থ হল استغفر الله لذنب যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, واستغفر لذنبك (তুমি তোমার গুনাহ্‌র জন্য ক্ষমা চাও)। অনুরূপ যিবরান গোত্রের নাবিগাহ নাম্নী মহিলা কবি বলেছেন

فیصدنا العیر المدل بحضره — قبل الونی و الاشعب النباحا -

এখানে فیصدنا-এর অর্থ হচ্ছে فیصد لنا মোটকথা আরবী গদ্যে ও পদ্যে এ ধরনের বাকরীতি অসংখ্য ও অগণিত। অনুধাবনের জন্য আমার পেশকৃত উদাহরণগুলোই যথেষ্ট।

الصراط المستقیم -এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এই ব্যাপারে সমস্ত তাফসীরকারগণ একমত যে, الصراط المستقیم এর অর্থ হলো, সেই সরল, সঠিক ও সুস্পষ্ট পথ, যার কোন অংশই বাঁকা নয়। আরবী অভিধানেও শব্দ দুটোর অর্থ তাই। এ প্রসংগে কবি জারীর ইব্‌ন আতিয়্যা আল-খাতফী বলেছেন,

امیر المؤمنین علی صراط — اذا اعوج الموارد مستقیم -

এখানে علی صراط مستقیم এর অর্থ علی طریق الحق-এর দ্বারা সত্য পথ বুঝানো হয়েছে। যুওয়াইবের পিতা হুযালী অনুরূপ বলেছেন,

صبحنا ارضهم بالخیل حتی — ترکناها ادق من الصراط -

এমনিভাবে কবি রাজিয এর কথাও বলা যেতে পারে। কবি বলেছেন, فصد عن نهج الصراط القاصد

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, صراط مستقیم-এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পূর্বে আমি যে

মতামত উল্লেখ করেছি—এ সম্পর্কে অসংখ্য ও অগণিত প্রমাণাদি আমার নিকট রয়েছে। তবে উল্লিখিত প্রমাণাদিই সুধী ও পাঠকদের জন্য যথেষ্ট। রূপক অর্থে الصراط-এর ব্যবহার আরবদের ব্যবহার পদ্ধতিতে কথা এবং কাজের উপরও হয়ে থাকে। আবার صراط-এর বিশেষণ কখনো 'সোজা' হয় এবং কখনো 'বাঁকা' হয়। তবে আমার নিকট اهدنا الصراط المستقيم-এর সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এমন কাজে সাহায্য করুন, তওফীক দিন, যা আপনার পছন্দীয় এবং যে কাজ ও কথার ব্যাপারে আপনি তওফীক দিয়েছেন আপনার অনুগৃহীত বান্দাদেরকে। এটাই সিরাতে মুসতাকীম। কেননা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ প্রকৃতির লোকদেরকে যে কাজের জন্য তওফীক দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাকে তওফীক দেয়া হল ইসলাম ও রসূলগণের সত্যতা সর্বতোভাবে স্বীকার করার জন্য, আল-কুরআনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করার জন্য, আল্লাহ্র নির্দেশাবলী নতশিরে মেনে চলার জন্য, আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকার জন্য, এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর চার খলীফা—আবু বাক্র, উমার, 'উছমান ও 'আলী—এবং আল্লাহ্র সমস্ত সৎ বান্দাদের পথে চলার জন্য। বস্তুতঃ এ সবের প্রত্যেকটিই হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম। সিরাতে মুস্তাকীম সম্পর্কে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মুফাসসিরদের বহু ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়ে আসছে। তবে আমার উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি সবগুলোকেই বুঝায়।

صراط مستقيم সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো নিম্নরূপঃ

হযরত আলী (রা) বলেছেন, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করত বলেছেন যে, এটাই সিরাতে মুসতাকীম।

হযরত আলী (রা) বলেছেন, আল-কুরআনই হ'ল সিরাতে মুসতাকীম।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, সিরাতে মুসতাকীম হ'ল আল্লাহ্র কিতাব।

হযরত জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, صراط مستقيم-এর ভাবার্থ হচ্ছে ইসলাম যা আকাশ ও পৃথিবী এবং এ-দুয়ের মধ্যবর্তী সমুদয় বস্তু হতে প্রশস্ততম।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, (একদা) হযরত জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! বলুন اهدنا الصراط المستقيم (আমাদেরকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন) এবং তা-হ'ল আল্লাহ্র দীন যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আল্লাহ্র বাণী اهدنا الصراط المستقيم—এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হচ্ছে ইসলাম।

ইব্নুল হানাফিয়্যা (র) আল্লাহ্র বাণী اهدنا الصراط المستقيم সম্পর্কে বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ্র ঐ দীন যা ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) সহ আরো কতিপয় সাহাবীর মতে اهدنا الصراط المستقيم-এর অর্থ ইসলাম।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে صراط مستقيم হল (সত্য ও শাশ্বত) পথ।

হযরত আবুল আলিয়ার মতে صراط مستقيم হ'ল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী দুইজন খলীফা অর্থাৎ হযরত আবু বাক্র ও উমার (রা)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই হাদীস হযরত হাসান (রা)-এর নিকট পেশ করার পর তিনি বলেছেন, আলিয়া সত্য ও সঠিক বলেছে।

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে যায়দ ইব্‌নে আসলামের মতে صراط مستقيم হচ্ছে ইসলাম।

নাওয়াস ইব্‌নে সামআন আল আনসারী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ضرب الله مثلا صراط مستقيما আল্লাহু তাআলা صراط مستقيم -এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, আর সিরাত হচ্ছে ইসলাম।

নাওয়াস ইব্‌নে সামআন আনসারী (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ আর একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, الصراط المستقيم যেহেতু সহজ, সরল ও স্বচ্ছ পথ এবং এ পথে যেহেতু কোন ভ্রান্তি ও বক্রতা নেই, তাই আল্লাহ্ পাক উহার বিশেষণ হিসাবে مستقيم শব্দটিকে উল্লেখ করেছেন। কোন কোন স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন অবিবেকী তাফ্‌সীরকারের মতে এ পথ যেহেতু পথিককে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, তাই উহাকে صراط مستقيم বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাবারীর মতে এটা অন্যান্য তাফসীরকারদের ব্যাখ্যার পরিপন্থী। মুফাসসিরদের ঐক্যবদ্ধ ব্যাখ্যা প্রদান করাই এ ব্যাখ্যার ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين -

তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ—যারা ক্রোধ নিপতিত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, صراط الذين انعمت عليهم মূলতঃ সিরাতে মুস্‌তাকীমেরই ব্যাখ্যা। কেননা সমস্ত পথই সিরাতে মুস্‌তাকীমের অন্তর্ভুক্ত। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে : হে মুহাম্মাদ বলুন, হে আল্লাহ্, আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর—তাদের পথ যাদেরকে তুমি ইবাদত ও আনুগত্যের কারণে অনুগৃহিত করেছ। অর্থাৎ ফিরিশতা, নবী-রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক প্রকৃতির লোকদের পথ। আলোচ্য আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতেরই সাদৃশ্য :

و لو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم و اشد تثبيتا - و اذا لا تينا
هم من لدنا اجرا عظيما - و لهديناهم صراطا مستقيما - و من يطع الله و الرسول
فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين -

"তাদেরকে যা করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছিল যদি তারা তা করত তাহলে তাদের ভাল হত। এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত। এবং আমি নিশ্চয় তখন তাদেরকে প্রদান করতাম আমার নিকট হতে মহাপুরস্কার। এবং অবশ্যই পরিচালিত করতাম আমি তখন তাদেরকে সহজ ও সরল পথে। কেহ আল্লাহ্ এবং রসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ন—যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন—তাদের সঙ্গী হবে এবং কতই না উত্তম সঙ্গী তারা"—(সূরা নিসা : ৬৬)।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) মতে যে পথের হিদায়েত কামনা করার জন্য আল্লাহ্ পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাতদের নির্দেশ দিয়েছেন, তা হচ্ছে ঐ পথ-যার

গুণাগুণ আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে অবিচল দৃঢ় প্রত্যয়ী যে পথের যাত্রীদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। আমাদের উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী এ মর্মে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ অনেকের সূত্রে বিভিন্ন রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, صراط الذين انعمت عليهم-এর অর্থ হ'ল : হে আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে ঐ সব ফিরিশতা, নবী-রসূল, সিদ্দীক এবং সৎ লোকদের পথে পরিচালিত করুন—যাদেরকে আপনি আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের কারণে পুরস্কৃত করেছেন।

হযরত রবী (র) বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে নবীগণ।

হযরত ইবন আব্বাসের (র) মতে انعمت عليهم -এর অর্থ হচ্ছে মু'মিনগণ।

হযরত ওয়াকীর (র) মতে انعمت عليهم -এর অর্থ হচ্ছে মুসলমানগণ, হযরত আবদুর রহমান (রা) صراط الذين انعمت عليهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীগণ।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের আলোকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে আল্লাহর্ তওফীক এবং অনুগ্রহ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করা সম্ভব নয়। এ কারণেই হিদায়াত, ইবাদত এবং আনুগত্য প্রভৃতি বিষয়গুলোকে انعام من الله (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ)—এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, صراط الذين انعمت عليهم (তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগৃহিত করেছ)।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আলোচ্য বাক্যে منعم عليهم -এর বর্ণনা নেই এবং নেই এতে منعم به -এর কথাও, অথচ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে انعمت عليك বলেন তাহলে সাথে সাথে তাকে منعم به কি তাও বলে দিতে হয়, এ কথা সর্বজন বিদিত। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক কেন منعم عليهم এবং منعم به-এর কথা বর্জন করে অসম্পূর্ণ ভাবে বলে দিলেন صراط الذين انعمت عليهم যা انعام ও تفهيم -এর ক্ষেত্রে অতীব দুর্বোধ্য ?

উত্তর : এই গ্রন্থে একটু পূর্বেই আরবদের পারস্পরিক বাকরীতি সম্পর্কে আমি আলোকপাত করেছি যে, যদি কোন বক্তব্যের কথিত অংশ অকথিত অংশকে বোধগম্য করে দেয় এবং অকথিত অংশের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, তখন আরবগণ বক্তব্যকে সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে ঐ অংশটুকুকে স্বাভাবিক ভাবে যথেষ্ট মনে করেন। আল্লাহ্‌র বাণী صراط الذين انعمت عليهم -এর বেলায়ও তাই হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর নিকট সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়েত কামনা করার নির্দেশের বিষয়টি যেহেতু صراط الذين انعمت عليهم -এর পূর্বে আলোচিত হয়েছে, যা صراط مستقيم -এরই ব্যাখ্যা এবং بدل হয়েছে—তাই এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ নেয়ামতগুলি (যার দ্বারা তিনি তাঁর ঐ সমস্ত বান্দাদেরকে অনুগ্রহিত করেছেন যাদেরকে তিনি তার নিকট সঠিক পথ প্রদর্শন করার প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন) হচ্ছে المنهاج القويم (দৃঢ় পথ) এবং الصراط المستقيم (সরল পথ) যার সম্বন্ধে আমি সবেমাত্র আলোচনা করেছি। সুতরাং উক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, বাক্যদ্বয়ের পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্কের কারণে

উক্ত বিষয়টির পুনরাবৃত্তি একান্তই নিষ্প্রয়োজন। যেমন যুবয়ান গোত্রের নাবিগা নাম্মী এক মহিলা কবি বলেছেন,

كأنك من جمل بني أقيش – يقعقع خلف رجليه بشن –

উক্ত কবিতার দ্বিতীয় চরণে একটি جمل শব্দ উহ্য আছে। মূলতঃ ইবারত হ'ল নিম্নরূপ। :

كأنك من جمال بني اقيش — جمل يقعقع خلف رجليه بشن –

কিন্তু প্রথম চরণে উদ্ধৃত جمال শব্দটি যেহেতু দ্বিতীয় চরণে উহ্য جمل শব্দটিকে বুঝায়, তাই কবি উক্ত শব্দটির উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করে তা বর্জন করেছেন।
অনুরূপভাবে ফারাযদাক ইবনে গালিব বলেন,

ترى ارباقهم متقلد يها – اذا صدى الجديد على الكماة –

এখানে কবিতার প্রথম চরণে متقلديها-এর পর هم সর্বনামটি উহ্য আছে, কিন্তু ارباقهم-এর هم সর্বনামটি যেহেতু পরবর্তী সর্বনামটির নির্দেশনা করছে, তাই উহাকে متقلديها-এর থেকে লোপ করে দেয়া হয়েছে। আরবী গদ্যে ও পদ্যে এর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। صراط الذين أنعمت عليهم-এর মাঝে এ রীতিরই প্রকাশ ঘটেছে, সুতরাং প্রশ্নকারীর এহেন প্রশ্ন কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

غير المغضوب عليهم-এর ব্যাখ্যা।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, غير (গায়র) শব্দটিকে 'যের' দিয়ে পড়ার ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ সকলেই একমত। 'ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র)-এর মতে এর কারণ দুটো :

এক : غير শব্দটি الذين-এর বিশেষণ পদ এবং الذين যেহেতু جرى حالت-তে অবস্থিত তাই غير শব্দের মাঝেও "যের" হওয়াই সমীচীন। যাতে صفت ও موصوف-এর মাঝে সামঞ্জস্য বাকী থাকে। তবে الذين – معرفت এবং غير – نكره হওয়া সত্ত্বেও غير শব্দটি الذين-এর বিশেষণ হতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা الذين-এর صله সহ যায়দ, আমর প্রভৃতি নামসমূহের মত معرفة موقتة নয়, বরং এ হচ্ছে نكره مجهولة তথা العمر – الرجل প্রভৃতি শব্দসমূহের ন্যায়। অধিকন্তু غير وقتة معرفة হওয়ার ব্যাপারে اسماء مجهولة-এর দিকে غير – منسوب শব্দও যেহেতু الذين-এর ন্যায়—তাই غير-কে الذين-এর صفت বা বিশেষণ বলা যায়। যেমনিভাবে لا اجلس الا الى العالم غير الجاهل (আল-আলিম ব্যতীত কোন জাহিলের সাথে বসবেন না) জায়েয হল বলা, যার অর্থ হচ্ছে لا اجلس الا الى من يعلم لا الى من يجهل। পক্ষান্তরে الذين যদি معرفة موقتة হ'ত তাহলে غير المغضوب عليهم কে কস্মিনকালেও উহার صفت বানানো ঠিক হ'ত না। কারণ معرفة موقتة-এর صفت যদি نكره লওয়া হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে ঐ نكره-এর মধ্যেও معرفة موقتة-এর اعراب। সংযোজন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, অথচ এ বিষয়টি আরবী ভাষার রীতির সম্পূর্ণ

পরিপন্থী। তবে تكرير عامل-এর পদ্ধতিতে نكره তেও معرفه-এর হরকত হতে পারে এতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন বলা হয় مررت بعبد الله غير العالم এখানে غير এ-اعتبار এর تكرير باء শব্দে যের দেয়া হয়েছে যা যের দিয়েছে عبد الله -তে। এ-হিসাবে উপরোক্ত বাক্যের মূল রূপটি হ'ল مررت بعبد الله مررت بغير العالم। এটা হচ্ছে غير المغضوب عليهم এ-غير এ 'যের' দেয়ার দুই কারণের একটি কারণ।

দুই: غير-কে যের দেয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, উপরোক্ত আয়াতে الذين শব্দটি معرفه غير موقتة -এর অর্থে নয়, বরং معرفة موقتة এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং الصراط শব্দটি বারবার উল্লেখ করায় غير শব্দটিতে যের হয়েছে যে صراط-এর اضافت-এর ফলে পূর্বোল্লিখিত الذين — حالت جرى-তে পতিত হয়েছে। এই হিসাবে আয়াতের মূলরূপ হবে صراط الذين انعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, غير المغضوب عليهم -এর উপরোক্ত ব্যাকরণগত ব্যাখ্যাদ্বয়ে হরকত ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদিও বিভিন্নতা রয়েছে কিন্তু অর্থের দিক থেকে এ দুয়ের মাঝে যথেষ্ট মিল রয়েছে। কেননা যাকে আল্লাহ্ পাক রহমত করেছেন তাকে নিশ্চয়ই তিনি দীনে হকের হিদায়েত দান করেছেন। ফলে সে আপন প্রতিপালকের গযব হতে নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং মুক্তি লাভ করেছে ধর্মীয় ব্যাপারে গোমরাহী থেকে। সুতরাং যখন কোন শ্রবণকারী তেলাওয়াতকারীর মুখে اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم শুনতে পায় তখন শ্রবণকারীর জন্য এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না যে, সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়েত প্রদান করতঃ আল্লাহ্ পাক যাদেরকে নিআমত দান করেছেন তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট নন। এবং মহান রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে তারা যেহেতু দীনে হকের সন্ধান পেয়েছেন তাই তাঁরা পথভ্রষ্টও নন। কেননা একই মুহূর্তে একই ব্যক্তির মাঝে হিদায়েত এবং গোমরাহী, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির সমন্বয় ঘটা একেবারেই অসম্ভব এবং অবান্তর। তাই আল্লাহ্র বর্ণিত গুণাবলী তথা আল্লাহ পাকের দেওয়া তওফীক হিদায়েত এবং غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলে দীনের ব্যাপারে তিনি যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন এর বিবরণ থাকুক অথবা না থাকুক। কেননা যেসব বাহ্যিক গুণাবলীর দ্বারা তাদেরকে গুণান্বিত করা হয়েছে, যদি তা উল্লেখ নাও করা হত, তাহলেও তাদের মতে দৃশ্যমান গুণাবলীই সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রকাশ করে দিত যে, তারা মূলত এমনই। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, غير শব্দ مجرور হওয়া সম্পর্কে প্রদত্ত ব্যাখ্যা মূলত الصراط تكرير-এর ভিত্তিতেই প্রদান করা হয়েছে; যা الذين (صراط) -কেও جر দিয়েছে। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে غير-কে الذين-এর বিশেষণ বানানো আমার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, বরং এ সময় غير المغضوب عليهم-এর দ্বারা الذين انعمت عليهم এর বিপরীত অর্থ বুঝানোই আমার উদ্দেশ্য। যদিও উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে পুরস্কৃত হবেন আল্লাহ্রই পক্ষ হতে। প্রকৃত পক্ষে যখন আমরা غير শব্দটিকে الذين এর বিশেষণ নির্ধারণ করব, তখন سامع-এর নিকট এ বিষয়ে প্রমাণাদি পেশ করা একান্ত ভাবে অপরিহার্য। যদিও আয়াতের বাহ্যিক অর্থ سامع-কে এ বিষয়টি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেয়। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, غير المغضوب عليهم -এর غير-কে যবরের সঙ্গে পড়াও জায়েয—যদিও কিরাআত বিশেষজ্ঞদের প্রচলিত পঠনরীতি হতে ব্যতিক্রমধর্মী হওয়ার ফলে তোমাদের নিকট উক্ত কিরাআত পছন্দনীয় নয়।

উক্ত বিষয়টির পুনরাবৃত্তি একান্তই নিষ্প্রয়োজন। যেমন যুবয়ান গোত্রের নাবিগা নাম্নী এক মহিলা কবি বলেছেন,

كأنك من جمال بني أقيش — يقعقع خلف رجليه بشن -

উক্ত কবিতার দ্বিতীয় চরণে একটি جمل শব্দ উহ্য আছে। মূলতঃ ইবারত হ'ল নিম্নরূপ। :

كأنك من جمال بني اقيش — جمل يقعقع خلف رجليه بشن -

কিন্তু প্রথম চরণে উদ্ধৃত جمال শব্দটি যেহেতু দ্বিতীয় চরণে উহ্য جمل শব্দটিকে বুঝায়, তাই কবি উক্ত শব্দটির উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করে তা বর্জন করেছেন।
অনুরূপভাবে ফারাযদাক ইবন গালিব বলেন,

ترى ارباقهم متقلديها — اذا صدى الحديد على المكماة -

এখানে কবিতার প্রথম চরণে متقلديها-এর পর هم সর্বনামটি উহ্য আছে, কিন্তু ارباقهم -এর هم সর্বনামটি যেহেতু পরবর্তী সর্বনামটির নির্দেশনা করছে, তাই উহাকে متقلديها -এর থেকে লোপ করে দেয়া হয়েছে। আরবী গদ্যে ও পদ্যে এর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। صراط الذين أنعمت عليهم -এর মাঝে এ রীতিরই প্রকাশ ঘটেছে, সুতরাং প্রশ্নকারীর এহেন প্রশ্ন কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

غير المغضوب عليهم-এর ব্যাখ্যা।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, غير (গায়র) শব্দটিকে 'যের' দিয়ে পড়ার ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ সকলেই একমত। 'ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র)-এর মতে এর কারণ দুটো :

এক : غير শব্দটি الذين-এর বিশেষণ পদ এবং الذين যেহেতু جرى حالت-তে অবস্থিত তাই غير শব্দের মাঝেও "যের" হওয়াই সমীচীন। যাতে صفت ও موصوف-এর মাঝে সামঞ্জস্য বাকী থাকে। তবে الذين — معرفة এবং غير — نكره হওয়া সত্ত্বেও غير শব্দটি الذين-এর বিশেষণ হতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা الذين-এর صله সহ যায়দ, আমর প্রভৃতি নামসমূহের মত معرفة موقتة নয়, বরং এ হচ্ছে نكره مجهولة তথা الرجل — البعير প্রভৃতি শব্দসমূহের ন্যায়। অধিকন্তু غير وقتة معرفة হওয়ার ব্যাপারে اسماء مجهولة-এর দিকে منسوب — غير শব্দও যেহেতু الذين-এর ন্যায়—তাই غير-কে الذين-এর صفت বা বিশেষণ বলা যায়। যেমনিভাবে لااجلس الا الى عالم غير الجاهل (আল-আলিম ব্যতীত কোন জাহিলের সাথে বসবেন না) জায়েয হল বলা, যার অর্থ হচ্ছে لا اجلس الا الى من يعلم لا الى من يجهل। পক্ষান্তরে الذين যদি معرفة موقتة হ'ত তাহলে غير المغضوب عليهم কে কস্মিনকালেও উহার صفت বানানো ঠিক হ'ত না। কারণ معرفة موقتة-এর صفت যদি نكره লওয়া হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে ঐ نكره-এর মধ্যেও معرفة-এর اعراب সংযোজন করা অপরিহার্য হয়ে দাড়ায়, অথচ এ বিষয়টি আরবী ভাষার রীতির সম্পূর্ণ

পরিপন্থী। তবে تكرير عامل-এর পদ্ধতিতে نكره তেও معرفه-এর হরকত হতে পারে এতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন বলা হয় مررت بعبد الله غير العالم এখানে غير এ-এতেবার এর تكرير باء শব্দে যের দেয়া হয়েছে যা যের দিয়েছে عبد الله -তে। এ-হিসাবে উপরোক্ত বাক্যের মূল রূপটি হ'ল مررت بعبد الله مررت بغير العالم। এটা হচ্ছে غير المغضوب عليهم-এ 'যের' দেয়ার দুই কারণের একটি কারণ।

দুই: غير-কে যের দেয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, উপরোক্ত আয়াতে الذين শব্দটি معرفه موقتة غير-এর অর্থে নয়, বরং معرفه موقتة غير-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং الصراط শব্দটি বারবার উল্লেখ করায় غير শব্দটিতে যের হয়েছে যে صراط-এর اضافت-এর ফলে পূর্বোল্লিখিত الذين — حالت جرى-তে পতিত হয়েছে। এই হিসাবে আয়াতের মূলরূপ হবে صراط الذين انعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, غير المغضوب عليهم -এর উপরোক্ত ব্যাকরণগত ব্যাখ্যাদ্বয়ে হরকত ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদিও বিভিন্নতা রয়েছে কিন্তু অর্থের দিক থেকে এ দুয়ের মাঝে যথেষ্ট মিল রয়েছে। কেননা যাকে আল্লাহ্ পাক রহমত করেছেন তাকে নিশ্চয়ই তিনি দীনে হকের হিদায়েত দান করেছেন। ফলে সে আপন প্রতিপালকের গযব হতে নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং মুক্তি লাভ করেছে ধর্মীয় ব্যাপারে গোমরাহী থেকে। সুতরাং যখন কোন শ্রবণকারী তেলাওয়াতকারীর মুখে اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم শুনতে পায় তখন শ্রবণকারীর জন্য এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না যে, সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়েত প্রদান করতঃ আল্লাহ্ পাক যাদেরকে নিআমত দান করেছেন তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট নন। এবং মহান রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে তাঁরা যেহেতু দীনে হকের সন্ধান পেয়েছেন তাই তাঁরা পথভ্রষ্টও নন। কেননা একই মুহূর্তে একই ব্যক্তির মাঝে হিদায়েত এবং গোমরাহী, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির সমন্বয় ঘটা একেবারেই অসম্ভব এবং অবান্তর। তাই আল্লাহ্র বর্ণিত গুণাবলী তথা আল্লাহ পাকের দেওয়া তওফীক হিদায়েত এবং غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলে দীনের ব্যাপারে তিনি যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন এর বিবরণ থাকুক অথবা না থাকুক। কেননা যেসব বাহ্যিক গুণাবলীর দ্বারা তাদেরকে গুণান্বিত করা হয়েছে, যদি তা উল্লেখ নাও করা হত, তাহলেও তাদের মতে দৃশ্যমান গুণাবলীই সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রকাশ করে দিত যে, তারা মূলত এমনই। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, غير শব্দ مجرور হওয়া সম্পর্কে প্রদত্ত ব্যাখ্যা মূলত الصراط تكرير-এর ভিত্তিতেই প্রদান করা হয়েছে; যা الذين (صراط) -কেও جر দিয়েছে। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে غير-কে الذين -এর বিশেষণ বানানো আমার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, বরং এ সময় غير المغضوب عليهم-এর দ্বারা الذين انعمت عليهم এর বিপরীত অর্থ বুঝানোই আমার উদ্দেশ্য। যদিও উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে পুরস্কৃত হবেন আল্লাহ্রই পক্ষ হতে। প্রকৃত পক্ষে যখন আমরা غير শব্দটিকে الذين এর বিশেষণ নির্ধারণ করব, তখন سامع-এর নিকট এ বিষয়ে প্রমাণাদি পেশ করা একান্ত ভাবে অপরিহার্য। যদিও আয়াতের বাহ্যিক অর্থ سامع-কে এ বিষয়টি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেয়। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, غير المغضوب عليهم -এর غير-কে যবরের সঙ্গে পড়াও জায়েয—যদিও কিরাআত বিশেষজ্ঞদের প্রচলিত পঠনরীতি হতে ব্যতিক্রমধর্মী হওয়ার ফলে তোমাদের নিকট উক্ত কিরাআত পছন্দনীয় নয়।

غير শব্দটিতে যবর ব্যবহার করার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, শব্দটি যবর বিশিষ্ট হওয়ার অবস্থায় عليهم-এর 'هم' সর্বনামের صفت হবে যার الذين-এর সাথে সম্পর্কিত। উল্লেখ্য, غير শব্দটি প্রকাশে যদিও 'على' — حرف جار-এর مجرور কিন্তু পক্ষান্তরে তা النعمت-এর مفعول এই হিসাবে আয়াতের মূল عبارت হবে নিম্নরূপ,

صراط الذين هد يتهم انعاما منك عليهم غير المغضوب عليهم اى لا مغضوبا عليهم و لا الضالين -

অর্থাৎ যাদেরকে অনুগ্রহ করে তুমি পথ প্রদর্শন করেছ তাদের পথ, যারা অভিশপ্ত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়। উপরোক্ত আয়াতে غير কে যবর দিয়ে পড়ার বিষয়টি مررت بعبد الله غير الكريم و لا الرشيد বাক্যের ন্যায়। এখানে غير الكريم শব্দটি عبد الله থেকে বিচ্ছিন্ন। কেননা عبد الله হচ্ছে معرفة এবং غير الكريم হচ্ছে نكره مجهولة বসরাপন্থী ব্যাকরণবিদগণ বলেছেন যে, যারা غير المغضوب عليهم-এর غير-কে যবর দিয়ে পাঠ করেন তারা মূলত : উহাকে حرف استثناء মনে করেই এ ধরনের তিলাওয়াত করেন। তাঁদের মতে مستثنى منه হচ্ছে الذين انعمت عليهم দ্বারা যাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে তাঁরা। এমতানুসারে আয়াতের অর্থ হচ্ছে,

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الا المغضوب عليهم الذين لم تنعم عليهم في اد يانهم و لم تهدهم للحق فلا تجعلنا منهم -

অর্থাৎ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাঁদের পথ যাঁদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু যারা অভিশপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট, যারা আপনার অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত—অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করবেন না। যেমন যুবেয়ান গোত্রের কবি নাবিগা বলেছেন,

و قفت فيها اصيلا لا اسائلها — اعيت جوابا و ما بالربع من احد -

الا اوارى لا يا ما ابينها — و النؤى كالحوض بالمظلو مة الجلد -

এখানে الا اوارى শব্দটি احد-এর সমতুল্য নয়, এতদসত্ত্বেও উহাকে যেমনি ভাবে احد থেকে استثناء করা হয়েছে তেমনি ভাবেই استثناء করা হয়েছে غير المغضوب عليهم-কে الذين انعمت عليهم থেকে' যদিও ধর্মের ক্ষেত্রে এক আদর্শের অনুসারী নয় তারা।

কুফাবাসী-আরবী ব্যাকরণবিদগণ উক্ত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে উহাকে ভুল বলে মতামত প্রকাশ করেছেন এবং মনে করেছেন যে. যদি বসরার ব্যাকরণবিদগণের মতামত সঠিক হয়, তাহলে ولا الضالين বলা অবশ্যই ভুল হবে, কারণ لا অব্যয়টি হচ্ছে না বাচক। আর আরবী ভাষার নিয়মানুসারে না বাচক বস্তুকে না বাচক বস্তুর উপরই عطف করতে হয়। এ পর্যায়ে তারা আরবী ভাষার প্রয়োগ বিধির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, অদ্যাবধি আরবী ভাষায় এমন استثناء-এর সন্ধান আমরা পাইনি যাকে না

বাচক বস্তুর উপর عطف করা হয়েছে। আমরা তো শুধু استثناء-কে اسماء-এর উপর এবং نفى-কে نفى-এর উপর عطف করার বিধানই পেয়েছি তাদের নিকট। তাই তো তারা استثناء-এর ক্ষেত্রে বলেন, ما قام اخوك و لا ابوك এবং نفى-এর অবস্থায় বলেন, قام القوم الا اخاك و الا اباك কিন্তু الا القوم الا اباك ولا اخاك-এর ব্যবহার আরবী ভাষায় কোথাও নেই এবং এ ধরনের ব্যবহার বিধি কোথাও আমাদের পরিলক্ষিত হয়নি। কুফার ব্যাকরণবিদগণ বলেন, এরূপ ব্যবহার রীতি যেহেতু আরবী ভাষায় কোথাও নেই এবং কুরআন যেহেতু বিশুদ্ধতম আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, তাই বুঝা যাচ্ছে যে, ولا الضالين-এর معطوف عليه — غير المغضوب عليهم-এর غير শব্দটি মূলতঃ حرف استثناء নয়, বরং এটা হচ্ছে حرف نفى এতদসত্ত্বেও উহাকে حرف استثناء বলা চরম বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। غير المغضوب عليهم-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা এর اعراب-এর বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে গৃহীত হয়েছে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, اعراب-এর বিভিন্নতার উপর আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা নির্ভরশীল হওয়ার দরুন আলোচ্য গ্রন্থে আয়াতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মূলে প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া সত্ত্বেও আমি اعراب-এর বিভিন্ন প্রেক্ষিত নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারনা করেছি। যাতে তাফসীর পাঠকের নিকট কিরাআত ও اعراب-এর বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাও সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে যায়। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে আলোচ্য আয়াতের সঠিক কিরাআত এবং বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হচ্ছে প্রথমটি। অর্থাৎ غير المغضوب عليهم এর غير-এর راء-এ যের দিয়ে উহাকে الذين انعمت عليهم-এর صفت বা বিশেষণ সাব্যস্ত করা, তবে صراط-এর পুনঃপৌণিকতার প্রক্রিয়ায় غير-এর راء-এ যের দেওয়াও সঠিক। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ঐ সমস্ত লোক কারা যাদের দলভুক্ত না করার প্রার্থনা করার জন্য—আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন?

উত্তর: তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের পরিচয় তুলে ধরে কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন,

قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت اولئك شر مكانا و اضل عن سواء السبيل -

"বল, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিব যা আল্লাহ্‌র নিকট আছে? যাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকরে রূপান্তর করেছেন এবং যারা তাগূতের (আল্লাহ্ বিরোধী শক্তির) ইবাদত করে—মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত—" (সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৬০)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাদের প্রতি আপতিত শাস্তির কথা জানিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অনুগ্রহ করে এই নির্মম পরিণতি থেকে মুক্তির পথ কি তাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন যে,—কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ পাক যাদের পরিচিতি এবং সংবাদকে এভাবে চিত্রিত করে তুলে ধরেছেন, তারাই যে ঐ সমস্ত লোক এ কথার প্রমাণ কি ?

উত্তর ঃ ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে নিম্নের হাদীসগুলো সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ المغضوب عليهم বলে য়াহূদী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, المغضوب عليهم-এর ভাবার্থ হচ্ছে য়াহূদী সম্প্রদায়।

হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে غير المغضوب عليهم-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এরা হচ্ছে য়াহূদী সম্প্রদায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (রা) বলেন, ওয়াদীউল কুরা অবরোধকালে এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এরা কারা যাদেরকে আপনি অবরোধ করছেন ? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এরা হচ্ছে অভিশপ্ত য়াহূদী সম্প্রদায়।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি প্রশ্ন করার পর তিনি অনুরূপ আলোচনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক থেকে বর্ণিত আছে যে, বনু কাইনের এক ব্যক্তি ওয়াদীউল কুরায় অশ্বারোহী অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এরা কারা ? উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম المغضوب عليهم বলে য়াহূদী সম্প্রদায়ের প্রতিই ইংগিত করলেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

غير المغضوب عليهم সম্বন্ধে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তারা হচ্ছে য়াহূদী সম্প্রদায় যাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত।

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সহ কতিপয় সাহাবী غير المغضوب عليهم সম্পর্কে বলেন, তারা হচ্ছে য়াহূদী সম্প্রদায়।

মুজাহিদ বলেন ঃ غير المغضوب عليهم তথা ক্রোধ নিপতিত অভিশপ্ত দলটি হল য়াহূদী সম্প্রদায়।

রবী বলেন, غير المغضوب عليهم হল য়াহূদী সম্প্রদায়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, غير المغضوب عليهم-এর জামাত হল য়াহূদী সম্প্রদায়।

ইব্‌ন যায়দ (রা) বলেন, غير المغضوب عليهم-এর দলটি হল য়াহূদী জামাত।

ইব্‌নে যায়দ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, المغضوب عليهم হচ্ছে য়াহূদী গোষ্ঠী।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের ক্রোধের ধরন কি? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ হল, ঐ ব্যক্তির প্রতি তার শাস্তিকে অবধারিত করে দেওয়া। চাই তা দুনিয়াতে হোক বা আখিরাতে হোক, যেমন আল-কুরআনে বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقنا هم اجمعين

"যখন তারা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না তখন আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সকলকে"—(সূরা যুখ্‌রুফ, আয়াত নং ৫৫)।

কেউ কেউ বলেন, মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের প্রতি এবং তাদের কর্মের প্রতি ভৎর্সনা করা এবং তাদের তিরস্কার করা।

আবার কারো কারো মতে আল্লাহ্‌র ক্রোধান্বিত হওয়া এমন একটি বিষয় যা গজব হতে বোধগম্য হয়। তবে এ গুণটি আল্লাহ্‌র জন্য একটি ذاتى। (স্থায়ী) গুণ। ফলে আল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং মানুষের ক্রোধের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কারণ ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষ চঞ্চলমতি ও অস্থির হয়ে যায় এবং এতে সে অনুভব করে বহু কষ্ট ও বহু ব্যথা। কিন্তু আল্লাহ্ পাক এসব অবস্থার উর্ধে, কোন বিপর্যয়ই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তবে এ হল আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ صفت (গুণ)— যেমন علم ও قدرة আল্লাহ্‌র الباقى صفت (স্থায়ী গুণ)। যদিও এসব গুণাবলীতে আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। কারণ বান্দার জ্ঞান তার অন্তরের অনুভূতি ও শক্তির অন্তর্ভুক্ত যা ক্রিয়া সংগঠিত হলে পাওয়া যায় এবং ক্রিয়া সংগঠিত না হলে পাওয়া যায় না।

ولا الضالين-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, কতিপয় বসরাপন্থী ব্যাকরণবিদের মতে الضالين-এর সাথে সংযুক্ত لا শব্দটি বাক্যের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অর্থগত দিক থেকে لا শব্দটি হল অতিরিক্ত। আরব কবি আজ্জাজের কবিতায়ও এর সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেছেন, فى بئر لا حور سرى و ما شعر মূলত ঃ কবিতার অর্থ হচ্ছে فى بئر حور سرى অর্থাৎ—সে ধ্বংসের কূপে পতিত হয়েছে, অথচ সে তা টের পায়নি—এখানে لا শব্দটি অতিরিক্ত, অনুরূপভাবে আরব কবি আবুন্ নাজ্‌ম বলেছেন,

فما الوم البيض ان لا تسخرا — لما رأين الشمط القفندرا -

এখানে لا تسخرا-এর لا শব্দটি হল অতিরিক্ত। মূল ঃ عبارت হবে فما الوم البيض ان تسخرا কবি আহ্‌ওয়াস বলেছেন,

و يلحيننى فى اللهو ان لا احبه — و للهو داع دائب غير غافل -

এখানেও ان لا احبه-এর لا শব্দটি হচ্ছে অতিরিক্ত। অনুরূপভাবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে, ما منعك ان لا تسجد আয়াতে বর্ণিত لا تسجد-এর لا শব্দটি হল অতিরিক্ত।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত মত পোষণকারী ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি المغضوب عليهم-এর সাথে সম্পৃক্ত غير সম্পর্কে বলেন যে, উক্ত শব্দটি হচ্ছে سوى শব্দের সমার্থবোধক। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে,

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الذين هم سوى المغضوب عليهم ولا الضالين -

কূফার কতিপয় আরবী ব্যাকরণবিদ مغضوب عليهم-এর সাথে সংযুক্ত غير শব্দটিকে سوى-এর সমার্থবোধক বলাকে পছন্দ করেন না। তাদের মতে বিষয়টি যদি তাই হয় তাহলে ولا الضالين-কে এর উপর عطف করা ঠিক হবে না। কারণ نفى এর দ্বারা نفى-এর উপরই عطف করা যায়, অন্যের উপর নয়। বিষয়টি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। সুতরাং যেমনিভাবে عندى سوى اخيك ولا ابيك বলা ভুল, এমনি ভাবে غير-কে سوى-এর অর্থে ধরে ولا الضالين-কেও এর উপর عطف করা ভুল। কেননা سوى শব্দটি حرف نفى-এর থেকে নয়। এরূপ ব্যবহার বিধি যেহেতু আরবী ভাষার নিয়ম বিরোধী এবং কুরআন যেহেতু সর্বাধিক বিশুদ্ধ ভাষায় নাযিল হয়েছে, তাই এতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, مغضوب عليهم-এর সাথে সম্পৃক্ত غير 'سوى'-এর অর্থে মনে করা নিতান্তই ভুল। কূফী ব্যাকরণবিদদের মতে শব্দটি এখানে نفى-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং غير শব্দটি نفى-এর অর্থে আরবী ভাষায় বহুল প্রচলিত। তাই আরব লোকেরা বলেন, اخوك غير محسن و لا مجمل-এর অর্থ হ'ল اخوك لا محسن ولا مجمل। কূফীদের মতে ابتداء (পূর্বে حرف نفى-এর উল্লেখ নেই এমন স্থানে) لا শব্দটি حذف (উহ্য)-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া ঠিক নয়। কারণ বাক্যের মাঝে دال على النفى (নেতিবাচকের প্রতি নির্দেশক) পূর্বে উল্লেখ থাকা ব্যতীত যদি لا শব্দটি حذف (উহ্য) অর্থে ব্যবহৃত হত তাহলে اردت ان لا اكرم اخاك-এর অর্থে ব্যবহৃত اردت ان اكرم اخاك বাক্যটি সঠিক হত। অথচ لا — ابتداء حذف-এর অর্থে ব্যবহৃত না হওয়ার ব্যাপারে—আরবী ভাষা শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত উক্ত মতামতের ভ্রান্তির উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে বিদ্যমান আছে। তবে বসরাপন্থী ব্যাকরণবিদদের দলীল আজ্জাজের কবিতা সম্পর্কে কূফীগণ বলেন যে, উক্ত কবিতাংশে لا শব্দটি نفى-এর অর্থ যথার্থই ব্যবহৃত হয়েছে এবং কবিতাংশের অর্থ হচ্ছে,

سرى فى بئر لا حور عليه خيرا ولا يتبين له فيها اثر عمل -

و هو لا يشعر بذلك ولا يدرى به

কবিতাংশে বিবৃত حور শব্দটি আরবদের কথিত বাক্য طحنت الطاحنة فما احارت شيئا اى لم ترجع থেকে উদ্গত। তাদের ভাষ্য মতে আবুন নাজমের কবিতা فما الوم البيض ان لا تسخرا -এ لا -حرف-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া বৈধ আছে। কেননা বাক্যের প্রথমাংশে نفى এর আলোচনা বিদ্ধৃতে আছে। তাই বাক্যের শেষাংশ প্রথমাংশের সাথে যুক্ত হবে। যেমন জনৈক কবি বলেছেন,

ما كان يرضى رسول الله فعلهم - و الطيبان ابو بكر ولا عمر -

বাক্যের প্রথমাংশে যেহেতু نفى-এর উল্লেখ আছে—তাই لا عمر-এর لا শব্দটি حرف-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া জায়েয আছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় অভিমত দুটির মধ্যে প্রথমটিই আমার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ আরবী ভাষার বাক্যের প্রথমাংশে نفى-এর উল্লেখ ব্যতীত لا শব্দটিকে حرف-এর অর্থে ব্যবহার করার বিধান কোথাও প্রচলিত নেই। অনুরূপভাবে উহাকে حرف استثناء-এর উপরও عطف করা জায়েয নেই। সাধারণতঃ غير শব্দটি আরবী ভাষায় তিন অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ

এক ঃ—استثناء দুই ঃ—نفى তিন ঃ—سوى

অতএব استثناء। যেহেতু لا — استثناء-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় না এবং مغضوب عليهم-এর সাথে সংযুক্ত غير-কেও استثناء-এর অর্থে ধরে এর উপর অন্যকে عطف করা যায় না এমনকি غير-কে سوى-এর অর্থে ধরেও যেহেতু এর উপর পরবর্তী বাক্যাংশের عطف জায়েয নেই, অথচ حرف عطف واو -এর মাধ্যমে لا অক্ষরটি عطف হয়েছে পূর্ববর্তী শব্দের উপর—তাই এতে বুঝা যাচ্ছে যে, مغضوب عليهم-এর সাথে সংযুক্ত غير শব্দটি এখানে একমাত্র نفى-এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং و لا الضالين — غير المغضوب عليهم-এর উপর عطف হয়েই ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লিখিত তথ্য মতে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই ঃ

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لا المغضوب عليهم و لا الضالين -

(আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদেরকে অনুগ্রহ দান করেছেন, যারা ক্রোধে নিপতিত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়)।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, ঐ সমস্ত পথভ্রষ্ট লোক কারা, যাদের পথকে গ্রহণ করে এবং চলে ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হওয়া থেকে বাচার জন্য—আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ?

উত্তর :—তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের পরিচিতি তুলে ধরে আল-কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন :

يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل -

"হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি কর না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর না"—(সূরা মায়িদা : ৭৭)।

প্রশ্ন :—এরাই যে পথভ্রষ্ট এ বিষয়ে তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি ?

উত্তর :—এ বিষয়ে নিম্নের রিওয়ায়েতগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় :

আদী ইবনে হাতিম (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ولا الضالين হ'ল খৃস্টান সম্প্রদায়।

আদী ইবন হাতিম (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন : নিশ্চয়ই الضالين (পথভ্রষ্ট মানুষগুলো) হচ্ছে খৃস্টান সম্প্রদায়।

আদী ইবনে হাতিম (রা) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর বাণী ولا الضالين সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল পর তিনি বলেন : النصارى هم الضالون খৃস্টান সম্প্রদায়ই হচ্ছে পথভ্রষ্ট।

আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াদিউল-কুরা অবরোধকালে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললেন, কারা ঐ গুমরাহ দলটি ? উত্তরে তিনি বললেন : এরা হচ্ছে খৃষ্টানদের জামাত।

আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ওয়াদিউল কুরায় অশ্বারোহী অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বনী কাইনের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! এরা কারা ? নবীজি বললেন : এ পথভ্রষ্ট দলটি হচ্ছে খৃস্টান সম্প্রদায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ولا الضالين-এর ব্যাখ্যায় বলতেন, و غير طريق النصارى الذين اضلهم الله بفريتهم عليه - (ঐ সমস্ত খৃস্টানদের পথ নয় যাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের মিথ্যাচারের ফলে)। অধিকন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আল্লাহর নিকট দুআ করে বলতেন,

اللهمنا دينك الحق - و هو لا اله الا الله و حده لا شريك لـه حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود - و لا تضلنا كما اضللت النصارى فتعذبنا بما تعذبهم به -

(হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি দীনে হকের ইলহাম করুন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই—এই পথে আমাদেরকে পরিচালিত করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ো না, যেমন ক্রোধান্বিত হয়েছ তুমি য়াহূদী সম্প্রদায়ের প্রতি এবং আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না, যেমন পথভ্রষ্ট করেছ তুমি খৃস্টান সম্প্রদায়কে। ফলে তাদের ন্যায় আমাদের প্রতিও তোমার শাস্তি আপতিত হবে)। তিনি আরো বলতেন, اعذنا من ذالك برفقك و رحمتك و قدرتك (হে আল্লাহ্! তোমার স্নেহ, করুণা ও ক্ষমতার দ্বারা আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত রাখুন)।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) الضالين তথা পথভ্রষ্ট দলটি খৃস্টান সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) সহ আরো কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, 'পথভ্রষ্ট দল' হচ্ছে খৃস্টান সম্প্রদায়।

হযরত রবী থেকে বর্ণিত আছে যে, الضالين-এর অর্থ হচ্ছে খৃস্টান সম্প্রদায়।

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ (রা) বলেন, الضالين (পথভ্রষ্ট)-এর অর্থ হচ্ছে খৃস্টান সম্প্রদায়।

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, الضالين-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে খৃস্টান সম্প্রদায়কে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, সরল পথ বর্জন করে ভ্রান্ত পথ অবলম্বনকারী প্রতিটি ব্যক্তিকেই আরবী ভাষায় ضال বা পথভ্রষ্ট বলা হয়। কারণ, সে পথভ্রষ্ট হয়েই এ কাজ করেছে। যেহেতু খৃস্টান সম্প্রদায়ও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এবং অবলম্বন করেছে ভ্রান্ত পথ—তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেছেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, য়াহূদী সম্প্রদায়ও কি পথভ্রষ্ট নয়?

উত্তর: হাঁ।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, খৃস্টানদেরকে বিশেষ করে পথভ্রষ্ট এবং য়াহূদীদেরকে কোপগ্রস্ত বলা হ'ল কেন?

উত্তর: উভয় সম্প্রদায়ই হচ্ছে ضلال (পথভ্রষ্ট) এবং مغضوب عليهم (অভিশপ্ত)। তবে আল্লাহ্ পাক মানুষের নিকট প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এমন একটি অবস্থাকেই তাদের বিশেষ নিদর্শন স্বরূপ বর্ণনা করেন, যার দ্বারা লোকেরা তাদের যথাযথ পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হবে—যখনই তাদের আলোচনা হবে কিংবা তাদের সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হবে। যদিও এর চেয়ে অধিক মন্দ স্বভাব তাদের মাঝে বিদ্যমান আছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিবেক বর্জিত কতিপয় লোক মনে করে যে, আয়াতাংশ ولا الضالين-এর মাঝে আল্লাহ্ পাক খৃস্টান সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ তারা নিজেরাই। তদুপরি এতে য়াহুদীদেরকে যেমনিভাবে তিনি কোপগ্রস্ত বলেছেন, তেমনিভাবে খৃস্টানদের مضلون (বিপথগামী) বলে অভিহিত না করে তাদেরকে তিনি বলেছেন الضالين (পথভ্রষ্ট)। এতে সুস্পষ্টভাবে ঐ কথাই বুঝা যাচ্ছে যা বলেছে তাদের মুর্খ ভ্রাতা কাদারিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা। অর্থাৎ তারা বলে, বান্দা নিজ ইচ্ছাধীন এবং মুক্ত ও স্বাধীন। সে নিজেই পছন্দ করে এবং নিজেই নিজের কাজ সম্পাদন করে। মূলতঃ আরবী ভাষার ব্যাপকতা এবং এতে বিভিন্ন প্রকারের বাগধারা সম্পর্কে তাদের অবগত না থাকার কারণে। যদি তাই হয় তার প্রত্যেক গুণী ব্যক্তির জন্য এমন একটি গুণ এবং প্রত্যেক সম্বন্ধ পদের জন্য এমন একটি ক্রিয়া পদ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যাতে ঐ সব গুণ বা ক্রিয়া প্রকাশের জন্য কোন কারণ থাকবে না। এ প্রেক্ষিতে সঠিক নিয়ম হল প্রতিটি বস্তু তার মূলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া। এ অপরিহার্যতা স্বীকার করে নেয়ার ফলে আরবী ভাষায় تحركت الشجرة (বাতাসে গাছ নাড়া দেয়া) এবং و اضطربت الارض (ভূমিকম্পে যমীন নাড়া দেয়া) বলে বক্তা যে বাক্য দুটো প্রয়োগ করে থাকে তা এবং অনুরূপ অন্যান্য বাক্য ভুল হিসাবে নিরূপিত হবে। অথচ উল্লিখিত বাক্যগুলোর শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আরব ভাষাবিদগণ সকলেই একমত। তদুপরি আল্লাহ্ পাকের বাণী حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم (এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলো আরোহী নিয়ে বয়ে চলে।) নৌকা অন্যের দ্বারা চালিত হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখিত আয়াতে এই চলার সম্পর্ক নৌকার দিকে করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে و لا الضالين দ্বারা খৃস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। যদি ও ضلالة (পথভ্রষ্ট)-এর সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে জড়িত। কাদরিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক ولا الضالين সম্বন্ধে প্রদত্ব ব্যাখ্যার ভ্রান্তির প্রতিই নির্দেশ করছে এবং "বান্দার কাজের মূল سبب হচ্ছেন আল্লাহ্ পাক এবং এর দ্বারাই তাদের কার্যাদি সম্পাদিত হয়" এ কথার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী সম্প্রদায়ের দাবীর বিশুদ্ধতার সমর্থনেই আল্লাহ পাক ضلالت-কে খৃস্টানদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেছেন বলে তারা যে দাবী আওড়াচ্ছে, এর অসারতার প্রতিও উক্ত আয়াতে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সর্বোপরি অসংখ্য এবং অগণিত আয়াতে মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পক্ষান্তরে হিদায়াত এবং গুমরাহীর চাবিকাঠি তাঁরই হাতে এবং তিনিই হচ্ছেন সুপথ প্রদর্শক ও পথভ্রষ্টকারী। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

افرأيت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه وقلبه
و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون -

(তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ? আল্লাহ্ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন এবং তার কর্ম ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখে দিয়েছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্‌র পর তাকে কে পথনির্দেশ করবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই মূলত হেদায়াত ও গোমরাহীর মালিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ اَفَرَاَيتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمعِه وَ قَلبِه وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِه غِشَاوَةً فَمَن يَّهدِيهِ من بَعدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ·(سوره الجاثية – ٢٣) "(তুমি কি লক্ষ্য করেছো তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজ মাবূদ বানিয়েছে, আল্লাহ্ জেনেশুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কান ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখে দিয়েছেন আবরণ, কাজেই আল্লাহ্র পথে কে তাকে পথনির্দেশ করবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (সূরা জাছিয়া ঃ ২৩)।

তবে মনে রাখতে হবে, কুরআন আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ, যেমন এ গ্রন্থের প্রথম দিকে আলোচনা করেছি। তাদের বাকপদ্ধতিতে অনেক সময় ক্রিয়াকে সেই ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, যার থেকে তা প্রকাশ পেয়েছে। আবার কখনও মূল কারণের সাথেও সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, যদিও তার প্রকাশ ঘটে ভিন্ন কারোর থেকে। এমতাবস্থায় বলুন তো, যে ক্রিয়া বান্দা স্বেচ্ছায় ও স্ব-ক্ষমতায় অর্জন করে এবং আল্লাহ্ তাআলা হন সে ক্রিয়ার অস্তিত্বদাতা ও সৃষ্টিকর্তা সে ক্ষেত্রে আপনার কি ধারণা ? বলাই বাহুল্য, সেথায় ক্রিয়াটিকে তার অর্জনকারীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা অধিক যুক্তিসংগত। আবার আল্লাহ্র সাথেও সম্বন্ধযুক্ত করা বিধেয়, যেহেতু তিনিই সে ক্রিয়ার অস্তিত্বদাতা এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন তাঁর সৃষ্টি।

কুরআন মজীদ সম্পর্কে ধর্মদ্রোহী সমালোচকদের একটি প্রশ্ন ঃ কেউ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে, আপনি তো এ গ্রন্থের শুরুতে বলেছেন যে, বর্ণনার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের ও সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাই, যা বিষয়বস্তুকে সর্বাধিক বিকশিত করে, বক্তার উদ্দেশ্যকে সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে এবং তা হয় শ্রোতার কাছে সহজবোধ্য। আরও বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলার বাণীই এরূপ স্তরের বর্ণনা হওয়ার অধিকারী, যেহেতু তা অন্যসব বাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বর্ণনার সর্বোচ্চ স্তরে তার অধিষ্ঠান। তাই যদি হয়, তাহলে (দৃষ্টান্তস্বরূপ) সূরা উম্মুল-কুরআন সাত আয়াতে প্রলম্বিত হওয়ার কারণ কি, যেখানে এর দু'টো আয়াতই সবগুলো আয়াতের অর্থ বহন করে ? আয়াত দু'টো হচ্ছে مٰلِكِ يَومِ الدِّينِ এবং اِيَّاكَ نَستَعِينُ কেননা যে আল্লাহ্ তাআলাকে বিচার দিবসের অধিকর্তা বলে জানে, সে তো তাঁকে সমুদয় উত্তম নাম ও মহৎ গুণাবলী সহকারেই জানে। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগত সে নিঃসন্দেহে তাঁর অনুগ্রহধন্য বান্দাদের পথাবলম্বী এবং অভিশপ্ত ও ভ্রষ্টদের পথ পরিহারকারী। তাহলে অবশিষ্ট পাঁচ আয়াতের সে কি মর্ম ও রহস্য, যা এ দুই আয়াত আদায় করতে পারেনি ?

জওয়াবে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থে প্রিয়নবী ও তাঁর উম্মাতের জন্য এত বিপুল অর্থবোধক বর্ণনা দিয়েছেন, যা আর কোন নবী ও উম্মাতের জন্য কোন গ্রন্থে ঘটাননি। কেননা ইতোঃপূর্বে যে নবীর প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, তাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ -এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বর্ণিত অংশমাত্রই বিদ্যমান ছিল। যথা তাওরাত গ্রন্থ, তা উপদেশবাণী ও বিধি-বিধানের

বিবরণ, যাবূর গ্রন্থ আল্লাহ্র প্রশংসা ও মর্যাদা এবং ইন্জীল শুধু উপদেশবাণী ও নীতিবাক্য। এর কোনটাতেই মুজিয়া নাই,যা প্রেরিত নবীর সত্যতা প্রমাণ করবে।পক্ষান্তরে যে কিতাব প্রিয় নবী মুহাম্মাদ -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়, তাতে উপরোক্ত সমুদয় বিষয়বস্তুর সমাহার তো রয়েছেই, অধিকন্তু তাতে এমন বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা অপরাপর গ্রন্থসমূহে নেই। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রণীধানযোগ্য যে বিষয়ের কারণে অন্যান্য গ্রন্থের উপর এ কিতাব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, তা হলো এর বিস্ময়কর ভাষাশৈলী, অলংকারময় শব্দযোজনা ও বাক্যবিন্যাস। যে কারণে এর ক্ষুদ্রতম একটা সূরার সমতুল্য বচন তৈরী করতে সক্ষম হয়নি দুনিয়ার পণ্ডিতগণ। হার মেনেছে সব জাঁদরেল কবি-সাহিত্যিক অনুরূপ রচনাশৈলীর দৃষ্টান্ত পেশ করতে। সমঝদার ও বুদ্ধিমান লোকদের বিবেক-বুদ্ধি এর নজীর দেখাতে হয়েছে ব্যর্থ। অবশেষে তাদের একথা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকেনি যে, এ গ্রন্থ মহা প্রতাপশালী এক আল্লাহ্র পক্ষ হতেই অবতীর্ণ। এ গ্রন্থে সৎকর্মে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং অসৎকর্ম হতে করা হয়েছে সতর্ক। এমনিভাবে আদেশ-নিষেধ, কাহিনী, বিতর্ক ইত্যাকার বহু বিষয়বস্তু এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে, যা আর কোন অবতীর্ণ গ্রন্থে নেই।

কাজেই কুরআন কারীমে উম্মুল-কুরআন সদৃশ যে দীর্ঘতা মাঝেমধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার কারণ একে তো এর গুণাবলী অপূর্ব, ভাষাশৈলী বিস্ময়কর, যা কবিতার মাত্রা, অতীন্দ্রিয়বাদী সুলভ ছন্দবদ্ধতা, বাগ্মীদের বক্তৃতা ও সাহিত্যিকদের রচনাধারা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; সমগ্র সৃষ্টি যার সমতুল গুণ উদ্ভাবন এবং সমস্ত মানুষ যার সমকক্ষ ভাষা বিরচনে নিতান্তই অক্ষম। এভাবে আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থকে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ -এর নবুওয়াতের পক্ষে সমুজ্জ্বল প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। তাছাড়া এতে যে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও স্তুতি সন্নিবেশিত হয়েছে, তদ্দারা বান্দাদেরকে তাঁর মহিমা ও শক্তি এবং নিখিল বিশ্বব্যাপী সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে, যাতে তারা তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করে এবং তাঁর প্রশংসায় লিপ্ত হয়। ফলে তারা আরও বেশী অনুগ্রহের উপযুক্ত হবে এবং আখিরাতে হবে মহা পুরস্কারের অধিকারী। অনুরূপ স্বীয় পরিচয়দান ও আনুগত্যের তাওফীক দিয়ে তিনি যাদেরকে অনুগ্রহীত করেছেন, এ গ্রন্থে তাদের যে প্রশংসা করা হয়েছে, তার দ্বারা বান্দাদেরকে এ কথাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দীন-দুনিয়ার যত নিয়ামত তারা লাভ করে, সবই তাঁর অনুগ্রহ, কাজেই তাদের উচিত মনগড়া সব মাবুদ ও তাঁর শরীক হতে মুখ ফিরিয়ে এক বিশ্বপালক আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়া। এমনিভাবে এতে যে অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদের পরিণাম ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, তার দ্বারা বান্দাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন তাঁর অবাধ্যতা এবং অনিবার্য শাস্তির কারণ হয় এমন কাজে জড়িত না হয়, অন্যথায় তাদেরকেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় ভাগ্য বরণ করতে হবে। বস্তুত এই হলো সূরা উম্মুল-কুরআন এবং অনুরূপ অন্যান্য সূরাগুলির দীর্ঘ হওয়ার কারণ। এই হলো দীর্ঘতার গূঢ় রহস্য ও প্রকৃত তাৎপর্য।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ বলেন, বান্দা যখন বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, حَمِدَنِى عَبْدِى আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ... যখন সে বলে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আল্লাহ্ পাক বলেন اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِى আমার বান্দা আমার তারীফ করেছে। যখন সে বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ মহান আল্লাহ্ বলেন, مَجَّدَنِى عَبْدِى فَهٰذَا لِى আমার বান্দা আমার মহিমা ঘোষণা করেছে। আমি এর অধিকারী। যখন সে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে তখন আল্লাহ্ পাক বলেন, فَذَاكَ لَهٗ বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে আরও দুই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এক সূত্রে তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ -এর উদ্ধৃতি দেননি, অন্য সূত্রে দিয়েছেন।

হযরত জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আন্সারী (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ বলেন, قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِى وَ بَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَ لَهٗ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ حَمِدَنِى عَبْدِى وَاِذَا قَالَ اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ قَالَ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِى وَ اِذَا قَالَ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِى عَبْدِى قَالَ هٰذَا لِى وَ لَهٗ مَا بَقِىَ 'আমার ও বান্দার মাঝে নামাযকে আধাআধি ভাগ করেছি। সে যা প্রার্থনা করে তা তার জন্য মনযূর হয়। যখন সে বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলে, الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আল্লাহ্ বলেন, বান্দা আমার তারীফ করেছে। যখন সে বলে, مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা ঘোষণা করেছে।

এ আয়াত পর্যন্ত (প্রথম তিনখানা আয়াত) শুধু আপনার প্রশংসার জন্য। পরবর্তী আয়াতগুলোতে বান্দার আবেদন-নিবেদন।

سُورَةُ البَقَرَةِ ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾
أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

وَآيَاتُهَا سِتٌّ وَثَمَانُونَ وَمِائَتَانِ

২. সূরা বাকারা

২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকূ, মাদানী

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১. আলিফ–লাম–মীম।

২. এটা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ,

৩. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে,

৪. আর তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা ঈমান রাখে এবং আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী,

৫. তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।

আলিফ—লাম—মীম—এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, الم –এর ব্যাখ্যায় তাফ্সীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, তা কুরআন কারীমের নামসমূহের মধ্যে একটা নাম। হযরত কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি الم– এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা কুরআন মজীদের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, الم কুরআন মজীদের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। হযরত ইব্ন জুবায়র (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কারো কারো মতে এ হরফ ক'টি উপক্রমণিকা। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা কুরআন কারীমের সূচনা করেছেন। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, الم কুরআন মজীদের সূচনা। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদ শুরু করেছেন। অন্য সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, الم - حم - المص ও ص হলো সূচনাবাক্য, যার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন সূরার সূচনা করেছেন। হযরত মুজাহিদ (র) হতে আরেক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে তা সূরার নাম। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহ্ব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আব্দুর রাহ্মান ইব্ন যায়দ ইব্ন আস্লাম (র) –এর কাছে الم ذلك الكتب الم تنزيل المر সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার পিতা (যায়দ ইব্ন আসলাম) বলেছেন, এগুলো সূরার নাম।

কারো কারো মতে তা আল্লাহ্ তাআলার একটি নাম। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না (র)–এর সূত্রে ইমাম শাবী (র) হতে বর্ণিত,। তিনি বলেন, আমি ইমাম সুদ্দী (র)–কে حم - طسم ও الم সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এগুলো আল্লাহ্ তাআলার নাম। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মুছান্না (র)–এর সূত্রে ইমাম শাবী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাসমূহের সূচনায় উল্লেখিত শব্দগুলো আল্লাহ্ তাআলার নাম।

কেউ কেউ বলেন, এটা আল্লাহ্ তাআলার এক নাম এবং এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা শপথ করেছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা শপথ করেছেন এবং এগুলো তাঁর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইকরিমা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন الم হলো শপথ।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এগুলো হলো বিভিন্ন নাম ও ক্রিয়া হতে গৃহীত حروف مقطعات (কর্তিত অক্ষর)। এর প্রত্যেক টির আলাদা আলাদা অর্থ আছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, الم অর্থ أَنَا اللّٰهُ أَعْلَمُ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। হযরত সায়ীদ ইব্ন জুবায়র হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) এবং অপর এক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, الم হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার নামসমূহের বর্ণমালা হতে উৎপন্ন শব্দ।

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি الم - حم ও ن সম্পর্কে বলেন, এগুলো বিচ্ছিন্ন নাম। কেউ কেউ বলেন, এগুলো অর্থবোধক হরফ।

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাসমূহের প্রারম্ভে উল্লেখিত - الر - طسم - حم - ص ق এগুলো অর্থবোধক অক্ষর।

কারও মতে এগুলো এমন হরফ, যার প্রত্যেকটির মধ্যে বহু অর্থ নিহিত রয়েছে। যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত রবী ইব্‌ন আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি الم সম্পর্কে বলেন, এগুলো ২৯টি বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত, যে বর্ণমালার উপর সমস্ত ভাষা নির্ভরশীল। এর প্রত্যেকটি হরফ দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র কোন না কোন নাম শুরু হয়। এ হরফসমূহের প্রত্যেকটির মধ্যেই তাঁর রহমত বা গযবের ইঙ্গিত রয়েছে। এমন কোন হরফ নেই যা কোন জাতির আয়ুষ্কাল ও মেয়াদের ইঙ্গিত বহন করে না। হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) বলেন, আশ্চর্য বটে, মানুষ আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নামসমূহ দ্বারা কথা বলে এবং তাঁরই দেওয়া জীবিকা দ্বারা জীবন নির্বাহ করে, তারপরও কিভাবে তারা কুফ্‌রী করে? তিনি বলেন, আলিফ হলো তাঁর আল্লাহ নামের কুঞ্জী।এমনিভাবে 'লাম' لطيف (লাতীফ, অর্থ সূক্ষ্মদর্শী, দয়ালু) এবং মীম مجيد (মাজীদ অর্থ মর্যাদাশীল) নামের কুঞ্জী। আবার আলিফ মানে آلاء الله (আল্লাহর অনুগ্রহাবলী), লাম মানে لطيف (অ... হ দয়া) এবং মীম মানে مجد الله (আল্লাহর মহত্ব)। অনুরূপ আলিফ হচ্ছে এক বছর, লাম ত্রিশ বছর এবং মীম চল্লিশ বছর। ইবন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে হযরত রবী (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, প্রত্যেক গ্রন্থেরই কিছু রহস্য আছে, কুরআন মজীদের সে অজানা রহস্য হলো হরূফে মুকাত্তায়াত (কর্তিত অক্ষরসমূহ)।

এর অর্থ সম্পর্কেও ভাষাবিদদের মাঝে মতভেদ আছে। তাদের কতকে বলেন, এগুলো আরবী বর্ণমালার এমন ক'টি হরফ যেগুলো উল্লেখ করার পর অবশিষ্টগুলো উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা বাকি থাকে না। অবশিষ্টগুলো আটাশটি বর্ণমালার পরিশিষ্ট বিশেষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কারও সম্পর্কে যদি সংবাদ দেওয়া হয় যে, সে আটাশটি বর্ণমালার মধ্যে আছে, তখন ا-ب-ت-ث উল্লেখ করলে বাকিগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না, যেগুলো আটশটিরই পরিশিষ্ট। এজন্যই ذلك الكتب -এর অবস্থান رفع -এর স্থানে। কেননা আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আলিফ, লাম ও মীম কর্তিত হরফসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই কিতাব যা আপনার প্রতি সমষ্টিগতভাবে (বিন্যস্ত আকারে ?) অবতীর্ণ করেছি, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ বলতে পারে, আলিফ, বা, তা, ছা তো বর্ণমালার মধ্যে নামের মত হয়ে গেছে ঠিক যেমন আলহামদু (الحمد) সূরা ফাতিহার নাম হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হবে, কোন ব্যক্তি যদি বলে, আমার ছেলে তোয়া ও জোয়া বর্ণের মধ্যে আছে তাহলে তা যেমন জায়েয তেমনি এটিও জায়েয।

তোয়া ও জোয়া বর্ণের মধ্যেই আছে—তাহলে তা যেমন জায়েয তেমনি এটিও জায়েয। সে যদি বলে, এ কথা দ্বারা সে অবহিত করতে চেয়েছে যে, বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোর মধ্যেই তার ছেলের নাম আছে—এ থেকে জানা যায় যে, ا - ب - ت - ث তার নাম নয়। যদিও তা বর্ণমালার অন্য বর্ণগুলোর উল্লেখ না করার কারণে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-তাবারী বলেনঃ সূরাসমূহের প্রারম্ভে আরবী বর্ণমালায় অক্ষরসমূহ এলোমেলো উল্লেখ করা এবং বর্ণমালার প্রারম্ভিক অক্ষরগুলো থেকে ا - ب - ت - ث ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কারণ এতে অর্থের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আমার ছেলে তোয়া ও জোয়ার মধ্যে আছে বলে আরবী বর্ণমালা বুঝানো হয়েছে এটি এবং অনুরূপ বাক্যে আমার পুত্র আলিফ. বা, তা, সা-র মধ্যে আছে কথাটি সমার্থক। এ ক্ষেত্রে তারা আসাদ গোত্রের একজন কবির রাজায ছন্দের কবিতাংশকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। কবিতাটি নিম্নরূপঃ

لما رأيت امرها فى حطى ؛ وفنكت فى كذب ولط ؛ اخذت منها بقرون شمط
فلم يزل ضربى بها و معطى ؛ فى علا الرأس دم يغطى

এ কবিতা দ্বারা সে স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে বলতে চেয়েছে যে, সে ابى جاد -এর মধ্যে আছে। তাই সে প্রকারান্তরে তার বাক্য لما رأيت امرها فى حطى -টিকে স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্যই উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি ابى جاد-এর মধ্যে আছে। তাই এ ক্ষেত্রে لما رأيت امرها فى ابى جاد এই পুরো কথাটা দ্বারা শ্রোতা যা বুঝাতে পারছে কথার ঐ বিশেষ অংশটুক অর্থাৎ আবিজাদ দ্বারাও তাই বুঝাতে পারছে। বর্ণ শোনার পর তারা পরবর্তী কথাগুলো শুনতে মনোযোগী হলে এ সবের সম্বন্ধে গঠিত কথাগুলো তাদের সামনে পেশ করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সূরাসমূহের সূচনাতে যেসব বর্ণ আছে সেগুলো দ্বারা মহান আল্লাহ্ তাঁর বাণী শুরু করেন। এতে যদি কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যার কোন অর্থ নেই তা কি কুরআনের অংশ হতে পারে? তাহলে জবাবে বলা হবে যে, এর অর্থ এতটুকুই যে—এগুলো দ্বারা মহান আল্লাহ্ তাঁর বাণী শুরু করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যাবে যে, পূর্বের সূরাটি এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে এবং এখন অন্য একটি সূরা শুরু হয়েছে। এই বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো এ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। আরবদের লেখায় ও কথায় এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে মাঝখানে যদি بل (বরং) শব্দটি ব্যবহার করে তাহলে বুঝতে হবে যে, পূর্বের কথা শেষ হয়ে নতুন কথা শুরু হয়েছে। যেমন,

و بلدة ما الانس من اهالها - و يقول لابل - ما هاج احزانا و شجوا قد شجا -

এখানে بل শব্দটি কবিতার অংশ নয়। কবিতার ছন্দের মিল রাখার ক্ষেত্রেও এর কোন ভূমিকা নেই। বরং এর দ্বারা একটা বাক্য শেষে আরেকটি শুরু করা হয়েছে।

আল্লামা তাবারী বলেন, যাদের বর্ণনা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাদের প্রত্যেকের মতের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। যাঁরা আলিফ-লাম-মীমকে কুরআনের একটি নাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁদের এ বক্তব্যের পেছনে দুটি কারণ আছেঃ প্রথম কারণটি হলো তাঁরা ধরে নিয়েছেন—আল-কুরআন যেমন কুরআনের একটি নাম তেমনি আলিফ-লাম-মীম একটি নাম। এ ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে মহান আল্লাহ্র বাণী الم - ذالك الكتاب-এর অর্থ হবে কসম। এ ক্ষেত্রে অর্থ হবে, 'কুরআনের

১৭—

শপথ'! এ কিতাবের মধ্যে আদৌ কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় কারণ হলো—তাঁরা মনে করেছেন, এটি সূরাটির একাধিক নামের মধ্যে এমন একটি নাম যা দিয়ে তা চেনা যাবে। যেমন সব বস্তুকে তাদের নামেই চেনা যায়। এ ভাবে কেউ যদি কাউকে বলে আমি আজ সূরা আলিফ-লাম মীম ছোয়াদ অথবা সূরা 'নূন' পড়েছি তাহলে শ্রোতা বুঝবে যে, সে অমুক সূরা পড়েছে। যেমন কেউ যদি বলে, আজ আমি উমার অথবা যায়েদের সাথে সাক্ষাত করেছি—কোন লোকের পক্ষে এ কথাটি বুঝা কষ্টকর হলেও যায়েদ এবং উমার ভাল করেই জানে যে, কোন লোকটি তাদের সাথে সাক্ষাত করেছে। নামসমূহ তখনই আলামত হয় যখন তা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সূচনা করে। যদি তা পার্থক্য সূচক না হয় তাহলে তা আলামত নয়।

এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, অনেকের একই নাম হওয়ার কারণে তা পার্থক্য সূচক হয় না বলে এ উদ্দেশ্যে আরো কিছু শব্দ, পরিচিতিমূলক কথা বা গুণাবলী কিংবা কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ততা দেখাতে হয়। এতে নামকরণের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

এর জবাবে বলা যায়, যে কোন জিনিসের নামকরণ করা হয় মূলতঃ পার্থক্য বুঝানোর জন্য। পরে একই নামের একাধিক ব্যক্তির বা বস্তুর নামকরণ করার কারণে এসব নামের ব্যক্তিদের পরিচিতির সুবিধার জন্য তার সাথে পার্থক্যসূচক কিছু শব্দ বা গুণাবলী উল্লেখের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সূরাগুলির নামকরণের ব্যাপারও তাই। প্রত্যেকটি সূরার নামকরণ সেই সূরাটিকে নির্দিষ্ট করে বুঝাতে তার আলামত বা চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের আরো সূরার নাম অনুরূপ হওয়ার কারণে বুঝার সুবিধার জন্য সূরার নামের সাথে এমন কিছু গুণ বা প্রশংসা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যা পার্থক্যসূচক হতে পারে। তাই যখন কেউ এ ভাবে বলবে যে সে সূরা আলিফ, লাম মীম (الم) পড়েছে তাকে বলতে হবে, আমি সূরা আলিফ, লাম, মীম আল-বাকারা (الم البقرة) সূরাটি পড়েছি। আর আলিফ, লাম, মীম (الم) বলে সূরা আলে-ইমরান বুঝাতে চাইলে বলতে হবে—আমি আলিফ, লাম, মীম—আলে-ইমরান (الم ال عمران) আলিফ, লাম, মীম—যালিকাল কিতাব (الم ذلك الكتاب) এবং আলিফ, লাম, মীম—আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম (الم الله لا اله الا هو الحي القيوم) পড়েছি। যেমন কেউ উমার নামে তামীম এবং আযদ গোত্রের দুই ব্যক্তির পরিচয় দিতে চাইলে তাকে অবশ্যই বলতে হবে—উমার আত-তামীমী বা উমার আল-আযদী। কেননা উমার নামের এ দুই ব্যক্তির মাঝে এছাড়া আর কোন ভাবেই পার্থক্য করা যাচ্ছে না। যারা বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহকে সূরাসমূহের নাম বলে ব্যাখ্যা করেন তাদের ব্যাপারটিও অনুরূপ। আর যারা এগুলোকে সূরাসমূহের প্রারম্ভিকা বলেছেন অর্থাৎ এসব বর্ণদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী শুরু করেছেন তারা যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা আমরা ইতিপূর্বেই আরবদের বাকরীতি থেকে উদ্ধৃত করেছি। অর্থাৎ তারা এক একটি সূরার শেষ ও আরেক সূরার শুরু বলে ধরে নিয়েছেন আর এ বর্ণগুলোকে দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্যসূচক বর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন পূর্বে বর্ণিত কাসীদাতে بل শব্দটি একটি কথার শেষ এবং আরেকটির শুরু বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে بل শব্দটি কাসীদার কোন অংশও নয়, আবার এর ছন্দ নির্মাণেও শব্দটির কোন ভূমিকা নেই। বরং এখানে একটি বাক্যের সমাপ্তির পর আরেক বাক্যের আরম্ভ বুঝাতে শব্দটির ব্যবহার হয়েছে।

আর যারা এগুলোকে বিচ্ছিন্ন বর্ণ (حروف مقطعة) বলে মত প্রকাশ করে বলেন, এর কোন কোন অক্ষর মহান আল্লাহ্‌র নাম আর কোন কোনটি তাঁর গুণাবলী বা গুণাবলী প্রকাশক এবং

প্রত্যেক حرف বা বর্ণের একটা স্বতন্ত্র অর্থ আছে, তারা এ ব্যাখ্যা দ্বারা কবির নিম্নোক্ত কবিতাংশে ফুটে উঠা প্রকাশভংগীই গ্রহণ করেন :

قلنا لها قفي لنا قالت قاف : لا تحسبي انا نسينا الايجاف -

অর্থাৎ কাফ (ق) বর্ণটি বলে সে وقفت বুঝালো। অর্থাৎ ق বর্ণটি পূর্ণ একটি শব্দ وقفت-এর প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তার অর্থ বহন করছে। তাই الم এবং অনুরূপে আরো যে সব বিচ্ছিন্ন বর্ণ কুরআন মজীদে আছে তাও একইভাবে অর্থ প্রকাশ করে থাকে। অর্থাৎ একেকটি বিচ্ছিন্ন বর্ণ একেকটি পূর্ণ শব্দের অর্থ প্রকাশ করে। তাই কেউ কেউ বলেছেন : আলিফ—'আনা' শব্দের, লাম 'আল্লাহু' শব্দের এবং মীম 'আ'লামু' শব্দের প্রতিনিধিত্ব করছে। এর সম্মিলিত রূপে দাঁড়ায় انا الله اعلم (আনাল্লাহু আ'লামু) যার অর্থ 'আমি আল্লাহই সর্বাধিক জানি।' তারা বলেন এভাবে কুরআনের যত সূরার প্রথমে বিচ্ছিন্ন বর্ণ আছে সেগুলোর ব্যাখ্যা এভাবেই করতে হবে। এটা আরবদের প্রসিদ্ধ রীতি যে, বক্তা কোন কোন সময় তার কথার শুধু একটি মাত্র বর্ণ ছাড়া আর সবগুলোই উহ্য রাখেন কিংবা অর্থের পরিবর্তন না ঘটলে কোন কোন বাড়তি বর্ণ যোগ করেন। যেমন حارث হারিস শব্দটিকে উচ্চারণের সুবিধার জন্য ث বিযুক্ত করে 'হারু' حار ব্যবহার করেন এবং (مالك) শব্দের কাফ বর্ণটিকে কমিয়ে مال উচ্চারণ করেন। যেমন :

ما للظليم عال كيف لا يا : ينقد عنه جلده اذا يا -

অর্থাৎ যখনই يفعل শব্দটি ব্যবহার করার দরকার হবে তখনই তার প্রথম অক্ষর يا-র ব্যবহারই যথেষ্ট মনে করবে। আরো একটি উদাহরণ :

بالخير خيرات وان شرافا : ولا اريد الشر الا ان تا -

এখানে প্রথম অংশের فا দ্বারা فشرا বুঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে الا ان تا দ্বারা الا ان تشاء বুঝানো হয়েছে। এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যায় যা কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করবে মাত্র। মুহাম্মাদ (ইবনে মাসলামা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়া মারা গেলে আবাদা আমাকে বললেন, এখন ফিতনা সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আমি আর কিছুই দেখছি না। তাই নিজের ক্ষতি সম্পর্কে সাবধান হও এবং পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যাও।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কি করতে আদেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমার জন্য আমার কাছে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় ব্যাপার হলো لا ضطجع অর্থাৎ তুমি শুয়ে থাকো। আইয়ুব ও ইবনু 'আওন বলেন, তিনি তাঁর ডান গালের নীচে হাত দিয়ে ইংগিতে শোয়ার বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এভাবে তুমি এখন কিছু দেখতে পাবে যা তোমার কাছে পরিচিত। অন্য একজন কবি বাড়তি বর্ণ যোগ করে বলেছেন :

اقول اذ خرت على الكلكال : يا ناقتي ما جلت من مجال -

এখানেও ابكى প্রকৃত পক্ষে ছিল لبكى। আলিফ যোগ করে ابكى করা হয়েছে। আরো একটি উদাহরণঃ

ان شكلى و ان شكلك شتى ؛ فالزمى الخص و اخفضى تبيضضى -

এখানেও تبيضضى শব্দের মধ্যে একটি ضاد অতিরিক্ত যুক্ত করা হয়েছে। অথচ মূল শব্দে সেটি নেই। এভাবে উপরোক্ত প্রত্যেকটি শব্দের যে সব বর্ণ উহ্য বা অনুল্লেখিত রাখা হয়েছে তা সবই আরবী বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। এর নজীর হিসেবে আমরা এখানে আরবদের কবিতা ও কথাবার্তা থেকে উদ্ধৃত করলাম। আর যারা বলেন যে, الم ও অনুরূপ বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহের প্রত্যেকটি অক্ষর বিভিন্ন অর্থবোধক। এ মর্মে আমরা রবী ইবনে আনাস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি। যারা الم-এর অর্থ علم । الله । انا বলে উল্লেখ করেছেন এ ক্ষেত্রে এসব ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ অর্থই করতে চান। প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি স্বতন্ত্র শব্দের প্রতিনিধিত্ব করছে। সুতরাং পুরো শব্দটা উল্লেখের কোন প্রয়োজন হয়নি।

الم -এর আলিফ অনেক কয়েকটি অর্থের ধারক ও প্রকাশক। তার মধ্যে মহান রব আল্লাহ্‌র নাম এবং তাঁর নিয়ামতসমূহের পূর্ণ নাম প্রকাশও অন্তর্ভুক্ত। আর সব বর্ণের মধ্যে মানের হিসেবে আলিফ যেহেতু এক মানের ধারক তাই তা কোন কওমের জন্য নির্দিষ্ট 'আজাল' বা সময় এক বছর নির্দেশ করছে। আর لام আল্লাহ্‌র لطيف নামটির পুরোটার প্রকাশক, আর এ নামটি আল্লাহ্‌র 'ফজল' বা মেহেরবানী তথা 'লুতফের' প্রকাশক। লামের মান ত্রিশ হওয়ার কারণে তা কোন কওমের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ বা সময়কাল ত্রিশ বছর নির্দেশ করে। মীম বর্ণটি আল্লাহ্‌র পুরো মজীদ নামটির প্রকাশক এবং তার 'মাজদ' অর্থাৎ মহত্বের বা তাঁর মর্যাদা প্রকাশক এবং কোন কওমের অবকাশকাল চল্লিশ বছর নির্দেশক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মহান আল্লাহ্‌ নিজের প্রশংসা ও গুণাবলী প্রকাশ করে তাঁর বাণী শুরু করেছেন। এভাবে বান্দা তার বক্তব্য শুরু করতে গিয়ে, চিঠিপত্র বা বই-পুস্তক লিখতে গিয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম করতে গিয়ে শুরুতেই যে পথ ও পন্থা অনুসরণ করে মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তা শিখিয়ে দিয়েছেন। যাতে কিয়ামতে তিনি বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করতে পারেন। তিনি 'আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন; আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী খালাকাস্‌-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদ এবং অনুরূপ যেসব সূরার প্রথমে নিজের প্রশংসা দিয়ে কথা শুরু করেছেন তা দ্বারাও তিনি বান্দাকে তার কাজ শুরু করার নিয়ম-পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। এসব সূরার কোনটি তাঁর মহত্ব প্রকাশের মাধ্যমে, কোনটি সম্মান প্রকাশের মাধ্যমে আবার কোনটি পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করেছেন। যেমন সূরা বানী ইসরাঈলের প্রথমে سبحان الذى اسرى بعبده ليلا বলে শুরু করেছেন। সমগ্র কুরআনে এরূপ আরো যেসব সূরা আছে তা প্রশংসা বর্ণনা, সম্মান প্রকাশ অথবা পবিত্রতা বর্ণনার দ্বারা শুরু হয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য সূরাগুলোর প্রারম্ভে কখনো আরবী বর্ণমালার কোন বর্ণ দিয়ে নিজের 'ইল্‌ম' ও জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে শুরু করেছেন। কখনো ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কথা বলে শুরু করেছেন, আবার কখনো সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর ফযল ও ইহসানের কথা বলে শুরু করেছেন এবং তারপর অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করেছেন।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে الم-এর প্রত্যেকটি হরফ বা বর্ণ মারফু হওয়া জরুরী। এক্ষেত্রে ذلك الكتاب

কথাটি الم-এর অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন خبر। দ্বিতীয় মতটি পোষণকারীর বক্তব্য অনুসারে ذلك শব্দটি মারফূ—যদিও তা প্রথম মত পোষণকারীর বক্তব্যের বিপরীত অর্থ বহন করে। আর যারা এগুলোকে স্থানীয় মান (حساب الجمل) ذلك যে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে তা স্বীকার না করে যারা বলেন যে, ঐগুলো মান নির্ণায়ক বর্ণ তারা আরো বলেন, আমরা الحروف المقطعة বা বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোর মান নির্ণায়ক বর্ণ ও حروف تهجي হওয়া ছাড়া আর কোন অর্থ আছে বলে জানি না। তারা বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে এমন ভাষার কখনো সম্বোধন করেন না যা সে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারে না। আমরা الم-এর অর্থের যে দুটি দিক বা কারণ বর্ণনা করেছি তা ছাড়া অন্য কোন অর্থ যদি না হয় আর ذلك-এর অবস্থাও যদি তাই হয় তাহলে দুটি কারণ বা দিকের একটি বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ আলিফ, লাম, মীমের حروف تهجي-এর অন্তর্গত হওয়া। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ মান নির্ণায়ক বর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোন অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না এবং সেটি সঠিক এবং প্রমাণিতও বটে। এ ক্ষেত্রে الم কথাটির সাথে ذلك الكتاب কথাটি সম্পৃক্ত হয়ে আসতে পারে না। কারণ এমতাবস্থায় এর বোধগম্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যারা الحروف المقطعة ধরে অর্থ করেন তারা বলেন, আমরা বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহের স্থানীয় মান প্রকাশক বা বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত বর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোন অর্থ বুঝি না। তারা আরো বলেন: বুঝা যায় বা বোধগম্য হয় এমন ভাবে কথা বলা ছাড়া মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে সম্বোধনই করতে পারেন না। الم-এর অর্থ যে তার আক্ষরিক মান হবে সে দলীল নীচে উল্লেখ করা গেল।

জাবের ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে রাবাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আবু ইয়াসার ইবনে আখতাব রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স) উপক্রমনিকা সূরা বাকারা অর্থাৎ الم ذلك الكتاب لا ريب فيه তিলাওয়াত করছেন। সে তার ভাই হুয়াই ইবনে আখতাবের কাছে গিয়ে বসলো। তখন হুয়াই ইবনে আখতাব একদল য়াহুদীর সাথে বসা ছিল। সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললো, জানো মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা থেকে আমি তাঁকে الم ذلك الكتاب তিলাওয়াত করতে শুনেছি। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি নিজে শুনেছো? সে বললো: হাঁ। জাবের ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে রাবাব বলেন, তখন হুয়াই ইবনে আখতাব ঐ সব লোককে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললো, হে মুহাম্মাদ (স)! আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা থেকে আপনি الم ذلك الكتاب তিলাওয়াত করছিলেন, তা কি আমাদের কাছে বলা হয়নি? তিনি বললেন, হাঁ। তারা বললো, এগুলো কি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জিবরাঈল (আ) আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন? তিনি বললেন: হাঁ। তারা বললো, মহান আল্লাহ্ আপনার পূর্বে বহু নবী পাঠিয়েছেন। তবে শুধু আপনাকে ছাড়া তাঁদের কাউকেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাজত্বের স্থিতিকাল ও উম্মাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় অবগত করেছেন বলে আমার জানা নেই। অতঃপর হুয়াই ইবনে আখতাব তার সাথীদের দিকে ঘুরে বললো, 'আলিফ' অর্থ এক, 'লাম' অর্থ ত্রিশ এবং 'মীম' অর্থ চল্লিশ। এ ভাবে এর অর্থ হচ্ছে একাত্তুর বছর। এরপর সে রসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে ফিরে বললো, হে মুহাম্মাদ (স)! এর সাথে কি আরো কিছু আছে? তিনি বললেন: হাঁ। সে বললো, কি আছে? তিনি বললেন: المص আছে। সে বললো, এতো আরো অধিক ভারী ও দীর্ঘতর। 'আলিফ' অর্থ এক, 'লাম' অর্থ ত্রিশ, 'মীম' অর্থ চল্লিশ এবং ছোয়াদ অর্থ নব্বই। এ ভাবে সব মিলিয়ে একশ একষট্টি বছর। হে মুহাম্মাদ, এর সাথে কি আরো আছে? রসূলুল্লাহ (স) বললেন: হাঁ। সে বললো, কি আছে? তিনি বললেন: الر। সে বললো, এটাও অধিক ভারী ও দীর্ঘতর। 'আলিফ' অর্থ এক, 'লাম' অর্থ ত্রিশ

এবং 'রা' অর্থ দুইশত। আর এ ভাবে দুইশ একত্রিশ বছর। এর পর সে বললো হে মুহাম্মদ, এর পর কি আরো কিছু আছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ المر আছে। সে বললো, এটাও অধিকতর ভারী ও দীর্ঘতর। 'আলিফ' অর্থ এক, 'লাম' অর্থ ত্রিশ, 'মীম' অর্থ চল্লিশ এবং 'রা' অর্থ দুইশো এবং এ ভাবে দুইশো একাত্তর বছর। এরপর সে বললো, হে মুহাম্মাদ, আপনার এ বিষয়টি আমাদের কাছে গোলমেলে মনে হচ্ছে। এমনকি আমরা বুঝতেই পারছি না যে, আপনাকে কম দেয়া হয়েছে না বেশী। এরপর তারা উঠে চলে গেল। আবু ইয়াসার তার ভাই হুয়াই ইবনে আখতাব ও তার সাথী ধর্মযাজকদের উদ্দেশ্য করে বললো ঃ হতে পারে এসব অক্ষরের পূর্ণ মান সমান সময় মুহাম্মাদকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ একাত্তর, একশত একষট্টি, দুইশত একত্রিশ এবং দুইশত একাত্তর সব মিলিয়ে মোট সাতশত চৌত্রিশ বছর। তারা বললো, তার ব্যাপারটা আমাদের কাছে গোলমেলে মনে হচ্ছে। এ ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে একদল মুফাসসির বলেন, কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি ঐ সব য়াহুদীর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে ঃ

هو الذى انزل عليك الكتاب منه ايات محكمت هن ام الكتاب و اخر متشابهات -

"তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। এতে দু'ধরনের আয়াত আছে। এক ধরনের আয়াত হলো 'মুহকামাত'। আর এগুলোই কিতাবের প্রকৃত বুনিয়াদ। আর আরেক ধরনের আয়াত হলো 'মুতাশাবিহাত'।[১]—(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭)

তারা বলেন—আমরা الم-এর যে ব্যাখ্যা করেছি এ হাদীস দ্বারা তা সত্য ও সঠিক প্রতিপন্ন হয় এবং বিরুদ্ধ মত পোষণকারীদের মত বাতিল সাব্যস্ত হয়। আমার কাছে যে ব্যাখ্যা সঠিক বলে মনে হয় তা হলো—সূরাসমূহের প্রথমেই যেসব বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে তা আরবী বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ্ এসব বর্ণকে শব্দের সম্মিলিত বর্ণগুলোর মত না মিলিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। কারণ তিনি এর প্রতিটি বর্ণকে একটি মাত্র অর্থে প্রয়োগ না করে বরং একাধিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। রবী ইব্‌ন আনাস তাঁর বর্ণনায় এ কথাটিই বলেছেন। যদিও তিনি এর অধিক অর্থ বর্ণনা না করে মাত্র তিনটির মধ্যে সীমিত রেখেছেন। আমার মতে এর সঠিক ব্যাখ্যা হলো—রবী এবং অন্য সব মুফাস্‌সির এর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন প্রতিটি বর্ণ তার সবটা অর্থই বহন করছে। তবে এতে উল্লেখিত আরবী ভাষাভাষীদের এ ব্যাখ্যা শামিল নয়, যাতে এসব অক্ষরকে আরবী বর্ণমালার অক্ষর বলা হয়েছে। সূরাসমূহের প্রথমে উল্লেখিত এসব অক্ষর উল্লেখ করেই মোট আটাশটি বর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ ভাবে যে, এই শব্দ সমষ্টি দ্বারাই এ কিতাব গঠিত যাতে কোন সন্দেহ নেই। তার এ মতটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ তা সমস্ত সাহাবা, তাবিঈন ও তাঁদের পরবর্তী মুফাস্‌সির ও ব্যাখ্যাকারদের মতামতের বিপরীত। আর এটিই তার ভুল প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মোটকথা ذلك-এর ব্যাখ্যা হলো এ সব বর্ণ সমষ্টিই ذلك الكتاب বা ঐ কিতাব।

১. মুহকাম ও মুতাশাবিহ শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা সূরা আলে ইমরানের উপরোক্ত আয়াতের অধীনে দেখুন

এ ক্ষেত্রে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, একটি মাত্র অক্ষর কি করে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থের ধারক হতে পারে? এর জবাব হলো—একটি মাত্র শব্দ যখন ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলো অর্থের ধারক হতে পারে তখন একটি অক্ষরও ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলো অর্থ বহণ করতে পারে। যেমন একদল মানুষ, অল্প কিছু সময়, আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত ইবাদত গুযার ব্যক্তি এবং দীন ও মিল্লাতকে উম্মাহ (أمة) শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন প্রতিদান ও কিসাসকে 'দীন' বলে, বাদশাহ ও আনুগত্যকে দীন বলে, নত হওয়া ও নম্রতা প্রকাশকে দীন বলে, কিয়ামতের হিসাব নিকাশকেও দীন বলে। এ ধরনের আরো অনেক শব্দ আছে যা অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তবে এ ক্ষেত্রে সে সবের উল্লেখ শুধু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করবে।

অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে আরবী বর্ণমালার যে সব বিভিন্ন অক্ষর আছে তার প্রত্যেকটি বিভিন্ন অর্থের ধারক। এ মর্মে বিভিন্ন মুফাসসিরের মতামত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁদের মতে এসব বর্ণের সবগুলোই মহান আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী প্রকাশক। যেমন - المص ॥ الم - المر। এবং অনুরূপ অন্যান্য সূরার প্রারম্ভিক বিভিন্ন বর্ণসমূহও ঐগুলির উপক্রমনিকা। আর ذلك শব্দটি মহান আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর অংশ হওয়ার কারণে তা সূরাগুলোর অবতরনিকা হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। কারণ মহান আল্লাহ্ কুরআনের অনেক সূরাই নিজের প্রশংসামূলক কথা দ্বারা শুরু করেছেন এবং অনেকগুলো সূরা নিজের তা'জীম ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করে শুরু করেছেন। এটা অসম্ভব নয় যে, এ সব সূরার কোন কোনটি তিনি কসম বা শপথ দ্বারা শুরু করবেন। তাই যেসব সূরা আরবী বর্ণমালার কিছু অক্ষর দিয়ে শুরু করা হয়েছে সেগুলো দ্বারা কসম করা হয়েছে। কারণ ঐগুলো আল্লাহ্ তা'আলার মহান নাম ও গুণাবলীর প্রকাশক শব্দের বর্ণ। এ বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আর আল্লাহ্, তাঁর নাম ও তাঁর গুণাবলীর শপথ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। এসব বর্ণ দিয়ে যেসব সূরা শুরু করা হয়েছে সেগুলো ঐ সূরার প্রতীক ও নাম। আমরা ইতিপূর্বে যেসব কারণ বর্ণনা করেছি তার ভিত্তিতে উল্লেখিত সবগুলো অর্থই ذلك শব্দটি ধারণ করে। ذلك শব্দটি যে অর্থ বহন করে না মহান আল্লাহ্ যদি সেটিই বুঝাতে চাইতেন তাহলে রসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত সহজভাবে তা প্রকাশ করতেন। কেননা আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর রসূলের উপর কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্যই হলো—যে সব ব্যাপারে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তা তাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা। আর যেহেতু রসূলুল্লাহ (স) তা বর্ণনা না করে এমনিই রেখে দিয়েছেন তাই এক যুক্তিতে এটিই তার অর্থ। তবে অন্য যুক্তিতে আবার এটি তার অর্থ নয়। এতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, শব্দটি যতগুলো অর্থের বাহক হতে পারে এখানে তার সবকটিই উদ্দেশ্য—যদি সেই ব্যাখ্যা ও অর্থ বিবেক-বুদ্ধির কাছে অসম্ভব ও অগ্রহণযোগ্য না হয়। যেমন একই বাক্যের একই শব্দের অনেকগুলো অর্থ হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা এখানে ذلك শব্দটি সম্পর্কে যা কিছু বললাম তা যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তাকে অন্যান্য অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত একাধিক অর্থবোধক শব্দ ও ذلك-র মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দিতে বলবো। যেমন: دين, أمة এবং এরূপ আরো অন্যান্য বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক শব্দসমূহ যার একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সে যাই বলবে তা অন্য শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এমনি ভাবে যারা অন্যসব কারণ ও যুক্তি প্রমাণ বাদ দিয়ে বিশেষ একটি কারণ বা যুক্তি দেখিয়ে এর ব্যাখ্যা করবে যা মেনে নেয়া তাদের কাছে অপরিহার্য—আমরা এর বিরুদ্ধেও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছি। সে এমন একটি ব্যাখ্যা পেশ করে যা ذلك-এর ক্ষেত্রে পেশকৃত ব্যাখ্যার পরিপন্থী। তাহলে তাকে এ দু'য়ের মধ্যে অর্থাৎ মূলগত ও মূল দ্বারা প্রতিপন্ন অর্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে বলা হবে। এ

ক্ষেত্রে সে একটির ব্যাপারে যা বলবে অন্যটির ব্যাপারেও তা অপরিহার্যভাবে প্রযোজ্য হবে। আর ব্যাকরণবিদদের মধ্যে যিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ذلك শব্দটি কবিতার মধ্যে بل শব্দটি ব্যবহারের অনুরূপ—এর স্বতন্ত্র কোন অর্থ নেই। বরং অর্থহীন ভাবে বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত একটি শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

بل ؛ ماهاج اخزانا و شجوا قد شجا -

উক্ত ব্যাকরণবিদ বিভিন্ন কারণে ভুল করেছেন। প্রথম কারণ হলো, তিনি মহান আল্লাহ্‌র প্রতি এই বিশেষণ আরোপ করেছেন যে, তিনি আরবদেরকে এমন এক ভাষায় সম্বোধন করেছেন যা তাদের এমন কি কোন মানুষেরই ভাষা নয়। কারণ আরবরা যদিও উপরে বর্ণিত কবিতার মত بل শব্দ দ্বারা তাদের কাব্য শুরু করতো তথাপি এটা সবারই জানা যে, তারা তাদের বক্তব্য الم - الر বা المص দ্বারা শুরু করতো না। অর্থাৎ এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণ بل শব্দের সমার্থক হয়ে তাদের বক্তব্যের প্রারম্ভিকা হতো না। ذلك শব্দটিও যখন বক্তব্যের প্রারম্ভিকা নয়, আর মহান আল্লাহ্ কুরআন মজীদে তাদেরকে যে ভাষায় সম্বোধন করেছেন তা তাদের জানা, পরিচিত ও পরস্পরের ব্যবহারের ভাষা। আরবী বর্ণমালার যে সব অক্ষর সূরা সমূহের প্রারম্ভে ব্যবহার করা হয়েছে আর ঐ সব অক্ষরকে আমরা যে ভাবে বিশেষিত করেছি নিঃসন্দেহে গোটা কুরআন মজীদের জন্য তা প্রযোজ্য। এতেই প্রমাণিত হয় যে, আরবরা যে ভাষা জানতো এবং নিজের কথাবার্তায় ভাষা ব্যবহার করতো মহান আল্লাহ্ সে ভাষা রীতিকে লংঘন করেন নি। কারণ তাহলে স্পষ্ট বর্ণনাকারী বলে কুরআনকে বিশেষিত করা অর্থহীন হয়ে পড়তো। অথচ আল্লাহ্ তাআলা নিজেই বলেছেন ঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ -

"আমানতদার রূহ্ তা নিয়ে তোমার কল্বের উপর নাযিল হয়েছে। যাতে তুমি একজন সতর্ককারী হতে পার। স্পষ্ট আরবী ভাষায়"—(আশ-শুআরা ঃ ১৯৩)।

যা বিশ্ব জাহানের কেউ বোঝে না এবং যা কোন মাখলুকের ভাষা বলে পরিচিত নয় তা কি করে স্পষ্ট হতে পারে? আর তা স্পষ্ট আরবী ভাষা আল্লাহ্ তাআলার একথাও মিথ্যা হতে পারে না। আরবরা যে এ কথা জানতো তাও তিনি জানিয়েছেন। আর তা ছিল তাদের জন্য স্পষ্ট। এটা তার (নাহবীর) ভুলের একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ হলো, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে বে-কায়েদা বা অর্থহীন কথায় সম্বোধন করেছেন—এ কথাটি সে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করেছে। এটা একটা অর্থহীন বিষয়কে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করা। সমস্ত একত্ববাদীগণ মহান আল্লাহ্‌র ব্যাপ্যারে এটা মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। তৃতীয় কারণ হলো, আরবদের ভাষা ও কথাবার্তায় ব্যবহৃত بل শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যা বোধগম্য। তাদের বাকরীতিতে কোন কোন সময় পূর্বোক্ত বক্তব্য পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ ما جاء ني اخوك بل ابوك "আমার কাছে তোমার ভাই আসেনি বরং বাপ এসেছে।" ما رأيت عمرا بل عبد الله "আমি উমারকে দেখি নাই, বরং আবদুল্লাহকে দেখেছি। এ ধরনের আরো যে সব বাক্য আছে তাতেও এর উদাহরণ মিলবে। যেমন সা'লাবা গোত্রের আ'শা বলেছেন ঃ و لاشرين ثمانيا و ثمانيا - و ثلاث عشرة و اثنين و اربعا

এ ভাবে বলতে বলতে এ কথা পর্যন্ত পেঁৗছেছেন ঃ

ما لجلسان و طيب اردا نه ؛ بالون يضرب لكو الاصبعا

তারপর বলেছেন,

بل عد هذا فی قریض غیره : و اذکر فی سمع الخليفة اروعا

এ ভাবে তিনি যেন বলেছেন ঃ এ সব কথা বাদ দিয়ে পরের কথাটি গ্রহণ করো। তাই দেখা যাচ্ছে আরবদের ভাষায় এ ধরনের কথোপকথনে بل শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

ذلك الكتاب -এর ব্যাখ্যা

'যালিকল 'কিতাব'-এর ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন যে এর অর্থ হলো 'হাযাল কিতাব' বা এই কিতাব। এ মতের স্বপক্ষে দলীল ঃ মুজাহিদ, ইকরিমা, সুদ্দী, ইবনে জুরাইজ ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, 'যালিকাল কিতাব' অর্থ হাযাল কিতাব বা 'এই কিতাব'। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি বলে যে ذلك (ঐ) শব্দের অর্থ هذا (এই) কি করে হতে পারে? কেননা 'হাযা' বা 'এই' শব্দ দ্বারা চোখের সামনের কোন দৃশ্যমান বস্তু বুঝানো হয়ে থাকে। আর 'যালিকা' বা 'ঐ' শব্দ দ্বারা দূরের কোন অদৃশ্য বা দৃষ্টির বাইরের বস্তুকে বুঝানো হয়ে থাকে। কারণ যা দ্বারা কোন খবর জানা যায় বা প্রায় জানা যায় তা নাম পুরুষ হলেও বক্তার কাছে তা মধ্যম পুরুষ হিসাবে গণ্য হয়। ذلك الكتاب কথাটির মধ্যে ذلك-এর অবস্থাও অনুরূপ। কেননা মহান আল্লাহ্ যখন যালিকা শব্দের পূর্বে الم উল্লেখ করেছেন তখন তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তিনি তাঁর নবী (স)-কে যেন বলেছেন ঃ হে মুহাম্মাদ এটাই সেই কিতাব যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি। আর এ কারণেই هذا-এর স্থানে ذلك-এর ব্যবহার উত্তম ও যথাযথ হয়েছে। কেননা এ ভাবে الم যে অর্থ বহন করছে সে দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ ভাবে মহান আল্লাহ্ যেন তাঁর নবী (স)-কে বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ (স), আমি তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি আর সে কিতাবের সূরাসমূহে যা আছে তার সবটা মিলে সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই অতঃপর মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, ذلك (ঐ) অর্থ هذا الكتاب (এই কিতাব)। কেননা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন সেই সমগ্র কিতাবের সব সূরা বাকারার পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের প্রথম ব্যাখ্যাই বেশী যুক্তিযুক্ত। কারণ এর দ্বারাই ذلك-এর অর্থ ভালভাবে প্রকাশ পায়। খিফাফ ইবনে নাদবা আস-সুলামীর নিম্নবর্ণিত কবিতায় ذلك শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তাকে এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

فان تك خيلى قد اصيب صميمها : فعمدا على عينى تيممت مالكا

اقول له والرمح يأطر متنه : تأمل خفافا اننى انا ذالكا -

কবি যেন এখানে تأمل خفافا اننى انا ذالكا বলে تأملنى انا ذلك বলতে চেয়েছেন। তাই মুফাসসিরগণ মনে করেছেন ذلك -এর ذلك অর্থ هذا। খিফাফ এখানে তার নামকে নাম পুরুষ বুঝানো অর্থে ব্যবহার করেননি। বরং তিনি নিজের সম্পর্কেই বলতে চেয়েছেন। এ ভাবে ذلك শব্দটি এখানে নাম পুরুষ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা যেসব কারণ উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে الكتاب -এর প্রথম ব্যাখ্যাটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'যালিকাল কিতাব' কথা দ্বারা তাওরাত ও ইনজীল কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। 'যালিকা'-র ব্যাখ্যা এ ভাবে করা হলে ব্যাখ্যাকারীকে কোন ভাবে অভিযুক্ত করা যায় না। কারণ এ ক্ষেত্রে যালিকাকে সঠিক ভাবেই নাম পুরুষের অর্থে ব্যবহার করা হবে।

১৮—

لا ريب فيه-এর ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ্‌র বাণী لا ريب فيه-এর অর্থ হলো لا شك فيه অর্থাৎ "এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।" রবী ইবনে আনাস, মুজাহিদ, সুদ্দী আতা, কাতাদা, ইব্‌নে আব্বাস ও নবী (স)-এর একদল সাহাবা থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন لا ريب فيه-এর অর্থ لا شك فيه অর্থাৎ এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ريب শব্দমূলে مصدر বা উৎস। এ থেকে رابني الشئ يريبني ريبا বলা হয়ে থাকে। যেমন সা'এদা ইব্‌নে জুওয়া আল-হাযালী বলেছেন ঃ

فقالوا تركنا الحى قد حصروا به ۞ فلا ريب ان قد كان ثم لحيم -

حصروا শব্দটি দুইবার উল্লেখ করেও বর্ণিত আছে। এখানে যের ও যবর দু'টি হরকতই বৈধ। তবে যবরের ব্যবহার অধিক। কবি তার কথা حصروا به দ্বারা اطافوا অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই এখানে لاريب فيه -এর অর্থ لا شك فيه। আর ان قد كان ثم لحيم কথাটি দ্বারা قتيلا বা নিহত অর্থ গ্রহণ করেছেন। কাউকে যখন হত্যা করা হয়, তখন قد لحم শব্দ ব্যবহৃত হয়। ريب فيه-এর فيه শব্দের মধ্যে যে هاء সর্বনামটি আছে তা দ্বারা কতাবকে বুঝানো হয়েছে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, এই কিতাবের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং এ কিতাব মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী هدى-এর ব্যাখ্যা

শাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ هدى-এর অর্থ হলো هدى من الضلالة গোমরাহী থেকে হিদায়াত করা। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর একদল সাহাবা থেকে هدى للمتقين শব্দের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন نور للمتقين বা মুত্তাকীদের জন্য নূর বা আলো। এ স্থলে هدى শব্দটি مصدر বা শব্দমূল। যেমন কেউ কাউকে পথ দেখিয়ে দিলে বা পথের দিকে ইশারা করলে বা বর্ণনা করে বলে দিলে সে বলতে পারে আমি অমুক ব্যক্তিকে হিদায়াত করেছি বা পথ দেখিয়েছি।

এক্ষেত্রে কেউ যদি বলে যে, আল্লাহ্‌র কিতাব কি 'মুত্তাকী' ছাড়া আর কারো জন্য নূর নয় এবং মু'মিন ছাড়া আর কারো জন্য হিদায়াত নয়? এর জবাবে বলা যেতে পারে, মহান আল্লাহ্ এ ভাবেই তাঁর কিতাবের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। যদি কিতাব মু'মিন ও মুত্তাকী ছাড়া আর কারো জন্য নূর এবং হিদায়াত হতো তাহলে তিনি মুত্তাকীদের উল্লেখ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিতেন না যে, এ কিতাব শুধুমাত্র তাদের জন্যই হিদায়াত; বরং বলতেন যে এ কিতাব সাধারণভাবে তাদের সবার জন্যই হিদায়াত যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু তা না বলে এ কিতাবকে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত, মু'মিনদের হৃদয়ের জন্য চিকিৎসা, মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কানের পর্দা, অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের চোখের অন্ধত্ব এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট দলীল বলা হয়েছে। তাই এ কিতাবের প্রতি ঈমান পোষণকারী হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং একে অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট।

هدى শব্দটি একাধিক অর্থের ধারক হতে পারে। প্রথমতঃ কিতাব শব্দটি থেকে আলাদা করে নসব (نصب) পড়া। কেননা শব্দটি نكرة কিন্তু الكتاب শব্দটি معرفة—এ ক্ষেত্রে অর্থ বা ব্যাখ্যা হবে الم ذلك الكتاب هاديا للمتقين অর্থাৎ "আলিফ-লাম মীম ঐ কিতাব মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত দানকারী।" এ ক্ষেত্রে الم ذلك দ্বারা মারফূ (مرفوع) হয়েছে এবং الم - ذلك দ্বারা মারফূ (مرفوع) হয়েছে। আর الكتاب ذلك এর نعت। এ ছাড়া فيه শব্দের ه সর্বনাম যা কিতাব শব্দের পরিবর্তে

ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে আলাদা করে নসব (نصب) পড়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অর্থ হবে الم الذى لا ريب فيه هاديا অর্থাৎ "আলিফ-লাম-মীম যার হিদায়াত প্রদানকারী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।" আবার যুগপৎ এ দুটি কারণেই নসব হতে পারে। অর্থাৎ فيه শব্দের সর্বনাম (هاء) থেকে যা আলাদা করে পড়ে এবং الكتاب থেকে আলাদা করে পড়ে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে الم হবে একটি পূর্ণাংগ বাক্য। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ কথাটিই বলেছেন। তিনি বলেছেন, الم-এর পূর্ণ রূপ হলো انا الله اعلم-আমি আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত। এ ক্ষেত্রে ذلك الكتاب হবে নতুন خبر আর الكتاب যালিকা (ذلك) দ্বারা মারফূ (مرفوع) হবে, এবং যালিকা (ذلك) আল-কিতাব (الكتاب) দ্বারা মারফূ হবে। هدى শব্দটি হবে কিতাবের অংশ। فيه শব্দের মধ্যে হা (ه) সর্বনাম যালিকা (ذلك)-র সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ذلك মারফূ (مرفوع) হবে। আর الكتاب হবে তার نعت। আর فيه শব্দের হা (هاء)-এর সাথে সম্পৃক্ত হবে هدى শব্দটি। هدى শব্দটিকে মারফূ করলে ذلك الكتاب নতুন خبر ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে الم হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। তবে শুধুমাত্র একটি কারণেই তা বাহ্যত হতে পারে। অর্থাৎ هدى-কে মাদহের অর্থে মারফূ পড়লে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য স্থানে বলেছেন الم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى و رحمة للمحسنين কুরআনের কুররা যা কারীদের একটি কিরাআতে رحمة শব্দটি مرفوع পড়া হয়েছে ايات শব্দের مدح হিসেবে। এ ক্ষেত্রে هدى শব্দটির উপরে তিনটি কারণে رفع জায়েয হবে। প্রথম কারণ যা আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ এটি নতুন مدح। দ্বিতীয় কারণ হলো এটি যালিকা ذلك শব্দের مرافع হবে। আর كتاب হবে যালিকার نعت। তৃতীয় কারণ হলো لا ريب فيه এর স্থানে تابع হবে। আর فيه এদের সর্বনামের কারণে ذلك الكتاب মারফূ হবে। তাহলে তা আল্লাহর وهذا كتاب انزلناه مبارك বাণীটির অনুরূপ হবে। আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞ প্রাচীন কুফাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, الم - كتاب। ذلك-এর مرافع। এ ক্ষেত্রে বাক্যটি দাঁড়াবে هذه الحروف من حروف المعجم ذلك الكتاب الذى وعدتك ان او حيه اليك, অর্থাৎ আরবী বর্ণমালার এই বর্ণগুলোই সেই কিতাব যা আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে পাঠানোর ওয়াদা আমি আপনার সাথে করেছিলাম। তারপর তারা অতি দ্রুত তাদের একথাটি বাতিল করে দিয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে যে, هدى শব্দটিও দুটি কারণে মারফূ (مرفوع) ও দু'টি কারণে মানসূব (منصوب) হবে। মারফূ হওয়ার দুটি কারণের একটি হলো كتاب। শব্দটি ذلك শব্দটির نعت হবে مرفوع স্থানে বসে ذلك-এর খবর হবে। এভাবে বাক্যের যে রূপ দাঁড়ায় তাহলো ذ لك لا شك فيه। যদি لا ريب فيه আয়াতাংশের খবর ধরে নেয়া হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও هدى শব্দটি মারফূ' হবে। কারণ তখন তা لا ريب فيه আয়াতাংশের স্থানে تابع হবে এবং তা আল্লাহ তাআলার বাণী وهذا كتاب انزلناه مبارك -এর অনুরূপ হবে। একথা দ্বারা যেন এটাই বলা হলো যে, এটি একটি হিদায়াতের গ্রন্থ এবং এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এরূপ এবং এরূপ। আর هدى শব্দটির মানসূব হওয়ার দুটি কারণের একটি হলো, যদি الكتاب-কে ذلك-র خبر হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে هدى-কে স্বতন্ত্রভাবে نصب দেয়া যাবে। কারণ هدى হলো نكرة যা একটি معرفة-র সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। এমতাবস্থায় তার خبر-ও থাকবে। এভাবে এতে نصب দেয়া হবে। কারণ نكرة কখনো معرفة-র বর্তমানে দলীল হতে পারে না। আর কেউ ইচ্ছা করলে هدى-কে فيه-এর هاء থেকে আলাদা করে نصب দিতে যেতে পারে। একক্ষেত্রে যেন বলা হলো: لا شك فيه هاديا। ইমাম আবু জাফর তাবারী

বলেছেন : এখানে মূলকে পরিত্যাগ করা হয়েছে যার মূল নিহিত আছে الم-এর মধ্যে। আর الم। ذلك। الكتاب দ্বারা মারফূ হয়েছে। এ বিষয়টিকে তারা পরিত্যাগ করেছে। এক্ষেত্রে মূলের মূলকে গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। অর্থাৎ একটি ক্ষেত্র ছাড়া কোন অবস্থায় هدى শব্দটিকে মারফূ' না করা। উক্ত কারণটি হলো هدى -এর নতুনভাবে مدح হয়। অন্যথায় هدى শব্দটি ذلك শব্দটির খবর হওয়া অথবা لا ريب فيه-এর স্থলে قاطع হওয়ার ক্ষেত্রে তার কথা ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। অর্থাৎ الم যদি ذلك الكتاب-কে رفع দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে هدى শব্দটি ذلك-এর خبر হতে পারে না। অর্থাৎ هدى শব্দটি ذلك শব্দটিকে মারফূ' করতে অথবা لا ريب فيه-এর স্থলে قاطع করতে পারে না। কারণ خبر-কে পূর্ণাঙ্গ করার নিমিত্ত هدى তখন মানসূব হবে।

للمتقين-এর ব্যাখ্যা

হাসান বসরী (র) 'মুত্তাকীন' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : যারা হারাম বস্তু থেকে সাবধান থাকে এবং ফরযসমূহ আদায় করে তারাই 'মুত্তাকী'। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 'মুত্তাকী' শব্দটির ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে এরূপ : যারা হিদায়াতকে বর্জন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর নির্দেশকে সত্য প্রতিপন্ন করার কারণে রহমতের আশা করে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবা থেকে هدى للمتقين বাণীটির ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, 'মুত্তাকীন' শব্দের অর্থ হলো মু'মিনীন বা মু'মিনগণ। আবু বাক্‌র ইবনে আইয়াশ বলেন : আমাশ আমাকে মুত্তাকীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে জবাব দিলাম। তিনি আমাকে বললেন : তুমি কালবীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : যারা কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকে। তিনি বলেন : এরপর আমি আমাশের কাছে ফিরে এসে তাকে তা জানালাম। তিনি বললেন, হাঁ, তাই। তিনি কালবী কর্তৃক বর্ণিত অর্থ অস্বীকার করলেন না। সাঈদ ইবনে আবী আরূবা বলেন : আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, মুত্তাকী কারা? তাঁদের পরিচয় ও গুণাবলী কি? তিনি কুরআনের এই আয়াত পড়ে তাঁদের পরিচয় ও গুণাবলী তুলে ধরলেন :

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون -

"যারা গায়েবে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমার দেওয়া রিয্ক থেকে খরচ করে।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) للمتقين কথাটির অর্থ করেছেন, যেসব ঈমানদার শিরক থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করে। তবে মহান আল্লাহর বানী هدى للمتقين-এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো মহান আল্লাহ যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন যারা তা থেকে বিরত থাকে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং এভাবে তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকে। আর তাঁর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে তাঁকে ভয় করে এবং ফরযসমূহ আদায় করে। মহান আল্লাহ তাঁদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা তাকওয়ার অনুসারী। আর তাঁদের তাকওয়াকে তাঁদের কোন ৫ ঢ় ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করেননি। তাই এ ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোন দলীল ছাড়া কোন নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে তাকওয়াকে গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না। কেননা এটা একদল লোকের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী। তাকওয়ার সাধারণ অর্থ পরিত্যাগ করে যদি তাকে নির্দিষ্ট কোন বিশেষ অর্থে গণ্ডিবদ্ধ করা হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের মাধ্যমে অথবা তাঁর রসূলের জবানীতে

বর্ণনা করে দিতেন। তবে তাও একমাত্র তখনই সম্ভব ছিল যদি কোন কারণে তাকওয়ার সাধারণ অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হতো। তাহলে যাদের মতে 'মুত্তাকীন' শব্দের অর্থ হলো যারা শিরক থেকে দূরে থাকে এবং মোনাফেকী থেকে পবিত্র থাকে-তাদের এমতটি বাতিল হয়ে যায়। কারণ কখনো কখনো এরূপ হয়ে থাকে। তাই সে ফাসেক, তার মুত্তাকী হওয়ার যোগ্যতা নেই। তবে এর অর্থ যদি মোনাফেকী, হারাম ও ফাহেশা কাজে লিপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর ফরযকে নস্যাত করা হয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা। যারা এ ধরনের কাজে লিপ্ত হয় একদল আলেম তাদেরকে মোনাফেক বলে অভিহিত করেন।

তা'হলে এ সংজ্ঞা অনুসারে মুত্তাকী-তাকওয়ার অনুসারী হবে। যদিও তা নামকরণ ক্ষেত্রে বাস্তবের বিপরীত হয়, তথাপি যে ব্যক্তি এ নামের সহিত এরূপ হবে, সে ব্যক্তিকে মুনাফিকের গন্ডি-ভুক্ত করা হলে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী لِلْمُتَّقِينَ 'মুত্তাকীগণের জন্য"—এর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার সঠিক ব্যাখ্যাদাতা হবেন।

الذين يؤمنون-এর ব্যাখ্যা

একাধিক সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি الذين يؤمنون (যারা ঈমান আনয়ন করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, يصدقون (যারা সত্যরূপে বিশ্বাস করে)।

রবী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি يؤمنون (তারা ঈমান আনয়ন করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, يخشون "তারা ভয় পোষণ করে।" ইমাম জুহরী (র) ايمان-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ঈমান হলো আমল করা। আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ঈমান হলো সত্যরূপে বিশ্বাস করা। আর আরবদের পরিভাষায় ঈমান হলো তাসদীক—সত্যরূপে বিশ্বাস করা। সুতরাং যখন কেউ কোন বস্তু সম্পর্কে কোন কথা বিশ্বাস করে, তখন তাকে তদ্বিষয়ে মু'মিন-(বিশ্বাসী) বলা হয়। আর যে ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে তার কথার সত্যতা প্রমাণকারী হয়, তাকে সে বিষয়ে মু'মিন বলা হয়। আর এ অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ১৭; وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (যদিও আমরা সত্যবাদী তথাপি আপনি আমাদের "প্রতি বিশ্বাসী" নন) ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আপনি আমাদের কথায় আমাদেরকে সত্যরূপে স্বীকার করেন না। ঈমানের অর্থে আল্লাহর ভয় রয়েছে, যার তাৎপর্য হলো আল্লাহর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা এবং কার্যে পরিণত করা। আর ঈমানের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। শব্দটি আল্লাহ্ তাআলা, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রসূলগণ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি এবং কার্য মাধ্যমে সেই স্বীকারোক্তিকে সত্যে পরিণত করা।

আর যখন তা' এরূপই তখন আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এটাই উত্তম এবং মু'মিনগণের হিসেবে সর্বাধিক উপযোগী যে, তারা কথা, কাজ ও বিশ্বাস, সর্বক্ষেত্রে গায়েবের প্রতি ঈমানের গুণে গুণান্বিত হবে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা জাল্লাশানুহু তাদেরকে ঈমানের বিভিন্ন অর্থের মধ্য বিশেষ কোন অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি—এর অর্থসমূহের মধ্যে বিশেষ কোন অর্থের মধ্যে সীমিত না করে তাদেরকে ঈমানের গুণে গুণান্বিত রূপে বর্ণনা করেছেন।

بالغيب (অদৃশ্য)-এর ব্যাখ্যা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি بالغيب-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যা' তাঁর নিকট হতে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে 'আব্বাস (রা) হতে (দ্বিতীয় সনদে) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, 'গায়ব' হলো যা বেহেশত, দোযখ সম্পর্কীয় এবং পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক এতদসংক্রান্ত যা কিছু উল্লেখ করেছেন—যে ব্যাপারে আরবের মু'মিনদের নিজেদের কিতাব এবং ধর্মীয় জ্ঞানে ইতিপূর্বে বিশ্বাস ছিল না। যির (زر) হতে বর্ণিত আছে যে, গায়ব অর্থ আল-কুরআন। হযরত কাতাদাহ الذين يؤمنون بالغيب (যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস পোষণ করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা বেহেশত, দোযখ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস পোষণ করেছে। এগুলো সবই (গায়ব) অদৃশ্য।

রবী ইব্‌নে আনাস الذين يؤمنون بالغيب -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা আল্লাহ্ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর প্রেরিত রসূলগণ, পরকালের, বেহেশ্‌তের, দোযখের এবং তাঁর সাক্ষাত লাভের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর এগুলো সবই অদৃশ্য (গায়ব)।

যে সব বস্তু অদৃশ্য মূলতঃ ঐসবকেই গায়েব বলা হয়। আর তা আরবদের বাগধারা غاب فلان يغيب غيبا (অমুক পুরাপুরিভাবে অদৃশ্য হয়েছে)।

এই সূরায় প্রথম দুটো আয়াতে যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তাদের অদৃশ্যে বিশ্বাসসহ যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করতে গিয়ে ভাষ্যকারগণ মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তারা হচ্ছে আহলে কিতাব ব্যতীত বিশেষভাবে আরবীয় মু'মিনগণ। আর তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা ও তাঁদের ব্যাখ্যার বাস্তবতার উপর এ আয়াত দু'টির মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন। আর তা' হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী و الذين يؤمنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلك (আর যারা ঈমান আনে আপনার উপর যা নাযিল হয়েছে এবং যা' আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে তার উপর)। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন, তৎপূর্বে আরবদের জন্য এমন কোন কিতাব ছিল না, যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, স্বীকারোক্তিকরণ ও যার উপর আমল করার মাধ্যমে তারা ধর্ম পালন করতে পারে এবং কিতাব তো ছিল, এ কিতাব ছাড়া অন্য দু' কিতাবের অনুসারী (অনারবদের জন্য)। তাঁরা বলেন, অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করার পর যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা—যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও তৎপূর্ববর্তী কিতাবের উপর ঈমান আনয়নকারীদের সংবাদ প্রসঙ্গে—আলোচনা করেছেন, সেহেতু আমরা বুঝতে পারি যে, তাদের প্রত্যেক দল অপর দল হতে ভিন্ন। আর অদৃশ্যে বিশ্বাসীগণ এবং উভয় কিতাবে বিশ্বাসীগণ যার একটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আর অপরটি তাঁর পূর্ববর্তী আল্লাহ্‌র রসূলগণের উপর অবতীর্ণ, ইহাদের উপর বিশ্বাস পোষণকারীগণ পৃথক শ্রেণী। তাঁরা বলেন, যখন ব্যাপারটি এরূপই, তবে আমাদের এ দাবী সঠিক হয়েছে যে, الذين يؤمنون بالغيب এই আয়াতাংশে গায়েব বিশ্বাসী হিসাবে ঐ সব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যাঁরা বেহেশ্‌ত, দোযখ, পুন্য, শাস্তি, পুনরুত্থান আল্লাহ্‌কে সত্য জানা এবং জাহিলী যুগে আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর যে ধর্মীয় 'আমল ওয়াজিব ছিল এই সব কিছুতে বিশ্বাস রাখেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, অদৃশ্য বিষয়ের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ হচ্ছেন ঈমানদার আরবগণ, আর তাঁরা সালাত কায়েম করেন ও আমি যা' তাদেরকে উপজীবিকা দান করেছি, তা হতে (আমার রাহে) ব্যয় করেন। আর অদৃশ্য হচ্ছে যা' বান্দাদের নিকট অদৃশ্য। যেমন, বেহেশ্‌ত ও দোযখের বিষয় এবং যা' আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন। এ সকল বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ইতিপূর্বে কোন কিতাবের ভিত্তিতে অথবা তাদের কিতাব ও জ্ঞানের ভিত্তিতে ছিল না। আর যারা ঈমান আনয়ন করে সেই কিতাবের প্রতি যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে, এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে, আর যারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এরাই হচ্ছে তখনকার আহলে কিতাব মুমিন।

আর কেউ কেউ বলেছেন, বরং এ চারটি আয়াতই বিশেষভাবে আহলে কিতাবের মধ্য হতে ঈমান আনয়নকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

কিতাবীরা নিজেদের মধ্যে বহু জিনিস গোপন রাখত। কুরআন করীমে আল্লাহু তাআলা যখন সেই সম্বন্ধে জানিয়ে দিলেন এবং ওহীর মাধ্যমে রসূলে (স)-এর কাছে যখন ঐ সব কিছু প্রকাশ করে দিলেন তখন তারা বুঝে ফেলল যে এই কিতাব অবশ্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ফলে তারা রসূল (স)-এর উপর ঈমান আনে এবং কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। সাথে সাথে কুরআন করীমে উল্লেখিত এমন সব গায়ব সম্পর্কীয় বিষয়েও তারা বিশ্বাস স্থাপন করল যা তারা জানত না। কেননা তারা নিজেদের মধ্যে যা গোপন রাখত তা-ও যখন আল্লাহু তাআলা দলীল-প্রমাণ সহ কুরআনে বলে দিলেন তখন অপরাপর গায়েব সম্বন্ধীয় বিষয়ও সঠিক হবে বলে তাদের প্রত্যয় সৃষ্টি হয় এবং পুরা কিতাবটিই যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই বিষয়ে তাদের দ্বিমত রইল না।

তাদের মধ্যে আরো কেউ কেউ বলেছেন, এই সূরার প্রথম চারটি আয়াত আরব, অনারব সমস্ত মুমিনের গুণাবলী বর্ণনা করে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে তবে কিতাবীদের ব্যতীত। বস্তুত ইহা এক শ্রেণীর লোকের বিশেষণ। আর আল্লাহু তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা' নাযিল করেছেন তার উপর এবং তৎপূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান আনয়নকারী হচ্ছে, অদৃশ্যে ঈমান আনয়নকারী। তাঁরা বলেন যে আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে অদৃশ্যে ঈমান আনয়নের সহিত বিশেষিত করার অব্যবহিত পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা' নাযিল হয়েছে এবং যা' তৎপূর্বে নাযিল হয়েছে তদুপরি ঈমান আনয়নের কথা। এ জন্য বিশেষিত করেছেন যে, যেহেতু তিনি তাদেরকে অদৃশ্যে ঈমান আনার সহিত বিশেষিত করেছেন, তদ্বারা এ অর্থই উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা বেহেশ্‌ত, দোযখ, পুনরুত্থান ও অপরাপর যাবতীয় বিষয় যার প্রতি ঈমান আনার সহিত আল্লাহু তা'আলা তাদের বাধ্য করেছেন, এবং যা' তারা প্রত্যক্ষ করে নি, তারা এ সবের উপর ঈমান আনয়ন করেছে। অতঃপর তিনি তাদের সম্পর্কে যে বিশেষণ প্রয়োগ করার ছিল তা' প্রয়োগের পর তাদের সম্পর্কে সংবাদ দান করা ব্যতীত কোন বিশেষণ আনয়ন করেননি। আর সে সংবাদ হচ্ছে এই যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা' আনয়ন করেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী রসূলগণ যা' আনয়ন করেছেন ও কিতাবসমূহ (যা' রসূলগণ কর্তৃক আনিত হয়েছে)-এর উপর ঈমান রাখে। তাঁরা

বলেন, সুতরাং যখন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী و الذين يؤمنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلك (আর যারা আপনার উপর যা নাযিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতারিত হয়েছে তার উপর ঈমান রাখে)-এর অর্থ الذين يؤمنون بالغيب "(যারা অদৃশ্যে ঈমান আনয়ন করে)" মধ্যে বিদ্যমান ছিল না, তাই বান্দাগণের নিকট তাদের বিশেষণ সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনের আলোকে অদৃশ্যে ঈমান আনয়নের সহিত বিশেষিত হয়। এ বিশেষণ সম্পর্কেও অবগতি ও পরিচিতি লাভ করতে পারে। যাতে তারা বান্দার কাজসমূহের মধ্য হতে যে সকল কাজের উপর আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন এবং তাদের বিশেষণ মধ্য হতে যা' তিনি ভালবাসেন, তা' সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে পারে এবং তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদেরকে তাওফিক দান করেন, তারাও সে সকল বিশেষণে বিশেষিত হবে।

যাঁরা এরূপ ব্যাখ্যা দান করেন, তাঁদের সম্পর্কিত আলোচনায় মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, সূরা বাকারার মধ্যে চার আয়াত মু'মিনগণের বিশেষণ বর্ণনায়, দুই আয়াত কাফির-গণের বিশেষণ বর্ণনায় এবং তের আয়াত মুনাফিকগণের বিশেষণ বর্ণনায় নাযিল হয়েছে।

(অন্য-সনদে) মুজাহিদ হতে অনুরূপেই বর্ণিত হয়েছে। (আবূ নাজীহ-এর সনদেও) মুজাহিদ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রবী ইবনে আনাস হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, এই সূরার অর্থাৎ সূরা বাকারার মুখবন্ধ অংশে উল্লেখিত চার আয়াত তাদের উদ্দেশে নাযিল হয়েছে, যারা ঈমান আনয়ন করেছে। আর দু, আয়াত আহজাব যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী কাফিদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে।

আর আমার (ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী), মতে সঠিক ও শুদ্ধ রূপে উত্তম এবং কিতাবুল্লাহ্‌র ব্যাখ্যারূপে সঠিক অধিক সঙ্গত বক্তব্য হচ্ছে উল্লেখিত বক্তব্য দু'টির মধ্য হতে প্রথমোক্ত বক্তব্যটি। আর তা' হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অদৃশ্যে ঈমান আনয়নের সহিত বিশেষিত করেছেন এবং প্রথম দু'আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাদের বিশেষণ উল্লেখ করেছেন, তারা তাদের ভিন্ন অপর লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা নাযিল হয়েছে এবং যা তাঁর পূর্ববর্তী রসূলগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছে—তদুপরি ঈমান আনয়নের সহিত বিশেষিত করেছেন। যেমন ইতিপূর্বে আমি যারা এরূপ বলেছেন তাদের এরূপ ব্যাখ্যার কারণসমূহ বর্ণনা করেছি। আর ইহাও এ বক্তব্যের বিশুদ্ধতার প্রতি নির্দেশ করে যে, ইহা মু'মিনদিগকে যে দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে যে বিশেষণের পর শ্রেণী হিসেবে ব্যবহৃত। আর ইহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক উভয় পক্ষকে শ্রেণী বিভাগ করার পর শ্রেণীস্বরূপ, যেমন আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। আর তিনি তাদের এক শ্রেণীকে অন্তরে ছাপ লাগানো ও মোহরাঙ্কিত, তাদের ঈমান আনয়নে আশাহতরূপে চিহ্নিত করেছেন। আর অপর শ্রেণীকে মুনাফিক—কপটাশ্রয়ী রূপে চিহ্নিত করেছেন, যারা প্রকাশ্যে ঈমান প্রকাশ মাধ্যমে নিজেদেরকে মু'মিন রূপে প্রতারিত করে, আর অন্তরে তারা নিফাক—কপটতা লুকিয়ে রাখে। এ ভাবে তিনি (আল্লাহ তা'আলা) কাফিরদিগকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন তিনি সূরার প্রারম্ভে মু'মিন-দিগকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর গুণ ও বিশেষণ সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তিনি পুণ্য ও শাস্তি মধ্য হতে যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তদ্বিষয়ে অবগত করেছেন। আর তাদের মধ্য হতে নিন্দনীয়দের নিন্দাবাদ করেছেন, আর তাদের মধ্য হতে অনুগত শ্রেণীর প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন।

و يقيمون-এর ব্যাখ্যা

(আর তারা প্রতিষ্ঠা করে), সালাত ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ সহ উহাকে যথাযথরূপে আদায় করা, সে ব্যক্তির বেলায় যার উপর তা' ফরজ হয়েছে। যেমন আরবদের ভাষায় বলা হয়—اقام القوم سوقهم। লোকেরা তাদের বাজার প্রতিষ্ঠিত করেছে, যখন তারা তাতে ক্রয়-বিক্রয় করা হতে উহাকে বেকার ফেলে রাখে নাই। আর যেমন কোন কবি বলেছেন—

اقمنا لأهل العرا قين سوق الضراب فخاسوا و ولوا جميعا -

(ইরাকবাসীদের জন্য আমরা ব্যবসায়ের বাজার প্রতিষ্ঠা করেছি, তখন তারা পরস্পরে লেনদেন ও প্রতিযোগিতা করেছে এবং সকলে দারিত্ব গ্রহণ করেছে বা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে)। আর যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি و يقيمون الصلوة-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা সালাতকে উহার ফরযসমূহ সহ যথাযথ ভাবে কায়েম করে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি "তারা সালাত কায়েম করে"-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সালাত কায়েম করা হচ্ছে—রুকু, সিজদা, তিলাওয়াত ও বিনয়-নম্রতা পূর্ণ করা ও তাতে তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়া।

الصلوة (সালাত)-এর ব্যাখ্যা

দাহ্হাক (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী و يقيمون الصلوة-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, অর্থাৎ ফরযকৃত সালাত বা নামায। আরবদের ভাষায় (সালাত) হচ্ছে, দোয়া। যেমন কবি আ'শা বলেছেন,

لها حارس لا يبرح الدهر بيتها - و ان ذبحت صلى عليها و زمزما -

"তার জন্য-প্রহরী রক্ষী রয়েছে, যামানা তার ঘরকে বিচ্ছিন্ন করে না। আর যদি যবেহকৃত হয়, তবে তার জন্য দোয়া করে এবং গুঞ্জরণ করে।" এখানে صلى عليها-এর অর্থ হচ্ছে, তার জন্য দোয়া করে। আর যেমন অন্য কেউ বলেছেন—

و قابلها الريح في دنها - و صلى على دنها وارتسم -

"বাতাস তার বৃহদাকার মটকায় মুখোমুখী হয়েছে। আর তার মটকার জন্য দোয়া করে ও চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে।"

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র)-এর মতে ফরয সালাতকে এজন্য সালাত নামকরণ করা হয়েছে, যেহেতু মুসল্লী তার আমলের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার বা ছাওয়াব আশা করে। একই সাথে সে তার প্রতিপালকের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহানুভূতি প্রার্থনা করে।

وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ-এর ব্যাখ্যা

"আমি যা তাদেরকে উপজীবিকা দান করেছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌র রাহে) ব্যয় করে।" তাফসীরকারগণের মধ্যে এর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য রয়েছে। অনন্তর কেউ বলেছেন, যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা তা থেকে পুণ্য লাভের প্রত্যাশায় যাকাত দান করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের সম্পদের যাকাত।

দাহ্‌হাক (র) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, কতিপয় ব্যয় নৈকট্য অর্জনে সহায়ক ছিল, যদ্দ্বারা তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভে তাঁদের সামর্থ্য ও সাধ্য অনুসারে সচেষ্ট হতেন। এমনকি সূরা বারাআতে ফরয সাদকা সম্বন্ধে সাতটি আয়াত নাযিল হয় যাতে ফরয সাদকাসমূহ উল্লেখ ছিল। এর দ্বারা ফরয সাদকাসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও পূর্বে প্রচলিত সাদকাসমূহ বাতিল হয়।

আর কেহ বলেছেন, যেমন—

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও রসূলুল্লাহ্ (স) এর কয়েকজন সাহাবীর মতে, وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ-এর অর্থ ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে। ইহা যাকাত সম্পর্কিত বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেকার বিষয়।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যাবলীর মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের গুণের অধিক সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে তাঁরা তাঁদের সম্পদের মধ্যে যা কিছু তাদের উপর অপরিহার্য তাঁরা তা আদায় করেন চাই তা যাকাত হোক, কিংবা অন্যবিধ ব্যয় হোক, যার উপর পরিবার-পরিজনের এবং অন্যান্য যাদের ব্যয়ভার বহন করা তার উপর আত্মীয়তার বন্ধন, মালিকানা বা অন্যবিধ কারণে ওয়াজিব হয়েছে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের বিশেষণকে ব্যাপক অর্থে রেখেছেন, এবং তিনি তাঁদের এ ব্যয়ের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং তা সুবিদিত যে, যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের প্রশংসা ও বিশেষণকে কোন বিশেষ ধরনের ব্যয়ের সাথে নির্দিষ্ট করেননি, যার উপর তার কর্তা প্রশংসিত হয়েছেন, এবং অন্য ধরনের ব্যয়কে তা হতে বাদ দেন নি কোন সংবাদ ইত্যাদি মাধ্যমে। তাঁদের দানের প্রশংসা করা হয়েছে এজন্য যে, তারা পবিত্র বস্তু থেকে দান করেছেন, যা এমন হালাল, যার সাথে কোন হারাম মিশ্রিত হয়নি।

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ-এর ব্যাখ্যা

এ বিশেষণে বিশেষিত গুণের বর্ণনা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে কোন শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের হতে ভিন্ন, সে সম্পর্কে আমি এখানে উল্লেখ করব—যা এ আয়াতের ব্যাখ্যার অধীনে উল্লেখিত হয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ "আর যারা ঈমান আনয়ন করে যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল

হয়েছে তার উপর''—এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন, তদ্বিষয়ে তারা আপনাকে সত্যারোপ করে বিশ্বাস করে, আর তারা আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপরও ঈমান আনে। তারা তাঁদের মধ্যে কোনরূপে পার্থক্য করে না এবং তারা সে সমুদয় অস্বীকার করে না, যা' তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট হতে নিয়ে এসেছেন।

আর ইবনে মাসউদ (রা) ও রসূলুল্লাহ (স)-এর একদল সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা - والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون—এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হলো আহলে কিতাবের মধ্য হতে ঈমান আনয়নকারী মুসলিমগণ।

وبالاخرة هم يوقنون-এর ব্যাখ্যা

আবু জাফর তাবারী বলেন, الاخرة (আখেরাত) ইহা হচ্ছে دار-এর সিফাত (বিশেষণ)। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ وان الدار الاخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون

"আর নিশ্চয় পরকালীন নিবাসই চিরস্থায়ী যদি তারা জানতো"—সূরা আনকাবূতঃ ৬৪)। আর ইহাকে এজন্য اخرة (পরকাল)-এর সাথে বিশেষিত করা হয়েছে, যেহেতু তৎপূর্বে যা ছিল সে পূর্ববর্তীটির পরবর্তী হিসেবে অবগত হবে। যেমন, তুমি কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলে থাক,

انعمت عليك مرة بعد اخرى فلم تشكر لى الاولى ولا الاخرة

"আমি তোমার উপর অন্য এক বারের পর আবার অনুগ্রহ করেছি, অথচ তুমি আমার জন্য পূর্ববর্তী অনুগ্রহ বা পরবর্তী অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর নাই।" পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির জন্য একারণে পরবর্তী হয়েছে, যেহেতু পূর্ববর্তীটি তার আগে অগ্রবর্তী হয়েছে। তদ্রূপ دار اخرة বা পরকালীন নিবাসকে এজন্য আখেরাত বা পরকাল নাম দেওয়া হয়েছে, যেহেতু পূর্ববর্তী নিবাস (পার্থিব নিবাস) তার আগে অগ্রবর্তী হয়েছে। সুতরাং তার পরে আগত নিবাস আখেরাত বা পরকালীন নিবাস হয়েছে।

আর আখেরাতকে পরকাল নাম রাখা এ জন্যও জায়েয হতে পারে যে, তা সৃষ্টি হতে পরবর্তী। যেমন দুনিয়াকে সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়ার কারণে দুনিয়া নাম রাখা হয়েছে।

আল্লাহ পাক তাঁর নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান ও আখেরাত সম্পর্কিত যে সব বিষয় নাযিল করেছেন এবং মু'মিনরাও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তা হচ্ছে পুনরুত্থান, হাশরের মাঠে সমাবেশ, পুন্য, শাস্তি, হিসাব-নিকাশ ও মীযান ইত্যাদি যা আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির জন্য কিয়ামতে প্রস্তুত করে রেখেছেন। মুশরিকরা এগুলো সবই অস্বীকার করে।

যেমন' ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وبالاخرة هم يوقنون (আর তারা পরকালে বিশ্বাস পোষণ করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তারা পুনরুত্থান, কিয়ামত, বেহেশত, দোযখ, হিসাব-নিকাশ ও মীযান বা কর্ম লিপি ওযন করা সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে। এর অর্থ হচ্ছে এ'রাই মু'মিন, যাঁরা এ সবে বিশ্বাস পোষণ করে। কিন্তু ঐ সকল লোক নহে, যারা ধারণা করে

যে, তারা আপনার পূর্বে যা ছিল বা যিনি আপনার পূর্বে ছিলেন, তারা তার উপর ঈমান রাখে এবং ঐ সব অস্বীকার করে যা আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে।

আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত এ ব্যাখ্যায় একথাই স্পষ্ট হয় যে, সূরাটি প্রথম হতেই যদিও তার প্রথমে যে সকল আয়াত রয়েছে, তা মু'মিনগণের পরিচয় সম্বলিত, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে আহলে কিতাবের মধ্য হতে কাফিরদের নিন্দায় পরোক্ষ আলোচনা। এসব আহলে কিতাব মনে করে যে, তারা মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে যে সকল নবী ছিলেন, তাঁরা যা কিছু আনয়ন করেছেন, তার উপর বিশ্বাস পোষণকারী এবং তারা মুহাম্মাদ (স)-কে মিথ্যারোপকারী, আর তিনি অবতীর্ণ ওহীর মধ্য হতে যা কিছু লাভ করেছেন, তারা সে সব অস্বীকার করে। আর তারা তাদের এ অস্বীকৃতি সত্ত্বেও দাবী করে যে, তারা সুপথপ্রাপ্ত। আর তারা এ'ও দাবী করে যে, ইহুদী ও নাসারাগণ ব্যতীত অপর কেহ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ সকল দাবীকে তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন ঃ

الم - ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين - الذين يؤمنون بالغيب
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون - والذين يؤمنون بما انزل اليك وما
انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون -

"আলিফ-লাম-মীম, এ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য তা পথ-নির্দেশক। যাঁরা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা জীবিকা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। আর যারা ঐ সব বিষয়ে ঈমান আনয়ন করে যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে আর যা আপনার পূর্বে অবতারিত হয়েছে। আর তারা পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে।"

আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাগণকে এ সংবাদ দান করেছেন যে, এ কিতাব হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি এবং তিনি যা কিছু আনয়ন করেছেন তৎপ্রতি ঈমান আনয়নকারীগণের জন্য পথ প্রদর্শক যারা তাঁর প্রতি যা' অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁর পূর্বের রসূলগণের প্রতি (স্পষ্ট নিদর্শনাবলী যা অবতীর্ণ হয়েছে হিদায়েতের মধ্য হতে) সে সবে বিশ্বাস পোষণ করে। বিশেষভাবে এ কিতাব তাদের জন্যই পথ প্রদর্শক। তাদের জন্য নহে যারা হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তিনি যা' আনয়ন করেছেন, সেসব মিথ্যা জ্ঞান করে। আর দাবী করে যে, তারা মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে যে রসূল ছিলেন এবং তিনি যে কিতাব আনয়ন করেছেন' তাতে বিশ্বাস করে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা আরব ও আহলে কিতাবদের মধ্য হতে মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর উপর যা নাযিল হয়েছে এবং যা পূর্ববর্তী রসূলগণের উপর নাযিল হয়েছে তার উপর বিশ্বাসী মু'মিনদের বিষয়ে তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে নিশ্চয়তা দান করেন ঃ

اولئك على هدى من ربهم و اولئك هم المفلحون -

"তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম।" অনন্তর তিনি সংবাদ দান করেন যে, তারাই বিশেষ ভাবে হিদায়াতপ্রাপ্ত, সফলকাম, অন্যরা নহে। আর অন্যরা হলো পথভ্রষ্ট এবং ক্ষতিগ্রস্ত।

أولـئك على هدى من ربهم-এর ব্যাখ্যা।

আল্লাহ তাআলার বাণী "এরাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে হিদায়াতপ্রাপ্ত"-এর দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা পূর্বোল্লিখিত গুণের অধিকারীদের ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করে এবং যারা হযরত মুহাম্মাদ (স) ও পূর্ববর্তী রসূলগণের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা সে সবের প্রতি বিশ্বাসকারীগণকে বুঝানো হয়েছে, আর তিনি বিশেষভাবে তাদের সকলকে এ গুণে গুণান্বিত করেছেন যে, তারাই তাঁর পক্ষ হতে হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলকাম।

তাফসীরকারদের মধ্যে যাঁরা এ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের আলোচনা।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) ও রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, الـذين يـؤمنون بالغيب দ্বারা আরবদেশী মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর الذين يـؤمنون بما انزل اليك দ্বারা আহলে কিতাব মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে। اولئك على هدى من ربهم و اولئك هم المفلحون দ্বারা উভয় দলকে বুঝানো হয়েছে। (অর্থাৎ তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুপথপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলতা প্রাপ্ত)।

আর কেউ কেউ বলেছেন, বরং الذين يؤمنون بالغيب দ্বারা মুত্তাকীগণকে বুঝানো হয়েছে। আর তারাই হচ্ছে সে সকল লোক যারা সে সবের প্রতি ঈমান আনয়ন করে যা মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তাঁর পূর্ববর্তী রসূলগণের উপর নাযিল হয়েছিল। আর অন্যরা বলেছেন, না বরং আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন— যারা মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা তাঁর পূর্ববর্তী রসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে ঐ সবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। আর তারাই হচ্ছে ঐ সব বিশ্বাসী আহলে কিতাব যারা মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তারাই তাঁর প্রতি সত্যারোপ করেছে। আর তারা ইতিপূর্বেকার সকল নবী ও কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।

আর এই শেষোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এ সম্ভাবনা আছে যে, الذين يـؤمنون بما انـزل اليك বাক্যটি জার (جر) ও রাফআ (رفع)-এর অবস্থায় হবে। আর রাফআ-এর অবস্থাও দুই কারণে হতে পারে। একটি হচ্ছে الـذين সম্পর্কে يـؤمنون بالغيب মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছে তৎপ্রতি আতফ হিসাবে। আর দ্বিতীয়টি হলো, ইহা মুবতাদার খবর হবে। আর اولئك على هدى من ربهم তার রাফআর স্থল হবে। আর জার হবে المتقين-এর উপর 'আতফ হিসাবে। আর যখন তা الذين-এর প্রতি 'আতফ হবে, তখন তাতে দুই প্রকার অর্থের ধারণা সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একটি হলো উভয়টি الذين হবে المتقين-এর সিফাত হবে। আর তা তাঁদের ব্যাখ্যানুসারে, যাঁরা ধারণা করেছেন যে, আলিফ-লাম মীম-এর পর আয়াত চতুষ্টয় মু'মিনদের একই শ্রেণীর প্রসঙ্গে নাযিল

হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, দ্বিতীয় الذين-টি ইরা'বের ক্ষেত্রে متقين-এর প্রতি জারের অর্থে আতফ্ হবে। আর তারা অর্থগতভাবে প্রথম শ্রেণীর বিপরীত একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী। আর এটা তাঁদের মতানুসারে যাঁরা ধারণা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী আলিফ-লাম-মীম-এর পরে প্রথম দু'টি আয়াত মু'মিনদের মধ্য হতে যাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তারা ঐসব ব্যক্তিদের থেকে ভিন্ন যাদের প্রসঙ্গে প্রথম দু'আয়াতের পরবর্তী দু' আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই সম্ভাবনাও আছে যে, দ্বিতীয় الـذين এ হিসাবে মারফূ হবে, استئناف (নবতর বক্তব্য)-এর অর্থে যখন আয়াত পূর্ণ হওয়া ও ঘটনা সমাপ্ত হওয়ার পর তার মাধ্যমে নতুন করে বক্তব্য দান শুরু করা হবে। আর তাতে استئناف নতুন বক্তব্যের ভিত্তিও বৈধ হবে। যখন তা আয়াতের সূচনা বা প্রারম্ভ হিসাবে গণ্য হবে, যদিও তা মূলতঃ متقين-এর সিফাতই হউক না কেন। সুতরাং এখানে চার প্রকারে তাতে রাফআ জায়েয হবে, আর জার জায়েয হবে দু' প্রকারে। আর আমার মতে اولئك على هدى من ربهم-এর ব্যাখ্যাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে, যা আমি ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত হিসাবে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর তাই উত্তম ব্যাখ্যা যে, اولئك "তারা" উভয় দলের প্রতি ইঙ্গিত স্বরূপ গৃহীত হবে। অর্থাৎ মুত্তাকীগণও و الذين يؤمنون بما انزل اليك আর যারা আপনার প্রতি যা' অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি ঈমান আনয়ন করেছে দ্বারা সম্বোধিত বাণী আর اولئك শব্দটি على هدى من ربهم বাক্যে ব্যবহৃত هم সর্বনাম-এর পুনরুল্লেখের মাধ্যমে রাফাআযুক্ত হবে। আর দ্বিতীয় الذين-টি পূর্ববর্তী বক্তব্যের প্রতি আতফ হবে, যেমন আমি ইতিপূর্বে তার কারণসমূহ উল্লেখ করেছি।

আর আমি এটাকেই আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যারূপে এজন্য গ্রহণ করেছি, যেহেতু আল্লাহ তাআলা উভয় দলের প্রশংসা করেছেন। অতঃপর তজ্জন্য তাদেরকে প্রশংসা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা উভয় দলের মধ্য হতে যে কোন এক দলকে প্রশংসার সাথে নির্দিষ্ট করতে পারেন না, যখন তারা উভয়ে সেই সিফাতের মধ্যে সমভাবে অংশীদার, যা দ্বারা তারা প্রশংসার পাত্র হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলার সুবিচারের দৃষ্টিতে তা জায়েয হতে পারে না যে, দু'টি দল কোন আমলের দ্বারা প্রতিদান লাভের প্রশ্নে সমপর্যায়ের হবে, আর আল্লাহ তাআলা তাদের একদলকে প্রতিদানের সহিত নির্দিষ্ট করবেন, অন্য দলকে বাদ দিবেন এবং অন্য দলটি তার আমলের প্রতিদান হতে বঞ্চিত হবে। আমলের উপর প্রশংসার প্রশ্নটিও একই রকম। কেননা প্রশংসা করা ইহাও এক প্রকার প্রতিদানই বটে। আর আল্লাহ তাআলার বাণী اولـئك على هدى من ربهم -এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ইহারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আলোক প্রাপ্ত এবং তারা দলীল প্রমাণ, দৃঢ় সংকল্প চিত্ততা ও সঠিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা এবং তিনি তাদেরকে তাওফিক দান করার কল্যাণে। যেমন ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে' তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আলোকপ্রাপ্ত এবং তারা তাদের নিকট আনীত শরীআতের উপর অবিচল নিষ্ঠার অধিকারী।

و اولـئك هم المـفـلحون-এর ব্যাখ্যা

আর তাঁর উক্ত বাণী ("আর তারাই সফলতা প্রাপ্ত")-এর ব্যাখ্যা হলো এরাই তাদের আমলসমূহ এবং আল্লাহ তাআলা, তাঁর কিতাবসমূহ ও রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার কল্যাণে সাফল্যমণ্ডিত হওয়া, আল্লাহ তাআলার নিকট যা কামনা করেছে তা প্রাপ্ত হওয়া, পুণ্য ও প্রতিদান

লাভে ধন্য হওয়া, বেহেশতে চিরস্থায়ী রূপে প্রবেশ করা এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর শত্রুগণের জন্য যে শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন, তা হতে পরিত্রাণ লাভ করা। যেমন ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি اولـئك هـم المـفـلحون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ যারা পেয়েছে ঐ বস্তু যা তারা কামনা করেছে, আর সে সকল অনিষ্টকারিতা হতে মুক্তি পেয়েছে যা হতে তারা বাঁচতে চেষ্টা করেছে।

আর এ কথার প্রমাণ যে, فلاح (সফলতা)-এর এক অর্থ হলো, অভিপ্রেত বস্তু লাভ করা ও প্রয়োজনীয় বস্তু লাভে ধন্য হওয়া। যেমন কবি লাবীদ ইব্‌নে রবীআর নিম্নোক্ত কবিতা ঃ

اعـقـلى ان كـنـت لا تـعـقـلى — ولـقـد افـلح من كان عـقل -

"তুমি উপলব্ধি কর, যদি তুমি উপলব্ধি না করে থাক। আর সেই সফলকাম হয়েছে, যে উপলব্ধি করেছে।" অর্থাৎ সে তার প্রয়োজন পূরণে কামিয়াব হয়েছে এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এ অর্থেই কোন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারী বলেছেন,

عدمت امًا ولـدت رباحا - جاءت بـه مفركما فـركاحا -

تحسب ان قـد ولـدت نجاحا - اشهد لا يـزيـدها فلاحا -

"সে যা কিছু লাভজনক বানিয়েছিল তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। পরিণামে তা' এমনি পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, যেন পাহাড়ের পাদদেশ খননকারীর ন্যায় পলায়ন করা। সে তো ধারণা করে যে, সে সাফল্য অর্জন করেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তা তার জন্য অধিক কল্যাণ বয়ে আনবে না।" অর্থাৎ কল্যাণ ও প্রয়োজনের আয়োজন হওয়া। আর فلاح শব্দটি মাসদার, যেমন বলা হয়, فـلـحا و فلاحا, افلاحا و افـلـح فلان يـفـلـح আর فلاح শব্দটি بـقاء (স্থায়িত্ব) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই কবি লাবীদ বলেছেন,

نحل بلادا كلها حل قـبـلـنـا — ونـرجو الفلاح بـعد عاد و حمير -

"আমরা অবতরণ করব সে সকল শহরে, যাতে সে আমাদের পূর্বে অবতরণ করেছে। আর আমরা স্থায়িত্বের প্রত্যাশা করি, আদ এবং হিময়ার গোত্রদ্বয়ের পরে।" এখানে কবি فلاح দ্বারা স্থায়িত্ব বুঝিয়েছেন, আর এ অর্থেই বনী যুবয়ানের কবি নাবিগাহ বলেছেন—

افـلـح بـما شئت فـقد يـبـلـغ بالضعف و قـد يخدع الاريب -

"তুমি যেমন ইচ্ছা জীবন যাপন কর ও বিরাজমান থাক। একদিন দুর্বলতায় পৌঁছুবে, আর তখন জ্ঞানী ব্যক্তিও হতবল হয়ে যাবে।" এখানে কবি افـلـح দ্বারা জীবন যাপন কর ও বিরাজ কর এ অর্থ বুঝিয়েছেন। তদ্রূপ বনী যুবয়ানের কবি নাবিগাহ্ এ অর্থেই বলেছেন—

وكل فتى متشعب شعوب - وان اثرى وان لاقى فلاحا -

"যুবক মাত্রকেই বৃদ্ধ হতে হবে—যদিও সাফল্য পদ চুম্বন করে।" অর্থাৎ তার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া ও স্থায়িত্ব লাভ করা।

ان الذين كفروا سواء عليهم أ انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون - ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم -

"যারা নাফরমানী করেছে, তাদের জন্য উভয় সমান, চাই আপনি তাদের সতর্ক করুন কিম্বা সতর্ক না করুন, তারা ঈমান আনবে না,। আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে মোহরাংকিত করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখে আবরণ রয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

ان الذين كفروا ... لا يؤمنون -এর ব্যাখ্যা

এ আয়াতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং কাদের সম্পর্কে তা নাযিল হয়েছে এ বিষয়ে তাফসীরকারগণ মতভেদ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) এ প্রসঙ্গে বলতেন, যেমন সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা) ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ان الذين كفروا (যারা নাফরমানী করেছে)। অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে, তাকে যারা অস্বীকার করেছে। যদিও তারা বলেছে যে, আমরা তো তোমার পূর্বে আমাদের নিকট যা এসেছে, তার উপর ঈমান এনেছি। আর ইবনে 'আব্বাস (রা) এ অভিমত পোষণ করতেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে সেই ইয়াহুদীদের সম্পর্কে যারা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতো। এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইয়াহুদীদের প্রতি তিরস্কার স্বরূপ। কেননা তারা মহানবী (স)-কে অস্বীকার করতো এবং মিথ্যা জ্ঞান করতো যদিও তারা তাঁকে চিনতো এবং জানতো যে, তিনি তাদের ও সকল মানুষের জন্য প্রেরিত আল্লাহ তাআলার রসূল।

আর ইবনে আব্বাস (রা) হতে একথা বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার প্রারম্ভে একশত আয়াত পর্যন্ত কতিপয় লোকের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তিনি তাদের নামধাম ও বংশ পরিচয় উল্লেখ করেছেন। ইয়াহুদী পুরোহিত এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মুনাফিকদের সম্পর্কে আমি এখানে তাদের নাম উল্লেখ করে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করা সমীচীন মনে করেছি না।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে এর ব্যাখ্যায় অন্য একটি অভিমতও উধৃত হয়েছে। তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ আবু তালহা (রা) ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ان الذين كفروا سواء ... لا يؤمنون—আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) আগ্রহ পোষণ করতেন যেন সকল মানুষ ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর হেদায়াতের অনুসরণ করে। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ সংবাদ দান করেছেন যে, যার নেককার হওয়া সম্পর্কে লাওহে মাহফুজে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে ব্যতীত অপর কেউ ঈমান আনবে না। আর যার সম্পর্কে তথায় আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে বদকার হওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে ব্যতীত অপর কেউ পথভ্রষ্ট হবে না!

রবী ইবনে আনাস (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আয়াত দুটি কাফের দলপতিদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে. অর্থাৎ ان الذين كفروا হতে ولهم عذاب عظيم পর্যন্ত আয়াত দুটি। তিনি বলেন, আর তারা হচ্ছে সেই সকল লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করেছেন—

الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دارالبوار - جهنم يصلونها وبئس القرار ○

"আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছেন. যারা আল্লাহ্‌র নিআমতকে কুফরীর মাধ্যমে পরিবর্তিত করেছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের নিবাস জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে? তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তাও হচ্ছে নিকৃষ্টতম অবস্থান ক্ষেত্র"– (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৮)।" তিনি বলেন, আর তারা হচ্ছে সেই সকল লোক যারা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।

আর এ সকল ব্যাখ্যার মধ্যে ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে উত্তম যা' সাঈদ ইব্‌নে জুবায়ের (র) উদ্ধৃত করেছেন। যদিও এ সম্পর্কে আমি বাঁদের মত উল্লেখ করেছি, তাঁরা যা' বলেছেন, তার মধ্য হতে প্রত্যেকটি কথার পিছনে এক একটি মাজহাব বা মূলনীতি রয়েছে। অনন্তর যাঁরা রবী ইব্‌নে আনাস (র)-এর উক্তি মতে ইহার ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের মূলনীতি হচ্ছে এই যে. মহান আল্লাহ্ তাআলা যখন কাফিরদের এক সম্প্রদায় সম্পর্কে এ সংবাদ দান করেছেন যে, তারা ঈমান আনয়ন করবে না এবং তাদেরকে সতর্ক করা তাদের কোন উপকার সাধন করবে না। অতঃপর দেখা গেল যে, কাফিরদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল বিশেষ করে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সতর্ক করার দ্বারা উপকৃত করেছেন। যেহেতু যে আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ্ (স) এবং তিনি যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে নিয়ে এসেছেন তার প্রতি এ সূরা নাযিল হওয়ার পর ঈমান আনয়ন করেছেন, সেহেতু আয়াতটি বিশেষ শ্রেণীর কাফিরদের সম্পর্কে নাযিল হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অতএব কাফির গোত্রসমূহের দলপতিগণ নিঃসন্দেহে সেই শ্রেণীভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সতর্ক করা দ্বারা উপকৃত করবেন না। এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানদের হাতে তাদেরকে হত্যা করিয়াছেন। সুতরাং ইহার মাধ্যমে জানা গেল যে, তারা সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে উদ্দেশ্য করেছেন। অবশ্য ব্যাখ্যা সমূহের মধ্য হতে আমি যে ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করেছি, তা গ্রহণ করার দলীল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে আপনি সতর্ক করুন কিংবা না করুন, উভয়ই সমান; তারা আদৌ ঈমান আনবে না" (আল-বাকারা ঃ ৬; ইয়াসীন ঃ ১০)। ইহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আহলে কিতাবের মধ্যকার মু'মিনদের সম্পর্কে সংবাদ দান করার পর এবং তাদের পরিচয়, বিশেষণ ও তৎকর্তৃক তাঁর প্রতি তাদের ঈমান আনয়ন, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপনের কারণে তাদেরকে প্রশংসা করার পর উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং

২০—

আল্লাহ তা'আলার হিকমাতের সহিত সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় ইহাই যে, অতঃপর তাদের মধ্যকার কাফিরগণের সম্পর্কিত সংবাদ, তাদের পরিচয়, তাদের অবলম্বন ও অবস্থাদির নিন্দাবাদ, তাদের দুশ্চরিত্র প্রকাশকরণ ও তাদের থেকে দায়মুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হবে। কেননা, তাদের মধ্যকার মু'মিন ও মুশরিকগণ যদিও ধর্মগত পার্থক্যের কারণে তাদের অবস্থা বিভিন্ন হয়েছে, কিন্তু জাতিগত-ভাবে তারা সকলেই এক ও অভিন্ন। এ হিসাবে যে, তারা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রথমেই বনী ইসরাঈলী পুরোহিত য়াহূদী মুশরিকদের সামনে তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স)-এর স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন, যারা তাঁর নবুয়াত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁর নবুয়াতকে অস্বীকার করেছিল এ সম্পর্কে ঐ সব পুরোহিতরা যেসব বিষয় য়াহূদীদের এক সংখ্যাগরিষ্ট অংশ হতে গোপন ও অপ্রকাশ্য রেখে দিয়েছিল, তা আল্লাহ পাক তাঁর নবী (স)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেন। যাতে তারা বুঝতে পারে যে, যিনি তাঁকে এতদ্‌সংক্রান্ত (গোপন রাখার বিষয়ে) সংবাদ দান করেছেন, তিনিই সেই সত্তা যিনি মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন। যেহেতু এ বিষয়টি এমন বিষয়াদিরই অন্তর্গত, যা মুহাম্মাদ (স) কিংবা তাঁর সম্প্রদায় বা তাঁর বংশের লোকেরা কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার পূর্বে জানতো না প্রিয়নবী (স)-এর নবী হওয়ার ব্যাপারে এবং তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু তাদের পক্ষে কিরূপে উম্মী রসূলের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ করা সম্ভব? যিনি উম্মীগণের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন, যিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না এবং অনুমান-আন্দাজ করতেন না। যার উপর ভিত্তি করে বলা যেতো যে, তিনি কিতাবসমূহ পাঠ করেছেন, আর তা থেকে অবহিত হয়েছেন কিংবা ধারণা করেছেন, অতঃপর তা তাদের লেখাপড়া জানা ধর্মযাজকদের নিকট প্রকাশ করেছেন, যারা কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছে। এভাবে যে, তিনি তাদেরকে তাদের গোপন দোষসমূহ, রক্ষিত জ্ঞানসমূহ, গোপনীয় সংবাদসমূহ এবং তাদের অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহের সংবাদ দিয়েছেন। যে বিষয়ে তাদের ধর্মযাজক ভিন্ন অন্যরা অজ্ঞ ছিল। বস্তুতঃ যাঁর ব্যাপারটি এমন, তাঁর দেওয়া সংবাদ আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ হতে হওয়া কঠিন নয় এবং তাঁর সত্যতা আলহামদু লিল্লাহ সুস্পষ্ট। আর যা' এ বিষয়টির বিশুদ্ধতা প্রকাশ করে, আমরা বলেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী যে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন কিংবা না করুন, তারা আদৌ ঈমান আনবে না।

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون -

(সূরা বাকারা—আয়াত ৬) দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন, তারা হচ্ছে য়াহূদী ধর্মযাজক। যারা কুফরী অবস্থায় নিহত হয়েছে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তা' হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাদের সংবাদ আলোচনা করা এবং তাদের নিকট হতে হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রসঙ্গে যে ওয়াদা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তা' স্মরণ করিয়ে দেওয়া। মুনাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচনার পর আল্লাহ তা'আলা ইবলীস ও আদমের আলোচনা সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন—অতঃপর তিনি বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে প্রাসঙ্গিক আলোচনা হিসাবে তাঁর বাণী—

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ... الآيات -

(হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নেয়ামতসমূহ স্মরণ করো, যা তোমাদের দান করেছি)-এর মধ্যে ইবলীস ও আদম (আ) সংক্রান্ত সংবাদ আলোচনা করেছেন। নবী করীম (স)-এর

নবুওয়াত অস্বীকার করায় তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত দলীল পেশ করা হয়েছে। যেহেতু প্রথমতঃ আহলে কিতাবের মু'মিনগণ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং শেষে তাদের মধ্য হতে মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইহাই সঙ্গত যে, মধ্যবর্তী সংবাদও তাদের প্রসঙ্গেই হবে। কারণ কিছু বক্তব্য আনুষঙ্গিকও হয়ে থাকে। হাঁ, বক্তব্য যে সম্পর্কে শুরু হয়েছে, তা থেকে তার কিয়দাংশ বিপরীতমুখী হলে এবং তার স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া গেলে তবে তা মূল বিষয় থেকে ভিন্নতর হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী إن الذين كفروا কুফর-এর অর্থ হচ্ছে جحود অস্বীকার করা। তা এই যে, মদীনার য়াহূদী ধর্মযাজকগণ রসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকার করেছে, আর তা মানুষ হতে গুপ্ত রেখেছে, আর তাঁর ব্যাপারটিকে তারা লুকিয়েছে। অথচ তারা তাঁকে এরূপই চিনতো যেমন তারা নিজেদের সন্তানদের চিনতো।

আরবদের নিকট কুফর শব্দের মূল অর্থ কোন বস্তুকে ঢেকে রাখা। এজন্যই তারা রাত্রিকে كافر (আচ্ছাদনকারী) নাম দিয়েছে। যেহেতু তার অন্ধকার সে যা পরিধান করেছে বা সংমিশ্রিত করেছে, তাকে ঢেকে রাখে। যেমন কোন কবি বলেছেন,

فتذكرا ثقلا رثيدا بعدما — ألقت ذكاء يمينها في كافر

"রাতের বেলায় তার শপথের কার্যকারী স্বরূপ ব্যবহৃত প্রাণীকে নিক্ষেপ করার পর সে তার ঝুঁকে পড়া বোঝার (গর্ভের) কথা স্মরণ করল।"

আর লাবীদ ইবনে রবীআ বলেছেন,

في ليلة كفر النجوم غمامها

"এমন রাতে যখন তার অন্ধকার তারকারাজিকে ঢেকে ফেলেছে।" এখানে كفر শব্দটি غطى (ঢেকে ফেলেছে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্রূপ য়াহূদী ধর্মযাজকগণ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (স)-এর ব্যাপারটিকে ঢেকে ফেলেছে এবং লোকদের থেকে উহাকে গোপন করেছে। অথচ তারা তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং তাঁদের কিতাবসমূহে তাঁর পরিচয় ও গুণাবলী বিদ্যমান পেয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এরশাদ করেন,

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون -

"আমি যে সকল স্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও পথনির্দেশ নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তা'আলা তাদের অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন"—। (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৫৯) আর এরাই সেই সকল লোক যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন :

৫ নং আয়াত

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون -

"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের বেলায় উভয়ই সমান, তারা কখনো ঈমান আনবে না।"

سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون-এর ব্যাখ্যা

سواء (সমান) শব্দটির ব্যাখ্যা হচ্ছে معتدل বা সমতাপূর্ণ, উভয়দিক সমান। এটা تساوى মাসদার হতে নিষ্পন্ন। যেমন এ সম্পর্কে উক্তি متساوى هذان الأمران عندى এ দু'টি বিষয়ই আমার নিকট এক সমান। আর যেমন, هما عندى سواء তারা উভয়ে আমার নিকট সমান, অর্থাৎ هما متعادلان عندى (তারা উভয়ে আমার নিকট পরস্পরে সমপর্যায়ভুক্ত)। আর এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলার বাণী فانبذ اليهم على سواء (তাদের প্রতি সমান ভাবে নিক্ষেপ কর — ৮ : ৫৮)।"

অর্থাৎ তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আহবান করা হয়েছে যুদ্ধের প্রতি। যার ফলে আপনার ও তাদের অবগতি একইরূপ হয়েছে ঐ বিষয়ে যার উপর প্রত্যেক দল পরস্পরের মোকাবেলায় অবস্থান করছে। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী سواء عليهم (তাদের জন্য সমান) অর্থাৎ তাদের নিকট উভয় ব্যাপারই সমান, চাই আপনার পক্ষ হতে তাদেরকে সতর্ক করা হোক বা না হোক, তারা আদৌ ঈমান আনবে না। আমি তো তাদের অন্তকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে মোহরাংকিত করে দিয়েছি।

আর এ অর্থেই আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়েস আল-রাকিয়াত বলেছেন,

تغدى الشهباء نحو ابن جعفر — سواء عليها ليلها ونهارها -

"সেনাদল ইব্‌ন জা'ফার পানে দ্রুত অগ্রসর হয়, তার জন্য রাত্রি ও দিবস সমান।" এর অর্থ হচ্ছে, তার নিকট রাত্রির ভ্রমণ দিবাভ্রমণ একসমান। যেহেতু তাতে কোন দুর্বলতা নাই।

এ অর্থেই অপর একজন কবি বলেছেন,

وليل يقول المرء من ظلماته — سواء صحيحات العيون وعورها -

"আর এমন রাত্রি—লোকেরা যার অন্ধকারের কারণে বলে থাকে, তাতে সুস্থ চক্ষু (নিখুঁত দৃষ্টি-শক্তি) ও অন্ধ একই সমান।" কেননা, সুস্থ চক্ষুষ্মান তাতে অন্ধকারের কারণে অসুস্থ চোখের ন্যায় অস্পষ্ট দেখে।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون (আপনি তাদের সতর্ক করুন কিম্বা না করুন, তারা বিশ্বাস করবে না)। তবে এর দ্বারা বক্তব্য প্রশ্নবোধক আকারে স্পষ্ট হয়েছে। আর তা খবর অর্থে, যেহেতু তা اى (যে কোন)-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়, لا أبالى أقمت أم قعدت (তুমি দাঁড়িয়েছ, না, বসেছো আমরা তার পরোয়া করি না)। এক্ষেত্রে

তুমি সংবাদ দানকারী, প্রশ্নকারী নও। যেহেতু তা ئ-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তার অর্থ এই যে, তুমি যেন বলছো, এ দু'টির মধ্য হতে যে কোনটি তোমার দ্বারা সংঘটিত হোক, আমি তাতে পরোয়া করি না। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم-এর অনুরূপ। কারণ বক্তব্যটির অর্থ হচ্ছে, আপনার পক্ষ হতে তাদের প্রতি এ দু'টির যে কোনটিই সমান ও স্বস্থানে উত্তম, চাই আপনি সতর্ক করার কাজটি করুন বা না করুন।

আর বসরী ব্যাকরণবিদগণের কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, حرف استفهام (প্রশ্নবোধক অক্ষর) سواء-এর সঙ্গে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তা প্রশ্নবোধক হয় না। কেননা যখন কোন প্রশ্নকারী অন্যকে প্রশ্ন করে বলল, তোমার নিকট কি যায়েদ আছে, না আমর। আর তার সাথী তাদের যে কোন একজনকে তার নিকট উপস্থিত থাকা সাব্যস্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের যে কোন একজন অন্যের তুলনায় استفهام বা প্রশ্ন করার সহিত অধিক হকদার নহে। অতএব যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم মধ্যস্থিত سواء শব্দটি تسوية অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তখন সে ইস্তিফহাম সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে। যেহেতু ইহাকে সমতার ক্ষেত্রে তুলনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে আমরা সঠিক ব্যাখ্যাটিই বিবৃত করেছি। সুতরাং এক্ষণে বক্তব্যটির ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, হে মুহাম্মাদ (স)! মদীনার য়াহূদী ধর্মযাজকগণের মধ্য হতে যে সকল লোক আপনার নবুওয়াত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করেছে, আর আপনি যে আমার সৃষ্টি জগতের প্রতি প্রেরিত আমার রসূল, আপনার এ বিবরণটি মানুষের নিকট ব্যক্ত করাকে তারা গোপন রেখেছে, অথচ আমি তাদের নিকট হতে এ মর্মে ওয়াদা-অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি যেন তারা তা গোপন না রাখে এবং তারা তা লোকদের নিকট ব্যক্ত করবে ও তাদেরকে এ বিষয়ে সংবাদ দিবে যে তারা তাদের কিতাবের মধ্যে আপনার পরিচয় পেয়েছে। এদের জন্য উভয়ই সমান কথা, চাই আপনি তাদের সতর্ক করুন বা না করুন, তারা বিশ্বাস করবে না, সত্য দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না এবং আপনার প্রতি ও আপনি যা আনয়ন করেছেন তৎপ্রতি ঈমান আনবে না। যেমন ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তাদের নিকট উল্লেখ সম্পর্কিত যে 'ইলম রয়েছে, তা' সত্ত্বেও কুফরী করেছে এবং তাদের নিকট হতে আপনার সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে, তারা তা' অস্বীকার করেছে। একারণেই আপনার নিকট যা' অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে অন্যান্য নবীগণ কর্তৃক আনিত যা' তাদের নিকট বিদ্যমান আছে, উভয়টির সাথেই অসদ্ব্যবহার করেছে। সুতরাং তারা কিরূপে আপনার সতর্ক করার প্রতি কর্ণপাত করবে? অথচ আপনার সম্পর্কিত যে ইলম তাদের নিকট রয়েছে, তারা তা অস্বীকার করছে।

৬ নং আয়াত

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

"আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং চোখের উপর পর্দা; এবং তাদের জন্য বড় ধরনের শাস্তি রয়েছে।"

খাতাম শব্দটি মূলতঃ মোহর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর খাতিম হচ্ছে সীলমোহর। আর এ অর্থেই বলা হয়, ختمت الكتاب (আমি পত্রে মোহরাঙ্কিত করেছি) যখন তাতে সীলমোহর করি। কেউ যদি আমাদিগকে এ প্রশ্ন করে যে, অন্তকরনের মধ্যে কিরূপে মোহর করা হবে? অথচ মোহর তো'

পেয়ালা, পাত্র ও খামসমূহে করা হয়। তদুত্তরে বলা হবে যে, বান্দাগণের অন্তঃকরণে আল্লাহ্ তা'আলা যে 'ইলম আমানত রেখেছেন, তজ্জন্য তা পেয়ালা বিশেষ এবং বস্তু নিচয়ের যা' কিছু পরিচয় উপলব্ধি তাতে রাখা হয়েছে, তজ্জন্য তা পাত্র স্বরূপ। সুতরাং তদুপর মোহরাঙ্কিত করা এবং শ্রবণেন্দ্রিয়—যার মাধ্যমে শ্রবণীয় বস্তুসমূহ উপলব্ধি করা হয় এবং তারই মধ্যস্থতায় অদৃশ্য বিষয়ের খবরাদির বিস্তর তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়—তাতে মোহরাঙ্কিত করার অর্থ সকল প্রকার পেয়ালা ও পাত্রের মধ্যে মোহরাঙ্কিত করারই অনুরূপ। অতঃপর যদি প্রশ্নকারী পুনঃ বলে যে, তবে কি এর এমন কোন সিফাত আছে, যা আপনি আমাদের নিকট ব্যক্ত করবেন? আর আমরা তা' উপলব্ধি করতে পারব যে, সত্যি কি তা সে মোহরেরই অনুরূপ যা বাহ্য দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ পেয়ে থাকে, না তা তার বিপরীত? তদুত্তরে বলা হবে যে, ব্যাখ্যাকারগণ এর সিফাত সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। আমরা অচিরেই তাঁদের মতামত উল্লেখ করার পর এর সিফাত প্রসঙ্গ উল্লেখ করব।

আ'মাশ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুজাহিদ (র) আমাদেরকে তাঁর হাতের মাধ্যমে দেখিয়ে বলেছেন যে, তাঁদেরকে দেখানো হতো হৃদপিণ্ড এর অনুরূপ। অর্থাৎ হাতের তালুর ন্যায় স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত। অতঃপর যখন বান্দা কোন পাপ কাজ করে তখন তার কারণে সংকুচিত হয়। আর তিনি তাঁর কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দেখিয়ে বলেন, যেমন এরূপ। অতঃপর যখন বান্দা পুনঃ পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার কারণে সংকুচিত হয় এবং অপর একটি অঙ্গুলি দেখিয়ে বললেন, যেমন এরূপ। তার পর আবার যখন বান্দা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার কারণে সংকুচিত হয় এবং আরেকটি অঙ্গুলি দেখিয়ে বললেন, যেমন এরূপ। এভাবে তিনি তাঁর সব কয়টি আঙ্গুলি সংকুচিত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তার উপরে সীলমোহরের সাহায্যে মোহরাঙ্কিত করা হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, তাঁরা এ রায় ব্যক্ত করতেন যে, তা হচ্ছে ময়লা—আবর্জনা। অর্থাৎ মোহরাঙ্কিত করার অর্থ হচ্ছে স্বচ্ছ অন্তরে পাপ-কালিমার ছাপ লেগে যাওয়া।

মুজাহিদ (র) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, অন্তঃকরণ হাতের তালুর ন্যায় স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত। অতঃপর বান্দা যখন পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তখন সে তার একটি অঙ্গুলিকে বক্র করল। এভাবে সব কয়টি অঙ্গুলি বক্র হয়। আর আমাদের সাথীগণ এটাকে আবরণ বলে মত প্রকাশ করতেন।

মুজাহিদ (র) হতে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, পাপ কার্যাদির কারণে অন্তরের উপর চারদিক থেকে দাগ সৃষ্টি হতে শুরু করে। এমন কি শেষ পর্যন্ত সেই দাগ সমূহ তাতে একত্রিত হয় (সম্পূর্ণ অন্তর দাগযুক্ত হয়ে একাকার হয়ে যায়)। আর এ দাগ তাতে একত্রিত হওয়াই ছাপ স্বরূপ আর এ ছাপই হলো তার মোহর। ইবনে জুরায়জ বলেন, এ মোহর হলো অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর স্থাপিত মোহর অংকন।

আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুজাহিদকে বলতে শুনেছেন, আবৃত করা সীলমোহর করা হতে সহজ, আর সীলমোহর করা তালাবদ্ধ করা হতে সহজ। আর তালাবদ্ধ করা এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক কঠিন।

আর তাঁদের মধ্য হতে অন্য কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ختم الله على قلوبهم (আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তঃকরণে মোহরাঙ্কিত করেছেন)—এর তাৎপর্য হল, তাদের অহংকার এবং আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ হতে বিমুখ হওয়া সম্পর্কে সংবাদ রয়েছে এ আয়াতে। যেমন, কারো প্রসঙ্গে বলা হয়, فلان لاصم عن هذا الكلام (অমুক এ কথা হতে বধির)

যখন সে অহংকার বশতঃ তা শ্রবণ করা হতে বিরত থাকে এবং তা উপলব্ধি করা হতে নিজেকে বিমুখ রাখে। আর এক্ষেত্রে আমার মতে সঠিক ব্যাখ্যা তাই, যার অনুরূপ সংবাদ রসূলুল্লাহ (স) হতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে, আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেনঃ "যখন বান্দা কোন পাপকার্যে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ সৃষ্টি হয়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ স্খলন করে বিরত থাকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তার অন্তঃকরণের ময়লা পরিষ্কার হয়। আর যদি সে পাপ অতিরিক্ত করে (পুনঃ পুনঃ পাপকার্যে লিপ্ত হয়) তবে সে দাগ বাড়তে থাকে, এমন কি তার অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলে।" এটাই হচ্ছে সেই আচ্ছন্নতা বা আবরণ, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (কখনও নয়, বরং তারা যা উপার্জন করতো, তা তাদের অন্তঃকরণে আবরণ সৃষ্টি করেছে)। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ (স) এ সংবাদ দান করেছেন যে, যখন পাপকার্য অন্তরে ক্রমাগত দাগ সৃষ্টি করতে থাকে, তখন তা অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর যখন তা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাতে মোহর ও ছাপ সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন তাতে ঈমানের কোন প্রবেশ পথ থাকে না এবং তা থেকে কুফরী বাহির হওয়ার কোন উপায় থাকে না। এটাই সেই ছাপ ও মোহর যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এটা সেই ছাপ ও মোহরের অনুরূপ যা চর্ম চক্ষু, পেয়ালা ও পাত্রসমূহে প্রত্যক্ষ করে থাকে। যার কারণে সে মোহর ও ছাপ ভেঙ্গে ফেলে তা খোলা ব্যতীত তার অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে, তৎপ্রতি পৌঁছানো যায় না। তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলা যাদের সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন যে, তিনি তাদের অন্তঃকরণে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন, তাদের অন্তরেও তার সে মোহর ভেঙ্গে ফেলা ও গ্রন্থি উন্মুক্ত করা ব্যতীত ঈমান প্রবেশ করতে পারে না।

আর দ্বিতীয় মত পোষণকারীগণ যাঁরা মনে করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ-এর অর্থ হচ্ছে, সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক তাদের যে আহবান করেছেন তারা তা অহংকার ও দাম্ভিকতা বশতঃ উপেক্ষা করার বিষয় এখানে বর্ণিত হয়েছে।

এই বর্ণনার দ্বারা তাদের অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি তাদের স্বীকৃতি দানের জন্য যে আহবান করা হয়েছে তৎপ্রতি তাদের উপেক্ষা করার কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কি তাদের পক্ষ হতে সংঘটিত কাজ, না তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সম্পাদিত কাজ? যদি তাঁরা মনে করেন যে, এটা তাদেরই কাজ এবং তা তাদেরই কথা—তবে তাঁদেরকে বলা হবে, আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিই তাদের অন্তঃকরণ ও তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে মোহরাঙ্কিত করেছেন। এমতাবস্থায় এটা কিরূপে বৈধ হতে পারে যে, কাফিরদের ঈমান আনা হতে বিরত থাকা এবং অহংকার বশতঃ তা স্বীকার না করাই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে মোহরাঙ্কিত করা হবে? আর কিভাবে তাদের অন্তর ও শ্রবণেন্দ্রিয় মোহরাঙ্কিত করা আল্লাহ্ তা'আলার কাজ হবে? অথচ তোমাদের মতে এগুলো (অর্থাৎ অহংকার করা ও বিরত থাকা) তাদেরই কাজ। তাঁরা যদি এরূপ মনে করেন যে, হাঁ এমন হওয়া জায়েয বা বৈধ, যেহেতু তার অহংকার করা ও বিরত থাকাটা তার অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট মোহরাঙ্কনের ফলেই সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং মোহরাঙ্কন যেহেতু এ অহংকার ও বিরত থাকার জন্য মূল কারণ হয়েছে, সেহেতু তাদের ধারণায় অন্তরে মোহরাংকন বৈধ হয়েছে।

এমতাবস্থায় ব্যাপারটা এই দাঁড়াবে যে, তাঁরা তাঁদের দাবী ত্যাগ করেছেন—তা হতে সরে গেছেন, এবং তাঁরা একথা সাব্যস্ত করেছেন যে, কাফিরদের অন্তকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার অংকিত মোহর কাফিরদের কৃত কুফরী, তাদের অহংকার এবং ঈমান কবুল করা ও তা স্বীকারোক্তি করা হতে বিরত থাকার নাম নয় আর এটা মূলতঃ তারা যা অস্বীকার করেছে, তাতেই প্রবেশ করা অর্থাৎ স্বীকার করে নেওয়া (যাকে স্ববিরোধিতা বলা হয়ে থাকে)।

আর এ আয়াতটি তাদের মতের অশুদ্ধতার প্রতি সুস্পষ্ট দলীল, যারা বান্দা অসাধ্য বিষয়ে আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত মুকাল্লাফ হওয়াকে অস্বীকার করেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাঁর এক শ্রেণীর কাফির বান্দার অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে মোহরাংকিত করে দিয়েছেন তা সত্ত্বেও তাদের উপর হতে তাকলীফ তথা শরীআতের অনুসরণের বাধ্যবাধকতা রহিত হয়নি, তাদের কারো হতে তাঁর ফয়সালাসমূহ স্থগিত হয়নি এবং তিনি যে তাদের অন্তর ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে মোহরাংকন করেছেন, সে কারণে তারা তাঁর আনুগত্য বিরোধী যে সকল কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তজ্জন্য তাদের কাউকে অক্ষম বা ক্ষমাযোগ্য গণ্য করা হয়নি; বরং তিনি এ সংবাদ দিয়াছেন যে, তাদেরকে যে সকল কাজ করার আদেশ করা হয়েছে এবং যে সকল কাজ হতে বারণ করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তারা তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করার কারণে তাদের সকলের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে। অথচ তাদের সম্পর্কে তিনি চূড়ান্ত ফয়সালা ঘোষণা করেছেন যে, তারা আদৌ ঈমান আনবে না।

وعلى ابصارهم غشاوة-এর ব্যাখ্যা

আর আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী وعلى ابصارهم غشاوة "আর তাদের চক্ষুসমূহে আবরণ রয়েছে" এটা ইতিপূর্বে আলোচিত কাফিরদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার মোহরাংকিত করা সম্পর্কিত সংবাদের সমাপ্তির পর আরেকটি স্বতন্ত্র সংবাদ। আর তা এভাবে যে, غشاوة শব্দটি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী وعلى ابصارهم-এর দ্বারা পেশবিশিষ্ট হয়েছে। আর তা এ কথার দলীল যে, সেটি একটি স্বতন্ত্র সংবাদ এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী ختم الله على قلوبهم এর দ্বারা প্রদত্ত সংবাদ وعلى سمعهم পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। আমাদের মতে দুই কারণে এটাই বিশুদ্ধতম পঠন পদ্ধতি। তার প্রথমটি হলো পাঠরীতি বিশুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ও আলেমগণের সাক্ষ্য দান সংক্রান্ত দলীলের ঐক্যমত এবং প্রতিপক্ষের মতের অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা ও তাদের ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নে বিশেষজ্ঞগণের ইজমা বা ঐকমত। আর তাঁদের এ ইজমাই তারা (প্রতিপক্ষ) ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআন মজীদ এবং রসূলুল্লাহ (স) হতে উদ্ধৃত কোন হাদীসে চোখকে মোহরাংকনের সাথে বিশেষিত করা হয়নি এবং আরবদের কারো ভাষায়ও এরূপ ব্যবহার বিদ্যমান নাই। আর আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের অন্য এক সূরায় ইরশাদ করেছেন وختم على سمعه و قلبه (আর তিনি তার শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে মোহরাংকিত করেছেন), এর পর ইরশাদ করেছেন, وجعل على بصره غشاوة "আর তার চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন।" (সূরা আল-জাসিয়াহ,-আয়াত নং ২৩)। সুতরাং চোখ মোহরাংকনের অর্থে প্রবেশ করেনি। আর

আরবদের ভাষায় এরূপ ব্যবহারই প্রসিদ্ধ। (শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্তরের বেলায় মোহর এবং চক্ষুর বেলায় আবরণ ব্যবহার করাই আরবদের নিকট বহুল প্রচলিত)।

অতএব আমি ইতিপূর্বে যে দুটি কারণ উল্লেখ করেছি, তার প্রেক্ষিতে আমাদের জন্য কিংবা অন্য কারো জন্য غشاوة শব্দটিকে যবর পাঠ করা বৈধ হবে না। যদিও আরবী সাহিত্যে এ ক্ষেত্রে যবর দানেরও একটি প্রসিদ্ধ রীতি চালু আছে।

এতদসম্পর্কে আমরা যা কিছু উক্তি করেছি ও ব্যাখ্যা দিয়েছি, তার সমর্থনে ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার মোহরাংকন তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে আর আবরণ হলো তাদের চক্ষুসমূহে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তবে এতে যবর দ্বারা পাঠ করার রীতি কি? উত্তরে বলা হবে যে, এখানে একটি وجعل ক্রিয়াপদ উহ্যরূপে গণ্য করে তাকে যবর দ্বারা পাঠ করা হবে। যেন আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ বলেছেন—وجعل على ابصارهم غشاوة অতঃপর جعل ক্রিয়া-কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। যেহেতু বাক্যের শুরুতে এমন শব্দ রয়েছে যা তৎপ্রতি নির্দেশ করে। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটাকে السمع-এর ইরাবের অনুকরণে যবর দেয়া হবে। যেহেতু তা নসবের (যবরের) স্থল ছিল। যদিও غشاوة শব্দে পরিবর্তনকারী (عامل) অব্যয়কে পুনরুল্লেখ করা পছন্দনীয় নয়। কিন্তু বক্তব্যের একাংশ অন্য অংশের অনুকরণের ভিত্তিতে তা যবর দিয়ে পঠিত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق

"তাদের সেবায় চিরকিশোরগণ পানপাত্র ও কুঁজোসহ আনাগোনা করবে—" (সূরা ওয়াকিয়াহ, ১৭ ও ১৮ আয়াত)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

وفاكهة مما يتخيرون - ولحم طير مما يشتهون - وحور عين -

"আর তাদের পছন্দনীয় ফলমূল, তাদের কাংখিত পক্ষীর গোশত ও আয়তলোচন—হূরগণ" (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত নং ২০, ২১, ২২)। বস্তুতঃ فاكهة (ফলমূল)-এর উপর আতফ হিসাবে لحم (গোশত) ও حور (হূর) শব্দ দু'টিতে যের দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এটা বক্তব্যের শেষ অংশ, প্রথমাংশের অনুকরণ করার ভিত্তিতে করা হয়েছে। অথচ এটা জানা কথা যে, لحم (গোশত) ও حور (হূর)-এর তাওয়াফ (আনাগোনা) সম্পর্কিত নয়। কিন্তু এটা এরূপ, যেমন কবি তাঁর ঘোড়ার বিবরণ দিয়ে বলেছেন—

علفتها تبنا وماء باردا — حتى شتت همالة عيناها

"আমি তাকে ভূষি ও ঠাণ্ডা পানি ঘাসরূপে সরবরাহ করেছি। এমনকি সে তার চোখের চাহনিকে

বিক্ষিপ্ত করেছে।" আর এটা সুবিদিত যে, পানি পান করা হয়, তা ঘাসরূপে বিবেচনা হয় না। কিন্তু ইহাকে যে কারণে খবর দেওয়া হয়েছে, তা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর যেমন অন্য একজন কবি বলেছেন—

ورأيت زوجك في الوغى — متقلدا سيفا ورمحا

"আর আমি তোমার স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি ও তীর স্কন্ধে বহনকারী অবস্থায় দেখেছি।"

ইব্‌নে জুরাইজ (র) মোহরাঙ্কন সংক্রান্ত সংবাদ প্রসঙ্গে বলতেন যে, তা وعلى سمعهم পর্যন্ত। তারপর নতুন ও স্বতন্ত্র সংবাদের সূচনা হয়েছে। যেমন আমরা এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব কুরআন মজীদের আয়াত فإن يشإ الله يختم على قلبك "(অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিতেন" সূরা শূরা: ২৪)-এর দ্বারা তার প্রদত্ত এ ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা পেশ করেছেন। ইব্‌নে জুরাইজ (র) বলেন, মোহরাঙ্কন অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে, আর আবরণ হয় চোখে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

"আল্লাহ্ তা'আলা তার শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন।" (সূরা জাসিয়াহ্, আয়াত নং ২৩)। আর আরবদের পরিভাষায়, غشاوة (আবরণ) অর্থ غطاء পর্দা বা ঢাকনা। আর এ অর্থেই হারিছ ইব্‌নে খালিদ ইব্‌নে আ'ছ-এর উক্তিটি প্রযোজ্য হয়েছে—

تبعتك إذ عيني عليها غشاوة — فلما انجلت قطعت نفسي الومها

"যখন আমার চোখে আবরণ ছিল, তখন আমি তোমার অনুসরণ করেছি। অতঃপর যখন তা চলে যায়—তখন আমি আমার আত্মাকে পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন করে তিরস্কার করতে থাকি।"

আর এ অর্থেই বলা হয়, تغشاه الهم اذا تجلله وركبه "তাকে দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, যখন তা তাকে আচ্ছাদিত ও প্রলিপ্ত করেছে।"

আর এ অর্থেই যুবইয়ান গোত্রের কবি নাবিগাহ বলেছেন—

هلا سألت بني ذبيان ما حسبي — إذا الدخان تغشى الأشمط البرما

"তুমি কি বনী যুবইয়ানকে জিজ্ঞাসা কর নাই যে, আমার উপায় কি ? যখন ধোঁয়া পত্র পল্লবিত ফলবতী গোছা নামক বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ?" এর দ্বারা কবি আচ্ছাদিত করা ও তাতে সংযুক্ত হওয়াকে বুঝিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে য়াহূদী ধর্মজাযকগণের মধ্য হতে যারা তাঁর সঙ্গে কুফরী করেছে, তাদের সম্পর্কে এ মর্মে সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাদের অন্তঃকরণে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন ও তাতে ছাপ লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি প্রদত্ত সেই সকল উপদেশ উপলব্ধি করে না, যার ইল্ম তাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব তাওরাতের মাধ্যমে তারা অর্জন করেছে এবং যা তিনি তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি প্রত্যাদিষ্ট ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে অবহিত করেছেন। আর তিনি তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন, পরিণামে আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষ হতে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা ও উপদেশ দান করা কিম্বা তাঁর নবুওয়াতের স্বপক্ষে যে দলীল প্রমাণ তিনি তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন, তারা এ সবের কোন কিছুর প্রতিই কর্ণপাত করে না। যদ্বারা তারা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্য নির্ধারিত আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করবে। যদিও তারা তাঁর সত্যতা ও তাঁর বিষয়টির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত আছে। একই সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, হেদায়াতের পথ দেখা হতে তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে। যদ্বারা তারা তাদের পথভ্রষ্টতার শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে। আমরা এর ব্যাখ্যায় যা কিছু উক্তি করেছি, ব্যাখ্যাকারগণের একদলের নিকট হতে এরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ হেদায়াত হতে, তাতে পৌঁছার ব্যাপারে (হেদায়াত পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে) তাদের চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন। তারা আপনার প্রতি যে সত্যের প্রশ্নে মিথ্যারোপ করেছে, যা' আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার কাছে এসেছে। যাতে তারা তার উপর ঈমান আনয়ন করবে। যদিও তারা আপনার পূর্ববর্তী যাবতীয় কিছুর উপর ঈমান আনয়নের দাবী করে।

ইব্ন আব্বাস (র) ও ইব্ন মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। পরিণামে তারা সত্য উপলব্ধি করে না এবং শ্রবণ করে না। আর তাদের চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেন, এ আবরণ তাদের চোখে, ফলে তারা দেখে না।

অন্যান্য ভাষ্যকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা এরূপে করেছেন যে, কাফিরদের মধ্যে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাদের সাথে এরূপ আচরণ করেছেন, তারা সে সকল গোত্রপতি, যারা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

রবী ইব্ন আনাস (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এ দু'টি আয়াতে ولهم عذاب عظيم পর্যন্ত উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ সে সকল লোক - الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار -

"যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে কুফরী গ্রহণ করেছে, স্বজাতীয় লোকদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে"—(সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ২৮)। এরা সে সকল কাফের, যারা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। অনন্তর আবূ সুফিয়ান ইব্‌নে হারব ও হাকাম ইব্‌ন আবিল আ'স ব্যতীত গোত্র প্রধানগণের মধ্য হতে কেউ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেনি।

হাসান বসরী (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কাফির গোত্র প্রধানগণের মধ্য হতে কেউ ইসলামের আহবানে সাড়া দানকারী বা মুক্তিপ্রাপ্ত কিম্বা সুপথপ্রাপ্ত নাই।

আমরা ইতিপূর্বে এ উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে সঠিক ও উত্তমটির প্রতি নির্দেশ করেছি। সুতরাং এখানে তা পুনরুল্লেখ সমীচীন মনে করি না।

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ-এর ব্যাখ্যা

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ইব্‌ন আব্বাস (র) যা করেছেন, আমার মতে তাই উত্তম।

ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা আপনার বিরোধিতা করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি অবধারিত আছে। তিনি বলেন, এ আয়াত য়াহূদী ধর্মযাজকগণের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ। যেহেতু আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে পবিত্র কুরআন আগমন করেছে, তার পরিচয় লাভ করা সত্ত্বেও তারা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে।

৮ নং আয়াত ও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

"এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ আয়াতাংশের মধ্যস্থিত الناس শব্দটিতে দু'টি দিক আছে। তার একটি এই যে, শব্দটি বহু-বচন, এ শব্দটির কোন এক বচন নাই। বরং তার পুংলিঙ্গ একবচনে انسان এবং স্ত্রীলিঙ্গে একবচনে انسانة ব্যবহৃত হয়। আর দ্বিতীয় দিক হলো শব্দটি মূলতঃ اناس ছিল। অতঃপর বহুল ব্যবহার জনিত কারণে الف অক্ষর বিলুপ্ত করা হয়েছে। তারপর তাতে معرفة (মারেফা) তথা নির্দিষ্ট করে বুঝাবার জন্য আলিফ ও লাম যোগ করা হয়েছে। তারপর যে লামটি আলিফ সহ তাতে মারিফার অর্থ দানের জন্য যোগ করা হয়েছে, তাকে নূনের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। যেমন, لكن هو الله ربى "কিন্তু তিনিই আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌"-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। যদ্রূপ আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার নাম প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। যা হলো আল্লাহ্‌।

আর কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, الناس শব্দটি আভিধানিকভাবে اناس নয়। আর আরবগণের

নিকট হতে এর اسم مصغر। (ক্ষুদ্রতা জ্ঞাপক বিশেষ্য) ناس হ'তে أنيس শুনা গিয়েছে। যদি শব্দটি মূলতঃ الناس হতো, তাহলে একে তার মূলের প্রতি প্রত্যাবর্তিত করে أنيس। বলা হতো।

ব্যাখ্যাকারগণ সকলে এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতটি মুনাফিকদের একদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটাই তাদের পরিচয়।

তাফসীরকারগণের মধ্য হতে যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের তাফসীর কতিপয় তাফসীরকারের নাম সহ আলোচনা—

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে তিনি "এবং এমনও কিছু লোক রয়েছে ... ..." আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অর্থাৎ আওস ও খাজরাজ গোত্রের মুনাফিকরা এবং যারা তাদের সাথে এ ব্যাপারে জড়িত ছিল। আর ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এ হাদীছটিতে উবাই ইবনে কা'ব হতে তাদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমি তাদের নামোল্লেখের কারণে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে তাদের নাম বর্জন করেছি। কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

وَمِنَ النَّاسِ ... فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ০ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে বলেন, এ আয়াতগুলো মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ। মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এ আয়াত হতে ত্রয়োদশ আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের পরিচয় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ। ইবনে আবী নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান ছাওরী (র) এক ব্যক্তি হতে তিনি মুজাহিদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা "এমনও কিছু লোক রয়েছে ... ..." আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "তারা হচ্ছে মুনাফিক।"

রবী ইবনে আনাস (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ হতে আরম্ভ করে فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ পর্যন্ত এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো মুনাফিক।

ইবনে জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি উক্ত (৮ নং) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই মুনাফিক হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যার কথা কাজের বিপরীত, যার গোপন অবস্থা প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত, যার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত, যার উপস্থিত অবস্থা অনুপস্থিত অবস্থার বিপরীত।

আর এর ব্যাখ্যা হলো যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স)-এর নবুওয়াতের কার্যক্রমকে তাঁর হিজরতের স্থল মদীনায় প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং তথায় তাঁর স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হলো, আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কলেমাকে বিজয়ী করলেন, তথাকার অধিবাসীগণের ঘরে ঘরে ইসলামকে ছড়িয়ে দিলেন, মূর্তিপূজক মুশরিকদের মধ্য হতে যারা সেখানে ছিল, মুসলমানগণ তাদেরকে পরাভূত করল এবং সেথায় যে সকল আহলে কিতাব ছিল, তারা মুসলমানদের অধীনস্থ হলো। তখন তথাকার য়াহূদী ধর্মযাজকগণ হযরত রসূলুল্লাহ (স)-এর

প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করতে লাগলো এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর প্রতি প্রকাশ্যে শত্রুতা ও বিরোধিতা শুরু করে দিল। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের প্রতি হেদায়েত দান করেছেন এবং তারাই শুধু ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ -

"তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর বিদ্বেষ বশতঃ আবার তোমাদেরকে কাফিররূপে ফিরে পাবার আকাংখা করে"- (সূরা আয়াত নং ১০৯) বাকারা, আর তাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীগণ এবং যাঁরা রসূলুল্লাহ (স)-কে আশ্রয় দিয়েছেন ও তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের শত্রুতা ও বিদ্বেষে আনসারদের স্বগোত্রীয় দুষ্ট লোকেরা গোপনে সহযোগিতা করেছে। তারা তাদের শিরক ও জেহালতের কারণে অহংকার করেছে। তারা আমাদের জন্য তাদের নাম প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমরা তাদের নামধাম ও বংশ পরিচয় উল্লেখ করে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীগণের হাতে হত্যা ও বন্দী হবার ভয়ে এবং য়াহুদীগণের প্রতি মানসিক আকর্ষণহেতু তাদেরকে এ ব্যাপারে গোপনে সাহায্য করছে। যেহেতু তারা শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ইসলাম সম্পর্কে কুধারণা ছিল। সুতরাং তারা যখন রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সাহাবীগণের সাথে মিলিত হতো, তখন তারা আত্মরক্ষার জন্য বলত, আমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূলে ও কিয়ামতে বিশ্বাসী। এবং তারা যে শিরক ইত্যাদির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, তা মুখে প্রকাশ করা হলে তাদের পোষণকৃত এসকল শিরকী আকীদার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার যে বিধান অবধারিত আছে, তা তাদের নিজেদের হতে এড়ানোর উদ্দেশ্যে তারা এসব বলতো। আর যখন তারা তাদের ভাই য়াহুদী, মুশরিক এবং মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর আনীত বিধান অস্বীকারকারীদের সাথে মিলিত হতো, তখন তারা তাদের সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাতে গিয়ে বলতো, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরা তো মুসলমানদের সাথে শুধু উপহাস করে থাকি। আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত (৮ নং) আয়াতে বিশেষভাবে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী দ্বারা তাদের সম্পর্কে এ সংবাদ দান করা উদ্দেশ্য যে, তারা آمنا بالله (আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি) এবং صدقنا بالله (আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি) এইরূপ বলে দাবী করে (অথচ তারা তাদের এ দাবীতে সত্য নহে এবং তারা প্রকৃত ঈমানদার নহে। বরং কপটতাপূর্ণ অন্তরে এরূপ দাবী করে থাকে)। আর আমরা ইতিপূর্বে আমাদের এ কিতাবে উল্লেখ করেছি যে, ঈমান শব্দের অর্থ সত্য বলে বিশ্বাস করা। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وباليوم الآخر-এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের দিবসে পুনরুত্থান। আর কিয়ামতের দিনকে اليوم الآخر (শেষ দিন) এজন্য নাম রাখা হয়েছে, যেহেতু তা সর্বশেষ দিন, তারপর আর কোন দিন নাই। এক্ষেত্রে কেউ যদি এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, তা কিরূপে হতে পারে যে, তারপর আর কোন দিন নাই, অথচ আখেরাতের কোন বিরতি, শেষ ও ক্ষয়-লয় নাই ? তদুত্তরে বলা হবে যে, আরবদের পরিভাষায় তো' يوم (দিবসকে) তার পূর্ববর্তী রাতের কারণে নাম রাখা হয়েছে। সুতরাং যে দিনের পূর্বে কোন রাত অগ্রবর্তী হবে না, তাকে

দিবস নাম রাখা হবে না। আর কিয়ামতের দিন এমনি একদিন যার পরে সে রাত ভিন্ন অপর কোন রাত নাই, যে রাতের ভোরে কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে। অতএব সে দিনটিই (কিয়ামতের দিন) সর্বশেষ দিন। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে اليوم الآخر শেষ দিন বা পরকাল নাম দিয়েছেন এবং ইহাকে يوم عقيم (বন্ধ্যাদিন) রূপে বিশেষিত করেছেন। যেহেতু তারপর কোন রাত নাই।

وماهم بمؤمنين-এর ব্যাখ্যা

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "তারা ঈমানদার নয়" এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঈমান নাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি স্বয়ং তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা তাদের মুখে বলে—আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি। তাদের ঈমান ও পুনরুত্থানে স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি যে সংবাদ দান করেছেন, তা সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং নবী করীম (স)-কে তাঁর পক্ষ হতে এমর্মে অবহিত করা যে, যারা মুখে তাঁর নিকট তাদের অন্তরে নিহিত বস্তুর বিপরীত প্রকাশ করছে এবং তাদের আন্তরিক সংকল্পের বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে মু'মিন নয়।

জাহ্মিয়া সম্প্রদায় মনে করে যে, ঈমান শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নয়, এ আয়াতে তাদের অভিমত বাতিল হওয়ার স্বপক্ষে প্রকাশ্য নির্দেশনা রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা মুখে বলে "আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনেছি।" এরপর তিনি তাদের মু'মিন হওয়ার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা তাদের আকীদা-বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সত্যতা স্বীকার করে না।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وماهم بمؤمنين (তারা ঈমানদার নয়) অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে বলে যে কথা বলে, তা সত্য নয়।

৯ নং আয়াত ও তার ব্যাখ্যা

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ -

"আল্লাহ ও মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদের ছাড়া কাউকেও প্রতারিত করে না তা তারা বুঝতে পারে না।"

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, মুনাফিকগণ কর্তৃক তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা ও মু'মিনদিগকে প্রতারণা করার অর্থ হলো তাদের অন্তরে যে সন্দেহ-সংশয় ও মিথ্যারোপ করা লুকায়িত আছে, তার বিপরীতে বাহিকভাবে তাদের মুখে স্বীকারোক্তি ও বিশ্বাস ব্যক্ত করা। যাতে তারা তাদের মুখে প্রকাশকৃত উক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, যা তাদের ন্যায় মিথ্যারোপকারীদের জন্য অবধারিত ছিল। যদি তারা মৌখিক ভাবে বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি না করতো তবে তাদের জন্য কয়েদ অথবা হত্যা অবধারিত ছিল। এটাই আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী মু'মিনদের সাথে তাদের প্রতারণা।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মুনাফিকরা কিরূপে আল্লাহ্ তা'আলা ও মু'মিনদের প্রতারণা করে? অথচ সে আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তার বিশ্বাসের বিপরীত দাবী মুখে প্রকাশ করে না।

তদুত্তরে বলা হবে যে, আরবগণ এমন ব্যক্তিকে প্রতারক বলা নিষেধ করেন না, যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থে তার অন্তরে গোপন রাখা বিষয়ের বিপরীত বস্তু প্রকাশ করে। আর এভাবে সে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। তদ্রূপ মুনাফিক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা ও মু'মিনগণের সাথে প্রতারণাকারীরূপে এজন্য নাম রাখা হয়েছে, যেহেতু সে হত্যা, বন্দীত্ব ও অন্যাবিধ পার্থিব শাস্তি হতে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষার্থে তার মুখে তা প্রকাশ করে থাকে। আর সে তা প্রকাশ না করে, গোপন করেছে। আর তার এ কার্য যদিও পার্থিব জগতে মু'মিনদের প্রতি প্রতারণা হয়, মূলতঃ সে এর দ্বারা স্বীয় আত্মাকেই প্রতারণা করে। কেননা সে তার এ কাজের দ্বারা এটাই প্রকাশ করছে যেনো সে নিজের আত্মাকে এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করছে, কাঙ্খিত বস্তু দান করছে। অথচ সে তদ্বারা নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। এবং নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার গযব ও পীড়াদায়ক শাস্তির যা উপযোগী করেছে, সে পূর্বে কখনো ভোগ করেনি। সুতরাং এটা তার নিজের প্রতিই প্রতারণা। তার ধারণায় সে নিজ আত্মার প্রতি মঙ্গলকারী, অথচ সে পরিণামে নিজের ক্ষতিসাধনকারী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— "অথচ তারা নিজ আত্মাকে ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতারিত করে না কিন্তু তারা তা' উপলব্ধি করে না।" ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর মু'মিন বান্দাগণকে এমর্মে অবহিত করা যে, মুনাফিকগণ তাদের কুফরী আচরণ, সন্দেহ-সংশয় ও মিথ্যারোপ দ্বারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করার কারণে তাদের আত্মার প্রতি যে অন্যায়-অবিচার করেছে, তারা তা অনুভব-উপলব্ধি করে না। অথচ তারা তাদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে অন্ধত্বের মধ্যেই অবিচল রয়েছে।

আমরা আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছি, ইব্‌নে যায়েদ (রা)-এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ বলেছেন।

ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র)-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী يخادعون الله والذين امنوا الخ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেন, এরা মুনাফিক। তারা বাহ্যিকভাবে যা প্রকাশ করছে, তা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মু'মিনদিগকে প্রতারিত করছে।

এ আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, যারা আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদ জানা সত্ত্বেও হঠকারিতা বশতঃ তাঁর সাথে কুফরী করে, তাদের ব্যতীত অন্য কাউকেও আযাব দেবেন না এ ধারণা মিথ্যা হবার জন্য এ আয়াতই যথেষ্ট।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা নিফাক ও তাঁর এবং মু'মিনদের সহিত প্রতারণা করা দ্বারা যাদেরকে বিশেষিত করেছেন, তাদের সম্পর্কে তিনি সংবাদ দান করেছেন যে, তারা যে বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে তারা অনুভূতিই রাখে না। আর তিনি এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তারা তাদের প্রতারণা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ও ঈমানদারগণকে প্রতারিত করছে বলে যে ধারণা করে, মূলতঃ তারা তা দ্বারা নিজেরাই প্রতারিত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, যদ্বারা তারা আল্লাহ্‌র নবীর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাঁর সাথে কুফরী আকীদা পোষণ করেছে এবং যা দ্বারা তারা নিজ ধারণায় মু'মিন হওয়ার দাবীতে মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নিয়েছে, অথচ তারা কুফরীতেই লিপ্ত ছিলো। তাদের এ মিথ্যারোপের কারণে তাদের জন্য পীড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, এটা জানা কথা যে, বা'বে مفاعلة (মুফাআলা) দু'টি ফায়েল ব্যতীত

হয় না। (অর্থাৎ এটা مشاركت-এর অর্থ দান করে)। যেমন তোমার উক্তি ضاربت اخاك (আমি তোমার ভাইয়ের সাথে মারামারি করেছি)। جالست اباك (আমি তোমার পিতার সঙ্গে একত্রে বসেছি) যখন উভয়ে একে অন্যকে প্রহার করার শরীক হয়েছে এবং উভয়ে একে অন্যের সাথে বসায় শরীক হয়েছে।

আর যখন فعل (ক্রিয়াপদ)-টি তাদের দুইজনের একজন হতে সম্পাদিত হয়, তখন বলা হয়, ضربت اخاك (আমি তোমার ভাইকে প্রহার করেছি) এবং جلست الى ابيك ("আমি তোমার পিতার নিকট বসেছি)। সুতরাং যে মুনাফিক সম্পর্কে خادع (প্রতারিত করেছে) ক্রিয়াপদ-টি ব্যবহৃত হয়েছে, তার বেলায় এটা বলা জায়েয হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনগণ ও তার সাথে প্রতারণা করেছেন। তদুত্তরে বলা হবে যে, আরবী ভাষায় সুবিজ্ঞ বলে খ্যাত কোন কোন ব্যক্তি বলেছেন, এ হলো একটি হরফ যা' এরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ يخادع শব্দটি يفاعل-এর ওযনে (আলিফ যোগে) ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তা يفعل অর্থে ব্যবহৃত। অবশ্য আরবদের কথোপকথনে এরূপ শব্দের ব্যবহার নগণ্য। যেমন তাদের উক্তি قاتلك الله বা قتلك الله (আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আমার মতে কথাটি যেমন বলা হয়েছে, তদ্রূপ নয়। বরং তা مفاعل পারস্পারিক শরীক অর্থেই ব্যবহৃত যা' দু'টি ফা'য়েল (কর্তা) ব্যতীত সংঘটিত হয় না। যেমন, আরবদের কথোপকথনে সকল يفاعل ও فاعل ক্ষেত্রে এটাই জানা যায়। আর তা' হলো মুনাফিক মৌখিক মিথ্যা বলার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতারণা করে যার বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তার দূরদর্শিতার দ্বারা পরকালের যে মুক্তির আশা তার ছিল, আল্লাহ্ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ও লজ্জিত করে যে শাস্তির বিধান দিয়েছেন, এটাই যেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে مخادعة। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র তাঁর বাণীর মাধ্যমে এমর্মে সংবাদ দান করেছেন :

ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما -

"আর কাফিররা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, আমি যে তাদেরকে অবকাশ দান করছি, তা তাদের নিজের জন্য মঙ্গলজনক। বরং আমি তাদের অবকাশ দিয়ে থাকি পাপের মধ্যে বেড়ে যাবার জন্যে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৭৮)

আর সে অর্থে যা তিনি নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে সংবাদ দান করেছেন যে, আখেরাতে তিনি তাদের সাথে এমনি আচরণ করবেন। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم -

"যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা মু'মিনদের লক্ষ্য করে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, আমরা তোমাদের নূর হতে একটু আলো সংগ্রহ করব"—(সূরা হাদীদ : ৫৭/১৩)।

সুতরাং এটা يفاعل ও مفاعل-এর ওযনে ব্যবহৃত যাবতীয় বাক্যের অর্থের ন্যায়ই অর্থ দান করবে (অর্থাৎ এখানেও مفاعلة পারস্পরিক অংশ গ্রহণ তথা مشاركت অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে)।

আর কোন কোন বছরী ব্যাকরণবিদ বলতেন যে, উভয় পক্ষের অংশ গ্রহণ ছাড়া مفاعلة সম্পন্ন হয় না। কিন্তু يخادعون الله বাক্যাংশটি এ অর্থে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের নিজেদের দৃষ্টিতে এবং তাদের এ ধারণায় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতারণা করছে যে, তাদেরকে এজন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী وما يخدعون الا انفسهم-এর মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকে বাস্তব ঘটনা অবহিত করায় তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে এর বিপরীত বাস্তবতা জানতে পেরেছে।

ইমাম আবূ জাফর বলেন, আর কেউ কেউ বলেছেন, وما يخدعون-এর অর্থ হচ্ছে يخدعون انفسهم بالخدعة بها "তারা একান্তভাবে তাদের নিজেদেরকেই প্রতারিত করে।" আর অনেক ক্ষেত্রে مفاعلة-এর ওযনে সংঘটিত ক্রিয়া একপক্ষ হতেও হতে পারে।

وما يخدعون الا انفسهم-এর ব্যাখ্যা

আমাদেরকে যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, মুনাফিকরা সত্যের পক্ষে তাদের জীবন, সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার জন্য তাদের মুখ দিয়ে যা প্রকাশ করেছে তার মাধ্যমে তারা মু'মিনদের কি প্রতারণা করেনি? এমনকি তাদের পার্থিব নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। যদিও তারা তাদের পরকালের ব্যাপারে স্বয়ং প্রতারিতই রয়ে গিয়েছে।

উত্তরে বলা যায় যে, এরূপ বলা ভুল হবে যে, তারা মু'মিনদেরকে প্রতারিত করেছে। কারণ আমরা যখন এরূপ বলব, তখন আমরা মু'মিনগণের প্রতি প্রকৃতই প্রতারণা কার্যকর হয়েছে বলে সাব্যস্ত করব। যেমন, আমরা যদি বলি অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে—তখন আমরা তার জন্য প্রকৃতই হত্যা সাব্যস্ত করব। কিন্তু আমরা তো এরূপ বলছি যে, মুনাফিকরা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনদেরকে প্রতারিত করছে, কিন্তু তারা তাঁদেরকে প্রতারিত করে নাই, বরং তা দ্বারা তারা নিজেদের আত্মাকেই প্রতারিত করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বলেছেন, "তারা কেবল নিজেকে প্রতারিত করেছে।", ব্যাপারটি এরূপ যেমন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে এবং স্বয়ং নিহত হয়েছে, কিন্তু তার সাথীকে হত্যা করতে পারেনি, সে ব্যক্তির বেলায় বলা হয় যে, قاتل فلان فلانا ولم يقتل الا نفسه "অমুক অমুকের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে কিন্তু সে নিজেকে ব্যতীত কাউকে হত্যা করে নাই।"

এক্ষেত্রে তুমি তার জন্য তার সাথীর সাথে মারামারিতে লিপ্ত হওয়া সাব্যস্ত করেছ, সে তার সাথীকে হত্যা করা নিষেধ করেছে এবং সে নিজ আত্মাকে হত্যা করা সাব্যস্ত করেছে। তদ্রূপ তুমি এক্ষেত্রে বলবে যে, মুনাফিক তার প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনদের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে তার নিজ আত্মাকে ভিন্ন অন্য কাউকে প্রতারিত করেনি। সুতরাং তুমি আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনগণের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হওয়াকে সাব্যস্ত করবে কিন্তু সে তার আত্মা ভিন্ন অন্য কাউকে প্রতারিত করা নিষেধ তথা অস্বীকার করবে। কেননা, সেই প্রতারণাকারী—যার প্রতারণা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছেছে এবং কাজটি বাস্তবে তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। কারণ মুনাফিকরা নিজেদেরকে

ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দিতে পারেনি। কেননা তারা প্রতারণা করার সময় কিম্বা প্রতারণা করার পূর্বে তাদের কোন সম্পদ বা স্বজন এরূপ ছিল না যার মালিক মুসলমানরা হয়েছিল এবং তারা প্রতারণা দ্বারা মুসলমানদের থেকে তা উদ্ধার করেছে। তারা তো তাদের মিথ্যা এবং অন্তরে নিহিত বস্তুর বিপরীত প্রকাশ করে উহার প্রতিরোধ করেছে মাত্র, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পদ, জীবন ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কে তাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে সেই হুকুমের সাথে হুকুম দান করেছেন, যার প্রতি তারা ধর্মগত ভাবে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের লুকায়িত বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। বস্তুত সেই তো প্রতারণকারী যে অন্যকে তার বস্তু হতে ধোঁকা দিয়েছে, অথচ প্রতারিত ব্যক্তি তার সঙ্গে প্রতারণাকারীর প্রতারণাস্থল সম্পর্কে অবহিত ছিল না। অবশ্য পারস্পরিক প্রতারণাকারী তার প্রতিপক্ষ তাকে প্রতারণা করা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত থাকে। আর তার প্রতারণা প্রতিপক্ষের উপর কার্যকর না হওয়া তার নিকট অপছন্দনীয়। বরং যে তাকে সন্তর্পণে প্রতারিত করবে বলে ধারণা করে, সে তো তার ব্যাপারে সতর্ক থাকে। যাতে সে এমন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, যথায় পৌঁছার পরিণামে শাস্তি কার্যকর করা যুক্তিযুক্ত হয় এবং এভাবে তার উপর শাস্তি প্রয়োগের যৌক্তিকতা পূর্ণত্ব লাভ করে। আর ধোঁকাদানকারী ধোঁকা-দানকালে তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকে না। আর সে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে পরিচিত থাকে না। আর ধোঁকাদানকারীকে অবকাশ দান করা এবং তার অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি দানে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ এই যে, যেন ধোঁকাবাজ তার দুষ্কর্মের আধিক্য ও অবাধ্যতার ফিরিস্তি দীর্ঘ হওয়ার মাধ্যমে শাস্তিযোগ্য হওয়ার সীমায় গিয়ে পৌঁছে। আর সে চূড়ান্ত সীমা হলো, প্রতারিত ব্যক্তির প্রতি অধিক পরিমাণে নমনীয়তা প্রদর্শন করা ও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া। সুতরাং মুনাফিক ব্যক্তি মূলত নিজেকেই প্রতারণা করে, যাকে প্রতারণা করে বলে সে কল্পনা করে তাকে নয়। কারণ, তার অবস্থা ঠিক তাই ছিল, যা আমরা এক্ষনে বর্ণনা করেছি। আর মুনাফিক তার প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনদেরকে প্রতারিত করার ব্যাপারটিও ঠিক তদ্রূপ ছিল, যা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি।

আর সে তার এ প্রতারণা দ্বারা মূলতঃ নিজকে ছাড়া অপর কাউকে প্রতারণা করে না। যেহেতু সে তার এ কাজের দ্বারা নিজেকেই ধ্বংসোম্মুখ করে এবং ক্ষতির সম্মুখীন হয়—তাই وما يخدعون কিরাতটির স্থলে وما يخدعون الا انفسهم কিরাআতটিই বিশুদ্ধ কিরাআতরূপে গণ্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা خداع শব্দটি প্রতারণাকে বিশুদ্ধ রূপে বুঝাবার জন্য যথেষ্ট নয়। আর خداع শব্দটি প্রতারণাকে বিশুদ্ধরূপে বুঝনোর জন্য যথেষ্ট।

আর এতে কোন সন্দেহ নাই যে, মুনাফিক স্বীয় আত্মার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র শাস্তিকে অনিবার্য করেছে। যেহেতু সে তার মুনাফিকীর মাধ্যমে তার প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছে। এজন্যই যাঁরা وما يخدعون الا انفسهم পাঠ করেন, তাঁদের কিরাআতই শুদ্ধ হওয়া অনিবার্য রূপে প্রমাণিত হয়েছে। আর এতে একথারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে যাঁরা وما يخادعون পাঠ করেন, তাঁদের কিরাআত وما يخدعون রূপে পাঠকারীগণের কিরাআতের তুলনায় উত্তম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতের শুরুতে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনদের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং যা তাদের কর্মকাণ্ড থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তা অস্বীকার করা অসম্ভব। কারণ এটা অর্থগত দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী। আর তা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য শোভনীয় নয়।

وما يشعرون-এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ তা'আলার বাণী وما يشعرون (আর তারা অনুভব করে না)-এর অর্থ হচ্ছে وما يدرون তারা উপলব্ধি করে না। যেমন বলা হয়, ما شعر فلان بهذا الامر وهو لا يشعربه (অমুক এ বিষয়টি অনুভব করেনাই, সে তা অনুভব করে না)। যখন সে বিষয়টি উপলব্ধি করে না এবং জানে না। এর মূল উৎস شعرا ও شعورا ব্যবহৃত হয়। যেমন কোন কবি বলেছেন—

عقوا بسهم ولم يشعربه احد ــ ثم استفاؤا وقالوا حبذا الوضح

(তারা অংশের মধ্যে কমতি করেছে কিন্তু কেউ তা অনুভব করে নাই। অতঃপর তারা তা পূর্ণ করেছে এবং বলেছে, কি চমৎকার সুন্দর বণ্টন।) এখানে لم يشعربه বাক্যাংশ দ্বারা কেউ তা উপলব্ধি করে নাই এবং জানে নাই অর্থ করা হয়েছে।

তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে নাই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দানের মাধ্যমে তাদের সাথে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

যা ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য দলীল-প্রমাণ চূড়ান্ত করা এবং তাদের পক্ষ হতে ওযর আপত্তি পেশ করার পথ বন্ধ করা। আর তা স্বয়ং তাদের পক্ষ হতে আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছু নয়, যার পরিণাম আখেরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ।

যেমন, ইবনে ওয়াহ্হাব (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি ইবনে যায়েদ (রা)-কে وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون এ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি তদুত্তরে বলেছেন, তারা কুফরী ও মুনাফিকী ইত্যাদি যা কিছু গোপন রেখেছে, তা তাদের জন্যই হয়েছে আত্মঘাতমূলক কাজ, তারা উপলব্ধি করে না। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী يوم يبعثهم الله جميعا হতে আরম্ভ করে ويحسبون انهم على شئ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। আর বলেন, তারা হচ্ছে মুনাফিক আর তিনি على شئ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা ধারণা করেছে যে, তাদের ঈমান তোমাদের নিকট তাদের জন্য উপকারী হবে।

(১০) في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا - ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون -

(১০) **তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি কারণ তারা মিথ্যাচারী।**

في قلوبهم مرض-এর ব্যাখ্যা

مرض ('ব্যাধি'), শব্দটি মূলতঃ سقم (অসুস্থতা রোগ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তা দৈহিক ও আত্মিক উভয়বিধ অসুস্থতার অর্থেই ব্যবহৃত হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, মুনাফিকদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আর তাদের অন্তরে রোগব্যাধি থাকার বিষয়ে সংবাদ দানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে যে সকল বিশ্বাসগত ব্যাধি রয়েছে, তা উদ্দেশ্য

করেছেন। কিন্তু দিলের রোগব্যাধি সংক্রান্ত সংবাদ দ্বারা তাদের অন্তরের বিশ্বাসগত ব্যাধিকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে অন্তর সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া এবং তাদের অন্তরের অবস্থাদি ও বিশ্বাস সমূহের বিবরণের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে নাই। যেমন, কবি উমার ইবনে লাজা বলেছেন—

وسمعت المدينة لا تلمها — رأت قمرا بسوقهم نهارا

"শহরে হট্টগোল হয় বিধায় তুমি তাকে তিরস্কার করো না। তাদের বাজারে তারা দিনে চাঁদ দেখেছে।" অর্থাৎ চোখে ঝিমিঝিমি দেখেছে। এখানে কবি নগরে হট্টগোল হয় বলে নগর অর্থে নগরবাসী বুঝিয়েছেন। আর নগর সম্পর্কিত সংবাদ দান ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রোতাগণ অবগত ছিল বিধায় তার অধিবাসীগণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট ছিল না।

অনুরূপ ভাবে কবি আনতারা আল-আ'বাসী বলেন,

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك — ان كنت جاهلة بما لم تعلمى

"হে মালেকের কন্যা! তুমি যা জান নাই, সে বিষয়ে তুমি যদি অজ্ঞ থাক, তবে কেন তুমি তো অশ্বকে জিজ্ঞাসা কর নাই?" এখানে কবি هلا سألت اصحاب الخيل তুমি ঘোড়ার অধিকারী বা ঘোড় সওয়ারদের প্রশ্ন কর নাই কেন, এ অর্থই বুঝিয়েছেন।

আর এ অর্থেই আরবগণ বলে থাকেন, ياخيل الله اركبى "হে আল্লাহর ঘোড়া! তুমি আরোহণ কর" যদ্বারা তাঁরা يااصحاب خيل الله اركبوا "হে আল্লাহর ঘোড়ার মালিক বা আরোহীগণ! তোমরা আরোহণ কর", অর্থ গ্রহণ করেন। আর আরবদের মাঝে এরূপ ব্যবহারের প্রমাণ এতো অধিক যে, তা কোন কিতাবে আবদ্ধ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমরা যতটুকু উল্লেখ করেছি, যার বুঝার তাওফীক অর্জিত হয়েছে, তার জন্য এ টুকুই যথেষ্ট।

তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী في قلوبهم مرض-এর অর্থ হচ্ছে, فى اعتقاد قلوبهم مرض "তাদের অন্তরের বিশ্বাসের মধ্যে ব্যাধি রয়েছে,"। আর "তাদের অন্তরের বিশ্বাসের মধ্যে" বলতে, তাদের যে সকল বিশ্বাস উদ্দেশ্য, যা তারা দীন সম্পর্কে এবং মুহাম্মাদ (স) ও আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তিনি যা আনয়ন করেছেন, তৎসম্পর্কে বিশ্বাস করার প্রশ্নে তাদের রোগব্যাধি রয়েছে। আর এখানে তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে প্রকাশ্য সংবাদ দান করার পরিবর্তে তাদের অন্তর সম্পর্কে সংবাদ দানকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

আর তাদের অন্তরের বিশ্বাসের মধ্যে যে ব্যাধির কথা আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন এবং যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, তা হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যা আনয়ন করেছেন, তৎসম্পর্কিত তাদের সন্দেহ-সংশয় এবং এক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্তহীনতা ও দোদুল্যমানতা। ফলে তারা প্রকৃত ঈমানদারীর সাথে তার উপর বিশ্বাস করে না এবং যথার্থ মুশরিক সুলভ মনোবৃত্তিসহ অস্বীকারও করে না। বরং তাদের অবস্থা ঠিক তাই যার সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিশেষিত করেছেন,

مذبذبين بين ذالك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء

"তারা এ দুই অবস্থার মাঝে দোদুল্যমান, তারা এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়"–(সূরা নিসাঃ ১৪৩)। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, فلان مرض فى هذا الأمر অমুক এবিষয়ে ব্যাধিগ্রস্ত অর্থাৎ সংকল্পে দুর্বল এবং তাতে বিশুদ্ধ অভিমত পোষণ করে না।

আমরা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বর্ণনা করেছি, এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের অনুরূপ উক্তি প্রকাশ্য-ভাবে বিধৃত হয়েছে। যাঁরা এরূপ উক্তি করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা—

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فى قلوبهم مرض-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ সন্দেহ-সংশয়। আর দাহহাক (রহ)-এর সনদে ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এখানে مرض শব্দটি মোনাফিকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবীর মতে আলোচ্য আয়াতে مرض শব্দটি সন্দেহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী فى قلوبهم مرض ("তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে") এটা হচ্ছে দীন সম্পর্কিত আত্মিক ব্যাধি, দৈহিক ব্যাধি নহে। তিনি বলেন, আর তারা হচ্ছে মুনাফিক। কাতাদাহ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তাদের অন্তরে সন্দেহ সংশয় রয়েছে।

আর রবী 'ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فى قلوبهم مرض-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এরা হচ্ছে মুনাফিক। আর তাদের অন্তরে যে ব্যাধি রয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাত প্রসঙ্গে তাদের অন্তরে লালিত সন্দেহ-সংশয়।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر আয়াতটি فى قلوبهم مرض পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। তিনি বলেন, এখানে উল্লেখিত ব্যাধি হচ্ছে সেই সন্দেহ-সংশয়, যা ইসলাম সম্পর্কে তাদের মনে স্থান পেয়েছে।

فزادهم الله مرضا এর ব্যাখ্যা

আমরা সবেমাত্র প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অন্তরে যে ব্যাধি থাকার বিবরণ দিয়েছেন, তা হচ্ছে তাদের অন্তরের বিশ্বাস, তাদের দীনসমূহ, মুহাম্মাদ (স) তাঁর নবুওয়াত এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এসব ক্ষেত্রে তারা যে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, সে সব সন্দেহ। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের যে ব্যাধি বর্দ্ধিত করেছেন বলে সংবাদ দিয়েছেন, তা ঠিক এই বর্দ্ধিত-করণের পূর্বে তাদের অন্তরে যে সন্দেহ ও অস্থিরতা ছিল তারই অনুরূপ ও সমতুল্য। এরপর তাদের অন্তরে এই বর্দ্ধিতকরণের পূর্বে আল্লাহর বিধানসমূহ ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে যে সন্দেহ ও অস্থিরতা ছিল, যাকে মুনাফিকরা বাড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করে দিয়েছেন। কেননা তারা যে ব্যাধির কারণে ঐ প্রশ্নেও সন্দেহ করেছে, যা তাদের অন্তরে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে, এবং যে সন্দেহ-সংশয় তাঁর বিধানসমূহে অবশ্য পালনীয় আদেশসমূহের ব্যাপারে পূর্ব হতেই তাদের অন্তরে বিরাজিত ছিল। মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ তাঁরা আল্লাহর বিধানসমূহ ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহের উপর ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যখন তাঁরা ঈমান আনয়ন করেছেন, তখন আল্লাহর যে বিধান ও অবশ্য পালনীয়

কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে তাদের বিরাজমান ঈমান অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণীর মধ্যে ইরশাদ করেছেন—

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا - فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون - وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون - (التوبة)

"যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল ? যারা মু'মিন এতো তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এটা তাদের কলুষতার সাথে আরো কলুষতা যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু হয় কুফুরী অবস্থায়।" (সূরা তওবা—১২৪-২৫)

অতএব মুনাফিকদের কলুষতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি, আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মু'মিনদের ঈমানও, তা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে, যে সম্বন্ধে আমরা বর্ণনা করেছি। এটাই আয়াতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাকারগণের মধ্য হতে যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের কতেক সম্পর্কে আলোচনা এই যে—

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فزادهم الله مرضا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে সন্দেহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা فزادهم الله مرضا-এর ব্যাখ্যায় বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সন্দেহ ও সংশয় বৃদ্ধি করেছেন।

কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فزادهم الله مرضا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হুকুমের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় বৃদ্ধি করেছেন।

ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের কলুষতা বৃদ্ধি করেছেন। অর তিনি এর সমর্থনে—সূরা তওবার ১২৪—২৫ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন, شرا إلى شرهم و ضلالة إلى ضلالتهم তাদের অসদাচরণ ও পথভ্রষ্টতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রবী (রহ) হতে বর্ণিত, তিনি فزادهم الله مرضا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ولهم عذاب أليم-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, أليم শব্দটি موجع (বেদনাদায়ক) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর এর অর্থ হচ্ছে ولهم عذاب مؤلم (আর তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি)। مؤلم ইসমে ফা'য়েল—এর শব্দটিকে الم সিফাতে মুশাব্বাহরূপে পরিবর্তিত করা হয়েছে। যেমন, বলা হয়ে থাকে ضرب وجيع অর্থাৎ موجع—বেদনাদায়ক প্রহার। আর যেমন الله بديع السموات والارض অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা"। এখানে بديع শব্দটি مبدع অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ অর্থেই আমর ইবন মা'দীকারাব জুবায়দী বলেছেন,

أمن ريحانة الداعي السميع ـ يؤرقني و اصحابي هجوع

"এমন কোন আহ্বানকারী শ্রোতা ফুলগুচ্ছ আছে কি, যে আমাকে পত্র পল্লবিত করবে, যখন আমার সাথীগণ ঘুমিয়ে আছে।" এখানে سميع শব্দটি مسمع অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ অর্থেই কবি যি-রিম্মাহ্ বলেছেন :

ويرفع من صدور شمردلات ـ يصد وجوهها وهج اليم

"তা সুদর্শন উষ্ট্রীর বক্ষ হতে উত্থিত হয়, পীড়াদায়ক অগ্নিশিখা তার মুখমন্ডলকে ফিরিয়ে দেয়। আর সে হাঁটুতে হাঁটুতে ঘষাঘষি করে তথা জোড় হাঁটু হয়ে পানি পানে পরিতৃপ্ত হয়।"

আর আয়াতে উল্লেখিত اليم শব্দটি عذاب-এর صفت। আল্লাহ্ তা'আলা যেন এরূপ বলেছেন, ولهم عذاب مؤلم "আর তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি"। আর তা الم শব্দ হতে নিষ্পন্ন, আর الم শব্দটি ব্যথা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন রবী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি اليم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হচ্ছে موجع বা বেদনাদায়ক।

আর দাহ্হাক (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি اليم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ الموجع পীড়াদায়ক। দাহ্হাক হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি اليم-এর ব্যাখ্যায় বলেন তা' হচ্ছে العذاب الموجع (বেদনাদায়ক শাস্তি)। আর পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত প্রত্যেক اليم-ই موجع বা পীড়াদায়ক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

بما كانوا يكذبون-এর ব্যাখ্যা

এখানে উল্লেখিত يكذبون শব্দটির পঠন পদ্ধতি প্রসঙ্গে কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ মতভেদ করেছেন। কেউ একে ى-এর মধ্যে যবর ও ذ-এ সাকিন সহ بما كانوا يكذبون পাঠ করেছেন। আর এটা অধিকাংশ কূফাবাসীগণের (কিরাআত)। আর অন্যরা একে ى-এর মধ্যে পেশ ও ذ-এ তাশদীদ যোগে يكذبون পাঠ করেছেন। আর এটা মদীনা, হিজায ও বসরাবাসী অধিকাংশ লোকের পঠিত (কিরাআত) বস্তুতঃ যাঁরা ذ-এর মধ্যে তাশদীদ ও ى-এর মধ্যে পেশ যোগে পাঠ করেছেন, তাঁরা যেন এদিকটিই বিবেচনা করেছেন যে, নবী (স) ও তিনি যা আনয়ন করেছেন, তৎপ্রতি মিথ্যারোপ করার কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জন্য পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দ্ধারণ করেছেন।

আর মিথ্যা দ্বারা যদি অন্যের প্রতি মিথ্যারোপ করা না হয়, তবে তা সাধারণ শাস্তি সাব্যস্তকারী হয় না, এমতাবস্থায় তা কিরূপে পীড়াদায়ক শাস্তি সাব্যস্তকারী হবে ? কিন্তু আমার মতে ব্যাপারটি মূলতঃ তা' নয়, যা তাঁরা বলেছেন। আর তা এই যে, এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে প্রদত্ত প্রথমেই এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলা, রসূল (স) ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে—ঈমানের দাবী করা এবং মুখে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

"এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনেছি। অথচ তারা মু'মিন নহে। তারা আল্লাহ তা'আলাও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করে।" আর তা তারা অন্তরে সন্দেহ সংশয় গোপন রেখে মৌখিক ভাবে ঈমানের দাবী করার মাধ্যমে করে থাকে। বস্তুতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা নিজেদের আত্মাকেই প্রতারিত করে। রসূলুল্লাহ (স) ও মু'মিনদেরকে নহে। কিন্তু তারা যে তাদের এ প্রতারণার মাধ্যমে পরিণামে নিজেদেরকেই প্রতারিত করে, এ বিষয়টি তারা উপলব্ধি করে না। আর আল্লাহ তা'আলা যে তাদের অন্তরে সন্দেহ নিহিত থাকার অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন তাও তারা উপলব্ধি করতে পারছে না।

আর তারা মুখে "আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনেছি" বলার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা, রসূলুল্লাহ (স) ও মু'মিনগণের সঙ্গে মিথ্যা বলেছে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের সন্দেহ-সংশয়কে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। যেহেতু তারা এরূপ বলার ক্ষেত্রে মিথ্যাচারী ছিল। কারণ, তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (স)-এর ব্যাপারে তাদের অন্তরে লালিত বিশ্বাস সমূহে বিরাজমান সন্দেহ ও ব্যাধিকে গোপন করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কৌশল ও প্রজ্ঞা বিবেচনায়, ইহাই অধিকতর উত্তম যে, তিনি তাদের যে সকল মন্দ কাজ ও ঘৃণ্য চরিত্র সম্পর্কিত সংবাদ দিতে শুরু করেছেন, তারই উপর তাঁর পক্ষ হতে তাদের প্রতি তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করা হবে। তাদের সেই সকল কাজের উপর নহে, যার আলোচনা এখনও শুরু হয় নাই। কারণ, আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআন মজীদের সমুদয় আয়াত এ বর্ণনাভঙ্গি অনুসরণে নাযিল হয়েছে। আর তা এই যে, যখন তিনি কোন সম্প্রদায়ের সংকার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন, তখন তাদের যে কাজের আলোচনা শুরু করেছেন, তার উপরই তিনি তাদের প্রতি তিরস্কার করে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করেন। আর যখন তিনি অপর কোন সম্প্রদায়ের মন্দ কাজের প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করেন, তখন তাদের যে কাজের মাধ্যমে তিনি তাদের আলোচনা শুরু করেছেন, সেকাজের উপরই তাদের প্রতি তিরস্কার ও শাস্তির ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা সমাপ্ত করেন।

তদ্রূপ এখানে উল্লেখিত আয়াতসমূহ যাতে মুনাফিকদের কতিপয় মন্দ কাজের উল্লেখের মাধ্যমে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করা হয়েছে, তাতেও বিশুদ্ধ মত এটাই হবে যে, তাদের যে মন্দ কাজের আলোচনা শুরু করা হয়েছে, তার উপরই শাস্তির ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কিত আলোচনা সমাপ্ত করা হবে।

আর আমরা এ প্রসঙ্গে যা বলেছি, অন্য একটি আয়াত তার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে এবং তা একথার উপর সাক্ষ্য বহন করে যে, আমরা যে পঠন রীতি গ্রহণ করেছি, তাই ওয়াজিব এবং আমরা যে

ব্যাখ্যা দান করেছি তা'ই নির্ভুল আর এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ মিথ্যার উপর মুনাফিকদের প্রতি তিরস্কার ও শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, যা সন্দেহ ও মিথ্যা উভয় অর্থই বহন করে। সে আয়াতটি হচ্ছে—

اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله م والله يعلم انك لرسوله ط والله يشهد ان المنافقين لكذبون ० اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ط انهم ساء ما كانوا يعملون ०

"যখন আপনার নিকট মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। আর আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিত জানেন যে, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথকে ঢালরূপে গ্রহণ করেছে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। নিশ্চয় তারা যা আমল করেছে তা অতি মন্দ। (সূরা মুনাফিকূন : ৬৩/১—২)

আর সূরা মুজাদালার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ०

"তারা তাদের শপথ ঢালরূপে গ্রহণ করেছে এবং তারা আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।" (মুজাদালাঃ ৫৮/১৬)

অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা তাদের বিশ্বাসে অটল থাকা সত্ত্বেও মৌখিকভাবে তারা মুহাম্মাদ (স)-কে উদ্দেশ্য করে যা বলেছে তারা তাদের বক্তব্যে নিজেরাই বিশ্বাস করে না। অতএব তারা মিথ্যাবাদী। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তাদের এ মিথ্যা কথার ফল স্বরূপে তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে। সুতরাং অত্র সূরা বাকারার মধ্যে কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ যে তাশদীদ যোগে ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون পাঠ করেছেন, তা যদি শুদ্ধ হতো, তবে অপর সূরাটিতে আয়াতটি والله يشهد ان المنافقين لمكذبون রূপে উল্লেখিত হতো। যাতে করে তাদের প্রতি যে সতর্কবাণী উল্লেখ করা হয়েছে, তা মিথ্যা বলার জন্য না হয়ে মিথ্যারোপ করার জন্য হতো। অথচ মুসলমানদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, এখানে বিশুদ্ধ পঠন রীতি হলো والله يشهد ان المنافقين لكاذبون যা মিথ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর একথার উপর (সর্বসম্মত মত) এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের জন্য তাদের ঐ মিথ্যাবাদিতার জন্যই পীড়াদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। তা হলো একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে,

সূরা বাকারার بما كانوا يكذبون পঠন রীতিই শুদ্ধ। আর মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সতর্কবাণী মিথ্যা বলার উপরই সঠিক ও যথার্থ, সেই মিথ্যারোপের উপর নয় যে সম্পর্কে এখনও আলোচনা শুরুই হয় নাই। যেমন, সূরা মুনাফিকুনে এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে।

আর কোন কোন বসরী ব্যাকরণবিদ ধারণা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী بما كانوا يكذبون-এর মধ্যকার ما অব্যয়টি মাছদারের ইস্ম্। যেমন বলা হয়ে থাকে احب ان تأتيني-এর মধ্যে ان ও فعل এদুটি মাছদারের জন্য ইসম। আর بما كانوا يكذبون-এর অর্থ হচ্ছে, انما هو بكذبهم و تكذيبهم "এটা তাদের মিথ্যা এবং মিথ্যারোপের কারণে।" ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন আর তাতে এজন্য كان-কে প্রবেশ করানো হয়েছে যেন তা এ সংবাদ দান করে যে, এটা অতীতে ছিল। যেমন বলা হয়, ما احسن ما كان عبد الله এখানে তুমি আবদুল্লাহ হতে বিস্ময় প্রকাশ কর, তার হওয়া হতে নহে। অবশ্য শব্দটির মধ্যে তার হওয়ার উপর বিস্ময় প্রয়োগ করা হয়েছে।

আর কোন কোন কূফাবাসী ব্যাকরণবিদ একথা অস্বীকার করেছেন এবং এটাকে ভুলরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা বলেন যে, বিস্ময় মধ্যে كان-কে অহেতুক ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা তার পূর্বে তো ফে'ল (ক্রিয়াপদ) উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং যেন এরূপ বলা হয়েছে حسن كان زيد ও حسنا كان زيد এবং এতে كان-এর আমল বাতিল হয়েছে। আর ইসম ও সিফাতের সংগে كان আমল করবে, যে সিফাতটি ইসমের শব্দের দ্বারা গঠিত হবে যখন সে সিফাতটি كان এর পূর্বে উল্লেখিত হবে এবং كان-তার ও ইসমের মধ্যখানে উল্লেখিত হবে। আর এই বাতিল হওয়ার কারণ এই যে, যখন كان এর আমল এ সকল অবস্থায় বাতিল হয়েছে, তখন তা' সিফাত ও ইসমসমূহ মধ্যে يفعل - فعل -এর সাথে সদৃশ হয়েছে, যাতে كان-এর আমল প্রকাশিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ যখন তুমি يقوم كان زيد বলবে, তখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, يقوم মধ্যে كان এর আমল প্রকাশিত হয়নি। তদ্রূপ قام كان زيد -এরও একই অবস্থা। এইজন্য يفعل - فعل-এর সাথে তুলনা করে فاعل-এর মধ্যেও তার আমল বাতিল করা হয়েছে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে كان অব্যয়টি فاعل-এর সাথে আমল করে থাকে, যেমন তা' ইসমের সাথে আমল করে। যেহেতু তা'ও একটি ইসমই বটে। আর যখন كان ইসম ও ফে'লের অগ্রবর্তী হয় এবং ইসম ও ফে'ল তা হতে পরবর্তী হয়, তখন তার মতে كان-এর আমল বাতিল হওয়া ভুল। একারণে তিনি বসরীগণের মত যা আমরা এক্ষণে উল্লেখ করেছি, তাকে অসম্ভবরূপে আখ্যায়িত করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী بما كانوا يكذبون-এর ব্যাখ্যা بالذي يكذبونه-এর সাথে করেছেন।

(১১) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ٥

(১১) "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরাই তো শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী।"

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ-এর ব্যাখ্যা

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। সালমান ফারসী (রা) আয়াতের ৫

...শৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না বলা

আসেনি।

ইবাদ ইবনে আবদিল্লাহ থেকে সালমান ফারসী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যাদের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত আয়াত নাযিল হয়েছে, তারা তারপর আর কখনো আসেনি।

সালমান ফারসী (রা) হতে অন্য একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আর অন্যরা বলেছেন, যেমন ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর অপর কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তারা হলো মুনাফিক শ্রেণী।

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ-এর ব্যাখ্যা

ফাসাদ হলো কুফরী ও পাপাচার।

রবী (র) হতে বর্ণিত যে, তিনি وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা পৃথিবীতে পাপাচার করো না। তিনি বলেন, তাদের সৃষ্ট ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা তাদের নিজ আত্মারই উপর।" আর তা হলো মহান আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতা। কারণ, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যাচরণ করে, কিংবা তাঁর অবাধ্যাচরণের আদেশ করে, সে তা দ্বারা মূলতঃ পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কেননা, পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলীর শৃঙ্খলা আনুগত্যের দ্বারাই হয়।

আর উল্লেখিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দু'টির মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো, যাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে বিদ্যমান মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও তাদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত যারা এই দোষে দোষী হবে, অর্থগতভাবে তারাও মুনাফিক বলে গণ্য হবে।

আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, এ আয়াত তিলাওয়াতকালে সালমান ফারসী (রা) যে বলেছেন, "অতঃপর তারা আর আসেনি" এটা তিনি এখন বলেছেন, তখন রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে যারা এ দোষে দোষী ছিল, তারা নিঃশেষ ও ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তা হুযূর (স)-এর পক্ষ হতে তাদের সম্পর্কে সংবাদ যারা তাদের পরে এসেছে এবং আসবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি এর দ্বারা এরূপ উদ্দেশ্য করেছেন যে, অনুরূপ দোষে দোষী কেউ অতিবাহিত হয়নি। আর আমাদের উল্লেখিত ব্যাখ্যা দু'টর মধ্য হতে আয়াতের এটাই উত্তম ব্যাখ্যা একথাটি আমরা এজন্য বলেছি যে, তাফসীরকারগণের পক্ষ হতে একথার উপর দলীলরূপে ইজমা' (ঐক্যমত) সংঘটিত হয়েছে যে, এটা সেই সকল মুনাফিকের সিফাত যারা রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় সাহাবায়ে কেরামের সমসাময়িককালে বিদ্যমান ছিল এবং একথার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি তাদেরই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইজমা সংঘটিত ব্যাখ্যা কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে সে ব্যাখ্যা বা উক্তি হতে উত্তম, যা বিশুদ্ধ হওয়ার উপর কোন নির্দেশনা বা নজীর নাই।

আর পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা বলতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন তা আমল করা, আর তিনি যা সংরক্ষণ করার আদেশ করেছেন, তার বিনাশ সাধন করা। আর তা হলো সামগ্রিকভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ফেরেশতাগণের উক্তি উদ্ধৃত করে ইরশাদ করেছেন قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ "তারা

বললো, আপনি কি তথায় এমন জাতিকে সৃষ্টি করবেন, যারা তথায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে?" আর এর দ্বারা ফেরেশতাগণ এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতিকে সৃষ্টি করবেন, যারা আপনার অবাধ্যাচরণ করবে আপনার আদেশ অমান্য করবে? মুনাফিকদের স্বভাব ও অনুরূপ। তারা পৃথিবীতে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যাচরণ করবে। যে সকল কাজে লিপ্ত হতে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন, তাতে লিপ্ত হবে, তাঁর ফরযসমূহ লংঘন করবে, আল্লাহ্ তা'আলার যে দীনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও এর সত্যতা বিষয়ে দৃঢ় আস্থা ব্যতীত তাতে কারো কোন আমল কবুল হয় না, তাতে তারা সন্দেহ পোষণ করবে, তারা যে সন্দেহ-সংশয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তার বিপরীতমুখী দাবী করার মাধ্যমে মু'মিনদের সাথে মিথ্যা বলবে, সুযোগ পেলে আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর কিতাবসমূহ ও রসূলগণের প্রতি অসত্যারোপ করবে। এগুলোই হচ্ছে মুনাফিক কর্তৃক আল্লাহ্‌র যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। এটাই হলো আল্লাহ্‌র যমীনে মুনাফিকের অশান্তি বিস্তার করা। অথচ তারা মনে করে যে তারা পৃথিবীতে তাদের একাজের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। অতএব তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি আল্লাহ্ রহিত করবে না। আর পাপীদের জন্য যে শাস্তি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তা কম করা হবে না, আল্লাহ্‌র এই অবাধ্যতার মধ্যে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বলে নিজেদেরকে মনে করে।

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "জেনে রেখ তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা তা অনুভব করে না"। আর এটি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের বিধান, তারা যে আল্লাহ্‌র কথাকে মিথ্যা আর তাদের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার এ বিধানটিই জ্ঞান করে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যারা একথা তাঁর পক্ষ হতে যে সকল লোকের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন বলে যে, আল্লাহ্‌র আযাব শুধু তাঁর অবাধ্য লোকেরাই ভোগ করবে।

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ -এর ব্যাখ্যা

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তারা বলে যে, আমরা উভয় পক্ষ তথা মু'মিনগণ ও আহলে কিতাবগণের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ইচ্ছা পোষণ করি।

আর অপরাপর ভাষ্যকারগণ এক্ষেত্রে তাঁর সাথে দ্বিমত করেছেন। যেমন মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এই এই কাজ করো না। তখন তারা বলে, আমরা হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, আমরা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী।

আবু জাফর তাবারী (রঃ) বলেন, আর এখানে তাদের হতে এ দু'বস্তুর মধ্য হতে কোনটি পাওয়া গেছে? অর্থাৎ তাদের এ দাবীর ক্ষেত্রে যে, তারা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী। বস্তুতঃ এতে কোন সন্দেহ নাই যে, তারা নিজেরা ধারণা করতো যে তারা যা কিছুতে লিপ্ত হয়, তাতে তারা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী। সুতরাং তাদের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার দাবীতে ইহুদী ও মুসলমানরা সমান। অথবা তাদের দীনসমূহ এবং তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও মুসলমানদের সাথে তাদের অন্তরে লুকায়িত অপ্রকাশিত বস্তুর বিপরীত প্রকাশ করার মাধ্যমে মিথ্যা বলা ইত্যাদি যাতে লিপ্ত হচ্ছে তাতেও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার দাবী তাদের ধারণা মাত্র। কারণ, তাদের ধারণা এসব কাজে তারা সংকর্মশীল ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট পাপাচারী ও আল্লাহ্‌র আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী

ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ইহুদীদের সাথে শত্রুতা করা এবং মুসলমানদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যা আনয়ন করেছেন, তদুপর বিশ্বাস স্থাপন করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ইহুদীদের সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সাক্ষাত করা এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত ও তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যা আনয়ন করেছেন, তৎপ্রতি তাদের সন্দেহ পোষণ করা এটাই বৃহত্তম বিশৃংখলা। যদিও তাদের দৃষ্টিতে তা তাদের দীনসমূহ কিংবা মুমিন ও ইহুদীদের মধ্যে শৃংখলা স্থাপন করা এবং তারা হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই ছিল না কেন। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেন, "জেনে রেখ, তারাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী," তারা নহে যারা তাদেরকে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে নিষেধ করে। "কিন্তু তারা তা'অনুভব করেনা"।

(١٢) اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ

(১২) "সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এর কোন চেতনাই তাদের নেই।"

এ বাণীটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনাফিকদেরকে তাদের দাবীর প্রশ্নে মিথ্যারোপ করা। যখন আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিষয় পালন করার জন্য তাদেরকে আদেশ করেছেন, যে সকল বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করতে তাদেরকে আদেশ করা হয় এবং যে সব অন্যায় কাজ হতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিষেধ করেছেন, সে সব হতে তাদেরকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল— তখন তারা দাবী করে বলে, আমরা তো শৃংখলা প্রতিষ্ঠাকারী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী নই আর আমরা সত্য-ন্যায় ও হেদায়াতের পথেই প্রতিষ্ঠিত আছি, যা তোমরা আমাদের ব্যাপারে অস্বীকার কর। বরং তোমরাই হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নও। বস্তুত আমরা হেদায়াত বিমুখ কিংবা পথভ্রষ্ট নই। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের এ দাবীতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন। তাই তিনি ঘোষণা করেন, "জেনে রেখ, এরাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী," আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিরুদ্ধাচারণকারী, সীমা লংঘনকারী, তাঁর অবাধ্যাচরণে আত্মনিয়োগকারী, তাঁর ফরযসমূহ বর্জনকারী। "কিন্তু তারা তা অনুভব করে না"। উপলব্ধি করে না যে, তারা বাস্তবে তাই। মুমিনগণ যাঁরা তাদেরকে ন্যায় ও সত্য অনুসরণে আদেশ করে এবং যাঁরা তাদেরকে আল্লাহর পৃথিবীতে নাফরমানী করতে নিষেধ করে, তাঁরা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী নহে।

(١٣) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ـ

(১৩) "যখন তাদের বলা হয়, যেসব লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ঈমান আন— তখন তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি তদ্রূপ ঈমান আনব? সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা বুঝতেই পারে না।"

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রঃ) বলেন, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাদের বিবরণ দান করেছেন এবং পরিচয় দিয়েছেন যে, তারা

বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তারা প্রকৃত বিশ্বাসী নহে, যখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, তোমরা মুহাম্মাদ (স) এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তিনি যা এনেছেন, তার প্রতি তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন কর, যেমন অন্যেরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

এখানে الناس বলতে মুমিনগণ উদ্দেশ্য, যাঁরা মুহাম্মাদ (স), তাঁর নবুওয়াত এবং আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে তিনি যা এনেছেন এ সমস্তের উপর ঈমান এনেছেন। যেমন—

হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা এমনি ভাবে ঈমান আন যে ভাবে মুহাম্মাদ (স)-এর সাথীরা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। যাঁরা বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল, তাঁর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য ও সঠিক। আর তোমরা পরকাল এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন কর।

الناس শব্দটিতে আলিফ লাম যুক্ত হয়েছে। এতে কিছু সংখ্যক মানুষকে বুঝানো হয়েছে সকল মানুষ নয়। কেননা যাদেরকে এ আয়াতের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের নিকট এ সকল লোক ব্যক্তিগত ভাবে সুপরিচিত ছিল। (অর্থাৎ এখানে الف لام টি عهدى, استغراقى বা جنسى নহে)। তোমরা ঈমান আন যেমনি ভাবে ঈমান এনেছে এসব লোকেরা যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (স) এবং তিনি যা আল্লাহর তরফ থেকে এনেছেন, আর কিয়ামতের দিনে বিশ্বাস স্থাপনকারী বলে জান। এ জন্যই الناس শব্দটিতে আলিফ-লাম লাগানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলার বাণী الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم (আলে ইমরান ৩/১৭৩)-এর মধ্যে الناس শব্দটিতেও আলিফ-লাম ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের নিকট যে সকল লোক সুপরিচিত, তাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قالوا انؤمن كما امن السفهاء এর ব্যাখ্যা।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী বলেন, السفهاء শব্দটি سفيه-এর বহুবচন। যেমন, علماء শব্দটি عليم-এর বহুবচন حكماء শব্দটি حكيم-এর বহুবচন। আর سفيه হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মূর্খ, দুর্বল রায় সম্পন্ন, উপকার ও ক্ষতির ক্ষেত্র সম্পর্কে অল্প পরিচিত। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা নারী ও শিশুদেরকে سفهاء রূপে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما –

"আর তোমরা নির্বোধদেরকে তোমাদের সে সম্পদ হাতে তুলে দিওনা, যা তিনি তোমাদের জন্য জীবিকার অবলম্বন করেছেন" (সূরা নিসা ৪:৫)। এপ্রসঙ্গে সকল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এরা হচ্ছে নারী ও শিশুগণ। যেহেতু তাদের মতামত দুর্বল এবং তারা স্বীয় সম্পদ ব্যয় করার বেলায় উপকার ও ক্ষতির খাত সম্পর্কে স্বল্প পরিচিত।

মুনাফিকদের উক্তি—انؤمن كما امن السفهاء-এর প্রসঙ্গে বলা যায় যখন মুনাফিকদেরকে মুহাম্মাদ (স) তিনি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, এবং কিয়ামতের উপর ঈমান আনতে আহবান করা হয়েছিল এবং তাদেরকে এও বলা হয়েছিল যে, তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর সাথী যারা

মু'মিন এবং আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং মুহাম্মাদ (স) যা তাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র কিতাব এবং কিয়ামতের দিবসে বিশ্বাস স্থাপনকারী—তাদের মত তোমরাও ঈমান আন। তখন তারা এই কথার উত্তরে বললো, আমরা কি মূর্খদের মত ঈমান আনবো এবং আমরা মুহাম্মাদ (স)-কে বিশ্বাস করবো ঐ সমস্ত লোকদের ন্যায় যাদের কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুররাতুল হামদানী এবং নবী (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী হতে বর্ণিত—তাঁরা বলেন, আয়াতে বর্ণিত سفهاء শব্দ দ্বারা নবী (স)-এর সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

রবী ইবনে আনাস (রা) থেকে ও শব্দের দ্বারা রসূল (স)-এর সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বর্ণিত আছে।

আবদুর রহমান ইব্নে যায়েদ ইব্নে আসলাম (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি قالوا انؤمن كما امن السفهاء এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা মুনাফিকদের উক্তি, এর দ্বারা তারা নবীকরীম (স)-এর সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করেছে।

ইব্নে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি قالوا انؤمن كما امن السفهاء -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুনাফিকরা বলত, আমরা কি তা'ই বলব, যা' মূর্খরা বলছে? এর দ্বারা তারা নবী করীম (স) এর সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করেছে। যেহেতু সাহাবাগণ (রা) মুনাফিকদের মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন।

اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সে সংবাদটি হচ্ছে এই যে, তারাই তাদের দীন সম্পর্কে নির্বোধ-অজ্ঞ তারা তাদের 'আকীদা ও বিশ্বাসে দুর্বল রায় সম্পন্ন। আর তারা তাদের নিজেদের জন্য যা অবলম্বন করেছে, তাদের সে অবলম্বিত বিষয় নির্বাচনে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রসূল (স) ও নবীর নবুওয়াতে এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে যা নিয়ে এসেছেন তাতে এবং কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। কারণ তারা এসব যা কিছু করেছে, তা দ্বারা তারা নিজেদের প্রতিই অন্যায় করেছে। অথচ তারা ধারণা করে যে, এর দ্বারা তারা নিজেদের আত্মার প্রতি কল্যাণ করছে। বস্তুতঃ তাই প্রকৃত মূর্খতা। কেননা, নির্বোধ ব্যক্তি বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এ ধারণায় যে, সে শৃংখলা স্থাপন করছে; ধ্বংস করে এ ধারণায় যে, সে সংরক্ষণ করছে। তদ্রূপ মুনাফিক ব্যক্তি তার প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করে এ ধারণায় যে, সে তার আনুগত্য করছে, তাঁর সঙ্গে সে কুফরী করে এ ধারণায় যে, সে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, যে তার নিজ আত্মার প্রতি অন্যায় করে এ ধারণায় যে, সে কল্যাণ সাধন করছে। যেমন, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ দোষে দোষারোপ করে ইরশাদ করেন—"জেনে রেখ, তারাই বিশৃংখলা সৃষ্টি-কারী কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।" তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, "জেনে রেখ, তারাই নির্বোধ", আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূলগণ, তাঁর পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিনগণ নির্বোধ নহে। "কিন্তু তারা তা জানে না"। ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এরূপই করতেন। যেমন – তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, জেনে রেখ এরাই নির্বোধ। তিনি বলেন, سفهاء অর্থাৎ অজ্ঞ-মূর্খগণ جهال, আর কিন্তু তারা তা' জানে না" অর্থাৎ তারা বুঝে না।

আর السفهاء শব্দটির মধ্যে আলিফ-লাম সংযোজিত হওয়ার কারণ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس আয়াতাংশে الناس শব্দটিতে আলিফ-লাম যুক্ত হওয়ার কারণের অনুরূপ। আর যেখানে আমরা তা ব্যবহৃত হওয়ার কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। এখানে السفهاء-এর মধ্যেও তা ব্যবহৃত হওয়ার কারণ তথায় الناس-এর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার কারণেরই সদৃশ।

আর এ আয়াতটি যে সকল লোকের ধারণার অবাস্তবতা নির্দেশ করে, যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শুধুমাত্র তারাই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে, যারা জেনে-শুনে তাদের প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করছে। আমাদের আলোচনায় ইতিপূর্বে অনুরূপ দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। যা আমরা, আল্লাহ তা'আলার বাণী ولكن لا يشعرون-এর ব্যাখ্যার অধীনে আলোচনা করেছি, আলোচ্য আয়াতের দৃষ্টান্তও অনুরূপ।

(১৪) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ج وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون ○

(১৪) যখন তারা মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা তামাশা করে থাকি।"

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতটি অপর একটি আয়াত সদৃশ, যাতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে তাঁর রসূল (স) ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করা প্রসঙ্গে সংবাদ দান করেছেন এবং তিনি ইরশাদ করেছেন— ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر

"মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী"। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর পূত বাণী وما هم بمؤمنين "তারা মু'মিন নয়"-এর মাধ্যমে তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছেন। আর তিনি তাদের সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন যে, বরং তারা তাদের এ উক্তির মাধ্যমে "আল্লাহ তা'আলা ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করতে চায়।"

তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব ও রসূলগণের প্রতি আস্থা পোষণকারী মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে মৌখিকভাবে বলে থাকে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা মুহাম্মাদ (স) ও তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যা' কিছু আনয়ন করেছেন তা' সব সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। বস্তুতঃ তারা তাদের জীবন, সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কল্পে প্রতারণামূলকভাবে এরূপ বলে থাকে এবং এর দ্বারা তারা মু'মিনদেরকে প্রতারিত করে। তৎপর তিনি তাদের সম্পর্কে এও সংবাদ দান করেছেন যে, যখন তারা নিভৃতে তাদের মধ্যেকার অবাধ্য, সীমালংঘনকারী, দুষ্টাচারী ও পাপাচার-এবং সকল শ্রেণীর মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়, যারা তাদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব-সমূহ ও তাঁর রসূলগণের সাথে কুফরী আচরণে লিপ্ত, তারাই হলো তাদের শয়তানগণ। আর

আমরা ইতিপূর্বে এ কিতাবে দলীল-প্রমাণ সহ উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচারী প্রত্যেক জীবই শয়তান। তখন তারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, انا معكم (আমরা তোমাদের সঙ্গে) তোমাদের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছি। আর যারা তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে তোমাদের বিরোধিতা করে, তাদের মোকাবিলায় আমরা তোমাদেরই সাহায্যকারী, আমরা তোমাদেরই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, মুহাম্মাদ (স)-এর সহচর সাহাবীগণের নয়। আমরা তো মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল ও তাঁর সাথীগণের সাথে উপহাস বিদ্রূপ করি।

যেমন ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইহুদীদের মধ্যে একদল লোক এমন ছিল, যারা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ কিংবা তাঁদের যে কারো সাথে মিলিত হতো, তখন তারা বলতো, আমরা তোমাদের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আর যখন তারা নিভৃতে নিজেদের সাথীগণের সাথে মিলিত হতো, আর তারাই হলো তাদের শয়তান, তখন তারা বলতো, قالوا انا معكم انما نحن مستهزءون "আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি, আমরা তো' নিছক বিদ্রূপ-উপহাস করে থাকি।"

ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে, তিনি واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, واذا خلوا الى شياطينهم যখন তারা তাদের ইহুদী শয়তানগুলোর সাথে নিভৃতে মিলিত হতো, যারা তাদেরকে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি মিথ্যারোপ ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করার আদেশ করতো, তখন তারা বলতো, قالوا انا معكم আমরা তোমাদের সাথেই আছি। অর্থাৎ আমরা তোমাদের মতই আছি। انما نحن مستهزءون আমরা তো মুসলমানদের সাথে বিদ্রূপ-উপহাসকারী। ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত, তাঁরা واذا خلوا الى شياطينهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো নেতৃস্থানীয় কাফির।

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত, তিনি واذا خلوا الى شياطينهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তারা হলো নেতৃস্থানীয় ও শীর্ষস্থানীয় দুষ্টাচারী। তারা যখন তাদের এ সকল শয়তানদের সাথে মিলিত হতো, তখন তারা বলতো, আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) বিদ্রূপ-উপহাস করে থাকি।

কাতাদা (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি واذا خلوا الى شياطينهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, শয়তানগণ অর্থে, মুশরিকগণ।

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী واذا خلوا الى شياطينهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন মুনাফিকরা গোপনে তাদের কাফির সাথীদের সাথে মিলিত হয়।

মুজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে, তিনি واذا خلوا الى شياطينهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা তাদের মুনাফিক ও মুশরিক সাথীদের সাথে মিলিত হয়।

রবী ইবনে আনাস (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি واذا خلوا الى شياطينهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো তাদের মুশরিক ভাই। তারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, قالوا انما نحن مستهزءون আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আমরা তো' (মুসলমানদের সাথে) ঠাট্টা-তামাশা করি।

ইবনে জুরাইজ (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন মুসলমানগণ কোন সৌভাগ্য বা স্বাচ্ছন্দ অর্জন করে, তখন মুনাফিকরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা তোমাদের দীনি ভাই। আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে নিভৃতে মিলিত হয়, তখন তারা মুসলমানদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তাদের শয়তানগণ হলো, তাদের মুনাফিক ও মুশরিক সাথীগণ।

এখানে যদি কেউ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে যে, তোমরা কি আল্লাহ্‌র বাণী وإذا خلوا إلى شياطينهم-এর প্রতি লক্ষ্য করেছো এতে خلوا بشياطينهم না বলে خلوا إلى شياطينهم বলা হয়েছে। অথচ একথা সুবিদিত যে, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথনে خلوت إلى فلان-এর তুলনায় خلوت بفلان বলার প্রচলন অধিক ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। আর তোমরা বলে থাক যে, বর্ণনা ক্ষেত্রে কুর'আন মজীদ সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও শব্দালংকারপূর্ণ। (এমতাবস্থায় خلوا إلى شياطينهم বলা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়েছে)?

তদুত্তরে বলা হবে যে, এ সম্পর্কে আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ মনীষীগণ মতভেদ করেছেন। কোন কোন বসরাবাসী ব্যাকরণবিদ বলেছেন, যখন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এই হয় যে, আমি আমার নির্দিষ্ট প্রয়োজনে তার সাথে নিভৃতে মিলিত হয়েছি, তখন خلوت إلى فلان (আমি অমুকের সাথে নিভৃতে মিলিত হয়েছি") এরূপ বলা হয়। আর যখন এরূপ বলা হয়, তখন প্রয়োজন পূরণার্থে নিভৃতে মিলিত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন অর্থের সম্ভাবনা থাকে। আর যখন خلوت بفلان বলা হয়, তখন দু' অর্থের সম্ভাবনা রাখে। তার একটি হলো নির্দিষ্ট প্রয়োজনে তার সাথে মিলিত হওয়া, অপরটি হলো তার সাথে হাসিঠাট্টা করার নিমিত্ত নিভৃতে মিলিত হওয়া। সুতরাং এ হিসাবে وإذا خلوا إلى شياطينهم বক্তব্যটি وإذ خلوا بشياطينهم-এর তুলনায় নিঃসন্দেহে অধিক বিশুদ্ধ। কারণ, إذا خلوا بشياطينهم-এর সাথে বক্তব্য দানকারীর বক্তব্যের মধ্যে এর অর্থ সম্পর্কে তার শ্রোতাগণের নিকট দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কালাম وإذا خلوا إلى شياطينهم-এর মধ্যে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব মুক্ত এ হলো এতদসম্পর্কিত একটি বক্তব্য।

অপর বক্তব্যটি হলো وإذا خلوا إلى شياطينهم অর্থ وإذا خلوا مع شياطينهم "যখন তারা তাদের শয়তানগণের সঙ্গে নিভৃতে একত্রিত হয়।" যেহেতু গুণবাচক শব্দের হরফসমূহে একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনেও তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)-এর সম্পর্কে সংবাদ দান পূর্বক ইরশাদ করেন যে, তিনি তাঁর সহচরগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, من أنصاري إلى الله আর তিনি এর দ্বারা مع الله উদ্দেশ্য করেছেন। এখানে إلى শব্দটি مع অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর যেমন على অব্যয়টিকে ب ও من - في - عن -এর স্থলে প্রয়োগ করা হয়—আরবী কাব্যেও তার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

إذا رضيت علي بنو قشير — لعمر الله أعجبني رضاها

"যখন বনূ কুশায়র গোত্র আমার উপর সতর্ক হয়, আল্লাহ্‌র শপথ, তখন তার এ সন্তুষ্টি আমাকে বিস্মিত করে।" এখানে কবি على (আলায়্যা) শব্দ দ্বারা عني (আন্নী) অর্থ গ্রহণ করেছেন।

আর কোন কোন কূফাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ এর ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, এর অর্থ হলো—যখন তারা মু'মিনগণের সাথে মিলিত হতো, তখন বলতো, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা তাদের শয়তানদের নিকট একান্তে প্রত্যাবর্তন করতো, তখন তারা উপরোক্ত উক্তি করতো। সুতরাং তাদের ধারণায় الى অব্যয়টি ব্যবহার করার কারণ হলো, মুনাফিকরা মু'মিনগণের সাক্ষাত হতে তাদের শয়তানদের নিকট প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত অর্থ, যার প্রতি বক্তব্যটি নির্দেশ করছে। সারকথা, এই প্রত্যাবর্তন করার অর্থেই الى-অব্যয়টি ব্যবহারের অন্তর্নিহিত কারণ, خلوا বক্তব্যটি নয়। আর এ ব্যাখ্যার আলোকে الى-এর স্থলে অন্য কোন অব্যয় ব্যবহার করার অবকাশ থাকে না। কারণ, তদস্থলে অন্য যে কোন অব্যয় প্রয়োগ করা হলে তাতে অর্থের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

আর আমার মতে এ অভিমতটি বিশুদ্ধতা বিচারে উত্তম। কেননা, অর্থবোধক অব্যয়সমূহের প্রত্যেকটির জন্য একটি বিশেষ দিক আছে, যা' তার জন্য অন্যের তুলনায় উত্তম ও অধিকতর সঙ্গত। সুতরাং তাকে যে নির্দিষ্ট দিক হতে অন্য কোন দিকে স্থানান্তরিত করা সঙ্গত মনে করা হয় না। হাঁ, এমন একটি প্রামাণ্য দলীলের মাধ্যমে এরূপ স্থানান্তর সম্ভব, যা মান্য করা অপরিহার্য। আর الى অব্যয়টি বক্তব্যের মধ্যে যে কোন স্থানে প্রবেশ করুক, তজ্জন্য একটি নির্দিষ্ট হুকুম বা অর্থ রয়েছে। আর এটাকে তার ব্যবহারের স্থলে স্বীয় অর্থ থেকে সরিয়ে নেয়া সমীচীন হবে না।

انما نحن مستهزءون -এর ব্যাখ্যা

তাফসীরকারগণ সকলে একমত পোষণ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নাই যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী انما نحن مستهزءون-এর অর্থ হচ্ছে انما نحن ساخرون "আমরা তো শুধু উপহাস করি।" অতএব বক্তব্যটির অর্থ হচ্ছে এই যে, মুনাফিকগণ যখন তাদের স্ব-গোত্রীয় অবাধ্যাচারী ও মুশরিকদের একান্তে মিলিত হয়, তখন তারা বলে, মুহাম্মাদ (স) তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তাঁর প্রত্যাবর্তন ক্ষেত্র ও তাঁর অনুসারীগণের প্রত্যাবর্তন ক্ষেত্রের প্রতি মিথ্যারোপ করার প্রশ্নে তোমরা যে অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত আছ, আমরা যে অবস্থার উপরই তোমাদের সাথে আছি। আমরা যখন তাদের সাথে মিলিত হই, তখন আমরা আমাদের এ উক্তি "আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছি"-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ (স)-এর সহচরগণের সাথে উপহাস করে থাকি। যেমন—

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি قالوا انما نحن مستهزءون -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবাদের সাথে উপহাসকারী।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে, তিনি انما نحن مستهزءون-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অর্থাৎ আমরা লোকদের সাথে বিদ্রূপ-উপহাস করি এবং তাদের সাথে তামাশা করি।

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি انما نحن مستهزءون-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ আমরা এই সব লোকদের উপহাস ও ঠাট্টা-তামাশা করি।

রবী (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি انما نحن مستهزءون-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর সহচরগণের সাথে উপহাস করি।

(١٥) اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

(১৫) আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী বলেন, মুনাফিকদের সাথে আল্লাহ তা'আলার উপহাস করার প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ মতভেদ করেছেন। যা তিনি সব মুনাফিকদের সাথে করার বিষয় উল্লেখ করেছেন, যাদের বিবরণ তিনি ইতিপূর্বে দিয়েছেন। তাদের মধ্য হতে কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে উপহাস করার প্রকৃতি বা ধরন এরূপ হবে, যা তিনি কিয়ামতের দিন তাদের সাথে করার কথা নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন :

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ - يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى ...

(الحديد : ٥٧/١٣ - ١٤)

"সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক স্ত্রীলোকেরা মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমাদের প্রতি একটু লক্ষ্য কর, আমরা তোমাদের নূর হতে কিছু অংশ গ্রহণ করব। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পশ্চাতে ফিরে যাও এবং নূর অনুসন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর—যাতে একটি দরজা থাকবে—যার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবেন, অবশ্যই ছিলে।" (আল-হাদীদ: ৫৭/১৩-১৪)।

আর যেমন তিনি কাফিরদের সহিত বিদ্রূপ করা সম্পর্কে তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে সংবাদ দান করেছেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا (آل عمران : ٣/٧٨)

"কাফিররা যেন কিছুতেই এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দান করছি, তা তাদের নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক। বরং আমি তো তাদেরকে এজন্য অবকাশ দান করি, যাতে তারা পাপ বৃদ্ধি করে।"—(আল-ইমরান : ৭৮)

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন এবং আয়াতের এ ব্যাখ্যা দান করেন, তাঁদের মতে এটা এবং এতদসদৃশ আল্লাহ তা'আলার কাজই মুনাফিক ও মুশরিকদের সাথে তাঁর উপহাস বিদ্রূপ করা ও ধোঁকা দেওয়া।

অপর একদল তাফসীরকার বলেছেন, এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার উপহাস হচ্ছে, তারা যে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, তজ্জন্য তাদেরকে শাসানো ও তিরস্কার করা। যেমন বলা হয়, ان فلانا ليستهزأ منه منذ اليوم ويسخر منه "অদ্য হতে অমুককে বিদ্রূপ করা হবে এবং তার প্রতি উপহাস করা হবে।" এটা দ্বারা লোকেরা তাকে দুর্নাম করা ও তিরস্কার উদ্দেশ্য। কিংবা এর দ্বারা তিনি তাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ সাধন করা উদ্দেশ্য। যেমন কবি উবায়েদ ইবনে আবরাস বলেন,

سائل بنا حجر ابن ام قطام اذ ظلت به السمر النواهل تلعب

"হুজর ইবনে উম্মে কুতাম আমাদের প্রতি তখন প্রবাহিত হবে, যখন পিপাসার্তের বাবলা কাঁটা তার সঙ্গে খেলা করবে।"

এখানে তারা ধারণা করেছে যে, বাবলা কাঁটা যার দ্বারা কোন খেলা হতে পারে না, হাঁ যখন তাকে কর্তন করা হয় এবং বিচ্ছিন্ন করা হয়। যে ব্যক্তি এরূপ করেছে, সে তাকে তার সাথে খেলায় পরিণত করেছে, যে তার সঙ্গে এমনটি করেছে।

তাঁরা বলেছেন, তদ্রূপ মুনাফিক ও কাফিরগণ যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে উপহাস করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার উপহাস হয়তো তিনি তাদের ধ্বংস ও বিনাশ সাধন করা কিম্বা যখন তারা নিজেদের দৃষ্টিতে নিরাপদ অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় আকস্মিক ভাবে তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে অবকাশ দান করা অথবা তিনি তাদেরকে শাসানো ও তিরস্কার করার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

তাঁরা আরও বলেছেন যে, একইভাবে আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে ধোঁকা দান করা, প্রতারিত করা ও উপহাস করা দ্বারা এরূপ অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

আর অন্যরা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم। এটা প্রতি উত্তরে ব্যবহৃত। যেমন কেউ তার সাথে প্রতারণাকারীকে যখন সে তার উপর বিজয়ী হয়েছে, উদ্দেশ্য করে বলল, আমিই তোমাকে প্রতারিত করেছি। অথচ তার পক্ষ হতে কোনরূপ প্রতারণা সংঘটিত হয়নি। কিন্তু যখন পরিস্থিতি তার অনুকূলে এসে গেছে, তখন সে একথা বলেছে।

তাঁরা বলেছেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين (آل عمران : ৩/৫৪) এবং الله يستهزئ بهم (البقرة : ২/১৫) ও প্রতি উত্তরে

ব্যবহৃত হয়েছে। নচেৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনরূপ প্রতারণা বা উপহাস সংঘটিত হয় না। আর এর অর্থ হচ্ছে, তাদের এ প্রতারণা ও উপহাস তাদেরই সাথে সম্পর্কিত হবে।

আর অন্য একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী (البقرة ٢ : ١٥) الله يستهزئ بهم يخادعون الله وهو خادعهم (النساء ٤ : ١٤٢) এবং انما نحن مستهزءون ○ (البقرة ٢ : ١٤) ونسوا الله فنسيهم (التوبة ٩ : ٦٧) এবং فيسخرون منهم سخر الله منهم (التوبة ٩ : ٧٩) ও ইত্যাদি আয়াতসমূহ হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এমর্মে সংবাদ দান করা যে, তিনি তাদেরকে উপহাসের প্রতিফল এবং প্রতারণার শাস্তি দান করবেন। এখানে তিনি তাদেরকে প্রতিফল দান করা এবং তাদেরকে শাস্তি দান করাকে শাব্দিকভাবে তাদের সে কাজের স্থলে প্রয়োগ করেছেন, যে কারণে তারা শাস্তিযোগ্য হয়েছে, যদিও অর্থগতভাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (الشورى ٤٢ : ٤٠) وجزاء سيئة سيئة مثلها "(অন্যায়ের প্রতিফল সমপরিমাণ অন্যায়)।" আর এটা সুবিদিত যে, প্রথম অন্যায়টি তার কর্তা হতে সংঘটিত একটি অপরাধ। যেহেতু তা তার পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণ হিসাবে সংঘটিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় অন্যায়টি বস্তুতঃ সুবিচারই বটে। কেননা, তা আল্লাহ আ'আলার পক্ষ হতে অপরাধের জন্য অপরাধীকে শাস্তি দান করা। যদিও এগুলো শব্দগতভাবে অভিন্ন কিন্তু অর্থগত ভাবে বিভিন্ন। (প্রথম سيئة অন্যায় দ্বারা প্রকৃত অন্যায়ই অর্থ, আর দ্বিতীয় سيئة অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিফল অর্থ)।

অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী (البقرة ٢ : ١٩٤) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ("যে ব্যক্তি তোমাদের উপর সীমালংঘন করেছে, তোমরাও তার উপর সীমালংঘন কর")-এর মধ্যেও প্রথম সীমালংঘনটি জুলুম কিন্তু দ্বিতীয় সীমালংঘনটি তার প্রতিফল জুলুম নহে। বরং তা সুবিচারই বটে। যেহেতু তা জালেমের প্রতি তার জুলুমের শাস্তি। যদিও দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দটিরই অনুরূপ। কুরআন মজীদে কোন সম্প্রদায়ের সাথে ধোঁকা ও প্রতারণা করা বা তদনুরূপ আচরণ করা সংক্রান্ত এতদ্সদৃশ যে সকল সংবাদ দান করা হয়েছে, তাঁরা এ সমস্ত আয়াতকে এ অর্থেই ব্যাখ্যা করেছেন।

আর অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেন-এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে এ মর্মে সংবাদ দান করেছেন যে, তারা যখন তাদের দুষ্টাচারী সাথীদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে, মুহাম্মাদ (স) ও তিনি যা আনয়ন করেছেন, তৎপ্রতি মিথ্যারোপ করার ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের ধর্মানুসারে তোমাদের সাথেই রয়েছি। আমরা তো' তাদের নিকট আমাদের উক্তি "আমরা মুহাম্মাদ (স) ও তিনি যা আনয়ন করেছেন তার উপর ঈমান আনয়ন করেছি' বলে তাদের প্রতি উপহাস করি। আর এর দ্বারা মুনাফিকরা এ অর্থ উদ্দেশ্য করে যে, আমাদের দৃষ্টিতে যা অসত্য এবং হেদায়াত নহে আমরা তাদের নিকট তা'ই প্রকাশ করি। তাঁরা বলেন, উপহাসের অর্থসমূহের মধ্য হতে একটি অর্থ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি

তাদের সাথে উপহাস করবেন। আর তা এভাবে যে, তিনি দুনিয়ায় তাদের জন্যে সে বিধান প্রকাশ করবেন, যা তাদের জন্য নির্ধারিত আখেরাতের বিধানের বিপরীত। যেমন, তারা দীন সম্পর্কে নবী (স) ও মু'মিনদের নিকট তাদের অন্তরে লুকায়িত আকীদা বিশ্বাসের-বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করেছে।

আর এক্ষেত্রে আমাদের মতে এটিই সঠিক অভিমত যে, আরবদের কথোপকথনে استهزاء হচ্ছে উপহাসকারী ব্যক্তি। বাহ্যতঃ উপহাসকৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এমন কথা ও কাজ প্রকাশ করা, যা তাকে সন্তুষ্ট করবে এবং প্রকাশ্যে তার মনঃপুত হবে। কিন্তু সে তার একথা ও কাজ দ্বারা গোপনে তার ক্ষতি সাধনকারী হবে। আর এটিই অর্থ হয় خداع প্রতারণা سخريه উপহাস, ও مكر ধোঁকাবাজি।

আর যদি তাই হয়, তবে আল্লাহ পাক মুনাফিকদের জন্যে দুনিয়াতে যে বিধান রেখেছেন তা হচ্ছে আল্লাহ পাক ও তার রসুল (স)-এর প্রতি এবং তিনি যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এনেছেন, তার প্রতি ঈমানের কথা মৌখিক প্রকাশের কারণে, যাদের প্রতি ইসলামের নাম ব্যবহার করা হয়, তাদের সাথে শামিল করা। যদিও মুনাফিকরা সেই মুমিনদের বিরোধী। যাদের অন্তরে সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, যাদের কর্ম প্রশংসনীয়, যাদের ঈমান বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারবার পরীক্ষিত। আর আল্লাহ পাক মুনাফিকদের মিথ্যা সম্পর্কে অবগত আছেন। এবং আল্লাহ পাকের তরফ হ'তে তাদের ঘৃণ্য ধর্ম বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা এবং তারা যা কিছু বিশ্বাস করে বলে দাবী করে তাতে সন্দেহ পোষণ করা। এমনকি তারা এই ধারণা করে যে, দুনিয়াতে যাদের সঙ্গে ছিল, আখিরাতেও তাদের সঙ্গে থাকবে এবং তারা মুসলমানদের অবতরণের স্থলে অবতরণ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পার্থিব জীবনে তাদের সাথে যে বিধান যুক্ত হবে, তা প্রকাশ করা সত্ত্বেও পরকালে যখন তাদের ও তাঁর ওলীগণের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে এবং তাঁরা ও তাদের মধ্যে তিনি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দিবেন, তখন তিনি তাদের জন্য তাঁর পীড়াদায়ক শাস্তি ও কঠিনতম আযাব প্রস্তুতকারী। যা তিনি তাঁর ঘোর শত্রু ও নিকৃষ্টতম পাপাচারী বান্দাগণের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যার ফলে তাঁর ওলীগণ ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি তাদেরকে তাঁর সৃষ্ট জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

একথা সুবিদিত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে এ আচরণ করার মাধ্যমে যদিও তাদের কৃত-কর্মের প্রতিফল দান করেছেন এবং তারা তাঁর নাফরমানীর কারণে এর উপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে বিধায় তা তাঁর পক্ষ হতে সুবিচারই ছিল। তথাপি তিনি দুনিয়ায় তাদের সাথে যে বিধান প্রকাশ করেছেন, তারা তাঁর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে তাঁর বন্ধুগণের বিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং তাদের ও তাঁর ওলীগণের মধ্যে পার্থক্য করার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামতে তাদেরকে মু'মিনদের সাথে হাশরে একত্রিত রাখবেন। এটি তাঁর পক্ষ হতে তাদের প্রতি উপহাস, তাদের প্রতি প্রতারণা। কারণ, উপহাস-বিদ্রূপ, ধোঁকা ও প্রতারণার অর্থ তাই যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, বিদ্রূপ করাকালীন সময় তিনি তাদের প্রতি অত্যাচারী কিংবা তাদের প্রতি অবিচারকারী। বরং আমরা ইতিপূর্বে যে সকল বিশেষণ উল্লেখ করেছি, তা পাওয়ার সাপেক্ষে এ সব কিছুই উপহাস বিদ্রূপ ও এতদ্‌সদৃশ আচরণ বিশেষ। আর আমরা এ প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছি, তার সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি الله يستهزئ بهم-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি তাদের সাথে প্রতিশোধ গ্রহণমূলক বিদ্রূপ উপহাস করেন।

আর যাঁরা ধারণা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী الله يستهزئ بهم প্রতিউত্তর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বাস্তবে আল্লাহ্ তা'আলা হতে কোন বিদ্রূপ-উপহাস ও ধোঁকা প্রতারণা সংঘটিত হয় না—মূলতঃ তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলা হতে সে বস্তুই নিষেধ করেছেন, যা তিনি স্বয়ং নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, যা তিনি তাঁর জন্য অনিবার্য করেছেন।

তাঁদের একথা এরূপ বলারই সমতুল্য যেমন কেউ বলল, আল্লাহ্ তা'আলা যাদের সম্পর্কে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদের সাথে উপহাস বিদ্রূপ করেন, তাদের সাথে ধোঁকা প্রতারণা করেন, বাস্তবে তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা হতে কোনরূপ উপহাস-বিদ্রূপ, ধোঁকা ও প্রতারণা সংঘটিত হয় না। কিংবা যে বলল, পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্য হতে যাদেরকে তিনি ধ্বংস করে ফেলার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি ধ্বংস করে ফেলেন নি। আর যাদের সম্পর্কে তিনি নিমজ্জিত করার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি নিমজ্জিত করেন নি। (অর্থাৎ এর দ্বারা কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণাকে অস্বীকার করা হয়ে যায়।)

আর এ অভিমত পোষণকারীকে বলা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে সংবাদ দান করেছেন যে, আমাদের পূর্বে যারা পৃথিবীতে ছিল এবং আমরা তাদেরকে দেখিনি, তাদের মধ্য হতে এক সম্প্রদায়ের সাথে তিনি প্রতারণা করেছেন। আরেক সম্প্রদায় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। অন্য এক সম্প্রদায় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে নিমজ্জিত করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে যে সকল বিষয়ে সংবাদ দান করেছেন, আমরা সে সকল বিষয়কে সত্যরূপে বিশ্বাস করেছি। আর আমরা এ সকল সংবাদের মধ্য হতে কোনটিতে কোনরূপ তারতম্য করিনি। এমতাবস্থায় তোমার নিকট এ বিষয়ে কি প্রমাণ রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে তুমি এ সকল সংবাদের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করেছো? যেমন তুমি ধারণা করছো যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাদের সম্পর্কে নিমজ্জিত করার সংবাদ দিয়েছেন, তিনি তাদেরকে নিমজ্জিত করেছেন। যাদের সম্পর্কে ধ্বসিয়ে দেওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। আর যাদের সম্পর্কে তিনি প্রতারণা করার সংবাদ দিয়েছেন, তাদের সাথে তিনি প্রতারণা করেন নাই। অতঃপর আমরা কথাটিকে বিপরীতভাবে বলতে পারি, তখন এগুলোর কোনটি সম্পর্কেই একান্ত আবশ্যকীয় বলা যাবে না।

আর যদি সে আমাদের এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথার আশ্রয় গ্রহণ করে যে, উপহাস বিদ্রূপ একটি নিরর্থক কাজ ও তামাশা। আর তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সংঘটিত হওয়া নিষিদ্ধ। তবে তাকে বলা হবে যে, ব্যাপারটি যদি তোমার নিকট এরূপই হয়, 'যা তুমি استهزاء উপহাস-বিদ্রূপের অর্থরূপে বর্ণনা করেছো, তবে কি বল না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে বিদ্রূপ (আল-ইমরান : ৩/৫৪) করেন, তাদের সাথে তামাশা করেন (আল-তাওবা : ৯/২৯) এবং তাদেরকে প্রতারিত করেন। আর তোমার মতে আল্লাহ্ তাআলা হতে উপহাস বিদ্রূপ হয় না। এর উত্তরে যদি বলে, না, আমি এইরূপ বলি না তবে সে কুরআনের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং এ কারণে সে ইসলামী মিল্লাতের গণ্ডি বহির্ভূত হয়ে গিয়েছে। আর যদি সে এর উত্তরে বলে হাঁ, আমি এরূপ বলি তবে তাকে বলা হবে যে, তুমি কি সে দৃষ্টিকোণ থেকে বল, যা তুমি বলেছো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ করেন তথা তিনি তাদের সাথে

খেল-তামাশা করেন এবং নিরর্থক কাজ করেন? অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে খেল-তামাশা নাই এবং নিরর্থক কাজ হতে পারে না। তদুত্তরে সে যদি বলে, হাঁ, আমি সে দৃষ্টিকোণ থেকেই বলেছি তবে সে আল্লাহ তা'আলাকে এমন বস্তুর সাথে বিশেষিত করল, যা আল্লাহ তা'আলা হতে না হওয়া এবং তাঁকে এর সাথে বিশেষিতকারীর ভ্রান্তির প্রশ্নে মুসলমানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর তাঁর প্রতি সে এমন বস্তুকে সম্পর্কিত করেছে, তাঁর প্রতি যা' সম্পর্কিতকারী পথভ্রষ্ট হওয়ার উপর যুক্তিমূলক দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আর যদি বলে যে, আমি এরূপ বলি না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে খেল-তামাশা করেন এবং তিনি নিরর্থক কাজ করেন। অবশ্য আমি একথা বলি যে, তিনি তাদের সাথে বিদ্রূপ উপহাস করেন। তবে তার উদ্দেশ্যে বলা হবে যে, তবে তো' তুমি খেল-তামাশা, নিরর্থক কাজ এবং বিদ্রূপ-উপহাস ও ধোঁকা-প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছো। এবং যে দৃষ্টিকোণ হতে এরূপ বলা জায়েয এবং যে দৃষ্টিকোণ হতে এরূপ বলা জায়েয নয়, উভয়ের অর্থ মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এগুলোর প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে, যা' অপরটির অর্থ হতে ভিন্ন।

বস্তুতঃ এধরনের আলোচনার জন্য এটা উপযুক্ত স্থান নয় বরং তজ্জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। সুতরাং আমি এ সম্পর্কিত আলোচনা দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করাকে অপছন্দ করেছি এবং আমি এ প্রসঙ্গে যতটুকু উল্লেখ করেছি, যিনি তা উপলব্ধি করার তওফিক লাভ করেছেন, তাঁর জন্য এটাই যথেষ্ট।

ويمدهم-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী ويمدهم-এর ব্যাখা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন—

ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবীর মতে ويمدهم এখানে يملى لهم অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। আর ইবনুল মুবারক, ইবন জুরায়জ ও মুজাহিদ-এর মতে يمدهم এখানে يزيدهم-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদের অবাধ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আর কোন কোন বসরাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ এর ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, يمدهم শব্দটি يمدلهم অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অর্থাৎ তাদের জন্য দীর্ঘায়িত করেন)। আরবী ভাষার এর আরও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা বলেন, আর তারা এ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থেও مددت له ও قد مددت له ও امددت له বলে থাকে। আর তা' হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী (আত-তূর: ৫২/২২) وامددنا هم; আর তা امددنا هم হতে নিষ্পন্ন। তিনি বলেন, আর বলা হয়, قد مد البحر (অর্থাৎ সমুদ্র উত্থিত হয়েছে, জোয়ার এসেছে) তখন তা হয় (কর্তৃকারকে) ماد (উত্থানকারী, জোয়ার সম্পন্ন)। আর امد الجرح ক্ষতকে দীর্ঘায়িত করেছে। তাই তা আরবী ممد (অর্থাৎ দীর্ঘায়িত) হয়েছে।

আর কথিত আছে যে, ইউনুস আল-জারামী বলতেন, যদি মন্দ বিষয়ের বর্ণনা হয় তবে مددت ব্যবহার হয়, আর যদি ভাল কিছুর বর্ণনা হয় তবে امددت ব্যবহার হয়। যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, তুমি কোন কিছু ছেড়ে দিয়েছ এমন স্থলে مددت له ব্যবহার হবে। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, তুমি কিছু দান করেছ একথা বলবে তবে امددت ব্যবহার কর।

আর কোন কোন কুফাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন, বস্তুর মধ্যে নিজের থেকে যা অতিরিক্ত সৃষ্টি হয় তা' আলিফ ব্যতীত مددت রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, তুমি বলবে مد النهر ومده نهر اخر غيره (অর্থাৎ নদী দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং তাকে অপর একটি নদী দীর্ঘায়িত করেছে) যখন তা' এর সাথে মিলিত হয়ে অঙ্গীভূত হয়েছে। আর বস্তুর মধ্যে অন্যের দ্বারা যা অতিরিক্ত সৃষ্টি হয় তা আলিফসহ ব্যবহৃত হবে। যেমন, তোমার উক্তি امد الجرح (অর্থাৎ ক্ষত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে) কেননা, এই অতিরিক্ত হওয়াটা ক্ষতের মধ্য হতে নহে। এর আরও একটি উদাহরণ যেমন, امددت الجيش بمدد (অর্থাৎ সাহায্যকারী দলের সংযোগে সৈন্য বাহিনী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে)।

বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে এটাই উত্তম কথা যে, ويمدهم অর্থ يزيدهم অর্থাৎ তাদের অহমিকার ও অবাধ্যতার সুযোগ বাড়িয়ে দেওয়া। যেমন, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে তাদের সমগোত্রীয়দের সাথে এরূপ করার বর্ণনা দিয়েছেন:

ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون (سورة الانعام : ٦/١١٠)

"তারা যেমন প্রথম বারে এতে বিশ্বাস করে নাই, তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও চোখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেব।" অর্থাৎ আমি তাদেরকে ত্যাগ করব, ছেড়ে দিব এবং তাদেরকে অবকাশ দান করব, যাতে তারা তাদের পাপের সাথে অতিরিক্ত পাপ করে।

আর যাঁরা বলেছেন যে, يمدهم আয়াতাংশ يمد لهم অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের এ বক্তব্যের কোন কারণ নাই। কেননা, আরবগণ ও আরবী ভাষাবিদগণ مد النهر نهر اخرا অর্থ অন্য কোন ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে বাক্যটিকে اتصل به نهر زائدا ماء المتصل به بماء المتصل (একটি নদী অন্য নদীর সাথে মিলিত হয়ে পানি বৃদ্ধি করবেই) এটাই তার অর্থে ব্যবহার করেছেন। তদ্রূপ এখানে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ويمدهم فى طغيانهم يعمهون-এর মধ্যে তা অনুরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

فى طغيانهم-এর ব্যাখ্যা।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী বলেন, طغيان শব্দটি فعلان-এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা এ শব্দটি "طغى فلان يطغى طغيانا" (যে কোন বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে) হতে নিষ্পন্ন। আর এ অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলার বাণী كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى "(জেনে রেখ, নিশ্চয় মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে, যেহেতু সে তাকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়)।" অর্থাৎ সে তার জন্য নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে।

আর এ অর্থেই কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবিস সালত বলেছেন—

ودعا الله دعوة لات هنا — بعد طغيانه فظل مشيرا

"আর সে তার সীমা লঙ্ঘনের পর সে আল্লাহ্‌কে ডেকেছে লাতকে ডাকার ন্যায় গোমরাহীর পর সে হয়েছে উপদেশদাতা।

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ এর মধ্যে এ অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন যে, তিনি তাদেরকে অবকাশ দান করবেন এবং তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিবেন, যেন তারা ভ্রষ্টতা ও কুফরীর মধ্যে অস্থিরভাবে ঘুরপাক খেতে থাকে। যেমন—

ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাদের কুফরী মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে।

ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা فِي طُغْيَانِهِمْ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তাদের কুফরীর মধ্যে।

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فِي طُغْيَانِهِمْ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তারা তাদের পথভ্রষ্টতায় ঘুরপাক খেতে থাকবে।

রবী ইবন আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের পথভ্রষ্টতার মধ্যে।

ইবন যায়েদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فِي طُغْيَانِهِمْ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের সীমালঙ্ঘন হলো তাদের কুফরী ও পথভ্রষ্টতা।

يَعْمَهُونَ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রঃ) বলেন, العمه শব্দটি মূলতঃ ভ্রষ্টতা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ঐ অর্থেই বলা হয় عمه فلان يعمه عمها وعموها যখন সে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী হয়।

আর এই অর্থেই জনমানবহীন স্থানের ভ্রষ্টতার বিবরণ দিয়ে কবি রউবা ইব্‌ন আল উজ্জাজ বলেছেন—

وَمَخْفِقٍ مِنْ لُهْلُهٍ وَلُهْلُهِ — مِنْ مَهْمَهٍ يَجْتَبْنَهُ فِي مَهْمَهِ

أَعْمَى الْهُدَى بِالْجَاهِلِينَ الْعُمَّهِ

"আর জনমানবহীন স্থান হতে সুপরিসর স্থানের সমতল ভূমি। জনমানবহীন স্থানে এটাকে অসহনীয় অপছন্দনীয় রূপে গণ্য করা হয়। ভ্রষ্টতা মূর্খদেরকে হেদায়াত হতে অন্ধ করেছে।

আর العمه শব্দটি عامه-এর বহুবচন। আর তারা হলো সে সকল লোক যারা তাতে পথভ্রষ্ট হয় এবং অস্থিরমতি ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকে।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ-এর অর্থ হলো, তারা তাদের যে পথভ্রষ্টতা ও কুফরীর মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে, যার পঙ্কিলতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করেছে, যার অপবিত্রতা তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তারা এ পথভ্রষ্টতা মধ্যে অস্থিরভাবে

ঘুরপাক খেতে থাকবে। তা' হতে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ তারা খুঁজে পাবে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তকরণে ছাপ লাগিয়ে দিয়েছেন এবং মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন যাদ্দরুন তাদের চক্ষু হেদায়াত হতে অন্ধ হয়ে পড়েছে এবং তা' আছন্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা হেদায়াতের পথ দেখে না এবং পথের সন্ধান পায় না।

العمه শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা যদ্রূপ উল্লেখ করেছি, ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায়ও তদ্রূপ উল্লেখিত হয়েছে, যেমন —

ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের একদল হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা يعمهون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা তাদের কুফরীর মধ্যে আবর্তিত হতে থাকবে।

ইবন আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি يعمهون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ আবর্তিত হতে থাকবে, ঘুরপাক খেতে থাকবে।

ইবন আব্বাস (রা) হতে (আরেক সনদে) বর্ণিত) আছে যে, তিনি يعمهون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঘুরপাক খেতে থাকবে।

ইবন আব্বাস (রা) হতে (অন্য এক সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, يعمهون অর্থাৎ অস্থিরচিত্ত থাকবে।

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি في طغيانهم يعمهون -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন অর্থাৎ ঘুরপাক খেতে থাকবে।

আবু নাজীহ্ মুজাহিদ (রহ) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

ইবন জুরাইজ মুজাহিদ (রহ) হতে একইরূপ উদ্ধৃত করেছেন।

রবী ইবন আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি يعمهون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ ঘুরপাক খেতে থাকবে।

(١٦) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ -

(১৬) এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, কেউ যদি এ প্রশ্ন করে যে, এসকল লোক কিরূপে হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে? কারণ তারা তো মুনাফিক ছিল, তাদের এ নিফাক বা কপটতার উপর ঈমান তো' অগ্রবর্তী ছিল না, যার উপর ভিত্তি করে একথা বলা যায় যে, তারা যে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাকে তারা গোমরাহীর বিনিময়ে বিক্রয় করেছে, তারা ভ্রান্তিকে ঈমানের পরিবর্তে গ্রহণ করেছে। যেহেতু এটা জানা কথা যে, ক্রয় করার ভাবগত অর্থ হলো, একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর বিনিময়ে বিক্রির মাধ্যমে গ্রহণ করা। আর মুনাফিকগণ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ বিশেষণের সাথে বিশেষিত করেছেন, তারা তো' কখনই হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না যে, তারা তা' ত্যাগ করে এর বিনিময়ে কপটতাকে গ্রহণ করবে?

এর উত্তরে বলা যায় যে, ব্যাখ্যাকারগণ এর অর্থ সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। অতএব আমরা এখানে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরব। অতঃপর ইনশা আল্লাহ আমরা এক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যাটি বিশুদ্ধ তা বর্ণনা করব।

ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তারা কুফরীকে ঈমানের বিনিময়ে গ্রহণ করেছে।

ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى-এর ব্যাখ্যায় বলতেন, যারা হেদায়াতকে বর্জন করে ভ্রান্তিকে গ্রহণ করেছে।

কাতাদাহ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হেদায়াতের স্থলে ভ্রান্তিকে পছন্দ করেছে।

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কুফরী করেছে।

আবু নাজীহ মুজাহিদ (রহ) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, যাঁরা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তারা পথভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করেছে এবং হেদায়েতকে বর্জন করেছে, তাঁরা যেন ক্রয় করার অর্থের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, ক্রেতা তার প্রদত্ত মূল্যের স্থলে খরিদকৃত বস্তুটি গ্রহণ করেছে। সুতরাং তারা এরূপই বলেছেন যে, তদ্রূপ মুনাফিক ও কাফির বা ঈমানের স্থলে কুফরীকে গ্রহণ করেছে। অতএব তাদের হেদায়াতকে বর্জন করত কুফরী ও পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করা যেনো ক্রয় করা। তাদের বর্জিত হেদায়াত হল এখানে গৃহীত পথভ্রষ্টতার বিনিময় মূল্য। আর যাঁরা এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী اشتروا (ক্রয় করেছে)-এর অর্থ হলো, আর যাঁরা اشتروا-এর অর্থ পছন্দ করা বলেছেন তারা প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ তাআলার বাণী واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى অর্থাৎ "আর সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা হেদায়াতের স্থলে কুফরী পছন্দ করেছে—" (সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ৪১/১৭)। এখানে কাফিররা হেদায়াতের স্থলে কুফরী পছন্দ করেছে বলে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন।

اشتروا الضلالة على الهدى-কে সে অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, با অব্যয়টি কখনো على-এর স্থলে এবং على অব্যয়টিও با-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, مررت بفلان ও مرد على فلان এ উভয় বাক্যের অর্থ একই। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك অর্থ "কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, বিপুল পদ আমানত রাখলেও ফেরৎ উঠবে" (আল-ইমরান ৩/৭৫)। এ আয়াতে উল্লেখিত بقنطار শব্দটি على قنطار অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুতরাং তাঁদের ব্যাখ্যা মোতাবেক আয়াতের অর্থ হলো তারা এমন সকল লোক, যারা হেদায়াতের স্থলে গোমরাহীকে পছন্দ করেছে। আর আমরা তাদেরকে اشتروا "ক্রয় করেছে"—কে اختاروا

"পছন্দ করেছে" অর্থে ব্যাখ্যা করতে দেখতে পাচ্ছি। কারণ, আরবদের মধ্যে اشتريت كذا على كذا "আমি অমুক বস্তুর বিনিময়ে অমুক বস্তু ক্রয় করেছি" এবং اشتريته "আমি তা ক্রয় করেছি" বলে, আমি পছন্দ করেছি, এ অর্থ উদ্দেশ্য করার প্রচলন রয়েছে। যেমন, সা'লাবা গোত্রের কবি আশা-এর নিম্নোক্ত কবিতার মধ্যে الاشتراء শব্দটিকে এ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে :

فلقد أخرج الكاعب المشترا — ة من خدرها وأشيع القمارا

কবি এখানে مشتراة দ্বারা مختارة অর্থ গ্রহণ করেছেন।

আর কবি যূর রিম্মাহ্ اشتراء শব্দটিকে اختيار অর্থে ব্যবহার করে বলেছেন—

يذب القصايا عن شراة كأنها — جماهير تحت المدجنات الهواضب

"নিকৃষ্ট জাতের উষ্ট্রীগুলিকে পছন্দনীয় উষ্ট্রী হতে হেফাজত করা হয়, যেন তা শক্তিশালী অশ্বের আস্তাবলে সংখ্যাগরিষ্ট অংশ।"

এখানে شراة দ্বারা مختارة অর্থ করা হয়েছে।

অন্য একজন কবি অনুরূপ অর্থেই বলেছেন—

ان الشراة روقة الأموال — وحزرة القلب خيار المال

"নিশ্চয় পছন্দনীয় উষ্ট্রীগুলি শ্রেষ্ট সম্পদ, আর অন্তরের ধনাঢ্যতা সর্বোত্তম সম্পদ।"

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রঃ) বলেন, যদিও এটা এক প্রকার ব্যাখ্যা কিন্তু তা আমার মনঃপূত নয়। কেননা এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন فما ربحت تجارتهم (তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি)। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى-এর মধ্যে ব্যবহৃত اشتروا শব্দটি দ্বারা জনসাধারণে সুপরিচিত ক্রয় তথা এক বস্তুর বিনিময়ে অন্য বস্তু গ্রহণ করা এবং বিনিময়ের পরিবর্তে বিনিময় লওয়ার অর্থই উদ্দেশ্য।

আর যাঁরা বলেছেন যে, এসব লোক প্রথমে মু'মিন ছিল, তারপর কুফরী করেছে—অত্র আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হলে, ব্যাখ্যাকারদের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। কেননা ঈমানকে বর্জন করে হেদায়াতের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করেছে। ইহাই সে অর্থ যা ক্রয়-বিক্রয়ের ভাবার্থ। কিন্তু মুনাফিকদের বিবরণ সম্বলিত আয়াতসমূহ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একথাই নির্দেশ করে যে, এ সকল লোক কখনো ঈমানের আলোকে আলোকিত হয় নাই, আর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণও করে নাই।

তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেখান হতে তাদের পরিচয় দান করা শুরু করেছেন এবং যে পর্যন্ত তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তাতে আল্লাহ্ পাক তাদের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স) এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপনের দাবীতে মুখে মিথ্যা প্রকাশ করেছে। আর তা তাদের নিজের পক্ষ হতে আল্লাহ্ তা'আলা

তাঁর রসূল (স) ও মু'মিনদের প্রতি প্রতারণা করা এবং তাদের অন্তরে মু'মিনদের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করা। অথচ তারা যা প্রকাশ করেছে, তাদের অন্তরে তার বিপরীত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাদের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

(আর মানুষের মধ্যে এমন কতেক লোক রয়েছে—যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছি কিন্তু তারা প্রকৃত মু'মিন নয়) (আল বাকারা : ২/৮)।

এরপর তাদের বিবরণ তিনি এ ভাবে দিয়েছেন যে, اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى (এরাই পথভ্রষ্টতাকে হেদায়াতের বিনিময়ে গ্রহণ করেছে)।

অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে, তারা মু'মিন ছিল এবং পরে কুফরী করেছে, এ নির্দেশ কোথায় পাওয়া গেল ?

বস্তুতঃ যদি এ অভিমত পোষণকারী এ ধারণা করে থাকেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى এটাই একথার দলীল যে, এসকল লোক ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, অতঃপর তারা কুফরী গ্রহণ করল। এজন্যই তাদের সম্পর্কে اشتروا শব্দ বলা হয়েছে তবে এমন একটি ব্যাখ্যা যা সমর্থনযোগ্য নয়। যেহেতু তাদের প্রতিপক্ষগণের মতে اشتراء শব্দটি এক বস্তু ছেড়ে দিয়ে অন্য বস্তু গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কখনো পছন্দ করা ছাড়াও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আর তা স্বতঃসিদ্ধ যে, যখন কোন শব্দ একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে, তখন অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত কোন একটি অর্থ নির্ধারণ করা কারোর জন্যই ঠিক নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী اشتروا الضلالة بالهدى -এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস ও ইবন মাসউদ (রা) বলেছেন যে, তারা পথভ্রষ্টতা ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছে এবং হিদায়াত বর্জন করেছে, এ ব্যাখ্যাটিই আমার নিকট উত্তম।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্য সে ঈমানের বদলে কুফরকে গ্রহণ করেছে। অথচ ঈমান আনার জন্য তার প্রতি আদেশ হয়েছিল।

যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল (স)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্থলে কুফরকে গ্রহণ করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কি বলেছেন তা কি তুমি লক্ষ্য করনি ? পবিত্র কুরআনের ভাষায় وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ০ "যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করে নিশ্চয় সে সরল পথ হারায়—" (আল বাকারা ২/১০৮)। আর এটিই ক্রয় (الشراء)-এর তাৎপর্য। কেননা ক্রেতা মাত্র যখন কোন কিছু ক্রয় করে তখন হতে যা' গ্রহণ করা হয় তার বিনিময়ে অন্য বস্তুটিকে ঐ বস্তুর বিনিময়ে কিছু তার নিকট হতে গ্রহণ করা হয়। ঠিক এভাবে মুনাফিক ও কাফির হিদায়াতের বদলে গুমরাহী এবং নিফাক গ্রহণ করে। তাই আল্লাহ তাদের উভয়কে পথভ্রষ্ট করে দেন এবং তাদের থেকে হিদায়াতের নূর ছিনিয়ে নেন। তাই তাদের সকলকে কঠিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেন। পরিণামে তারা কিছুই দেখতে পায় না।

فما ربحت تجارتهم-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা এই যে, মুনাফিকরা হেদায়াতের বিনিময়ে যে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে, তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, লাভবান হয় নাই। কেননা যে ব্যবসায়ী তার মালিকানাধীন পণ্য তদপেক্ষা উত্তম পণ্য অথবা সে যে মূল্যে উক্ত পণ্য ক্রয় করেছে তদপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যের সাথে বিনিময় করেছে, বস্তুতঃ সেই লাভবান ব্যবসায়ী। কিন্তু যে ব্যবসায়ী তার পণ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের পণ্য অথবা সে যে মূল্যে উক্ত পণ্য খরিদ করেছে, তদপেক্ষা কম মূল্যের সাথে বিনিময় করেছে, সে'ই নিঃসন্দেহে তার ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত। তদ্রূপ কাফির মুনাফিকও তাদের এ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

যেহেতু তারা উভয়ে সুপথ প্রাপ্তি ও হেদায়াত লাভের পরিবর্তে অস্থিরতা ও অন্ধত্বকে বরণ করে নিয়েছে এবং নিরাপত্তার পরিবর্তে ভয়-ভীতি ও শান্তির পরিবর্তে উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে গ্রহণ করেছে—তাই তারা ইহজীবনে সুপথ প্রাপ্তির পরিবর্তে অস্থিরতা, হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা, নিরাপত্তার পরিবর্তে ভয়-ভীতি ও শান্তির পরিবর্তে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে বিনিময়রূপে গ্রহণ করেছে। আর তৎসঙ্গে পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য তাঁর পীড়াদায়ক শাস্তি ও কঠিন আযাব ইত্যাদি যা কিছু তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাও তারা ক্রয় করেছে। তাই তারা উভয়েই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর এটিই চরম ক্ষতিগ্রস্ততা। এ প্রসঙ্গে আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি, কাতাদাহ (রহ) এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ কথা বলতেন। যেমন—

কাতাদাহ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কুরআনের فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা তাদেরকে অবশ্যই দেখেছো যে, তারা হেদায়াত হতে গোমরাহীর দিকে, জামাআত ও সংঘবদ্ধতা হতে বিচ্ছিন্নতার দিকে, শান্তি ও নিরাপত্তা হতে ভয়-ভীতির দিকে এবং সুন্নত হতে বিদআতের দিকে চলে গেছে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রঃ) বলেন, কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ তা'আলা فما ربحت تجارتهم (সুতরাং তাদের ব্যবসায় লাভ করে নাই) বলার কারণ কি? আর ব্যবসায় কি কোনরূপ লাভ বা ক্ষতি স্বীকার করে? যার ভিত্তিতে বলা হবে যে, ব্যবসায় লাভ করেছে কিংবা ক্ষতি করেছে। তদুত্তরে বলা হবে যে, তুমি যা ধারণা করেছ, এর কারণ তা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, فما ربحوا فى تجارتهم (তারা তাদের ব্যবসায়ে লাভ করে নাই) তাতে নহে, যা তারা ক্রয় করেছে এবং বিক্রয় করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে আরবদের সম্বোধন করেছেন। তাই তিনি তাদেরকে সম্বোধন করা ও তাদের অন্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সেই সম্বোধনরীতি ও বর্ণনাভঙ্গী গ্রহণ করেছেন, যা তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সুতরাং তাদের নিকট যেহেতু কারো এরূপ উক্তি خاب سعيك (তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে) نام ليلك (তোমার রাত্রি নিদ্রা যাপন করেছে) خسر بيعك (তোমার বিক্রয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে) ইত্যাদি বক্তব্য যা শ্রোতার নিকট বক্তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থাকে না, এগুলো বিশুদ্ধ বক্তব্যরূপে স্বীকৃত। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন বক্তব্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন যা তাদের পারস্পরিক

কথোপকথনে প্রচলিত এ জন্যই তিনি فما ربحت تجارتهم (তাদের ব্যবসা লাভ করেনি) বলেছেন। কেননা তা তাদের নিকট বোধগম্য যে, লাভ ব্যবসার মধ্যে অর্জিত হয়, যেমন নিদ্রা রাত্রিতে সংঘটিত হয়। অতএব তিনি শ্রোতাগণের উপলব্ধি, জ্ঞান ও বোধ শক্তির উপর নির্ভর করে فما ربحوا في تجارتهم (সুতরাং তারা তাদের ব্যবসায় মধ্যে লাভ করে নাই) অর্থেই অনুরূপ বলেছেন। যদিও এটাই অর্থ ছিল। যেমন কোন কবি বলেছেন,

وشرا لمنايا ميت وسط اهله — كهلك الفتاة اسلم الحي حاضره

"নিকৃষ্ট মৃত্যু হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে তার পরিবারবর্গের মাঝে মৃত্যু বরণ করেছে। যেমন কোন কিশোরী এমতাবস্থায় ধ্বংস হয়েছে, যখন সকলেই উপস্থিত ছিল। এর অর্থ হচ্ছে, وشر المنايا منية ميت وسط اهله বস্তুতঃ এখানে কবি এতদ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যকে শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করার শক্তির উপরে ছেড়ে দিয়েছেন আর তা উল্লেখ করা বর্জন করেছেন।

আর যেমন, কবি রাওয়াবা ইবনে উযাজ বলেছেন,

حرث لقد فرجت عني همي — فنام ليلي وتجلى غمي

"হে হারিস! নিশ্চয়ই তুমি দূর করেছ আমার দুশ্চিন্তা, রাত আমার নিদ্রায় কেটেছে, দুঃখ আমার হয়েছে দূরীভূত।" এখানে নিদ্রা গমনের সাথে রাত্রিকে বিশেষিত করা হয়েছে। অথচ তিনি স্বয়ং নিদ্রা যাপন করেছেন, এটাই উদ্দেশ্য।

আর যেমন কবি জারীর ইবনে খাতাফী বলেছেন—

واعور من نبهان اما نهاره — فاعمى واما ليله فبصير

"চামচিকা অপেক্ষা অধিক কানা, তার দিন তো অন্ধ কিন্তু তার রাত্রি দৃষ্টিমান।" এখানে অন্ধত্ব ও দৃষ্টিমানতাকে যথাক্রমে দিন ও রাত্রির প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। অথচ তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে চামচিকাকে এর সাথে বিশেষিত করা।

وما كانوا مهتدين-এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ তা'আলার বাণী "আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না"-এর অর্থ হচ্ছে, তাদের হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করা ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে গ্রহণ করা, আস্থা পোষণ ও স্বীকারোক্তি করার পরিবর্তে মুনাফিকীকে ক্রয় করার ক্ষেত্রে তারা সুপথ প্রাপ্ত ছিল না।

১৭ নং আয়াত ও তার ব্যাখ্যা

(১৭) مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ـ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ○

"তাদের উদাহরণ—যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল, তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি হরণ করে নিলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন—ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।"

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, কেউ যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا (তাদের উদাহরণ যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করল) কিভাবে এরূপ বলা হয়েছে? অথচ তোমাদের জানা আছে যে, مَثَلُهُمْ মধ্যস্থিত هُمْ সর্বনাম দ্বারা একদল পুরুষ কিংবা পুরুষ ও মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর الَّذِى ইসমে মাওসূলটি পুংলিঙ্গে একবচন নির্দেশ করে। সুতরাং এক ব্যক্তি সম্পর্কিত সংবাদকে একটি দলের জন্য কিরূপে উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে, আর مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ اسْتَوْقَدُوْا نَارًا "তাদের উদাহরণ সেই সকল লোকের ন্যায়, যারা অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে" এরূপ বলা হয়নি কেন?

আর তোমার দৃষ্টিতে যদি একদলকে এক ব্যক্তির সাথে উদাহরণ দেওয়া বৈধ হয়, তবে যে ব্যক্তি এক দল লোককে দেখেছে, আর তাদের আকৃতিসমূহ, তাদের নিখুঁত সৃষ্টি ও তাদের দেহসমূহ তাকে বিস্মিত করেছে। তার জন্য তুমি كَانَ هَؤُلَاءِ نَخْلَةً "তারা একটি খেজুর বৃক্ষ সদৃশ ছিল" অথবা كَانَ اَجْسَامُ هَؤُلَاءِ نَخْلَةً "তাদের দেহসমূহ খেজুর বৃক্ষ সদৃশ ছিল" এইরূপ বলাকে বৈধরূপে গণ্য করবে (অথচ এরূপ বলা শুদ্ধ নয়।)

এর উত্তরে বলা যায় যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে এক ব্যক্তির উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছেন, যাকে তিনি তাদের কাজের জন্য উপমা স্থির করেছেন, তা বৈধ ও উত্তম হয়েছে।

আর এর অনুরূপ বক্তব্যসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো রয়েছে—

تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ "তাদের চোখসমূহ সেই ব্যক্তির ন্যায় ঘূর্ণায়মান হয়, যার উপর মৃত্যুর অবস্থা আপতিত হয়েছে" (সূরা আহযাব : ১৯)।
অর্থাৎ সেই ব্যক্তির চক্ষু ঘূর্ণায়মান হওয়ার ন্যায়, যার উপর মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে।

আরও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ "তোমাদের সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান তো এক ব্যক্তির সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের ন্যায়" (সূরা লুকমান : ২৮)।

অর্থাৎ كَبَعْثِ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ একই সত্তাকে পুনরুত্থান করার ন্যায়।

আর একদল লোকের দেহসমূহকে দৈর্ঘ্য ও সৃষ্টির পূর্ণতায় একটি খেজুর বৃক্ষের সাথে উপমা দান করা ঠিক নহে এবং এতদ্সদৃশ বক্তব্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ উপমা দান করা ঠিক নহে। যেহেতু এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অবশ্য মুনাফিকদের এক দলকে একজন অগ্নি প্রজ্বলনকারী ব্যক্তির সাথে উপমা দান করা এজন্য ঠিক হয়েছে, যেহেতু মুনাফিকদের উপমা দানের উদ্দেশ্য হলো, তাদের আলো অন্বেষণ করার উপমা সম্পর্কে বলা যে—আলো মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করার মাধ্যমে অন্বেষণ করছে। অথচ তারা এর বিপরীত নিকৃষ্ট ও ভ্রান্ত আকীদাসমূহ গোপন করছে। আর তাদের আভ্যন্তরীণ কপটতা বাহ্যিকভাবে স্বীকারোক্তিকৃত ঈমানের সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে।

আর যদিও অন্বেষণকারীর ব্যক্তিসত্তা বিভিন্ন হোক না কেন, আলো অন্বেষণ করার অর্থ একটিই, একাধিক বা বিভিন্ন নহে। সুতরাং তার সাথে উপমা দান করা বিভিন্ন সত্তার অধিকারী বস্তুসমূহের মধ্যে একটির সাথে উপমা দান করার ন্যায়।

আর এর ব্যাখ্যা এই যে, মুনাফিকরা আল্লাহ্ তা'আলা, হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তিনি যা আনয়ন করেছেন মৌখিকভাবে এগুলোর স্বীকারোক্তি করতঃ অন্তরের বিশ্বাসের দিক হতে এগুলোর প্রতি মিথ্যারোপ করার মাধ্যমে যে আলো অনুসন্ধান করছে, তা অগ্নি প্রজ্বলনকারী ব্যক্তির আলো অনুসন্ধানের মত। অতঃপর আলো অনুসন্ধান করা উল্লেখ করণকে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং উদাহরণকে তাদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। যেমন, কবি নাবিগাহ বনী জায়দাহ বলেছেন—

وكيف تواصل من اصبحت — خلالته كابى مرحب

"আর সে ব্যক্তি কিরূপে পরিষ্কার সম্পর্ক রক্ষা করবে, যার বন্ধুত্ব মুসাফিরের বন্ধুত্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়েছে?" এখানে كابى مرحب দ্বারা ابى مرحب। كخلالة বুঝানো হয়েছে, আর خلالة শব্দটিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। যেহেতু বক্তব্যের মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে যা' তা হতে বিলুপ্ত করা হয়েছে, শ্রোতাগণের জন্য তৎপ্রতি নির্দেশনা রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী مثلهم كمثل الذى استوقد نارا-এর মধ্যেও অনুরূপ নির্দেশনা রয়েছে। যেহেতু বক্তব্যের মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তদ্দ্বারা এর শ্রোতাগণের নিকট তা জানা হয়ে গিয়েছে যে, এখানে মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে লোকদের আলো অনুসন্ধান করার উদাহরণই পেশ করা হয়েছে, যাদের দৈহিক গঠনের নহে। সুতরাং আলো অনুসন্ধান করণকে বিলুপ্ত করতঃ উপমাকে তার কর্তার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা সঙ্গত হয়েছে।

আর উদাহরণের উদ্দেশ্য তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং আমরা যে বিবরণ দান করেছি, সে হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী مثلهم كمثل الذى استوقد نارا বৈধ ও যথার্থ হয়েছে।

আর যখন উপমা দ্বারা অর্থের মধ্যে এক ও অভিন্ন হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তখন শাব্দিকভাবে দলের উপমা এক ব্যক্তির উপমার সাথে সদৃশ হয়। আর যখন মানব জাতির নির্দিষ্ট লোকজনের মধ্য হতে এক দলকে বা আকৃতি ও দেহ সম্পন্ন কতিপয় বস্তুকে কোন বস্তুর সাথে তুলনা করা উদ্দেশ্য হয়, তখন দলকে দলের সাথে এবং ব্যক্তিকে ব্যক্তির সাথে তুলনা করাই বক্তব্য হিসাবে সঠিক। কেননা এদের প্রত্যেকটির সত্তা অন্যগুলোর সত্তা হতে পৃথক ও ভিন্ন।

আর এ অর্থগত কারণেই ক্রিয়াসমূহ ও নামসমূহের তুলনার ক্ষেত্রে বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। সুতরাং একদল মানুষ বা অন্য যে কোন প্রাণীর কাজসমূহ যখন সমার্থক হয়, তখন তাদের কাজকে একজনের কাজের সাথে তুলনা করা বৈধ। অতঃপর ক্রিয়ার নামসমূহ তথা কাজের কর্তাগণকে বিলুপ্ত করা এবং উপমাকে তাদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা বৈধ, যাদের দ্বারা ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছে। অতএব এরূপ বলা যাবে যে, ما افعالكم الا كفعل الكلب "তোমাদের কাজগুলি তো কুকুরের কাজের ন্যায়।" অতঃপর বিলুপ্ত করত বলা হবে, ما افعالكم الا كالكلب "তোমাদের কাজসমূহ তো কুকুরের ন্যায়।" অথবা ما افعالكم الا كالكلاب "তোমাদের কাজগুলি তো কুকুরগুলির ন্যায়।" আর এর দ্বারা كفعل الكلب (কুকুরের কাজের ন্যায়) এবং كفعل الكلاب

কুকুরগুলোর কাজের ন্যায়) অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে। কিন্তু যখন তুমি তাদের দেহসমূহকে দৈর্ঘ্য ও পূর্ণতায় খেজুর বৃক্ষের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য কর, তখন তুমি ماهم الا نخلة (তারা খেজুর বৃক্ষ বৈ নহে) বলা শুদ্ধ হবে না।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী استوقد শব্দটি اوقد অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কোন কবি বলেছেন—

وداعٍ دعا يا من يجيب الى الندى — فلم يستجبه عند ذاك مجيب

"আহবানকারী একজনকে আহবান করল—কে আছ যে আহবানে সাড়া দিবে?" কিন্তু তার এ আহবানকালে কেউ সাড়া দেয়নি।" এখানে فلم يستجبه দ্বারা لم يجبه অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সুতরাং এক্ষণে বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, এ সকল মুনাফিক তাদের মুখে রসূলুল্লাহ (স) এবং মু'মিনগণের নিকট তাদের মৌখিক এ কথার প্রকাশ করায় امنا بالله وباليوم الاخر। (আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের উপর ঈমান আনায়ন করেছি এবং আমরা হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তিনি যা' কিছু এনেছেন, তৎপ্রতি আস্থা পোষণ করেছি) প্রকাশ করতঃ অন্তরে কুফরী গোপন রেখে আলো অনুসন্ধান করেছে, তাদের এ আলো অনুসন্ধান করা এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে যে আচরণ করবেন, তার প্রেক্ষিতে তাদের এ কাজের উদাহরণ যে অগ্নি প্রজ্বলনকারী ব্যক্তির আলো অনুসন্ধান করার ন্যায়—যে স্বয়ং অগ্নি প্রজ্জ্বলন করেছে এবং যে আগুন তার চারিদিক আলোকিত করেছে। আর ঠিক সে মুহূর্তে 'আল্লাহ তা'আলা তার জ্যোতিকে হরণ করে নিয়েছেন।

আর কতিপয় আরবী ভাষাভাষী বসরী ব্যক্তিবর্গ ধারণা করেছেন যে, এখানে আল্লাহ তা'আলার বাণী كمثل الذى استوقد نارا মধ্যে যে الذى শব্দটি রয়েছে তা الذين অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন—

والذى جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون

"আর যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই তো মুত্তাকী"—(সূরা যুমার : ৩৩)।

আর যেমন কোন কবি বলেছেন—

فان الذى حانت بفلج دماؤهم — هم القوم كل القوم يا ام خالد

"হে উম্মে খালিদ! নিশ্চয় তারা সমগ্র গোত্র, যাদের রক্তসমূহ পক্ষাঘাতে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, প্রথমোক্ত বক্তব্যটিই সে কারণে সঠিক, যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এ শেষোক্ত বক্তব্যটি যিনি বলেছেন, তিনি আয়াতে উল্লেখিত الذى ও তাঁর উদ্ধৃত আয়াত এবং কবিতা মধ্যকার الذى-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তৎসম্পর্কে গাফলত করেছেন। কেননা, আল্লাহ পাকের বাণীতে والذى جاء بالصدق এর মধ্যে যে الذى ব্যবহৃত হয়েছে (একবচন) বা বহুবচনের তা নির্দেশনা রয়েছে যে, অর্থ বহন করে। আর আয়াতের শেষাংশে রয়েছে

اولئك هم المفلحون অনুরূপ অবস্থায়ই কবিতার পংক্তিতেও বিদ্যমান। আর তা হল কবির ভাষায় دماؤهم কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী كمثل الذى استوقد نارا -এর মধ্যে الذى শব্দটির মধ্যে এমন কোন নির্দেশনা নাই। তাতে আর এখানে আয়াতাংশেও বা পংক্তিতে ব্যবহৃত الذى শব্দটি الذين (বহু বচন) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অথচ আরবদের ব্যবহারে কোন শব্দ যে অর্থে বহুল প্রচলিত, তাকে অনিবার্যরূপে স্বীকার্য কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতীত বিপরীত কোন অর্থের প্রতি স্থানান্তর করা বৈধ নয়।

আবার ব্যাখ্যাকারগণ এর ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে এ সম্পর্কে একাধিক বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তম্মধ্যে একটি হলো এই যে—

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে একটি উপমা দান করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন—

مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون -

অর্থাৎ, তারা যখন সত্য প্রত্যক্ষ করে, তখন তা স্বীকারোক্তি করে, আর যখন তারা কুফরীর অন্ধকার হতে সত্যের দিকে বেরিয়ে আসে, তখন তারা তাদের কুফরী ও মুনাফিকী দ্বারা সে আলোকে নিভিয়ে দেয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কুফরীর অন্ধকারে ছেড়ে দেন। ফলে তারা হেদায়াতের পথ দেখতে পায় না এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত দ্বিতীয় বক্তব্যটি হচ্ছে এই যে,

হযরত আলী ইবনে আবী তালহা (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়াত مثلهم كمثل الذى استوقد نارا—এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হলো আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে একটি উপমা।

আর তা হচ্ছে এই যে, তারা ইসলামের দ্বারা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছে, মুসলমানগণ তাদের সাথে বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তাদেরকে উত্তরাধিকার দান করেছেন, তাদের মধ্যে গনীমত বন্টন করেছেন। অতঃপর যখন তারা মৃত্যুবরণ করেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছেন। যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী তার আলো রহিত করেছে। আর সে তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছে। হয়ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, এখানে ظلمات অন্ধকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত তৃতীয় বক্তব্যটি হচ্ছে ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ধারণা করেছেন যে, কতিপয় লোক মদীনায় হযরত রসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর তারা মুনাফিকী করেছে। সুতরাং তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়েছে, যে অন্ধকারে ছিল, তারপর সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে—যার ফলে তার চারিদিকে ময়লা আবর্জনা বা কষ্টদায়ক যা কিছু ছিল, তার জন্য

তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর সে তা দেখতে পেরেছে এবং যা হতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক তা বুঝতে পেরেছে। সে যখন এমতাবস্থায় ছিল—হঠাৎ তার অগ্নি নিভে গেল। তখন সে আবার একই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ কষ্টদায়ক যে সব বস্তু হতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক তা উপলব্ধি করতে পারে না। মুনাফিকদের অবস্থাও তদ্রূপ যে, তারা শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অতঃপর সে যখন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, তখন সে হালাল-হারাম ও ভাল-মন্দ বুঝতে পেরেছে। এমন অবস্থায় সে পুনরায় কাফির হয়েছে। পরিণামে তার অবস্থা এমন হয়েছে যে, সে হালাল-হারাম ও ভাল-মন্দ বুঝতে পারে নাই। আর তাদের সে নূর হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ (স) যা এনেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আর অন্ধকার হচ্ছে তাদের মুনাফিকী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত চতুর্থ বক্তব্যটি হচ্ছে :

তিনি مثلهم كمثل الذى استوقد نارا হতে فهم لايرجعون পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনাফিকদের সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত। আর তিনি ذهب الله بنورهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, নূর হচ্ছে তাদের কথিত ঈমান যা তারা মুখে প্রকাশ করতো। আর অন্ধকার হচ্ছে তাদের পথভ্রষ্টতা ও কুফরীসমূহ যা তারা বলে বেড়াত। আর তারা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায় যারা হেদায়াতের উপর ছিল, তারপর তা হতে বঞ্চিত হয়েছে। পরিণামে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আর অন্য একদল ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

হযরত কাতাদাহ (রহ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মুনাফিকরা কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ করেছে, তখন দুনিয়ায় তাদের জন্য নূর সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তারা তদ্দ্বারা মুসলমানদের সাথে বিবাহ শাদীতে আবদ্ধ হয়েছে, রোগে মুসলমানদের সেবা-শুশ্রূষা লাভ করেছে, মুসলমানগণ হতে উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এবং তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদে রয়েছে। অতঃপর যখন সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে, তখন মুনাফিক সে আলো নির্বাপিত করে ফেলেছে। যেহেতু তার অন্তরে ঈমানের কোন শিকড় ছিল না এবং তার ইলমে এর কোন হাকীকাতও ছিল না।

হযরত মুয়াম্মার (রহ) হযরত কাতাদাহ (রহ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت ماحوله-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তা হচ্ছে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তা তাদের জন্য আলো সঞ্চারিত করেছে। তদ্দ্বারা তারা পানাহার করেছে, দুনিয়ার নিরাপত্তা লাভ করেছে, স্ত্রীগণকে বিবাহ করেছে, তাদের রক্ত তথা জীবনকে তদ্দ্বারা নিরাপদ রেখেছে। আর যখন তারা মৃত্যুবরণ করেছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হতে ঈমানের জ্যোতি হরণ করে নিয়েছেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছেন, যদ্দরুণ তারা দেখতে পায় না।

দাহ্হাক ইবনে মাজাহিম (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت-এর ব্যাখ্যায় বলেন, নূর হচ্ছে তাদের কথিত ঈমান যা তারা প্রকাশ করতো, আর অন্ধকার হচ্ছে তাদের পথভ্রষ্টতা ও কুফরী।

আর অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, যেমন—

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما اضائت ماحوله-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অগ্নি প্রজ্বলন করা হচ্ছে—মু'মিনদের প্রতি ও হেদায়াতের প্রতি তাদের অগ্রসর হওয়া। আর তাদের নূর চলে যাওয়া হচ্ছে কাফিরদের প্রতি ও গোমরাহীর প্রতি তাদের অগ্রসর হওয়া।

হযরত ইবনে জুরাইজ (রহ) হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত রবী ইবনে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে একটি উপমা দান করত ইরশাদ করেছেন। مثلهم كمثل الذى استوقد نارا তিনি বলেন, আগুনের আলো ও তার জ্যোতি হচ্ছে—যা সে প্রজ্বলিত করেছে। অতঃপর যখন তা নির্বাপিত হয়েছে, তার আলো বিদূরিত হয়ে গিয়েছে। তদ্রূপ মুনাফিক যখন ইখলাসের সাথে কথা বলেছে তখন তার জন্য হেদায়াতের আলো প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর যখন সে তাতে সন্দিহান হয়েছে, তখন সে অন্ধকারে পতিত হয়েছে।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি। كمثل الذى استوقد نارا হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি মুনাফিকদের সম্পর্কে বিবরণ। তারা ঈমান আনয়ন করেছিল, ফলে তাদের অন্তরে ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। যেমন তাদের জন্য অগ্নি আলোকিত হয়েছিল, যারা তা প্রজ্বলিত করেছে। অতঃপর তারা কুফরী করেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জ্যোতি হরণ করে নিয়েছেন।

আর তিনি তাদের হতে ঈমান প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, যেমন সে অগ্নির আলো দূরীভূত হয়েছে। অনন্তর তিনি তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছেন, যার ফলে তারা দেখতে পায় না।

আর আয়াতের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো, যা হযরত কাতাদহ (রহ) ও হযরত দাহহাক (রহ) বলেছেন এবং যা আলী ইবনে আবূ তালহা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ প.ক এ বিবরণের শুরু করেছেন। (ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وماهم بمؤمنين) দ্বারা তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ তারা কুফর ও শিরককে প্রকাশ করেনি।

আর যদি এ উপমাটি তাদের জন্য প্রদত্ত হতো, যারা সঠিকভাবে ঈমান এনেছে, তারপর কুফরের কথা ঘোষণা করেছে, যেমন কোন কোন ব্যাখ্যায় আল্লাহ পাকের এবাণী كمثل الذى استوقد نارا فلما اضائت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون সম্পর্কে মনে করেছেন যে, দিনের আলো দৃষ্টান্ত হলো সেই ঈমানের যা তাদের নিকট ছিলো। প্রকৃতপক্ষে তাদের জ্যোতি বিলুপ্ত হওয়ায় দৃষ্টান্ত হলো তাদের ধর্মত্যাগী হওয়া ও তাদের কুফরের কথা প্রকাশ করা। তা'হলে সেক্ষেত্রে তাদের তরফ থেকে কোনরূপ প্রতারণা, বিদ্রূপ-উপহাস ও মুনাফিকী পাওয়া যেতো না। আর তার পক্ষ হতে প্রতারণা ও মুনাফিকী কিরূপে

পাওয়া যেতে পারে? যে ব্যক্তি কথায় বা কাজে শুধু এতটুকুই প্রকাশ করেছে, যে বিষয়ে তুমি ভালভাবেই অবস্থিত। আর সে তাই প্রকাশ করছে যা তার অন্তরের সুদৃঢ় ইচ্ছার উপর সে স্থায়ী। নিশ্চয়ই এবং নিসন্দেহে তা মুনাফিকী থেকে দূরে এবং প্রতারণা থেকে মুক্ত।

যদি এটিই হয় যে, এই সম্প্রদায়ের জন্য এ দু'অবস্থা ব্যতীত তৃতীয় কোন অবস্থা ছিল না অর্থাৎ প্রকাশ্য ঈমানের অবস্থা ও প্রকাশ্য কুফরীর অবস্থা। তবে তো এ সকল লোকের উপর হতে মুনাফিক নাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, তারা তাদের খাঁটি ঈমান অবস্থায় মু'মিন ছিল আর তাদের নির্ভেজাল কুফরী অবস্থায় তারা কাফির ছিল। এখানে এমন কোন তৃতীয় অবস্থা নাই, যখন তারা মুনাফিক ছিল। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুনাফিক নামে আখ্যায়িত করেছেন—যা একথার প্রতি ইংগিত বহন করে যে, এখানে প্রকৃত বক্তব্য তার প্রতি বিপরীত যা সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তারা মু'মিন ছিল তৎপরে ধর্মত্যাগী হয়ে কাফের হয়েছে অতঃপর এর উপর স্থায়ী রয়েছে।

হাঁ, যদি এ উক্তি দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেন যে, তারা ঈমান বর্জন করে কুফর তথা নিফাক গ্রহণ করেছে। আর এটা এমন একটি বক্তব্য, যদি সে তা বলে তবে এর বিশুদ্ধতা নির্ভরযোগ্য হাদীস বা এমন কোন অর্থ ব্যতীত উপলব্ধি করা যাবে না, যা এর বিশুদ্ধতাকে অনিবার্যরূপে প্রমাণ করে। কিন্তু বাহ্যত পবিত্র কুরআনে এর বিশুদ্ধতার কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু তাতে এর চেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা নেয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

আর আমরা যা বর্ণনা করেছি তাই যদি হয়, তাহলে আয়াতের দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, মুনাফিকদের মুখে রসূলুল্লাহ (স)-এর স্বীকৃতি প্রকাশ করা এবং নবী (স) ও মু'মিনদেরকে তাদের বলা যে, আমরা আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি। এতে তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা, পরিবার-পরিজনকে বন্দীত্ব হতে নিরাপত্তা দান, বিবাহ-শাদী ও উত্তরাধিকার প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ হুকুম দান করা হয়েছে। আর তা অগ্নির সাহায্যে সে অগ্নি প্রজ্বলনকারী ব্যক্তির আলো অনুসন্ধান করার ন্যায়, যে ব্যক্তি আলোর মাধ্যমে সাহায্য কামনা করেছে, এবং তার চারিদিক আলোকিত দেখতে পেয়েছে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে আগুন নির্বাপিত হয়ে গিয়েছে, এবং তার আলো দূরীভূত হয়েছে। আর তদ্বারা আলোপ্রার্থী ব্যক্তি পুনঃ অন্ধকার ও অস্থিরতায় প্রত্যাবর্তন করেছে। বস্তুতঃ মুনাফিক সর্বদাই তার যে কথার দ্বারা আলো অনুসন্ধানী ছিল, যাতে সে তার পার্থিব জীবনে হত্যা ও বন্দীত্বকে এড়িয়েছে, যদিও সে তা গোপন করেছে, যদি সে মুখে প্রকাশ করতো, তবে তা তার হত্যা ও সম্পদহারা হওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতো। আর এর দ্বারা তার এ ধারণা হয়েছে যে, সে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রসূল (স) ও মু'মিনদের সাথে বিদ্রূপ এবং প্রতারণা করতে পেরেছে। আর তার এ অন্যায় কাজকে তার অন্তর মোহনীয় করে তুলেছে এইখানে যখন আখেরাতে তার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হবে—তখন সে নাজাত পাবে। যেমন সে মিথ্যা মুনাফিকীর দ্বারা দুনিয়াতে মুক্তি পেয়েছে। ইমাম তাবারী বলেনঃ তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যখন তাঁরা আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন তাদের অবস্থা কি হবে সে প্রসংগে ইরশাদ করেছেন—

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء
الا انهم هم الكاذبون ـ

"যেদিন আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তারা তাঁর নিকট তদ্রূপ শপথ করবে, যেমন তারা তোমাদের নিকট শপথ করে। আর তারা ধারণা করবে যে, তা তাদের কোন উপকারে আসবে। জেনে রেখ, এরাই মিথ্যাবাদী।" (সূরা মুজাদিলা : ১৮)

আর এ ধারণায় তারা মুনাফিকী করে যে, আখেরাতে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তাদের পরিত্রাণ লাভ করা তাতেই নিহিত যে কারণে তারা দুনিয়ায় হত্যা, বন্দীত্ব ও সম্পদ হরণ হতে মিথ্যা ও অসত্যের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছে। আর তারা এ ধারণা করত যে, তাদের এ প্রতারণা সেখানেও তাদের জন্য উপকারী হবে, যেমন তা দুনিয়ায় তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র বিধান প্রত্যক্ষ করবে, যদ্দ্বারা তারা উপলব্ধি করবে যে, তারা তাদের ধারণাসমূহে ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা, আত্ম-প্রতারণা ও উপহাসে নিমজ্জিত ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কিয়ামতে তাদের নূর নির্বাপিত করে দিবেন, তখন তারা মু'মিনদের নিকট হতে আলো সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁদের নিকট অপেক্ষা করার আবেদন করবে। আর তখন তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা তোমাদের পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন কর এবং আলো সন্ধান কর। আর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর এটিই সে সময় যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নূর হরণ করে নিয়েছেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা কিছুই দেখতে পাবে না।
যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারীর আলোকিত হওয়ার পর আলো নির্বাপিত হল পরিণামে সে অন্ধকারে পথহারা ও অস্থিরতায় পড়ে রইল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة
وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم
انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور ـ
فاليوم لايؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس
المصير ـ

"সেই দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মুমিনদেরকে বলবে—'তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর। যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তবে তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলো সন্ধান কর এরপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে। এর অভ্যন্তরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে শাস্তি। মুনাফিকরা মুমিনগণকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা অপেক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে আর অলিক আকাংখাসমূহ তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহ্‌র হুকুম না আসা পর্যন্ত। মহা প্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ পাক সম্পর্কে। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছে তাদের থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটিই তোমাদের যথার্থ স্থান। কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তন স্থল" (সূরা হাদীদ : ১৩—১৫)।

যদি কেউ আমাদেরকে এ প্রশ্ন করে যে, তুমি আল্লাহ তা'আলার বাণী كمثل الذى استوقد نارا فلما اضائت ماحوله-এর অর্থ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছ যে, যখন তা শীতল হয়েছে এবং নির্বাপিত হয়েছে। অথচ একথা কুরআন মজীদেও নাই। সুতরাং তোমার নিকট কি প্রমাণ রয়েছে এটিই এই আয়াতের অর্থ ? এর উত্তরে বলা যায় যে, কোন বক্তব্যে যদি কোন কিছু উহ্য রাখা হয় এবং তার উপর যদি যথেষ্ট নির্দেশনা থাকে এমন অবস্থায় আরবগণ সাধারণত বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে থাকেন। যেমন কবি আবু জুয়াইব আল-হাজালী বলেছেন—

عصيت اليها القلب انى لامرها — سميع فما ادرى ارشد طلابها

"তার প্রতি আমার অন্তর আহবান করেছে আর আমি তার আদেশ শ্রবণকারী। বস্তুতঃ আমি জানি না, তার প্রার্থীগণ সুপথ প্রাপ্ত, না পথভ্রষ্ট।" আর এ দ্বারা তিনি فما ادرى ارشد طلابها ام غى "আমি জানি না তার প্রার্থীগণ সুপথ প্রাপ্ত, না, পথভ্রষ্ট ?" অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন। এখানে ام غى -এর উল্লেখ উহ্য রাখা হয়েছে, যেহেতু উল্লেখকৃত বক্তব্যের মধ্যে এর সুস্পষ্ট ইংগিতও রয়েছে।

আর যেমন কবি যুর রিম্মাহ্ গাধার প্রশংসায় বলেছেন,

فلما لبسن الليل اوحين نصبت — له من خذا اذانها وهو جانح

"যখন তারা রাত যাপন করেছে কিংবা যখন রাত হয়েছে তখন তাকে সে বস্তু ক্লান্ত করেছে, যা তার কানকে অবনত করেছে। আর তখন সে একদিক ঝুঁকা অবস্থায় রয়েছে।" অর্থাৎ او حين اقبل الليل আর এরূপ দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে রয়েছে, আর গ্রন্থ দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে এগুলো উল্লেখ করছি না।

তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী كمثل الذى استوقد نارا فلما اضائت ماحوله-এর মধ্যেও خمدت انطفأت উহ্য রয়েছে। যেহেতু তাতেও পরবর্তী উল্লেখিত ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون মধ্যে পরিত্যক্ত বক্তব্যের উপর সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। আর এতে সংক্ষেপ

করার উদ্দেশ্যে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তদ্রূপ পরবর্তী পর্যায়ে মুনাফিকদের উপমা সম্পর্কিত সংবাদ থেকে যা সংক্ষেপ করা হয়েছে, তা অগ্নি প্রজ্বলনকারীর উপমা তার অনুরূপ। কেননা বক্তব্যটির অর্থ হচ্ছে এই যে, তদ্রূপ মুনাফিকদের অবস্থা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জ্যোতি হরণ করে নিয়েছেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছেন, যে কারণে তারা দেখতে পায় না। সেই জ্যোতি ইসলাম সম্পর্কে তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তি যার কল্যাণে তারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অথচ তারা তার বিপরীত বিশ্বাস গোপন করতো। যেভাবে অগ্নি প্রজ্বলনকারীর অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার পর তার আলো বিদূরিত হয়ে গিয়েছে। পরিণামে সে এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে, যার কারণে সে দেখতে পায় না।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ذهب الله بنورهم — مثلهم মধ্যকার هم সর্বনামের সাথে সম্পর্কিত। এখানে بنورهم-এর সর্বনামটি যাদের বুঝায় مثلهم-এর সর্বনামটিও তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বাণী ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون-এর ব্যাখ্যা তা'ই ছিল যা আমরা বর্ণনা করেছি যে, ইহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সে বিষয় সম্পর্কিত সংবাদ যা তিনি মুনাফিকদের সাথে পরকালে আচরণ করবেন, যখন তাদের গোপন রহস্য উদঘাটিত করা হবে, তাদের লজ্জাকর গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করা হবে এবং তাদেরকে কিয়ামতের ভয়ংকর অন্ধকারে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে তাদের আলো হরণ করে নেওয়া হবে। তখন তারা সে অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে থাকবে এবং এর ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাবে না। তাই আল্লাহ পাক স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী صم بكم عمي فهم لا يرجعون "তারা বধির, মূক ও অন্ধ, সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করবে না" আয়াতাংশটি উল্লেখের দিক থেকে শেষে, অর্থের দিক থেকে আগে আর এখানে এ কথাও সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ - صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ - مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ○

এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি। তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়। তারা বধির, মূক ও অন্ধ, সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করবে না। তাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল, তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদেরক ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না। বাকারা ২/১৬,১৭

অথবা তাদের উদাহরণ আকাশ হতে বর্ষণ মুখর ঘন মেঘের ন্যায়। আর যখন কথার অর্থ তাই হয় স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী صم بكم عمي আরবী ব্যাকরণ রীতি মোতাবেক

আল্লাহ্ পাকের এ কালামে দুই কারণে পেশ দেওয়ায় পেশ ব্যবহার করা যায়। আর দু কারণে নাসাব বা যবর ব্যবহার করবার এবং পেশ ব্যবহার করা যায়। একটি কারণ হল বাক্যের শুরুতে মদ্দ প্রকাশ করার ভাব থাকার কারণে। আরবগণ প্রশংসায় আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রেই এ রীতি গ্রহণ করেন। সুতরাং তা মারিফা তথা নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে খবর হওয়া সত্ত্বেও তাতে পেশ ও যবর উভয়ই ব্যবহার হয়ে থাকে। আরবী কাব্যে এ দৃষ্টান্ত রয়েছে। কবি বলেছেন—

لا يبعدن قومي الذين هم — سم العداة وآفة الجزر

النازلين بكل معترك — والطيبين معاقد الأزر

"আমার সম্প্রদায় বিতাড়িত হবে না, যারা শত্রুর জন্য বিষ তুল্য এবং যবেহ যোগ্য প্রাণীর জন্য বিপদ। যারা সকল যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণকারী। আর যারা সাহায্য দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধগণের উত্তম ব্যক্তিবর্গ।"

যেহেতু এতে বিবরণ রয়েছে তাই হালাতে রফা النازلون এবং হালতে নাসাব النازلين এমনিভাবে কবিতাটি الطيبون ও الطيبين রূপে পঠিত হবে।

পেশ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল اولئك শব্দটি বার বার ব্যবহৃত হওয়া। এমতাবস্থায় এর অর্থ এরূপ হবে যে, এরাই সেই সকল লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে, পরিণামে তাদের ব্যবসায় লাভজনক হয় নাই এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। এরা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করবে না।

আর নাসাব দানের দু'পদ্ধতির একটি হচ্ছে এই যে, مهتدين শব্দের মধ্যে اولئك প্রসঙ্গে যে আলোচনা রয়েছে, তার অংশ বিশেষরূপে গণ্য হবে। কেননা তাতে যাদের আলোচনা রয়েছে তারা হচ্ছে মারিফা বা নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক এবং صم (বধির) শব্দটি নাকারা বা অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক।

আর এর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে এই যে, এটা الذين-এর অংশবিশেষ রূপে গণ্য হবে। যেহেতু الذين শব্দটি মারিফা এবং صم ইত্যাদি নাকারা। আর কখনো তাতে নিন্দাবাদের ভিত্তিতেও নাসাব দেওয়া যায়। আর এমতাবস্থায় তা নাসাব দেওয়ার তৃতীয় পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হবে।

অবশ্য আলী ইবনে আবী তালহা কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ব্যাখ্যার বিপরীত তাঁর নিকট হতে উদ্ধৃত যে ব্যাখ্যাটি আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে একটি মাত্র পদ্ধতি অর্থাৎ مستانفة বাক্য হিসাবে রফা দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে রফা দেওয়া বৈধ হবে না। আর যে বর্ণনার ভিত্তিতে তাতে দু' পদ্ধতিতে যবর দেওয়া বৈধ হবে—তার একটি হচ্ছে, নিন্দাবাদ প্রকাশ করার ভিত্তিতে নাসাব দান করা, আর অপরটি হচ্ছে تركهم-এর মধ্যস্থিত هم এর অংশবিশেষ হওয়ার ভিত্তিতে কিম্বা لايبصرون-এর মধ্যে যাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তাদের অংশবিশেষ হওয়ার ভিত্তিতে নাসাব দান করা।

আর আমরা এক্ষেত্রে বিশুদ্ধরূপে উত্তম বক্তব্যটি এবং পেশের সাথে পঠিত কিরাআতটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি, নাসাবের সাথে পঠিত কিরাআত নহে। যেহেতু মুসলমানদের মাসহাফের লিখন পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকার কারোই নাই। আর যখন আয়াতকে নাসাবের সাথে পাঠ করা হবে, তখন তা মুসলমানদের মাসহাফের লিখন পদ্ধতির বিপরীত হবে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আর এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এমর্মে সংবাদ দান করা যে, মুনাফিকগণ হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতাকে ক্রয় করার কারণে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়নি, বরং তারা সৎপথ বধির, সুতরাং তারা হেদায়াত ও সৎপথের কথা শ্রবণ করে না। কেননা হেদায়াত ও সৎ পথ থেকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর লাঞ্ছনা প্রধান্য পেয়েছে। তারা মূক এ জন্যে তারা হেদায়াত ও সত্য সম্পর্কে কথা বলে না, আর بكم শব্দটি ابكم-এর বহুবচন। عمى অন্ধ। অর্থাৎ তারা হক ও সত্য দেখতে পায় না। পরিণামে তারা হক এবং সত্যকে বুঝতেও পারে না। আল্লাহ তা'আলা অন্ধ অর্থাৎ তাদের অন্তরকে মুনাফিকীর কারণে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। পরিণামে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত করে না।

এই পর্যায়ে যা কিছু বলেছি, তা তত্ত্ববিদ আলেমগণের অভিমত।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি صم بكم عمى-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা মঙ্গল পথ হতে বধির, মূক ও অন্ধ।

আলী ইবনে আবী তালহা ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি صم بكم عمى এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হেদায়াতের বাণী শ্রবণ করে না, তা দেখে না এবং উপলব্ধি করে না।

ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের কয়েকজন হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা بكم-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন অর্থাৎ خرس মূক।

কাতাদাহ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি صم بكم عمى-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা সত্য হতে বধির, তাই তারা তা শ্রবণ করে না। তারা সত্য হতে অন্ধ, তাই তারা তা দেখে না। তারা সত্য হতে মূক, তাই তারা তা বলে না।

فهم لا يرجعون-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আর আল্লাহ তা'আলার বাণী فهم لا يرجعون আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনাফিকদের সম্পর্কে এমর্মে সংবাদ দান করা যে, তিনি যাদের সম্পর্কে হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করা এবং সত্য ও কল্যাণ শ্রবণ করা হতে বধির হওয়া, তা বলা হতে মূক হওয়া ও তা দর্শন করা হতে অন্ধ হওয়ার বিবরণ দান করেছেন, তারা গোমরাহী থেকে হেদায়েতের পথে প্রত্যাবর্তন করবে না এবং তারা মুনাফিকী হতে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে না। অতএব তারা মু'মিনদেরকে নিরাশ করেছে এই মর্মে যে, কোনদিন তারা সত্যকে দেখবে না, সত্য বলবে না এবং হেদায়াতের প্রতি আহবায়কের আহবানের প্রতি সাড়া দেবে না অথবা তার উপদেশ গ্রহণ করবে না এবং গোমরাহী থেকে তওবা করবে না। যেমন তথা কথিত আহলে কিতাব এবং পৌত্তলিক নেতাদের তওবা থেকে মু'মিনগণ নিরাশ হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, তিনি তাদের অন্তর ও কর্ণকে মোহারাঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং চক্ষুসমূহে আবরণ

রয়েছে। আর যা কিছু এ পর্যায়ে বললাম তা অভিমত হল তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণের। আমরা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছি, ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

কাতাদাহ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فهم لا يرجعون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তারা তওবা করবে না ও উপদেশ গ্রহণ করবে না।

ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা فهم لا يرجعون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন অর্থাৎ তারা ইসলামের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে না।

অপর দিকে ইবনে আব্বাস (রা) হতে এরূপ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, যার অর্থ এর বিপরীত। আর তা হচ্ছে এই যে, সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ) ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি فهم لا يرجعون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তারা হেদায়াত ও মঙ্গলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে না, সুতরাং তারা সে পরিত্রাণ লাভ করবে না, যার উপর তারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এমন এক ব্যাখ্যা কুরআনের বাহ্যিক তিলাওয়াত যার বিপরীত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এখানে এ সকল লোক সম্পর্কে এমর্মে সংবাদ দান করেছেন যে, তারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করা হতে হেদায়াত অন্বেষণ ও সত্য দর্শনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অবস্থা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অন্য সময় ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট সময় বা অন্য অবস্থা ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট অবস্থার সীমাবদ্ধতা আরোপ করেন নাই। অথচ ইবনে আব্বাস (রা) হতে উদ্ধৃত যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা এ বিশেষণের সাথে বিশেষিত থাকা সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ। আর তা হচ্ছে, তারা তাদের অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সময়। আর তাতে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা তা হতে প্রত্যাবর্তন করার উপায় আছে।

বস্তুতঃ এরূপ ব্যাখ্যা করা এমন ভ্রান্ত দাবী যার উপর বাহ্যিক ভাবে কোন নির্দেশনা নাই এবং তার স্বপক্ষে এমন কোন হাদীস উদ্ধৃত নাই, যদ্দ্বারা প্রামাণ্য দলীল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যার ভিত্তিতে সে ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করা যায়।

(١٩) أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ○

(٢٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

(১৯) "অথবা (তাদের উপমা) যেমন আকাশের বর্ষণ মুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের কর্ণে আঙ্গুল প্রবেশ করায়। আল্লাহ কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।"

(২০) "বিদ্যু-চমক তাদের দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুৎতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ শক্তিও দৃষ্টি শক্তি হরণ করতেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, الصيب শব্দটি الفيعل-এর ওজনে গঠিত যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন বলা হয় صاب المطر يصوب صوبا। যেমন কবি বলেন,

فلست لانسي ولكن لملاك — تنزل من جو السماء يصوب

"তুমি কোন মানুষের জন্য (সৃষ্ট) নও, বরং ফেরেশতার জন্য, যে আকাশের শূন্যলোক থেকে নীচে অবতরণ করে।"

অনুরূপ আলকমা ইবনে আবাদা বলেছেন—

كانهم صابت عليهم سحابة — صواعقها لطيرهن دبيب

فلا تعدلي بيني وبين مغمر — سقت روايا المزن حين تصوب

"মনে হয় যেন তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, তা উড়ে যাওয়ার গর্জন অতি বিকট। সুতরাং তুমি আমার ও মুগাম্মারের মধ্যে তুলনা করো না—যে মুষলধারে বৃষ্টি ধারায় সিক্ত হয়েছে"

এখানে حين تصوب অর্থ حين تنحدر, অর্থাৎ যখন তা উপর থেকে নীচে নামে صيب-এর মূলরূপ صيوب, কিন্তু واو-এর পূর্বে ى সাকিন হওয়ায় واو-কে ى দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তারপর তাশদীদ দ্বারা প্রথম ى-কে দ্বিতীয় ى-তে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন ساد يسود হতে سيد এবং جاد يجود হতে جيد গঠিত হয়েছে। এ ভাবেই আরবগণ হরকত যুক্ত واو-এর পূর্বে সাকিন যুক্ত ى থাকলে উভয়টিকে তাশদীদ যুক্ত ى দ্বারা পরিবর্তিত করে থাকেন। আর এ বিষয়ে আমরা যা কিছু বললাম তা হচ্ছে তাফসীর বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত او كصيب من السماء অর্থ القطر অর্থাৎ—বৃষ্টির ফোটা। ইবনে জুরাইজের সূত্রে আতা হতে বর্ণিত الصيب অর্থ المطر — বৃষ্টি।

'আসীর সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত : الصيب অর্থ المطر — বৃষ্টি।
ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও আরো কতিপয় সাহাবী হতে বর্ণিত- الصيب অর্থ المطر
মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ-এর সূত্রেও ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।
কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত, তিনি او كصيب—এর অর্থ করেছেন المطر।
হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়ার সূত্রেও কাতাদা থেকে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে আমর আল-বাহিলী ও আমর ইবনে আলীর সূত্রে মুজাহিদ বলেন الصيب অর্থ المطر।

হযরত মুছান্নার (রঃ) এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত যে الصيب অর্থ المطر।

হযরত মুছান্নার (রঃ) অন্য সূত্রে হযরত রবী ইবনে আনাস (রঃ) হতে বর্ণিত الصيب অর্থ المطر।

হযরত মিনজাব (রঃ)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত الصيب হল المطر।

হযরত ইউনুসের (রঃ) সূত্রে হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) হতে বর্ণিত যে, او كصيب من السماء অর্থ او كغيث من السماء অর্থাৎ প্রবল বর্ষণ।

হযরত সাওয়ার ইবনে আবদিল্লাহ আল-আম্বারী (রঃ) হযরত সুফিয়ান (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, الصيب বলতে তাই বুঝায় যার মধ্যে বৃষ্টি থাকে।

হযরত আমর ইবনে আলীর (রঃ) সূত্রে হযরত আতা (রঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি او كصيب من السماء -এর অর্থ করেছেন المطر।

উপরে উল্লেখিত উদাহরণের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, মুনাফিকরা অন্তরে কুফরী গোপন রেখে মুখে ইসলাম স্বীকার করতঃ আলোর অন্বেষণ করা এদের দৃষ্টান্ত এই যে, অগ্নি প্রজ্জলনকারীর তার প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দ্বারা আলোকিত করা। আর এ অগ্নির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ এখানে উল্লেখ করেছেন। অথবা তাদের উদাহরণ আকাশ হতে বর্ষিত আঁধার ঘেরা বৃষ্টির মত, যা অন্ধকার রাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঘপুঞ্জ থেকে বর্ষিত হয়। আল্লাহ পাক এ সকল অন্ধকারের কথাই এখানে উল্লেখ করেছেন।

এখানে এই দুইটি উদাহরণ সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন উঠায় যে, এই উদাহরণ দুইটি কি দুই শ্রেণীর মুনাফিকদের জন্য, না এক শ্রেণীর মুনাফিকদের জন্য? যদি দুই শ্রেণীর মুনাফিকদের জন্য হয়, তা হলে او كصيب বলা কিভাবে শুদ্ধ হয়, কেননা او (অথবা) ব্যবহৃত হয় সন্দেহ সূচক বাক্যে। وكصيب এখানে বরং বলাই হত যুক্তি সঙ্গত। কেননা واو (এবং) তখন দ্বিতীয় উদাহরণকে প্রথম উদাহরণের সাথে সংযুক্ত করে দিত। আর যদি এ উদাহরণ এক শ্রেণীর মুনাফিকদের জন্য দেয়া হয়ে থাকে, তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, পরবর্তীতে او (অথবা) এনে অন্য শ্রেণীর উল্লেখ করা হয় কি ভাবে? অথচ এ কথা সুবিদিত যে, যখন কোন বাক্যে او ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয়, সংবাদ-দাতা যে বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করছে তাতে তার সংশয় ও সন্দেহই রয়েছে। ধরা যাক, যদি কোন ব্যক্তি বলে لقيني اخوك او ابوك (আমার সাথে তোমার ভাই অথবা তোমার পিতা সাক্ষাত করেছে)। এখানে নিশ্চয়ই দুই জনের মধ্যে যে কোন একজন সাক্ষাত করেছে। কিন্তু কে যে সাক্ষাত করেছে তা নির্দিষ্ট করতে তার সন্দেহ হচ্ছে। অবশ্য এ বিষয়ে সে নিশ্চিত যে, দু'জনের একজন অবশ্যই তার সাথে সাক্ষাত করেছে। আর আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহজনক কথার সম্পর্ক কিছুতেই বৈধ হতে পারে না, অথবা যে বিষয়ে তিনি সংবাদ দিচ্ছেন সে বিষয়টি তিনি বিস্মৃত হয়েছেন বা তাঁর অবগতির বাইরে রয়েছে এও হতে পারে না। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রশ্নকারী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সেরূপ নয়। বস্তুত او (অথবা) যদিও কখনো কখনো সন্দেহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে واو (এবং) অর্থও প্রকাশ করে থাকে। আর তা বুঝা যাবে তার পূর্ববর্তী বাক্যের দ্বারা অথবা পরবর্তী বাক্যের সাহায্যে। যেমন তাওবা ইবনুল হুমাইর বলেছেন:

وقد زعمت ليلى بأني فاجر — لنفسي تقاها او عليها فجورها

অর্থঃ "লাম্নলা আমাকে ধারণা করেছে যে, আমি এক দুর্বৃত্ত ব্যক্তি। আমার নিজের স্বার্থে যা থেকে সে রক্ষা পেয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে আছে তার দুর্বৃত্তপনা।"

এখানে এটা জানা কথা যে, তাওবা যা বলেছেন তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে যখন او আনা হয়েছে তখন এ দ্বারা সেরূপ অর্থই বোঝান হবে যা واو প্রকাশ করে থাকে, যদিও এটা واو ব্যবহার করারই উপযুক্ত স্থান।

অনুরূপভাবে জারীর বলেছেন ঃ

جاء الخلافة او كانت له قدرا — كما اتى ربه موسى على قدر

"সে খিলাফাত লাভ করেছে এবং এ ছিল তার জন্য নির্দ্ধারিত। যেরূপ মূসা (আ) তার প্রভুর দরবারে গিয়েছিলেন যা ছিল তার জন্যে নির্দ্ধারিত।"

অন্য আর এক কবি বলেছেন—

فلو كان البكاء يرد شيئا — بكيت على جبير او عناق

على المرأين اذ مضيا جميعا — لشأنهما بحزن واشتياق

"ক্রন্দন যদি কোন বস্তুকে ফিরিয়ে দিতে পারত তা হলে আমি জুবায়ের ও আনাক এ দু ব্যক্তির উপর শোকাতুর ভাবে ও আকাংখিত হয়ে ক্রন্দন করতাম যখন তারা উভয়েই একত্রে মৃত্যুবরণ করেছিল।" এখানে কবির কথা على المرأين اذ مضيا جميعا (সেই দু'ব্যক্তি যখন এক সাথে তিরোহিত হয়েছিল)-এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি যে ক্রন্দন করতে চেয়েছেন তার উদ্দেশ্য এক জনকে বাদ দিয়ে অন্য জনের জন্যে ক্রন্দন করা নয়। বরং তার উদ্দেশ্য তাদের উভয়ের জন্য ক্রন্দন করা। অনুরূপ ভাবে একই অবস্থা হয়েছে কুরআনের উপরোক্ত আয়াত او كصيب من السماء -এর ক্ষেত্রে, কেননা আয়াতটির পরিবেশ থেকেই পূর্ব হতে জানা আছে যে, এখানে او ঠিক ঐ অর্থই প্রকাশ করছে যা واو প্রকাশ করে। আর আলোচ্য ক্ষেত্রটির এই যখন অবস্থা তখন او বা واو যে কোন একটিকে ব্যবহার করা চলে, এতে কোনই পার্থক্য নেই। অনুরূপ ভাবে একই কারণে مثل শব্দটিতে او كصيب আয়াত থেকে বিলোপ করা হয়েছে। কেননা পূর্ব উদাহরণ كمثل الذى استوقد نارا আয়াতই যখন বুঝাচ্ছে যে, এখানে او كصيب-এর অর্থ হচ্ছে او كمثل صيب তখন এখান থেকে مثل শব্দটি লোপ করা হয়েছে এবং পূর্বের আয়াত كمثل الذى استوقد نارا এই আয়াতাংশের উপর নির্ভর করেই مثل শব্দটিকে লোপ করা হয়েছে।"

এ আয়াতের অর্থ হবে او كمثل صيب আর এরূপ করা হয়েছে কুরআনকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে।

আয়াতের পরবর্তী অংশ

فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم فى اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين - يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا -

"তাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্র ধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের কানে আঙ্গুলসমূহ প্রবেশ করায়। আল্লাহ কাফেরদেরকে ঘিরে রয়েছেন। বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুৎ আলোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই চলতে থাকে। আর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়।"

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, ظلمات শব্দটি বহু বচন এক বচনে ظلمة — । رعد-এর ব্যাখ্যায় আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, رعد এক ফেরেশতার নাম যিনি মেঘ পরিচালনা করেন। এ মতের প্রবক্তাগণ হচ্ছেন :

মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্নার (রঃ)অন্য আর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, رعد একজন ফেরেশতা, যিনি তার আওয়াজ দ্বারা মেঘ পরিচালনা করেন।

মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্নার (রঃ) অন্য আর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে তালহা আল ইয়ারবূঈ (রঃ)-এর সূত্রেও হযরত মুজাহিদ (রঃ)থেকে অনুরূপ রিওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবূ সালেহ (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, رعد ফেরেশতাকুলের মধ্যে এমন একজন ফেরেশতা যিনি তাসবীহ পাঠে রত।

হযরত নাসর ইবনে আবদির রহমান আল-আওদী (রঃ) সূত্রে হযরত শাহর ইবনে হাওশাব (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, الرعد এমন এক ফেরেশতা, যিনি মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি মেঘপুঞ্জ সামনের দিকে তাড়িয়ে নেন, যেভাবে উট-চালক তার উটকে সম্মুখে তাড়িয়ে নেয়। তিনি তাসবীহ পাঠ করেন। যখনই এক খণ্ড মেঘের সাথে অন্য খণ্ডের সংঘর্ষ হয় তখন তিনি গর্জে উঠেন। যখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হন তখন তার মুখ থেকে অগ্নি বের হতে থাকে। এটাই সেই বজ্র যা তোমরা দেখতে পাও।

হযরত মিনজাব ইবনে হারিস (রঃ)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, الرعد এমন এক ফেরেশতার নাম, যাঁর চিৎকারধ্বনি তোমরা শুনতে পাও।

হযরত আহমাদ ইবনে ইসহাক আহওয়াজী (রঃ) সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, الرعد এমন এক ফেরেশতা যিনি তাসবীহ ও তাকবীর ধ্বনি দ্বারা মেঘ পরিচালনা করেন।

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, الرعد এক ফেরেশতার নাম, তার এই গর্জনই হচ্ছে তার তাসবীহ, আর যখন মেঘের প্রতি সে গর্জন তীব্র হয় তখন মেঘের সাথে সংঘর্ষ হয়, তা থেকে বিকট শব্দসমূহ বের হয়।

হযরত হাসান-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, الرعد একজন ফেরেশতা যিনি তাসবীহ পাঠের সাহায্যে মেঘ তাড়িয়ে নেন, যেমনি ভাবে উট-চালক তার কারাভাঁ সঙ্গীত দ্বারা উট তাড়িয়ে থাকে।

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদের (রঃ) সূত্রে হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন الرعد একজন ফেরেশতা যিনি মেঘ পরিচালনা করেন।

হযরত আহমাদ ইবনে ইসহাকের (রঃ) সূত্রে হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত, الرعد মেঘের মধ্যে অবস্থানকারী এক ফেরেশতা। তিনি মেঘ একত্রিত করেন যেমনি ভাবে রাখাল তার উটসমূহ একত্রিত করে।

হযরত বিশর (রঃ)-এর সূত্রে হযরত কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত, رعد হল মহান আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টি, তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী ও অনুগত।

হযরত কাসিম ইবনে হাসানের (রঃ) সূত্রে হযরত ইকরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত الرعد জনৈক ফেরেশতা, তিনি খণ্ড খণ্ড মেঘসমূহকে নির্দেশ দেন, তারপর সেগুলিকে মিলিয়ে দেন, আর ঐ শব্দ হচ্ছে তাঁর তাসবীহ পাঠ।

হযরত কাসিমের (রঃ) সূত্রে হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত, الرعد একজন ফেরেশতা। হযরত মুসান্নার (রঃ) সূত্রে হযরত সালিম (রঃ) অথবা অন্য রাবী থেকে বর্ণিত। হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) বলেন, رعد একজন ফেরেশতা। হযরত মুসান্নার (রঃ) সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাসের (রঃ) মাওলা হযরত মূসা ইবনে সালিম আবু জাহযাম (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবুল খুলদের (রঃ) নিকট হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) الرعد সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি উত্তরে লিখে পাঠান যে, الرعد হচ্ছে একজন ফেরেশতা।

হযরত মুসান্নার (রঃ) সূত্রে হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত, رعد একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘ হাঁকিয়ে নেন, যেভাবে রাখাল উট হাঁকিয়ে নেয়।

হযরত সা'দ ইবনে আবদিল্লাহর (রঃ) সূত্রে হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন বলতেন سبحان الذى سبحت له (মহা পবিত্র সেই সত্তা—আপনি যাঁর তাসবীহ পাঠ করলেন)। তিনি আরো বলতেন যে, رعد একজন ফেরেশতা, তিনি মেঘকে চিৎকার ধ্বনি দেন, যেমন রাখাল তার মেষপালকে চিৎকার ধ্বনি দেয়।

অপর এক দলের মতে رعد হচ্ছে বায়ু, যা মেঘের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উপরে উঠে। আর তা থেকেই এ শব্দ উৎপন্ন হয়।

এ মতের প্রবক্তাগণ হচ্ছেন—

আহমাদ ইবনে ইসহাকের (রঃ) সূত্রে আবু কাছীর (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি একদা আবুল খুলুদের নিকট ছিলাম, তখন হযরত ইবনে আব্বাসের (রঃ) এক দূত আবুল খুলুদের নিকট লিখিত একটি পত্র নিয়ে তথায় আগমন করে। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল—আপনি আমার নিকট رعد সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র লিখেছেন, জেনে রাখুন رعد হচ্ছে বায়ু।

ইবরাহীম ইবনে আবদিল্লাহর সূত্রে ফুরাত বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ)-এর নিকট আবুল খুলদ رعد সম্পর্কে লিখিতভাবে জানতে চাইলে তিনি বলেন. رعد হচ্ছে বায়ু।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রঃ) বলেন, رعد-এর অর্থ যদি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধরা হয় তবে আয়াতের অর্থ হবে او كصيب من السماء فيه ظلمات وصوت رعد (বর্ষণমুখর ঘন মেঘ যাতে রয়েছে অন্ধকার ও রা'দ নামক ফেরেশতার ধ্বনি)। কেননা رعد যদি ফেরেশতা হন যিনি মেঘ পরিচালনা করেন তাহলে তিনি صيب (বৃষ্টি)-এর মধ্যে থাকতে পারেন না, কেননা صيب হচ্ছে তা, যা মেঘ হতে গলিত হয়ে পতিত হয়। আর رعد থাকে শূন্য আকাশে যেখান থেকে তিনি মেঘ পরিচালনা করেন। অন্যথায় যদি তিনি বৃষ্টির মধ্যে থেকে গমনাগমন করতেন তা হলে তাঁর শব্দ শুনাও যেত না এবং তখন এতে কারো ভীত হওয়ার কিছু থাকত না। কেননা কথিত আছে, বৃষ্টির প্রতি ফোটার সঙ্গে একজন করে ফেরেশতা থাকেন। সুতরাং رعد নামক ফেরেশতা যদি মেঘের সাথে থাকেন, ফলে তাঁর শব্দও শ্রুত না হয়, তখন কারোর জন্যে ভয়ের কারণ থাকে না। তিনি ঐ সব ফেরেশ-তাদের চেয়ে কোন ব্যতিক্রম হবেন না যারা বৃষ্টির ফোটার সাথে ধরার বুকে নেমে আসেন। অতএব, বুঝা গেল, বিষয়টি যদি উপরে উল্লেখিত হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতের ব্যাখ্যানুযায়ী গ্রহণ করা হয় তবে আয়াতটির অর্থ হবে او كمثل غيث تحدر من السماء فيه ظلمات وصوت رعد (অথবা তাদের উদাহরণ এমন বৃষ্টি ধারার ন্যায় যা আকাশ থেকে পতিত হয়, যার মধ্যে থাকে অন্ধকার ও রা'দ ফেরেশতার আওয়াজ)। যদি رعد-এর অর্থ তাই ধরা হয় যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এবং এও বুঝা গেল যে, রা'দের নাম যখন শাব্দিক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন এর দ্বারা উক্ত আয়াতের মর্ম বুঝার জন্যে صوت (আওয়াজ)-এর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আর যদি رعد-এর অর্থ তাই হয় যা আবুল খুলদ বলেছেন তা হলে فيه ظلمات و رعد এই আয়াতাংশে কোন কিছুই বাদ পড়ে না। কেননা তখন বাক্যটির অর্থ হবে فيه ظلمات ورعد (তার মধ্যে থাকে অন্ধকার ও রা'দ বায়ু) যার বৈশিষ্ট আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

برق (বারক)-এর অর্থ সম্পর্কে তফসীর বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তৎসম্বন্ধে কয়েকজনের মত হলো, যা মাতার ইবনে মুহাম্মাদ আদ-দাব্বী বিভিন্ন সূত্রে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, برق (বারক) ফেরেশতাদের কোড়া।

আহমাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত; বারক হচ্ছে ফেরেশতাদের হাতের কোড়া, যা দিয়ে তাঁরা মেঘ তাড়ান।

হযরত মুসান্নার (রঃ) সূত্রে হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রা'দ হলো ফেরেশতা আর বারক হলো লোহার কোড়া দ্বারা মেঘে আঘাত করা।

অন্য কয়েকজনের মতে বারক হচ্ছে নূরের তৈরী চাবুক, ফেরেশতা তা দ্বারা মেঘ তাড়ান।

মিনজাব ইবনে হারূছ—এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এইরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অপর কয়েকজন বলেছেন, বারক হচ্ছে পানি। এ মত পোষণকারীগণ হচ্ছেন ঃ

আহমাদ ইবনে ইসহাক আল-আহওয়াজীর সূত্রে আবু কাছীর বর্ণনা করেন যে, আমি একবার আবুল খুলদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এক দূত আবুল খুলদের নিকট লিখিত একটি চিঠিসহ আগমন করে। তিনি উত্তরে আবুল খুলদের নিকট লেখেন, আপনি আমার নিকট বারক সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, মনে রাখুন বারক হচ্ছে পানি।

ইবরাহীম ইবনে আবদিল্লাহ্‌র সূত্রে আল-ফুরাত বর্ণনা করেন, আবুল খুলদ হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নিকট বারক সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি পত্র মারফত উত্তর দেন, বারক হলো পানি। ইবনে হামীদ এর সূত্রে বসরার জনৈক অধিবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞ বর্ণনা করেন যে, হাজার-এর অধিবাসী আবুল খুলদ নামক জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নিকট বারক সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি চিঠির মাধ্যমে তাকে উত্তর দেন যে, আপনি আমার নিকট বারক সম্পর্কে জানার জন্য পত্র লিখেছেন, বারক হলো এক প্রকার পানি।

অন্য এক দল বলেছেন, বারক হলো ফেরেশতার জ্যোতি (مصع ملك) মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-এর সূত্রে হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, বারক হল ফেরেশতাদের জ্যোতি।

হযরত মুসান্নার (রঃ) সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আত-তায়িফী (طائفی) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, বারক একজন ফেরেশতা, তার ৪টা মুখ—একটা মুখ মানুষের, একটা গরুর, একটা শকুনের এবং একটা সিংহের। যখন তিনি তার ডানা দিয়ে আলোক বিচ্ছুরিত করেন, তখনই হয় বারক।

হযরত কাসিমের (রঃ) সূত্রে হযরত শুআইব আল-জুবাই (রঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে আছে যে, কতিপয় ফেরেশতা আরশ বহন করে আছেন। এদের প্রত্যেকের একটি করে মানুষের চেহারা, একটি গরুর চেহারা ও একটি সিংহের চেহারা আছে। এসব ফেরেশতা যখন তাদের ডানাসমূহ নাড়া দেন তখন তাই হয় বারক।

উমাইয়্যা ইবনে আবিছ ছালত বলেন :

رجل و ثور تحت رجل يمينه — والنسر للاخرى والليث مرصد

"একজন মানুষ ও একটি ষাড় তার ডান পায়ের নীচে এবং একটি শকুন ও একটি সিংহ অপরটির জন্যে পাহারায় নিযুক্ত।"

হযরত হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদের (রঃ) সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, বারক হচ্ছে ফেরেশতা।

হযরত কাসিমের (রঃ) সূত্রে হযরত ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেন, الصواعق ফেরেশতার নাম। তিনি কোড়া দ্বারা মেঘমালায় আঘাত করেন, যথায় ইচ্ছা করেন উঁহা হতে বর্ষণ করেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত মুজাহিদ (রহ) যে মতামত পেশ করেছেন সেগুলির একই অর্থ এবং তা এভাবে হযরত আলী (রা) যে কোড়ার কথা বলেছেন প্রকৃত পক্ষে ওটাই বারক। তা নূরের তৈরী চাবুক, যা দ্বারা ফেরেশতা মেঘমালা তাড়ান, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আর তখন ফেরেশতা কর্তৃক মেঘমালা তাড়ানোর অর্থ হবে তার দ্বারা মেঘমালা আলোকিত হওয়া। কেননা আরবদের নিকট مصاع এর মূল ব্যবহার হচ্ছে চামড়া দিয়া তলোয়ার বাঁধানো, অতঃপর একে সেসব জিনিসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় যা চামড়ার সাথে সংযুক্ত থাকে, যুদ্ধের জিনিসে হোক বা অন্য কিছুতে। ছা'লাবা গোত্রের কবি আ'শা কয়েকজন বালিকার প্রশংসায় যারা অলংকার নিয়ে খেলছিল এবং তা চামড়ায় বাঁধাছিল—বলেছেন :

إِذَا هُنَّ تَأْذَنَّ أَقْرَانُهُنَّ — وَكَانَ الْمِصَاعُ بِمَا فِي الْجُوْنِ

"যখন তারা অবতরণ করল তাদের সাথীদের নিকট এবং তাদের বর্ম নির্মিত থলিতে যা ছিল তা অতি উজ্জ্বল ছিল।"

এ থেকেই বলা হয় صاعقة ، صاعقة হযরত মুজাহিদের (রঃ) বক্তব্য مصع ملك-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যখন ফেরেশতা মেঘমালা আলোকিত না করে বরং প্রকৃত পক্ষে রা'দই তা আলকোজ্জ্বল করে। صاعقة অর্থ বর্ণনাকালে আমরা এর আলোচনা করে এসেছি যা শাহর ইবনে হাওশাব বলেছেন।

আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ তাফসীরকারগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে একাধিক মত বর্ণিত হয়েছে ঃ

এক ঃ মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়েদ (রহ)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত—

(أَوْ كَصَيِّبٍ ... ... حَذَرَ الْمَوْتِ)

অর্থাৎ তারা তাদের অন্তরের কুফরীর অন্ধকার এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান বিরোধের দরুন মৃত্যুভয় ও তোমাদের প্রতি ভয়ের কারণে ঐ ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় হয়েছে—যে বৃষ্টির ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়েছে। সুতরাং গর্জনের সময় সে মৃত্যু ভয়ে আঙ্গুলগুলি দুই কানে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ—বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়, অর্থাৎ সত্যের অত্যুজ্জ্বলতার জন্যে। كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا—যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সত্য পথ কোনটি তা তারা উত্তম ভাবেই চিনে এবং সে সম্পর্কে আলোচনাও করে। সুতরাং সত্যের পক্ষে কথা বলার দরুন তারা সঠিক পথে সুদৃঢ় থাকে। তারপর যখন সে স্থান ত্যাগ করে এবং সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে কুফরীর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন তারা উদভ্রান্ত পথিকের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে।

দুই ঃ আয়াতের অন্য ব্যাখ্যা যা মূসা ইবনে হারূনের একাধিক সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সহ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে

(أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ... ... إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

যে, সায়্যিব (صيب) ও মাতার (مطر) মদীনার দুই মুনাফিকের নাম। তারা হযরত রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হতে পালিয়ে (মক্কায়) মুশরিকদের নিকট চলে যায়। পথিমধ্যে সেই বৃষ্টিতে পতিত হয় যে সম্পর্কে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন যে, তাতে রয়েছে তুমুলগর্জন, বজ্র ধ্বনি ও বিদ্যুতালোক। অতঃপর যখনই গর্জনের সময় বিদ্যুৎ চমকিয়ে তাদেরকে আলোকিত করত, তখনই তারা কানে আঙ্গুল দিত এই আশংকায় যে, বজ্র তাদের কানের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে মৃত্যু ঘটাতে পারে। যখন বিদ্যুৎ চমকে উঠে তখনই তারা সে আলোয় পথ চলত থাকে।

আর যখন বিদ্যুৎ না চমকায় তখন তারা কিছুই দেখতে পায় না, পরিণামে তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অতঃপর তারা বলতে থাকে, হায়! যদি সকাল পর্যন্ত কোন প্রকার বেঁচে যাই, তা হলে মুহাম্মাদের নিকট হাযির হয়ে তাঁর হাতে হাত রেখে আত্মসমর্পণ করব! তারপর প্রভাত হল। তারা উভয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ও তাঁর হাতে হাত রেখে আত্মসমর্পণ করে এবং অতি উত্তমরূপে ইসলামী জীবন যাপন করে। আল্লাহ্ পাক এখানে এই দুই বাইরের মুনাফিক দ্বারা মদীনায় অবস্থানরত মুনাফিকদের উদাহরণ দিয়েছেন। মুনাফিকদের অভ্যাস ছিল, যখন তারা নবী করীম (স)-এর মজলিসে উপস্থিত হত, তখন তাঁর কথা না শুনার জন্যে কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখত, এ ভয়ে যে, তাদের সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হল না কি, বা তারা কোন বিষয়ে আলোচনা করলে সে কারণে তাদের হত্যা করা হতে পারে। যেমনি ভাবে কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখত ঐ দুই বহিরাগত মুনাফিক। বিদ্যুতালোক যখনই তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তারা তখনই পথ চলতে থাকে, অর্থাৎ যখন তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, সন্তানাদি জন্ম হয় এবং গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অথবা বিজয় লাভ করে, তখন তারা এ পথেই চলতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (স)-এর দীন সত্য দীন। সুতরাং তারা এ দীনের উপরই স্থির থাকত, যেমনি ভাবে ঐ দুই মুনাফিক পথ চলত যখন বিদ্যুৎ তাদেরকে আলকোজ্জ্বল করত। আর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকিয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ যখন তাদের সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, কন্যা সন্তান জন্ম হয় এবং বিপদ-মুসিবতে ঘিরে নেয়, তখন তারা বলে, এই সব বিপর্যয় নেমে এসেছে মুহাম্মাদ (স)-এর দীনের কারণে। সুতরাং তখন তারা পুনরায় কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকত ঐ দুই মুনাফিক যখন বিদ্যুৎ তাদেরকে অন্ধকারে ফেলে দিত।

তিন : মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, اوكصيب من السماء فيه ظلمات و رعد و برق ... [আয়াতের শেষ পর্যন্ত] এটি মুনাফিকদের ঐ আলোর উদাহরণ যা তারা লাভ করে তাদের নিকট আল্লাহ্‌র যে গ্রন্থ আছে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে মৌখিক আলোচনা দ্বারা ও লোক দেখান আমল দ্বারা। এরপরে যখন সে নির্জনে থাকে তখন ঠিক এর বিপরীত আমল করে! সুতরাং সে তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, যতক্ষণ সে এই অবস্থায় থাকে। এখানে অন্ধকার হলো পথভ্রষ্টতা এবং বিদ্যুৎ হলো ঈমান। আর এ মুনাফিকরা হচ্ছে আহলে কিতাব। واذا اظلم عليهم এবং তারা যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—এ সেই ব্যক্তি যে সত্যের একটি প্রান্ত ধরেছে কিন্তু তা সে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না।

চার : হযরত মুসান্নার (রঃ) সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : اوكصيب من السماء অর্থাৎ বৃষ্টি, পবিত্র কুরআনে এর দ্বারা উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তাতে রয়েছে অন্ধকার, অর্থাৎ পরীক্ষা এবং গর্জন অর্থাৎ ভীতি ও বিদ্যুৎ চমক যেন তাদের দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেয়। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত যেন মুনাফিকদের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ করে দেয়, যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে, অর্থাৎ যখনই মুনাফিকরা ইসলামের সাহায্যে সম্মান প্রাপ্ত হয়, তখনই তারা প্রশান্তি লাভ করে, আর যদি ইসলামের দ্বারা তারা কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন বলে চল, কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করি। তিনি বলেন, আর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকিয়ে দাঁড়ায় এ আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যথা :—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ

আয়াতের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করে দ্বিধার মধ্যে যদি তাতে তার মঙ্গল লাভ হয়, তবে তার চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে, আর যদি কোন বিপর্যয় ঘটে, তবে সে তার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায় (সূরা হজ্জ : ১১)।

অতঃপর সকল তাফসীরকারগণ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত মতভেদের মধ্যে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং মুহাম্মাদ ইবনে আমর আল-বাহিলীর সূত্রে মুজাহিদ (রহ) বলেন, বিদ্যুতের চমক ও অন্ধকার উপরোক্ত উদাহরণেরই অনুরূপ।

মুছান্নাহ (রহ)-এর সূত্রেও মুজাহিদ (রহ) থেকে অনুরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

আমর ইবনে আলীর সূত্রেও মুজাহিদ (রহ) থেকে একইরূপ বর্ণিত হয়েছে।

বিশ্র ইবনে মাআজ (রহ)-এর সূত্রে কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত فيه ظلمات و رعد و برق থেকে واذا اظلم عليهم قاموا পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মুনাফিকরা যখন ইসলামের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতা দেখতে পেত, তখন মুসলমানদের বলত—আমরা তোমাদের সাথেই আছি এবং আমরা তো তোমাদের দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আর যখন তাদের উপর কোন বিপদ আসত ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হত, যদিও আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই এসে থাকে, তখন তারা তা থেকে কেটে পড়ত, বিপদে ধৈর্য ধারণ করত না এবং তার পুরস্কারকে কোন গুরুত্ব দিত না ও তার ফলাফলেরও কোন আশা করত না।

হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি فيه ظلمات ورعد وبرق প্রসঙ্গে বলেন, এখানে এমন এক সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যাদের মৃত্যুভয় এত অধিক যে, কোন কিছু কানে শুনা মাত্রই তারা সন্দেহ করত, হায়! এই বুঝি আমাদের ধ্বংস নেমে এলো। আল্লাহ পাক কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছেন। অতঃপর তাদের আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি যেন কেড়ে নেয়, যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তারা তখনই পথ চলতে থাকে অর্থাৎ যখনই মুনাফিকের ধন-দৌলত প্রচুর হয় ও গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শান্তিময় জীবন লাভ করে তখন সে বলে, যখন থেকে আমি এই ধর্মে প্রবেশ করেছি তখন থেকে শুধু উন্নতিই লাভ করেছি واذا اظلم عليهم قاموا "যখন তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়।" অর্থাৎ যখন তাদের সম্পদ ফুরিয়ে যায়, গবাদি পশু ধ্বংস হয় এবং বিপদ-মুসীবতে পতিত হয় তখন তারা দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মুছান্নার সূত্রে রবী ইবনে আনাস (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি فيه ظلمات ورعد وبرق প্রসঙ্গে বলেছেন, তাদের উদাহরণ ঐ কাফেলার ন্যায় যারা বিদ্যুৎ ও বজ্র-বৃষ্টিপূর্ণ ঘোর অন্ধকার রাতে পথ অতিক্রম করছে। যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন তারা পথ দেখে চলতে থাকে আর যখন বিদ্যুৎ চলে যায়, তখন তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে। তেমনি ভাবে মুনাফিকরা যখন সত্যের পক্ষে কথা বলে তখন তাদের অন্তর আলোকিত হয়, আবার যখন সন্দিগ্ধ মনে কথা বলে তখন দিশাহারা হয় এবং অন্ধকারে পতিত হয়। এ কথাই কুরআন করীমে বলা হয়েছে। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারে

ছেয়ে যায় তখন তারা থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর আল্লাহ পাক তাদের কান ও চোখ সম্পর্কে বলেছেন, যার সাহায্যে তারা লোক সমাজে জীবন যাপন করে "ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم" আর যদি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হতো তা হলে তিনি তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি রহিত করতেন। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, কাসিমের সূত্রে দাহ্হাক ইবনে মুজাহিদ ظلمات (فيه ظلمات) শব্দের অর্থে হবলেছেন, অন্ধকার পথভ্রষ্টতা আর বিদ্যুৎ হলো ঈমান।

ইউনুস (রহ)-এর সূত্রে আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি فيه ظلمات ورعد وبرق হতে ان الله على كل شيء قدير পর্যন্ত পাঠ করে বলেন, এটিও মুনাফিকদের আরেকটি দৃষ্টান্ত। আল্লাহ পাক মুনাফিকদের সম্পর্কে তা বর্ণনা করেছেন। তারা ইসলাম থেকে আলো পেত যেমনি ভাবে এ ব্যক্তি বিদ্যুতের চমক থেকে আলো পায়।

কাসিমের সূত্রে ইবনে জুরাইজ (রহ) বলেন, এ পৃথিবীর যে কোন শব্দ মুনাফিকের কানে প্রবেশ করে, সে মনে করে যে, এ কথা বুঝি তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। মৃত্যু তার নিকট অতি ভীতিপ্রদ এবং আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মুনাফিকই মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে যেমন তারা যখন কোন শূন্য ময়দানে বৃষ্টিতে পতিত হয় তখন বজ্রের ভয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালায়।

আমর ইবনে আলী (রহ)-এর সূত্রে আতা' (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি

او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এটি কাফিরদের জন্য একটি উপমা।

আর এ সকল মতামত ও বক্তব্য যা আমরা তাঁদের থেকে উল্লেখ করেছি, যদিও এ সকল মতামতে ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ও বিভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু সেগুলো অর্থের দিক হতে নিকটতম। কেননা এসকল মতের প্রত্যেকটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকের বাহ্যিক ঈমানকে صيب বা বর্ষণমুখর ঘন মেঘরূপে উপমা দিয়েছেন। আর তাতে যে অন্ধকার রয়েছে, তাকে তার গোমরাহী বলে উপমা দান করেছেন। আর তাতে বিদ্যুতের যে আলো রয়েছে, তাকে তার ঈমানের জ্যোতি হিসেবে উপমা দান করেছেন, কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখার মাধ্যমে বজ্রধ্বনি হতে তার রক্ষা করাকে তার অন্তরের দুর্বলতা ও আল্লাহর শাস্তি তাকে ঘিরে ধরার ভয়ে তার হৃদয়ের অস্থিরতার উপমা দিয়েছেন। বিদ্যুতের ঝলকানির মধ্যে তার পথ চলাকে তার ঈমানের আলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপমা দান করেছেন। তার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকাতে তার গোমরাহীর মধ্যে অস্থির থাকা ও বিপথগামীতায় অবস্থান করার উপমা দান করেছেন।

বিষয়টি যেহেতু তদ্রূপই যেমন আমরা উল্লেখ করেছি, সুতরাং এক্ষণে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ (স) ও মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে মৌখিকভাবে বলে, আমরা আল্লাহ তা'আলা, পরকাল, মুহাম্মাদ (স) ও তিনি যা আনয়ন করেছেন, তৎপ্রতি ঈমান এনেছি। এদ্বারা দুনিয়ায় তারা মু'মিনরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ তারা তাদের মুখে যা প্রকাশ করেছে

তা প্রকাশ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রসূল (স), আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তিনি যা' নিয়ে আগমন করেছেন তা' এবং পরকালের প্রতি মিথ্যারোপকারী। কারণ তারা মুখে যা প্রকাশ করে, অন্তরে তার বিপরীত আকীদা পোষণ করে। তারা যে পথভ্রষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে তদ্বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে, যে দু'টি বস্তু তাদের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে, তন্মধ্যে কোনটি হেদায়াত বা সুপথ? তা কি সে কুফরীর মধ্যে নিহিত, যার উপর তারা মুহাম্মাদ (স)-কে ইসলামী শরীআত সহ তাদের নিকট প্রেরণ করার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল, না সেই শরীআতের মধ্যে নিহিত যা সহ মুহাম্মাদ (স) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগমন করেছেন। সুতরাং তারা মুহাম্মাদ (স)-এর মুবারক যবানে তাদেরকে সতর্ক করনের দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত, আবার তারা তাদের এ ভয় সত্ত্বেও এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান। (فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا)

'তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাধিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।" তাদের এ আলো অন্বেষণ করার উদাহরণ সেই বৃষ্টিপাতের অনুরূপ যা গাঢ় কাল মেঘমালায় অন্ধকার রজনীতে ভেসে বেড়ায়, যার পাশাপাশি বজ্রধ্বনি উত্থিত হয়, তার কিনারায় ভীষণ চমক বিশিষ্ট ও অত্যধিক ভয়ংকর বিদ্যুৎ বিক্ষিপ্ত হয়। يكاد سنا برقه يذهب بالابصار - "যে বিদ্যুতের-প্রখরতা চক্ষুর জ্যোতি হরণ করার উপক্রম করে, আর তার আলোর তীব্রতা ও আলোক-রশ্মি চক্ষুকে দৃষ্টিহীন করে তোলে।" তা থেকে বজ্রপাতের অগ্নিপিণ্ডসমূহ নিম্নে নিক্ষেপিত হয় যার মারাত্মক ভয়াবহতায় আত্মাসমূহ অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে।

সুতরাং বর্ষণমুখর ঘন মেঘ হলো মুনাফিকগণ বাহ্যতঃ তাদের যবানে স্বীকারোক্তি ও আস্থা পোষণ করা ইত্যাদি যা প্রকাশ করে তার উদাহরণ। আর যে অন্ধকারসমূহ তাতে নিহিত রয়েছে, তা হলো তারা অন্তরে সন্দেহ-সংশয়, মিথ্যারোপ ও আত্মিক ব্যাধি ইত্যাদি যা গোপন রাখে সেই অন্ধকারসমূহ। আর বজ্রধ্বনি ও মেঘ গর্জন হলো আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রসূল (স)-এর মুবারক যবানে তাঁর কিতাব কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের মাধ্যমে সতর্কীকরণ হতে তারা যে ভয়-ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে তার উদাহরণ—যা তাদের উপর ইহ জগতে কিংবা পরকালে আপতিত হবে। যদিও তারা এ প্রসঙ্গে সন্দিহান যে, তা কি সংঘটিত হবে, না হবে না? এর জন্য কি বাস্তবতা রয়েছে, না তা মিথ্যা ও বাতিল? বস্তুতঃ তারা তা বাস্তব হওয়ার ভয়ে তাদের নিজেদের উপর ধ্বংস ও শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আশংকায় হযরত মুহাম্মাদ (স) যা নিয়ে আগমন করেছেন, মৌখিকভাবে তা স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। আর এই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت "বজ্র ধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করে—" এর ব্যাখ্যা। ইহার অর্থ হচ্ছে এই যে আল্লাহ তা আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজীদেও তাঁর রসূল (স)-এর মুবারক যবানে তাদের বিরুদ্ধে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, বাহ্যিক স্বীকারোক্তি ইত্যাদি যা তারা মৌখিকভাবে প্রকাশ করে থাকে, তার মাধ্যমে তারা তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। যেমন, মেঘ গর্জন হতে ভয় পোষণকারী ব্যক্তি নিজ আত্মা সম্পর্কে তা হতে ভয় করতঃ তার কর্ণদ্বয় বন্ধ করা ও তাতে অঙ্গুলি স্থাপন করার মাধ্যমে বাঁচতে চেষ্টা করে।

আর আমরা ইতিপূর্বে যে হাদীছটি উল্লেখ করেছি, যা ইবনে মাসউদ (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা উভয়ে বলতেন, মুনাফিকগণ যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিসে উপস্থিত হতো, তখন তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী শ্রবণ করা হতে তাদের কানে অঙ্গুলিসমূহ প্রবিষ্ট করতো। এভয়ে যে, তাদের প্রসঙ্গে কিছু অবতীর্ণ হবে, কিম্বা কোন কিছুর মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দান করা হবে, আর তাদেরকে হত্যা করা হবে। যদি হাদীছটি সহীহ হয়, যা আমি সহীহ বলে মনে করি না, যেহেতু আমি এর সনদ সম্পর্কে সন্দিহান—তবে বক্তব্য তাই যা তাঁদের হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর যদি হাদীছটি সহীহ না হয়, তবে আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা তাই যা আমরা ব্যাখ্যা করেছি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, তারা তাদের উক্তি "আমরা আল্লাহ তা'আলা, ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি" দ্বারা আল্লাহ তা'আলা, তার রসূল (স) ও মু'মিনগণকে প্রতারিত করে। অথচ রসূলুল্লাহ (স) তাদেরই প্রতিপালকের নিকট হতে যা কিছু আনয়ন করেছেন, এবং উহার বিশ্বাসী বলে তারা যে ধারণা করেছে, তদ্বিষয়ে তাদের অন্তরে সন্দেহ ও হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে। আর কুরআন মজীদের যে সকল আয়াতে তাদের বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে, তৎসমুদয় আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর সাথে বিশেষিত করেছেন। এ আয়াতের বর্ণনাও তদ্রূপ।

আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্ণকুহরে অঙ্গুলি প্রবেশের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন – হযরত রসূল (স) এবং মু'মিনদের ভয় করার জন্য। যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ভয় করে। আর এ উদাহরণটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের আয়াতসমূহে তাদের ব্যাপারে যে সকল সতর্কবাণী অবতীর্ণ করেছেন, তাকে বজ্রধ্বনির সাথে উপমা দান করার সদৃশ।

তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী حذر الموت "মৃত্যু ভয়ে" বাক্যটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের সে ভয় ও আশংকার উদাহরণ দিয়েছেন যা তাদের অন্তরে দ্রুত আগমনকারী ধ্বংসাত্মক শাস্তির কারণে সঞ্চারিত হয়েছে যেমন, বজ্রধ্বনি শ্রবণকারী ব্যক্তি নিজ আত্মার ধ্বংস ও মৃত্যু ভয় তার অঙ্গুলিকে কর্ণদ্বয়ে স্থাপন করে যে, উহার তীব্রতায় প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে যাবে।

আর বিখ্যাত তাফসীরকার কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি حذر الموت-এর ব্যাখ্যা حذرا من الموت (মওতের ভয়ে)-এর সহিত করতেন। যেমন, মুয়াম্মার (রহ) তাঁর নিকট হতে এরূপ সংবাদ দিয়েছেন। আর তা ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে একটি দুর্বল মত। কেননা, লোকেরা মৃত্যু হতে আত্মরক্ষার জন্য তাদের কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করে না, এমতাবস্থায় তার অর্থ দাঁড়াবে, তাতে حذرا من الموت "মৃত্যু হতে আত্মরক্ষাকল্পে" বরং তারা তো' তা حذار الموت মৃত্যু ভয়ে করে থাকে।

আর কাতাদা (রহ) ও ইবনে জুরাইজ (রহ) আল্লাহ তা'আলার বাণী يجعلون اصابعهم فى اذانهم من الصواعق حذر الموت "মৃত্যু ভয়ে তারা বজ্রধ্বনিতে তাদের কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করে।" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতেন যে, তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনাফিকদের কাপুরুষতা, দুর্বল চিত্ততা ও মৃত্যুকে ভয় করার বর্ণনা। আর তাঁরা এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করতেন যে, তারা প্রত্যেক বিকট শব্দ তাদের প্রতি উচ্চারিত মনে করতো। অবশ্য আমার মতে এক্ষেত্রে ব্যাপারটি তদ্রূপ নয়, যেমন তাঁরা উভয়ে বলেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্যে কতেক এমন লোকও ছিল, যার শৌর্য-বীর্য অনস্বীকার্য ও যার বীরত্ব অপ্রতিরোধ্য। যেমন, সে হতভাগা মু'মিনদের মুকাবিলায় কেউই উহুদ প্রান্তরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। বরং রসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাদের

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি অস্বীকার করা এবং তার শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে তারা সাহায্য বন্ধ করা এজন্য ছিল যে, যেহেতু তারা তাদের দীন সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী ছিল না এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আন্তরিক আস্থাশীল ছিল না। তাই তারা তাঁর পক্ষ হতে লজ্জিত করা ভিন্ন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিতিকে অপছন্দ করতো। বস্তুতঃ তা হলো তাদের মুনাফিকীর কারণে পার্থিব জীবনে অথবা পরকালে তাদের প্রতি যে আল্লাহ্‌র শাস্তি আপতিত হবে সে ব্যাপারে তাদের ভয়ভীতির কথা আল্লাহ তা'আলা এখানে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছেন এবং তার দৃষ্টান্তও বর্ণনা করেছেন। মুনাফিকরা যদিও আল্লাহ পাকের শাস্তি ও আযাবের ভয়ে কানে অংগুলি প্রবেশ করিয়ে রাখে, তবুও তারা তাঁর কিতাবের আয়াতসমূহে বর্ণিত ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে না। কেননা, তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি ও আকীদায় রয়েছে সন্দেহ।

এসম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, والله محيط بالكافرين (আল্লাহ তাআলা কাফিরদিগকে পরিবেষ্টন করে আছেন)। অতঃপর আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের প্রতি অবধারিত। যেমন— মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী والله محيط بالكافرين এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। আর ইবনে আব্বাস (রা) হতে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি والله محيط بالكافرين -এর ব্যাখ্যায় বলতেন, আল্লাহ তা'আলা এজন্য তাদের প্রতি শাস্তি অবতরণ করবেন। মুজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি والله محيط بالكافرين-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদেরকে একত্রিত করবেন ও কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিবেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মুনাফিকদের মৌখিক স্বীকারোক্তির বিবরণ, তদ্বিষয়ে এবং তাদের সন্দেহ ও তাদের অন্তরের ব্যাধি পুনরুল্লেখ করে ইরশাদ করেন—

(٢٠) يكاد البرق يخطف ابصارهم ط كلما اضاء لهم مشوا فيه - واذا اظلم عليهم قاموا ط ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ط ان الله على كل شيء قدير ٥

(২০) বিদ্যুৎ-চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

"বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টি প্রায় কেড়ে নেয়।" বিদ্যুৎ দ্বারা এখানে তাদের যে স্বীকারোক্তি উদ্দেশ্য, যা তারা তাদের মুখে আল্লাহ তা'আলা, রসূল (স) ও তিনি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যা কিছু আনয়ন করেছেন তৎসম্পর্কে প্রকাশ করেছে। বিদ্যুৎকে তাদের সে স্বীকারোক্তির জন্য উপমা উদাহরণরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে—যার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাদের চক্ষু হরণ করে নিচ্ছিল, অর্থাৎ জ্যোতি হরণ করে নিচ্ছিল, নিষ্প্রভ করে দিচ্ছিল, উহাকে বিকৃত করে দিচ্ছিল, ঐ আলোর আধিক্য ও বিকীরণের কারণে। যেমন—

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি يكاد البرق يخطف ابصارهم "বিদ্যুৎ তাকে"

চক্ষুর জ্যোতি হরণ করার উপক্রম করেছিল"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তাদের চক্ষুজ্যোতিকে বিকৃত করে দিচ্ছিল এবং তারা যা কিছু করছিল।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, الخطف শব্দটির অর্থ السلب হরণ করা। আর সে অর্থেই রসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণিত হাদীসটি যে, روى عن النبى (ص) انه نهى عن الخطفة "তিনি হরণ করার হতে নিষেধ করেছেন।" আর এ দ্বারা লুটতরাজ বুঝানোর উদ্দেশ্য। তা থেকেই কূপ হতে বালতি উত্তোলনকারী শিকলকে خطاف বলা হয়, যেহেতু তার সঙ্গে যা ঝুলানো হয়, উহাকে দ্রুত আহরণ করেলয় এবং ছিনিয়ে লয়। আর এ অর্থে বনী যুবইয়ানের কবি নাবিগাহ বলেছেন—

خطاطيف حجن فى حبال متينة — تمدبها ايد اليك نوازع

"শক্ত রজ্জুসমূহে বক্র থাবা, যদ্বারা তোমার প্রতি আকর্ষণকারী হাত সম্প্রসারিত করছে।"

বস্তুত: এখানে বিদ্যুতের জ্যোতি ও তার আলো বিকীরণের তীব্রতাকে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রসূল (স) ও তিনি যা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে নিয়ে এসেছেন এবং পরকাল সম্পর্কে তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তিকে এখানে বিদ্যুতের জ্যোতি ও তার আলো বিকীরণের তীব্রতাকে বুঝানো হয়েছে। আর তার জ্যোতির বিকিরণকে উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন كلما اضاء لهم "যখনই তাদের সম্মুখে আলোক উদ্ভাসিত হয়।" অর্থাৎ বিদ্যুৎ যখন তাদের সম্মুখে চমকে উঠে বিদ্যুৎকে তাদের ঈমানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাদের ঈমানের আলো প্রকাশ করেছেন। আর তা তাদের জন্য আলোক উদ্ভাসিত হওয়া এই যে, তারা এ মৌখিক ঈমানের দ্বারা এমন সব সাফল্য প্রত্যক্ষ করবে, যা তাদেরকে তাদের পার্থিব জীবনে উৎসাহিত করবে। যেমন শত্রুর উপর বিজয় লাভ করা, যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমত সমূহ অর্জন করা, অধিক সংখ্যক বিজয় ও তার উপকারিতা অর্জিত হওয়া, ধন-সম্পদে প্রাচুর্য আসা, নিজেদের জীবন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান—সন্ততির নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি। বস্তুতঃ এগুলোই তাদের জন্য আলোকোদ্ভাসিত হওয়া। কেননা, তারা তাদের মুখে যে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে, তা তারা এ গুলোর অন্বেষণে এবং নিজেদের জীবন, সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিগণ হতে অনিষ্টকারিতা প্রতিরোধ কল্পেই প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে তাদের বিশেষণ আলোচনা করেছেন।

ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه

"মানুষের মধ্যে কতেক এমন লোক আছে যারা দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তার প্রতি কোন কল্যাণ পৌঁছে, তবে সে তাতে আত্মতৃপ্ত হয়, আর যদি তার বিপর্যয় ঘটে তবে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়" (সূরা হজ্জ : ১১)।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী مشوا فيه "(তারা তাতে পথ চলছে)"-এর অর্থ হলো, তারা বিদ্যুতের আলোকে পথ চলেছে। আর তা হলো তাদের স্বীকারোক্তির উদাহরণ, যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, যখন তারা ঈমানের মধ্যে যে সাফল্য প্রত্যক্ষ করে, যা তাদেরকে তাদের পার্থিব জীবনে উৎসাহিত ও পুলকিত করে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি তখন তারা এ বিশ্বাসের উপর সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেমন সেই পথিক যে রাত্রি ও বর্ষণ ঘন মেঘের অন্ধকারে পথ চলে, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বিবরণ দান করেছেন যে, যখন তাতে একটি বিদ্যুৎ চমকায় তখন সে তাতে তার পথ দেখে (তখন সে পথ চলে) واذا اظلم عليهم—আর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় অর্থাৎ তাদের উপর থেকে বিদ্যুতের আলো বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার বাণী عليهم (তাদের উপর) দ্বারা যে সকল পথযাত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন সে বর্ষণ ঘন মেঘে পথ চলে, তাদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা এ বিবরণ দান করেছেন। আর তা মুনাফিকদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত। আর তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার অর্থ হলো মুনাফিকরা যখন ইসলামের মধ্যে সেই সাফল্য না দেখে যা তাদেরকে তাদের পার্থিব জীবনে পুলকিত করে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাগণকে বিপদাপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করে। শত্রুগণকে তাদের উপর সাফল্য দান কিম্বা তাদের হতে তাদের পার্থিব স্বার্থ হাতছাড়া করার মাধ্যমে কঠিন বিপদ-আপদে লিপ্ত করত তাদের গুনাহ মার্জনা করেন, তখন তারা তাদের মুনাফিকীর উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাদের পথভ্রষ্টতার উপর স্থির থাকে। যেমন বর্ষণ ঘন মেঘের অন্ধকারে পথ চলা পথিকগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার পর এবং বিদ্যুতের আলোক বিলীন হওয়ার পর থেমে যায়, তখন সে তার পথে উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে, ফলে সে তার পথ চিনে না।

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم -এর ব্যাখ্যা।

"আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিয়ে যেতেন।" ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রসঙ্গে যে উল্লেখ করেছেন, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে মুনাফিকদের হতে তা হরণ করতেন, তাদের দেহের অন্যান্য অঙ্গ সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ করেননি। তা এজন্য যে, পূর্ববর্তী আয়াত দু'টিতে অঙ্গ প্রসঙ্গে আলোচনা চলে এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী يجعلون اصابعهم এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী—يكاد البرق يخطف في اذانهم من الصواعق حذر الموت ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه। আর এ আয়াত দু'টি আল্লাহ তা'আলা উপমা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী পর্যায়ে তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাদের মুনাফিকী ও কুফরীর কারণে শাস্তিস্বরূপ তাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি থেকে বঞ্চিত করে দিতেন। তিনি তাদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে এই বলে সতর্ক করেছেন: والله محيط بالكافرين "আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে বেষ্টন করে আছেন।" এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের শক্তি ও কুদরত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাদের উপর ক্ষমতাবান এবং তাদের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি অবশ্যম্ভাবী। করণ ও তাদের প্রতি তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করার জন্য তাদেরকে এক-

নিতকরণে সক্ষম আর এর দ্বারা তিনি তাদেরকে তাঁর পরাক্রমশালীতা সম্পর্কে সতর্ককারী ও তাদেরকে তাঁর শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী। যাতে তারা তাঁর কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা করে এবং তওবার সাথে তাঁর প্রতি অগ্রসর হয়। যেমন—

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যেহেতু সত্যের পরিচয় লাভের পর তা ত্যাগ করেছে।

রবী ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুনাফিকদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় যাদ্বারা তারা মানব সমাজে বসবাস করে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, তবে তাদের ঐ শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত করবেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, لذهب بسمعهم وابصارهم এর অর্থ হলো لاذهب سمعهم وابصارهم (অর্থাৎ با এর মাধ্যমে فعل টি متعدى হয়েছে) (তাদের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি ছিনিয়ে নিতাম)। কিন্তু আরবগণ যখন এরূপ ক্ষেত্রে 'ب' অক্ষরটি ব্যবহার করেন তখন তাঁরা বলেন, ذهبت ببصره "আমি তার চক্ষু হরণ করেছি।" আর যখন তারা 'ب' অক্ষরটিকে বিলুপ্ত করেন, তখন তাঁরা বলেন, ذهبت بصره। আমি তার চক্ষু হরণ করেছি"। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, اتنا غداءنا। "আমাদেরকে আমাদের সকালের খাবার দাও"। আর যদি غداءنا শব্দটির পূর্বে ب অক্ষরটি সংযোগ করেন, তবে তখন ائتنا بغدائنا। বলা হতো।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, যদি কেউ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন যে, কিরূপে لذهب بسمعهم বলা হয়েছে, যাতে سمع-কে একবচন আর وابصارهم বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ সর্বজন বিদিত যে, سمع দ্বারা একদল লোকের শ্রবণেন্দ্রীয়কে বুঝানো হয়েছে যেমন, ابصار শব্দের মধ্যেও একদল লোকের চক্ষু সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে যে, আরবগণ এতে মতভেদ করেছেন। কোন কোন কুফাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন যে, سمع শব্দটিকে এজন্য একবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু তার দ্বারা শব্দমূল (مصدر)-এর অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, আর তদ্বারা خرق কর্ণকুহর উদ্দেশ্য করেছেন। আর ابصار-কে বহুবচনরূপে ব্যবহার করেছেন, যেহেতু তদ্বারা চক্ষুসমূহ উদ্দেশ্য করেছেন।

আর কোন কোন বসরাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ ধারণা করেছেন যে, سمع শব্দটি যদিও শব্দগতভাবে একবচন, কিন্তু তা জামাআত বা বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর তাঁরা এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কালাম لا يرتد اليهم طرفهم-কে দলীল হিসেবে পেশ করেন। কেননা এতে তরফুহুম শব্দটি একবচনে হলেও বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা ইবরাহীম আয়াত ৪৩)।

আর আমার মতে ইহা এইজন্য বৈধ, কেননা বক্তব্যের দ্বারা বহুবচন বুঝানো হয়েছে। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি ابصار-এর ক্ষেত্রে তদ্রূপই করা হতো বা سمع এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে, কিংবা যদি سمعهم-এর ক্ষেত্রে তাই করা হতে যা ابصار-এর ক্ষেত্রে

করা হয়েছে, বহুবচন ও একবচন যোগে ব্যবহার করণের প্রশ্নে, তবে তা'ও সঠিক ও যথার্থ হতো আমাদের পূর্ব বর্ণিত নিয়মানুসারে। যেমন কোন কবি বলেছেন—

كلوا فى بعض بطنكم تعفوا — فان زمانكم زمن خميص

"তোমরা তোমাদের পেটের কিছু অংশ ভরে ভক্ষণ কর, তবে তোমরা সুস্থ থাকবে। কেননা আমাদের যুগ বুভুক্ষার যুগ।"

এখানে بطن (পেট) শব্দটিকে একবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ তদ্বারা بطون বহুবচন উদ্দেশ্য। আর এটি ঐ কারণেই করা হয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

ان الله على كل شئ قدير -এর ব্যাখ্যা

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে নিজেকে সকল বস্তুর উপর ক্ষমতার সংগে বিশেষিত করেছেন। এজন্য যে, তিনি মুনাফিকদেরকে তাঁর কঠোর শাস্তি ও পরাক্রম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, আর তাদেরকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টনকারী এবং তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও চক্ষুর জ্যোতি হরণে শক্তিমান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুনাফিকগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর এবং আমি ও আমার রসূল ও আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীগণের সাথে প্রতারণা করা হতে বিরত থাকো। তবে আমি তোমাদের প্রতি আমার শাস্তি অবতীর্ণ করবো না। নিশ্চয় আমি এবিষয়ে ও এতদ্ব্যতীত সকল বিষয়ে শক্তিমান। আর قدير শব্দটি قادر অর্থে ব্যবহৃত, যেমন عليم শব্দ عالم অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমি ইতিপূর্বে এরকম শব্দ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, প্রশংসা ও নিন্দাবাদের ক্ষেত্রে فاعل অর্থে فعول এর ব্যবহার অর্থের আধিক্য প্রকাশার্থে হয়ে থাকে।

(২১) يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ○

(২১) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলা এ উভয় গোত্র যাদের একদল সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদেরকে সতর্ক করা হোক, কিম্বা সতর্ক না করা হোক তিনি তাদের অন্তর, কান, চক্ষুসমূহে মোহরাঙ্কিত করে দেয়ার দরুন তারা ঈমান আনয়ন করবে না। আর দ্বিতীয় দল সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা অন্তরে আল্লাহ ও মু'মিনদের এই বলে প্রতারণা করে যে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেছি, অথচ তারা অন্তরে তার বিরূপ আকীদা পোষণ করে। এদের সকলকে এবং অপরাপর তাঁর সকল

৩০—

আনুগত্য আদিষ্ট সৃষ্টিকে তাঁর আনুগত্যের সাথে তাঁর সম্মুখে দীনতা প্রকাশ করতে ও বিনীত হতে এবং তাঁকেই একমাত্র প্রতিপালকরূপে স্বীকার করে নিতে, মূর্তিসমূহ, প্রতিমাসকল ও কল্পিত দেব-দেবী ব্যতীত শুধু তাঁরই ইবাদত-উপাসনা করতে আদেশ করেছেন। যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলাই তাদের পূর্ব-পুরুষসহ সকলেরই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই তাদের মূর্তিগুলি, প্রতিমা সকল ও কল্পিত দেব-দেবীর স্রষ্টা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, অতএব যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষ এবং তোমরা ব্যতীত অপরাপর সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই তোমাদের ক্ষতি ও উপকার সাধনে শক্তিমান। তিনিই সে সকল বস্তু যা তোমাদের উপকার ও ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখে না তাদের অপেক্ষা আনুগত্য লাভের একমাত্র যোগ্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে আমাদের জন্য যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে সে মতে তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরূপই বলতেন, যেরূপ আমরা এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি। অবশ্য এতদ্ভিন্ন তাঁর নিকট হতে এরূপ বর্ণনাও উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি বলতেন اعبدوا ربكم "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর"-এর অর্থ হচ্ছে وحدوا ربكم "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের একত্ব বর্ণনা কর।"

আমরা ইতিপূর্বে আমাদের এ কিতাবে দলীল-প্রমাণ পেশ করেছি যে, ইবাদত শব্দের অর্থ হলো আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট বিনয় প্রকাশ করা এবং দীনতা-হীনতা প্রকাশ পূর্বক তাঁর সম্মুখে অক্ষমতা প্রকাশ করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর যা অর্থ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ কালাম اعبدوا ربكم দ্বারা একথা অর্থাৎ وحدوه শুধু এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এটিই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ শুধু তোমাদের প্রতিপালকেরই বন্দেগী কর, আর কারো নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একথাও বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুনাফিক উভয় দলকে একই সঙ্গে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেনঃ "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের একত্ববাদে বিশ্বাস কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা يايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতটি সে সকল লোকের মতঅশুদ্ধ হওয়ার প্রতি অকাট্য দলীল, যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেওয়া বৈধ নয়। তাদের এ ধারণা অশুদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, আমরা যাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, তারা ঈমান আনয়ন করবে না এবং তাদের পথ হতে প্রত্যাবর্তন করবে না, এমর্মে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দান করার পর তাদেরকে তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর অবাধ্যাচরণ হতে প্রত্যাবর্তন করার আদেশ করেছেন।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -এর ব্যাখ্যা

"যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পারো।" ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে এবং তিনি তোমাদেরকে যা করার আদেশ করেছেন ও যা হতে নিষেধ করেছেন সে ক্ষেত্রে তোমরা তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে এককভাবে নির্দিষ্ট করতঃ তাঁকে ভয় কর। যেন তোমরা তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ হতে আত্মরক্ষা করতে পার এবং মুত্তাকীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, যাঁদের প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট।

আর মুজাহিদ (রহ) لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ-এর অর্থ বলতেন, تُطِيعُونَ যাতে তোমরা আনুগত্য প্রকাশ কর। যেমন মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "যাতে তোমরা ভয় কর"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, لَعَلَّكُمْ تُطِيعُونَ যাতে তোমরা অনুগত হও। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আমার মতে মুজাহিদ (রহ)-এর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো হয়তো তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করবে—তাঁর প্রতি আনুগত্যের প্রদর্শন ও গোমরাহী থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, কেউ যদি এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ তা'আলা কি অর্থে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "(হয়তো তোমরা পরহেযগার হবে) বললেন? তবে কি তিনি এবিষয়টি অবহিত ছিলেন না যে, তারা যখন তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁরই অনুগত হবে তখন তাদের এ কাজের পরিণামফল কি দাঁড়াবে? যদ্দরুন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হয়তো তোমরা যখন তা করবে, তখন তোমরা তাকওয়া বা পরহেযগারী অবলম্বন করবে। আর এভাবে তিনি তাঁরই ইবাদত করার পরিণাম-ফলকে সন্দেহচ্ছলে উল্লেখ করেছেন।

তদুত্তরে তাকে বলা হবে, যেরূপ তুমি ধারণা করেছো, সে অর্থে নয়। বরং এর অর্থ হলো তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাঁকে ভয় করো, তাঁর আনুগত্য, একত্ববাদে বিশ্বাস এবং একক প্রতিপালন ও তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে। যেমন কোন কবি বলেছেন—

وَقُلْتُمْ لَنَا كُفُّوا الْحُرُوبَ لَعَلَّنَا — نَكُفُّ وَوَثَّقْتُمْ لَنَا كُلَّ مُوثِقِ
فَلَمَّا كَفَفْنَا الْحَرْبَ كَانَتْ عُهُودُكُمْ — كَلَمْحِ سَرَابٍ فِي الْفَلَا مُتَأَلِّقِ

"আর তোমরা আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছো, তোমরা যুদ্ধ হতে বিরত হও, যেন আমরা বিরত থাকি। আর তোমরা আমাদের প্রতি পূর্ণরূপে আস্থা রেখেছো। অতঃপর আমরা যখন বিরত হয়েছি তখন তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ শূন্য মাঠে চমকানো মরীচিকা দেখার ন্যায় হয়েছিল।"

এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমরা আমাদের বলেছো, বিরত হও যেন আমরা বিরত হই। আর তা এজন্য যে, যদি এখানে لعل শব্দটি সন্দেহ প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হতো, তবে তারা তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণকারী হতো না।

(২২) الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(২২) যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করিও না।

আল্লাহ তা'আলার বাণী الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا (যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যারূপে তৈরী করেছেন) পূর্ববর্তী اعبدوا ربكم الذى خلقكم মধ্যস্থিত الذى-এর সাথে সম্পর্কিত। উভয় বিবরণই তোমাদের প্রতিপালক-এর বিশেষণ। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যেন এরূপ বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের স্রষ্টা, তোমাদের পূর্ববর্তীগণেরও স্রষ্টা, তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যারূপে সৃষ্টি করেছেন। আর এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা, বিচরণ ক্ষেত্র ও এমন অবস্থান ক্ষেত্র করে দিয়েছেন, যাতে অবস্থান করা সম্ভব হয়। আর আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ বাণীর মাধ্যমে তাদের নিকট তাঁর নেয়ামতরাজি ও অনুপম অনুগ্রহের আধিক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেন তারা তাদের নিকট বিদ্যমান তাঁর নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করতঃ তাঁর আনুগত্যের প্রতি মনোযোগী হয়। যদ্বারা তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যা তিনি তাদের প্রতি দয়া ও করুণা স্বরূপ প্রদান করেছেন। যদিও তাদের ইবাদতের তাঁর কোনরূপ প্রয়োজন নাই বরং তিনি তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও নেয়ামত পূর্ণ করেছেন। যেনো তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা الذى جعل لكم الارض فراشا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হলো এমন শয্যা যার উপর তারা বিচরণ করে, আর তা হলো শয্যা ও অবস্থান ক্ষেত্র।

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি الذى جعل لكم الارض فراشا এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমাদের জন্য শয্যা স্বরূপ করেছেন।

রবী ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি الذى جعل لكم الارض فراشا এর ব্যাখায় বলেছেন, অর্থাৎ শয্যা।

والسماء بناء -এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, سماء (আকাশ)-কে এজন্য سماء নামকরণ করা হয়েছে, যেহেতু তা পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের উর্দ্ধে অবস্থিত। আর প্রত্যেক বস্তু যা অপর বস্তুর উর্দ্ধে

অবস্থিত, তা তার নিম্নে অবস্থিত বস্তুর জন্য سماء এজন্যই ঘরের ছাদকে তার سماء বলা হয়। যেহেতু তা তার উর্ধ্বে অবস্থিত। আর এজন্যই বলা হয়, سماء فلان لفلان অমুক অমুকের জন্যে سماء হয়েছে, যখন সে তার উপর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয় এবং তার উপর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হিসাবে তার প্রতি পরিগণিত হয়। যেমন কবি ফারাজদাক বলেছেন—

سموْنا لِنجران اليماني وأهله — ونجران أرض لم تديث مقاوله

"তোমরা আমাদেরকে ইয়ামানী নাজরান ও তার অধিবাসীদের জন্য উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নরূপে গন্য কর। আর নাজরান এমন ভূখণ্ড যার বক্তব্য অশালীন হয় না।"

আর যেমন কবি বনী যুবয়ান গোত্রের নাবিগাহ্ বলেছেন,

سمت لي نظرة فرأيت منها — تحيت الخدر وا ضعة القرام

"আমার চোখের এক পলক উত্থিত হয়েছে, তখন আমি তদ্বারা দেখতে পেয়েছি যে, লাল রংয়ের পাতলা কাপড় স্থাপিত পর্দা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে"। কবি এখানে سمت لي نظرة বলে اشرفت لي نظرة (আমার জন্য চোখের এক পলক উত্থিত হয়েছে এবং প্রকাশমান হয়েছে) উদ্দেশ্য করেছেন। তদ্রূপ আকাশকে যমীনের জন্য سماء বা আকাশ নামকরণ করা হয়েছে, তা তার উপর সমুচ্চ ও উর্ধ্বে স্থাপিত হওয়ার কারণে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা والسماء بناء-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যমীনের উপর আকাশের ছাদ হচ্ছে গম্বুজের আকৃতি সদৃশ্য। আর তা হচ্ছে যমীনের উপর ছাদ বিশেষ।

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী والسماء بناء-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ আকাশকে তোমার জন্য ছাদ করেছেন।

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কৃত অনুগ্রহরাজির বিবরণ দান উপলক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ এজন্য করেছেন, যেহেতু এতদুভয়ের মধ্য হতেই তাদের খাদ্য, জীবিকা ও জীবন ধারণের উপকরণ অর্জিত হয় এবং এতদুভয়ের মধ্যেই তাদের পার্থিব জীবনের স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যিনি এ দুটিকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, আর তারা তাতে যে সকল নেয়ামত ভোগ করছে, এ সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের উপর আনুগত্যের হকদার এবং তাদের পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা ও ইবাদত লাভ করার অধিকারী, সেই সকল প্রতিমা ও মূর্তি নয় যা অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না।

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم -এর ব্যাখ্যা

"তিনি আকাশ হ'তে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন।" এর অর্থ হল—আল্লাহ পাক আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তারপর সেই বৃষ্টির পানি

দ্বারা তারা যমীনে যা কিছু কৃষিকর্ম ও বৃক্ষ রোপন করেছে, তাতে তিনি জীবিকা ও খাদ্য হিসেবে ফল ও ফসল সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর কুদরত ও সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে এখানে অবহিত করেছেন এবং তদ্বারা তাদেরকে তাঁর যে সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যা তাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে। আর তাদেরকে এব্যাপারেও অবহিত করে দিয়েছেন যে, একমাত্র তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদেরকে জীবিকা দান করেন, তিনিই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সে সকল মূর্তি ও কৃত্রিম উপাস্য নয়, যেগুলিকে তারা তাঁর নজীর ও সমকক্ষ করে রেখেছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর জন্য নজীর স্থির করার ব্যাপারে তিরস্কার করেছেন যে, প্রকৃত ব্যাপার তাই, যা তিনি তাদেরকে সংবাদ দান করেছেন। আর তিনি তাদেরকে এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কোন নজীর বা সমকক্ষ নাই, আর তিনি ভিন্ন অপর কেউ তাদের জন্য উপকারী ও ক্ষতিকারক, স্রষ্টা ও জীবিকাদাতা নেই।

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا -এর ব্যাখ্যা

"সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য সমকক্ষ দাঁড় করিও না"।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, اندادا শব্দটি ند-এর বহুবচন, আর তা' হলো সমকক্ষ ও সদৃশ। যেমন, কবি হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন—

اتهجوه ولست له بند — فشركما لخيركما الفداء

"তুমি কি তার নিন্দাবাদ কর, অথচ তুমি তাঁর সমকক্ষ নও। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট ব্যক্তি তারা তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্টতমের জন্য কোরবান হোক।"

তাঁর একথা দ্বারা তিনি এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, তুমি তাঁর (মুহাম্মাদ-এর) সমকক্ষ নও। আর যে কোন বস্তু যা' অপর কোন বস্তুর সদৃশ ও তুল্য' তা'ই সে বস্তুর সমকক্ষ। যেমন—

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فلا تجعلوا لله اندادا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ সমকক্ষগণ।

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فلا تجعلوا لله اندادا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ সমকক্ষগণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা فلا تجعلوا لله اندادا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে তোমরা যাদের অনুসরণ কর, সে সব লোকের সমকক্ষ যারা।

ইবনে ইয়াযীদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী فلا تجعلوا لله اندادا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সমকক্ষগণ হলো তাদের কৃত্রিম উপাস্যগণ, যাদেরকে তারা তাঁর সাথে অংশীদার মনে করে। আর তারা সে সকল কৃত্রিম উপাস্যের জন্য তাই সাব্যস্ত করেছে, যা তারা তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فلا تجعلوا لله اندادا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন অর্থাৎ সদৃশগণ।

ইকরামা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فلا تجعلوا لله اندادا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ যেমন তোমরা বলে থাকো যদি আমাদের কুকুরটি না থাকতো তবে চোর আমাদের গৃহে প্রবেশ করতো। যদি আমাদের কুকুরটি গৃহে আওয়াজ না করতো ইত্যাদি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশ করা, তিনি ভিন্ন অপর কারো ইবাদত করা, আনুগত্যের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর সমকক্ষ সদৃশ করা হতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আর বলেছেন, যেভাবে তোমাদের সৃষ্টিতে, তোমাদের জীবিকা দানে, তোমাদের প্রতি আমার অধিকারে এবং আমার নেয়ামত প্রদানে তোমাদের প্রতি কেউ আমার অংশী নয়, তদ্রূপ তোমরা এককভাবে আমারই আনুগত হও শুধু আমারই ইবাদত করো। এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তোমরা আমার অংশী ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না। কেননা, তোমরা নিশ্চিত ভাবে জান যে, তোমাদের প্রতি যাবতীয় নেয়ামত আমারই পক্ষ হতে।

وانتم تعلمون-এর ব্যাখ্যা

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। এ আয়াতে কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে? অনন্তর তাঁদের কেউ বলেছেন, এর দ্বারা আরবের সকল মুশরিক সম্প্রদায় ও আহলে কিতাবগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কেউ বলেছেন, এর দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের অনুসারীগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

যাঁরা বলেছেন যে, এর দ্বারা আরবের সকল মূর্তিপূজক ও আহলে কিতাব কাফিরগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এ আয়াতাংশ কাফির ও মুনাফিক উভয় গোত্রের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী "সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না, অথচ তোমরা জান" দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন যে, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে অপর কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না, যারা তোমাদের কোনরূপ উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। অথচ তোমরা জান যে, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন প্রতিপালক নাই যে, সে তোমাদের জীবিকা দান করবে। আর তোমরা এ কথাও জেনেছ যে, রসূল (স) আল্লাহ তা'আলার যে তাওহীদের প্রতি তোমাদেরকে আহবান করেছেন, তাই সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وانتم تعلمون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তোমরা জান যে, আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারপরও তোমরা তাঁর সমকক্ষ ও অংশী সাব্যস্ত কর?

যাঁরা বলেছেন যে, এ দ্বারা আহলে কিতাবগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা :

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, অথচ তোমরা জান যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের বর্ণনায় রয়েছে—তিনিই একমাত্র মাবুদ। মুজাহিদ (রহ) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অপর বর্ণনায় মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وأنتم تعلمون-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথচ তোমরা জান যে, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাওরাত-ইঞ্জীলেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আর আমি মনে করি, যে কারণে মুজাহিদ (রহ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং একে তাওরাত ও ইঞ্জীলপন্থীদের প্রতি সম্বোধন, অন্যদের প্রতি নয়, এ কথার প্রতি সম্বন্ধ করণে উদ্বুদ্ধ করেছে, তা তাঁর আরবদের সম্বন্ধে এ ধারণা যে, তারা জানতো না যে আল্লাহ পাক তাদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। যেহেতু তারা তাদের প্রতিপালকের একত্ববাদ অস্বীকার করতো এবং তারা তাঁর ইবাদতে অন্যকে শরীক করতো। আর এটি একটি কথা বটে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআনে আরবদের প্রসঙ্গে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করতো, যদিও একথা সত্য যে, তারা তাঁর ইবাদতে শরীক করতো। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله

"আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, কে তাদের সৃষ্টি করেছেন—তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা যুখরুফ, আয়াত নং ৮৭)।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন,

قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ○

"আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবিকা দান করেন? কিম্বা কে শ্রবণেন্দ্রিয় ও দৃষ্টিশক্তির অধিকর্তা? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর কেইবা জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন আর কেইবা কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করেন? তবে তারা অচিরেই বলবে, আল্লাহ তা'আলাই এগুলো করেন। সুতরাং আপনি বলুন, তবে কি তোমরা ভয় করবেনা?" —(সূরা ইউনুস ঃ ৩১)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী وأنتم تعلمون-এর ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে যা উত্তম, তা' হচ্ছে সেই ব্যাখ্য যা ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (রা) প্রদান করেছেন যে, এর দ্বারা জগতের বুকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও এ বিশ্বাস যে, তার সৃষ্টিকর্মে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার যাকে তাঁর সঙ্গে তার ইবাদতে শরীক করা যায় এতদ্বিষয়ে আদিষ্ট সকল ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে,সে যে কোন মানুষই হোক না কেন, আরব হোক কিম্বা অনারব, শিক্ষিত হোক কিম্বা অশিক্ষিত. সবাইকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু আরবদের নিকট আল্লাহর একত্ববাদ এবং তিনি যে সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও তাদের স্রষ্টা, জীবিকা দাতা এ সম্পর্কিত

ইলম বিদ্যমান ছিল। যদ্রূপ তা কিতাব দুটি তথা তাওরাত ও ইঞ্জীলের অনুসারীগণের নিকট বিদ্যমান ছিল। আর আয়াতের মধ্যে এমন কোন নির্দেশনা নাই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী وانتم تعلمون দ্বারা দু'পক্ষের এক পক্ষকে উদ্দেশ্য করেছেন, বরং এর মাধ্যমে সম্বোধনের ক্ষেত্র সাধারণভাবে সকল মানুষ। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী يا ايها الناس اعبدوا ربكم -এর মাধ্যমে সকল মানুষকে সম্বোধন করেছেন। আর এ সম্বোধন আহলে কিতাবের কাফিরগণের প্রতি করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের নিবাস মদীনার আশেপাশে অবস্থান করতো, আর তাদের মধ্য হতে মুনাফিকদের প্রতি এবং যারা তাদের সমসাময়িকগণের মধ্য হতে অংশীবাদী ছিল, অতঃপর রসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে মুনাফেকীর দিকে ধাবিত হয়েছে।

(٢٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

(২৩) আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন করো এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাক—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সমর্থনে তাঁর সম্প্রদায় আরবদের মধ্য হতে মুশরিক ও মুনাফিক এবং আহলে কিতাবগণের মধ্যকার কাফির ও পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ যাদের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ... ...

-এর সূচনা করেছিলেন। আর তিনি এসকল আয়াতে একান্ত তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন এবং তাদের উল্লেখযোগ্য বিশেষণ সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, হে আরব মুশরিক ও আহলে কিতাব কাফিরগণ! তোমরা যদি আমার বান্দাহ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি হেদায়াতের আলো, দলীল-প্রমাণ ও পার্থক্য নির্ণয়কারী আয়াত প্রসঙ্গে সন্দিহান হও, আর তা হলো ريب সন্দেহ-সংশয় এ প্রশ্নে যে, তা আমারই পক্ষ হতে এবং আমি যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছি—যে সন্দেহের কারণে তোমরা তৎপ্রতি ঈমান আনয়ন কর নাই এবং তিনি যা বলেন তাতে তাঁকে সত্যারোপ কর নাই। তবে তোমরা এমন দলীল উপস্থাপন কর, যদ্দারা তোমরা তাঁর দলীলকে খণ্ডন করবে। কেননা তোমরা জান যে, প্রত্যেক নবুওয়াতের অধিকারীর নবুওয়াত সংক্রান্ত দাবীর সত্যতার উপর দলীল হলো, তিনি এমন দলীল পেশ করবেন, যার অনুরূপ দলীল আনয়নে সমগ্র সৃষ্টি জগত অক্ষম হবে। আর মুহাম্মাদ (স)-এর সত্যতা ও তাঁর নবুওয়াতের স্বপক্ষে এবং তিনি যা কিছু আনয়ন করেছেন তা আমারই পক্ষ হতে হওয়ার দলীলসমূহের মধ্য হতে একটি হলো তোমরা সবাই এবং তোমরা

তোমাদের যে সকল সাহায্যকারী সহযোগীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, তারা সকলে তদনুরূপ একটি সূরা আনয়নে অপারগ ও অক্ষম হওয়া। আর যখন তোমরা তা করতে অক্ষম হয়েছো, অথচ তোমরা পাণ্ডিত্য, ভাষার অলংকার ও মর্মোপলব্ধি ক্ষেত্রে পূর্ণত্বের অধিকারী শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং তোমরা ইতিমধ্যে তা জানতে পেরেছো যে, তোমরা যা হতে অক্ষম হয়েছো, তোমাদের অপরগণ তার উপর অধিকতর অক্ষম। যদ্রূপ পূর্ববর্তী আমার নবী-রসূলগণের বেলায়ও তাঁরও সত্যতা ও তাঁর নবুওয়াতের স্বপক্ষে প্রামাণ্য দলীল যে সকল নিদর্শনাবলী ছিল, যার অনুরূপ দলীল আনয়নে আমার সমগ্র সৃষ্টি অপারগ-অক্ষম ছিল। সুতরাং তোমাদের নিকট ইহা স্বপ্রমাণিত হয়ে গেল যে, মুহাম্মাদ (স) তাকে বানোয়াট ও মিথ্যারূপে রচনা করেননি এবং তিনি তা আবিস্কার করেন নি। কারণ তা যদি তাঁর পক্ষ হতে আবিস্কার কিংবা মিথ্যা রচনা হতো, তবে তারা এবং আমার সমগ্র সৃষ্টি তদনুরূপ আনয়নে অপারগ হতো না। যেহেতু মুহাম্মাদ (স) তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ ভিন্ন আর কিছু নন। আর দৈহিক গঠন, সৃষ্টিগত নৈপুণ্য ও বাকপটুতা ইত্যাদি বিচারেও তিনি তোমাদের অনুরূপ অবস্থার উর্ধে নন। যার এরূপ ধারণা করা যেতে পারতো যে, তোমরা যে বিষয়ে অপারগ হয়েছো তিনি তার উপর ক্ষমতাবান ছিলেন কিংবা এরূপ কল্পনা করা যেতো যে, তোমরা যে বিষয়ে অক্ষম হয়েছো, যার উপর তিনি সফলকাম হয়েছেন।

অতঃপর ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ তা'আলার বাণী فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একাধিক বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন কাতাদা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ এ কুরআনের অনুরূপে বাস্তব ও সত্য হিসাবে, যাতে অমূলক ও মিথ্যা কিছু নাই। কাতাদা (রহ) হতে আরেকটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর।

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, কুরআনের অনুরূপে।

মুজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) একইরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

মুজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, مِّثْلِهِ (উহার অনুরূপ)-এর অর্থ হলো مثل القران (কুরআনের ন্যায়)। সুতরাং মুজাহিদ ও কাতাদা (রহ) এর বক্তব্য যা আমরা তাদের উভয় হতে উদ্ধৃত করেছি, তার মর্ম হলো, কাফিরগণের মধ্য হতে যারা আল্লাহ তা'আলার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক বিরোধ করেছে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আরবগণ! তোমরা তোমাদের কথোপকথনের মধ্য হতে এ কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর, যেমন মুহাম্মাদ (স) তোমাদের ভাষায় ও তোমাদের কথা বলার মর্মানুসারে তা আনয়ন করেছেন।

অন্য কয়েকজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ এর অর্থ হলো তবে তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর। যেহেতু মুহাম্মাদ (স) তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ। ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন প্রথম ব্যাখ্যাটি

যা মুজাহিদ ও কাতাদা (রহ) প্রদান করেছেন, তাই বিশুদ্ধ এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা অন্য সূরার মধ্যে ইরশাদ করেছেন, ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله । "তারা কি বলে, তিনি তা নিজে রচনা করেছেন? তবে আপনি তাদের বলুন, তা হলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর।" আর তা জানা কথা যে, سورة (সূরা) তারা আনয়ন করেছে, তা হযরত মুহম্মাদ (স)-এর আনয়ন করা সূরার জন্য সমকক্ষ ও সদৃশ নয়। যার উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (স) যেমন সূরা এনেছেন তেমন একটি সূরা আনয়ন কর।

অতঃপর কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, আপনি উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী فأتوا بسورة من مثله দ্বারা এ কুরআনের অনুরূপ হতে অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন। তবে কি কুরআনের জন্য কোন সাদৃশ্য আছে? যার উপর ভিত্তি করে বলা যাবে যে, তদনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর। তদুত্তরে বলা হবে যে, এ অর্থে আল্লাহ পাক একথা বলেননি, বরং এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, বর্ণনা শৈলীর দিক থেকে এরূপ একটি সূরা আনয়ন কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। আর আরবী হওয়ার অর্থে আরবদের বক্তব্যের সদৃশ থাকার প্রশ্নে কোন সন্দেহ নেই। হাঁ, যে অর্থ বৈশিষ্টের কারণে কুরআন সমগ্র সৃষ্টি জগতের বক্তব্য হতে স্বাতন্ত্র অর্জন করেছে, তবে সে দিক বিচারে তার কোন সদৃশ-সমতুল্য নাই। আর কোন দৃষ্টান্ত ও সমকক্ষ নাই। আল্লাহ তা'আলা তো তাদের বিরুদ্ধে তাঁর নবী (স)-এর স্বপক্ষে কুরআনের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন, যখন বর্ণনা ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের ন্যায় সূরা আনয়নে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। যেহেতু কুরআন তাদের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা ছিল এবং তা এমন কালাম ছিল, যা তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তা আমার পক্ষ হতে হওয়ার প্রশ্নে তোমরা যদি সন্দিহান হও তবে তোমরা তোমাদের বক্তব্যে তদনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর। তোমরা আরব হওয়ার কারণে সে বক্তব্য আরবী হিসাবে উহার সদৃশ। আর তা এমন বর্ণনা যা তোমাদের বর্ণনার অনুরূপ, এমন বক্তব্য যা তোমাদের বক্তব্যের সদৃশ। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন কোন ভিন্ন ভাষায় সূরা আনয়নে বাধ্য করেননি, যা সে ভাষায় অনুরূপ যার উপর কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে তারা এরূপ বলার সুযোগ লাভ করতো যে, আপনি আমাদেরকে এমন বিষয়ে বাধ্য করেছেন, আমরা যদি তা শিক্ষা করতাম তবে আমরা তা আনয়ন করতে পারতাম। আর আমরা তা আনয়নে এজন্য সক্ষম নই যে, আমরা সে ভাষাভাষী নই যা আনয়নে আপনি আমাদের বাধ্য করেছেন। সুতরাং ইহার মাধ্যমে আমাদের উপর আপনার কোন দলীল সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা আমরা যদিও আমাদের ভাষার বিপরীত অন্য ভাষায় তদনুরূপ বক্তব্য আনয়নে অপারগ হয়েছি, যেহেতু আমরা সে ভাষাভাষী নই—তবে লোকদের মধ্যে এমন অনেক রয়েছে, যারা আমাদের ভাষাভাষী নয়, তারা তদনুরূপ ভাষায় সূরা আনয়নে সক্ষম যা আনয়নে আপনি আমাদের বাধ্য করেছেন। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেছেন, তৎসাথে একটি সূরা আনয়ন কর। কেননা ভাষাসমূহের মধ্যে তৎসদৃশ ভাষা হলো তোমাদের ভাষা। যদি হযরত মুহাম্মাদ (স) ইহাকে সৃষ্টি করে থাকেন এবং নিজের তরফ থেকে রচনা করে থাকেন, তবে তোমরা যখন একত্রিত হয়ে পবিত্র কুরআনের ন্যায় তোমাদের ভাষায় ও তোমাদের বর্ণনায় সূরা আনয়নে

পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা করবে, সম্মিলিত প্রয়াস চালাবে, তখন তা সৃষ্টি করা, প্রণয়ন করা ও রচনা করায় তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (স) অপেক্ষা অধিক সক্ষম হবে। আর যদি তোমরা তাঁর অপেক্ষা অধিক সক্ষম না হও তথাপি তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (স) যা করতে সক্ষম হয়েছেন, তা করায় একান্ত অক্ষম-অপারগ হয়ে পড়বেন। অথচ তোমরা একদল লোক, আর তিনি একা আর তা তখনই সত্যরূপে প্রমাণিত হবে যখন তোমরা তোমাদের দাবী ও ধারণার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হবে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) তা নিজের তরফ থেকে রচনা করেছেন এবং নিজ হতে সৃষ্টি করেছেন, আর তা আমি ব্যতীত অপর কারো পক্ষ হতে প্রেরিত।

মুফাসসিরগণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين -এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত পেশ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি وادعوا شهداءكم من دون الله-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত আছ, তাতে তোমাদের সাহায্যকারীগণকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত, তিনি وادعوا شهداءكم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে সকল লোক যারা সাক্ষ্য দান করবে।

আবূ নাজীহ মুজাহিদ (রহ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুজাহিদ (রহ) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমন একদল লোক যারা তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে।

ইবনে জুরাইজ (রহ) মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি وادعوا شهداءكم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে সকল লোক, যারা সাক্ষ্য দান করবে।

ইবনে জুরাইজ (রহ) বলেন, তোমরা যখন তা আনয়ন করবে, তখন তা যে কুরআনের অনুরূপ সে বিষয়ে তোমাদের সাক্ষ্যদানকারীগণ। তা হয়ত কাফিরদের মধ্য থেকে যারা হযরত মুহাম্মাদ (স) আনীত কিতাব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র এ বাণী فادعوا "তোমরা আহবান কর" এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর, সহযোগিতা কামনা কর। যেমন, কোন কবি বলেছেন—

فلما التقت فرساننا ورجالهم — دعوا يالكعب واعتزينا لعامر

"যখন আমাদের অশ্বারোহীগণ ও তাদের পদাতিক যোদ্ধাগণ মুখোমুখী হয় তখন তারা কা'বের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে আর আমরা আ'মেরের জন্য ধৈর্য ধারণ করি।"

এখানে دعوا يالكعب-এর দ্বারা তারা কা'বের নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করে এবং তাদের নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ করে, উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর شهداء শব্দটি شهيد-এর বহুবচন, যেমন شركاء শব্দটি شريك-এর বহুবচন, আর خطباء শব্দটি خطيب-এর বহুবচন আর شهيد বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে অন্যের জন্য এমন সাক্ষ্য দান করে, যদ্দ্বারা তার দাবী প্রমাণিত হয়। আর কখনো কোন বস্তু প্রত্যক্ষকারীকেও شهيد বলা হয়। যেমন বলা হয় فلان جليس فلان "অমুকে অমুকের সঙ্গী" আর এর দ্বারা এক সঙ্গে উঠাবসাকারী উদ্দেশ্য। আর যেমন বলা হয় فلان نديمه 'অমুক তার সাথী" আর এর অর্থ একই সঙ্গে উপবেশনকারী তদ্রূপ বলা হয়, شهيده তার,

প্রত্যক্ষকারী, আর এর অর্থ তাকে প্রত্যক্ষকারী। সুতরাং যদি شهداء শব্দটি شهيد-এর বহুবচন হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, যা আমরা যে দু'টি অর্থের উল্লেখ করেছি, সে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে উভয় অর্থেই আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে তাই উত্তম ব্যাখ্যা যা ইবনে আব্বাস (রা) ব্যক্ত করেছেন। আর তা এই যে, আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা তদনুরূপ একটি সূরা আনয়নে তোমাদের সে সকল সাহায্যকারী ও সহযোগীগণের নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা কর যারা তোমাদের আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (স)-এর প্রতি অসত্যারোপনে তোমাদের সাহায্য সহযোগিতা করে, তোমাদেরকে কুফরী ও মুনাফেকীতে সাহায্য করে, পৃষ্ঠপোষকতা করে। যদি তোমরা তোমাদের নাফরমানীতে সত্যাশ্রয়ী হও, যদি আমরা তর্কের খাতিরে মেনে নিই হযরত মুহাম্মাদ (স) তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন, তা স্ব-রচিত ও স্বকল্পিত। যাতে তোমরা নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে পরীক্ষা করতে পার যে, তারা তদনুরূপ একটি সূরা আনয়নের ক্ষমতা রাখে কিনা? যার প্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর নিজ হতে সম্পূর্ণ কুরআন আনয়নে ক্ষমতা রাখে প্রমাণিত হয়। কিন্তু মুজাহিদ (রহ) ও ইবনে জুরাইজ (রহ) এর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন, তার কোন যৌক্তিকতা নেই। কেননা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারীগণ, (২) নির্ভেজাল কুফরের অনুসারীগণ ও (৩) এতদুভয়ের মধ্যে কপট শ্রেণীর মুনাফিকগণ।

আর ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (স)-এর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ও বিশ্বাসী। যদি কাফিরেরা কোনো একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করে এবং তা কুরআনের অনুরূপ বলে দাবী করে, তবে তাতে কোনো মু'মিনের সাক্ষ্য পাওয়া অসম্ভব। যদি মুনাফিক ও কাফিরগণকে অসত্যকে প্রমাণ করা এবং সত্যকে বাতিল করার প্রতি আহবান করা হয়, তবে এতে সন্দেহ নাই যে, তারা তাদের কুফরী ও পথভ্রষ্টতার বলে তজ্জন্য তৎপর হয়ে উঠবে। অতএব উভয় দলের মধ্য হতে যে দলই হোক না কেন, সে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী হবে, যদি তারা দাবী করে যে, তারা কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন করেছে। বরং প্রকৃত অর্থে তা তদ্রূপ যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا - (বনী ইসরাঈল ১৭/৮৮)

"আপনি বলুন, যদি এই কুরআনের অনুরূপ সূরা আনয়নকল্পে মানুষ ও জিন সকলে সমবেত হয়, তারা তদনুরূপ সূরা আনয়ন করতে পারবে না—যদিও তারা পরস্পরের সাহায্যকারীও হয়।"

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, মানুষ ও জিন সকলে সমবেত হয়েও কুরআনের অনুরূপ সূরা আনায়ন করতে পারবে না। যদিও তারা পরস্পরে তা আনয়নে সাহায্য সহযোগিতা করে। আর সূরা বাকারায় তাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা মোকাবেলা করার আহবান জানিয়ে বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

"তোমরা যদি আমার বান্দাহর প্রতি আমি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে সন্দিহান হও, তবে তোমরা তদনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর, আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অপরাপর সাহায্যকারীগণকে ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

তার অর্থ হলো আমার পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন, তদ্বিষয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সত্যবাদিতায় তোমরা যদি সন্দিহান হও, তবে তোমরা তদনরূপ একটি সূরা আনয়ন কর। আর এ ব্যাপারে তোমরা পরস্পরে সাহায্য কামনা কর–যদি তোমরা তোমাদের ধারণায় সত্যবাদী হও। এমন কি তোমরা যখন তা করায় অপারগ হবে, তখন তোমরা জানতে পারবে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) বা কোন মানুষ তা আনয়নে সক্ষম নয়। আর তোমাদের নিকট সঠিকরূপে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তা আমারই অবতীর্ণ এবং আমার বান্দাহ্র প্রতি আমার প্রত্যাদেশ।

(২৪) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ط أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○

(২৪) যদি তোমরা তা না কর এবং কখনই করতে পারবে না তবে সেই আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا (যদি তোমরা তা করতে না পার) এর অথ হলো, যদি তোমরা তদনুরূপ সূরা আনেয়ন করতে না পার, অথচ তোমরা ও তোমাদের অংশীদার সহযোগীগণ ও তোমাদের সাহায্যকারী-গণ এ বিষয়ে পরস্পরে সাহায্য করেছো তবে তোমাদের এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাতে তোমাদের এবং আমার সমুদয় সৃষ্টির অক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, তা আমার পক্ষ হতে অবতীর্ণ। তারপরও কি তোমরা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ কার্যে অবিচল থাকবে? আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَنْ تَفْعَلُوا (এবং তোমরা তা কখনো করতে পারবে না) অর্থাৎ তোমরা কখনও তদনুরূপ একটি সূরা আনয়ন করতে পারবে না। যেমন, কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তোমরা তা করায় সক্ষম হবে না এবং তোমরা এর ক্ষমতাও রাখ না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি তোমরা তা করতে না পার, আর তা তোমরা আদৌ করতে পারবে না, অতএব তোমাদের জন্য সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ -এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী فَاتَّقُوا النَّارَ (সুতরাং তোমরা আগুন হতে বেঁচে থাক)-এর অর্থ হলো, আমার রসূল (স) তোমাদের নিকট আমার প্রত্যাদেশ ও অবতীর্ণ বাণীর মধ্য হতে যা কিছু নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছেন, তৎসম্পর্কে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া হতে তোমরা বেঁচে থাক। অথচ তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তা আমার কিতাব ও আমার পক্ষ হতেই অবতীর্ণ। আর তোমাদের উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তা আমারই বাণী ও আমার ওহী। আর তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তোমরা এবং আমার জন্য সকল সৃষ্টির অনুরূপ সূরা আনয়নে অপারগ হওয়ার মাধ্যমে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে আগুনের বিবরণ দান করেছেন, যাতে নিক্ষিপ্ত হওয়া হতে তিনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন—তাদের সংবাদ দান করেছেন যে, আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ। "যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর।" আল্লাহ তা'আলার বাণী وَقُودُهَا "তার ইন্ধন" দ্বারা তার লাকড়ী উদ্দেশ্য। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য করা হয় যে, তা প্রজ্জলিত হয়েছে, শিখা বিস্তার করেছে। অতঃপর যদি কোন প্রশ্নকারী এ প্রশ্ন করে যে, কিভাবে পাথরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল এবং মানুষের সহিত যুক্ত করা হল ? এমনকি উক্ত পাথরকে জাহান্নামের আগুনের জন্য ইন্ধনরূপে গণ্য করা হয়েছে ? তদুত্তরে বলা হবে যে, তা হচ্ছে দিয়াশলাইয়ের পাথর। আর তা আমাদের জানামতে যখন তাকে উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা উত্তাপের ব্যাপকতার জঘন্যতম পাথর। যেমন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা দিয়াশলাই পাথর। আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন তাকে দুনিয়ার আসমানে সৃষ্টি করেছেন। তাকে তিনি কাফিরদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো দিয়াশলাই পাথর, আল্লাহ তা'আলা তাকে যেমন চেয়েছেন তেমনি তৈরী করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত রসূল (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে তাঁরা فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, পাথর হলো দোযখের মধ্যে দিয়াশলাইয়ের কালো পাথর। কাফিরদের দোযখের আগুন দ্বারা শাস্তি দান করা হবে।

ইবনে জুরাইজ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তা হলো দোযখের মধ্যে দিয়াশলাইয়ের কালো পাথর। আর তিনি বলেন, আমর ইবনে দীনার আমাকে বলেছেন, আর সে পাথরটি এ পাথর অপেক্ষা অধিকতর শক্ত ও বৃহত্তর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তা দিয়াশলাই জাতীয় এক প্রকার পাথর, আল্লাহ তা'আলা ঐ পাথরটিকে তাঁর মোতাবেক সৃষ্টি করে রেখেছেন।

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ -এর ব্যাখ্যা

"কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে" আমরা আমাদের এ কিতাবে ইতিপূর্বে দলীল-প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি যে, আরবদের ভাষায় كافر (কাফির) হচ্ছে, কোন বস্তুকে আবরণ দ্বারা গোপনকারী। আল্লাহ তা'আলা কাফিরগণকে এজন্য কাফির নামে আখ্যায়িত করেছেন, যেহেতু সে তার নিকট বিদ্যমান আল্লাহ তা'আলার দানকে অস্বীকার করে এবং তার সম্মুখে বিরাজমান আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতরাজিকে গোপন করে। সুতরাং এক্ষণে اعدت للكافرين-এর অর্থ হবে, দোযখ তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা একথা অস্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের প্রতিপালক যিনি তাদের ও তাদের পূর্ববর্তীগণের সৃষ্টি ক্ষেত্রে একক। যিনি তাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যারূপে তৈরী করেছেন, আর আসমানকে ছাদরূপে বানিয়েছেন, আসমান হতে পানি অবতরণ করেন, তদ্দ্বারা ফলমূল ইত্যাদি তাদের জীবিকা হিসেবে উৎপাদন করেছেন। যারা তাঁর ইবাদতে দেব-দেবী ও উপাস্যগণকে অংশ স্থাপন করে থাকে। অথচ তিনিই তাদের সৃষ্টিতে একক, অদ্বিতীয় ও তাদেরকে জীবিকা দানে অনন্য। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি اعدت للكافرين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তোমাদের ন্যায় যারা কুফরীতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদের জন্য দোযখ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

(২৫) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

(২৫) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে তাদের সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত—যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত এতো তাই। তাদের অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী بشر (সুসংবাদ দান করুন)-এর অর্থ হলো, সংবাদ দান করুন। আর بشارت মূলত: এমন বিষয়ের সহিত সংবাদ দান করা, যা সংবাদ প্রদত্ত ব্যক্তিকে আনন্দিত করে। যখন উক্ত সংবাদদাতা অন্যান্য সংবাদদাতাদের পূর্বেই সে সংবাদটি পৌঁছিয়ে দেয়।

আর এ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর প্রতি নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেওয়া শুভ সংবাদ ঐ সব জিনিসের যা নির্ধারিত রেখেছেন আল্লাহ তাঁদের জন্য যাঁরা ঈমান এনেছেন আল্লাহ পাকের প্রতি, মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি এবং তিনি যা, নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে। আর নেক আমলের দ্বারা তাঁদের ঈমান ও স্বীকারোক্তিকে সত্যরূপে প্রমাণ করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা রসূলে পাক (স)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন: হে মুহাম্মাদ (স)। আপনি সুসংবাদ দিন ঐ ব্যক্তিদেরকে যাঁরা আপনাকে আমার রসূল হিসাবে এবং আপনি আমার পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও নূর (কুরআন) নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। আর তাঁদেরই মৌখিক স্বীকারোক্তিকে সে সকল পুন্যকর্ম-সম্পাদনের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন যা আমি তাঁদের উপর আমার কিতাবের মাধ্যমে আপনার ভাষায় ফরয ও ওয়াজিব করে দিয়েছে। তাঁদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তবে তা ঐ সব লোকের জন্য নয় যারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং আপনি আমার পক্ষ হতে যে হেদায়াত নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করেছে আর

আপনার বিরোধিতা করেছে। আর তা ঐ সব লোকের জন্যও নয় যারা আপনাকে এবং আপনি আমার নিকট থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা মৌখিকভাবে স্বীকার করেছে, অথচ বিশ্বাসগত ভাবে তা অস্বীকার করেছে এবং বাহ্যত তা আমলে পরিণত করেছে। কেননা ঐসব লোকের জন্য রয়েছে আমার নিকট নির্ধারিত এমন জাহান্নাম যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।

جنات শব্দটি جنة-এর বহুবচন। আর জান্নাত হলো বাগান। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত উল্লেখ করতঃ তন্মধ্যস্থিত বৃক্ষ, ফল ও উদ্ভিদরাজি বুঝিয়েছেন, তার যমীনকে বুঝাননি। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, تجرى من تحتها الانهار "যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।" কেননা তা জানা কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তার নহরের পানি সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন যা বেহেশতের বৃক্ষরাজি, উদ্ভিদ এবং ফলসমূহের নীচ দিয়ে প্রবহমান। বেহেশতের ভূমির নীচ দিয়ে প্রবাহিত বুঝানো হয়নি। কারণ পানি যখন মাটির নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তার ও জান্নাতের মাঝের আচ্ছাদন ব্যতীত এর উপরিভাগের কারও কোনো হিস্সা থাকে না। জান্নাতের নহরসমূহের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, এগুলো খোদাই ছাড়াই প্রবাহিত। যেমন,

মাসরূক (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, বেহেশতের খেজুর বৃক্ষ তার মূল হতে শাখা পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত, আর তার খেজুরগুলো মটকা সমূহের ন্যায়। যখনই তা থেকে একটি খেজুর ছেঁড়া হবে, তখনই তার স্থলে আরেকটি খেজুর সৃষ্টি হবে। আর তার পানি খনন করা ছাড়াই প্রবাহিত হবে।

মুজাহিদ (রহ) আবু ওবায়দা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

আমর ইবনে মুররাহ (রহ) আবু উবায়দা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। আর তিনি তা মাসরূক (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাপারটি যখন এরূপ যে, বেহেশতের নহরসমূহ খনন করা ব্যতীতই প্রবাহিত হয়, সুতরাং এতে সন্দেহ নাই যে, جنات (উদ্যানসমূহ) দ্বারা উদ্যানের বৃক্ষরাজি, উদ্ভিদ ও ফলসমূহ বুঝানো হয়েছে। তার ভূমিকে বুঝানো হয়নি। যেহেতু তার নহরসমূহ তার যমীনের উপর দিয়ে এবং তার উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজির নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়, যেমন মাসরূক (রহ) উল্লেখ করেছেন। তার নহর সমূহ ভূমির নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়, একথা অপেক্ষা উপরোক্ত অভিমত জান্নাতের অবস্থার সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁর বান্দাগণকে ঈমান আনয়নের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর ইবাদত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সে সুসংবাদের মাধ্যমে যদ্বিষয়ে তিনি সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাঁর অনুগত ও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেমন এর পূর্ববর্তী আয়াতে যারা কুফরী করেছে আল্লাহর সাথে অন্যান্য অবাধ্য ও শরিক বানীয়েছে তাদেরকে তিনি শিরকের শাস্তি ও অবাধ্যতা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরিণাম উল্লেখ করে সতর্ক করেছেন।

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل واتوا به متشابها

متشابها -এর ব্যাখ্যা

আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا-এর অর্থ হচ্ছে, তারা যখন জান্নাত হতে জীবিকা প্রদত্ত হয়, আলোচ্য আয়াতে هَا সর্বনামটি جَنَّات-কে বুঝায় আর এর অর্থ হচ্ছে, জান্নাতের বৃক্ষরাজি। যেন আল্লাহ তা'আলা এরূপ ইরশাদ করেছেন: যখন তারা জীবিকা প্রদত্ত হয়, বাগানসমূহের বৃক্ষ হতে কোন ফল যা আল্লাহ তা'আলা তৈরী করেছেন সেই সব লোকের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে—তখন তারা বলে এতো সেই ফল যা আমাদিগকে ইতিপূর্বে জীবিকা প্রদত্ত হয়েছে।

অতঃপর ব্যাখ্যাকারগণ هَـٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ (এতো তাই যা আমাদেরকে ইতিপূর্বে জীবিকা প্রদত্ত হয়েছে) এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এ রিজিক তো তাই যা আমরা ইতিপূর্বে দুনিয়াতে ভোগ করেছি। যাঁরা এ ব্যাখ্যা দান করেছেন, তাঁদের আলোচনা:

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা قَالُوا هَـٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, বেহেশতে যখন বেহেশতবাসীদের সম্মুখে কোন ফল পেশ করা হবে এবং যখন তারা তা দেখবে তখন বলবে, এ তো সে ফল যা আমরা পৃথিবীতে উপভোগ করেছি।

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি قَالُوا هَـٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে যা লাভ করেছি।

মুজাহিদ (রহ)-এর মতে هَـٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ-এর ব্যাখ্যা হলো: কি আশ্চর্য এ ফলের সাথে দুনিয়ার ফলের কতই না মিল রয়েছে।

ইবনে জুরাইজ মুজাহিদ (রহ) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এতো সেই ফল যা আমরা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে জীবিকা প্রদত্ত হয়েছি। তিনি বলেন আর তাদেরকে সাদৃশ্যপূর্ণ ফল প্রদত্ত হবে, যা তারা চিনতে পারবে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আর অন্যরা বলেন, বরং এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এতো সেই ফল যা ইতিপূর্বে বেহেশতের ফল হিসাবে আমরা পেয়েছি। কেননা বর্ণ ও স্বাদের দিক দিয়ে এগুলি একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এ মত পোষণকারীদের কারণ হচ্ছে এই যে, বেহেশতী ফলের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন একটি ফল ছেঁড়া হবে তখন সাথে সাথে তদস্থলে অনুরূপ আরেকটি ফল সৃষ্টি হবে।

আবু উবায়দা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, বেহেশতী খেজুর বৃক্ষ উহার মূল হতে শাখা পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে সুসজ্জিত হবে, আর এর ফল আকৃতিতে মটকার ন্যায় হবে, যখন তা থেকে কোন ফল ছেঁড়া হবে, তখন তদস্থলে আরেকটি ফল সৃষ্টি হবে। তাঁরা বলেন, বেহেশতী-গণের নিকট এজন্য সাদৃশ্যপূর্ণ হবে যে, যে ফলটি সৃষ্টি হয়েছে তা ছেঁড়া ফলটির অনুরূপই, সুতরাং এর যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ উপভোগ করতে দেওয়া হবে। তাঁরা বলেন, এজন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا আর তাদেরকে অনুরূপ ফলই প্রদত্ত হবে। যেহেতু এর সবই পূর্ববর্তী ফলের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আর তাদের মধ্য হতে কেউ বলেছেন, "এতো সেই ফল যা আমরা ইতিপূর্বে জীবিকা হিসাবে পেয়েছি।' এজন্য বলবে যে, এই ফল বর্ণের দিক থেকে যদিও অনুরূপ কিন্তু স্বাদ ভিন্ন। যাঁরা এমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাসীর হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বেহেশতীগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে এক পাত্রে খাদ্য প্রদত্ত হবে. সে তা খাবে, অতঃপর আরেকটি পাত্র প্রদান করা হবে। তখন সে বলবে, এতো সেই খাদ্য যা আমাদেরকে ইতিপূর্বে প্রদান করা হয়েছে। তখন ফেরেশতা বলবেন, খেয়ে দেখুন। এগুলোর বর্ণ একই কিন্তু স্বাদ ভিন্ন। আর এ বক্তব্য তাঁদের যাঁরা আলোচ্য আয়াতের পূর্বোল্লিখিত ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য আয়াতের বাহ্যিক তিলাওয়াত এর বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করে। আর আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে যা বুঝায় এবং যার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় তার মর্মার্থ হলো ঃ এই রিযিক ইতিপূর্বেও আমরা দুনিয়াতে উপভোগ করেছি। আর তা এজন্যে সাব্যস্ত বা স্বপ্রমাণিত করে, তা এই যে, এ আয়াতে যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا আল্লাহ পাক এই আয়াত দ্বারা এ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, যখন জান্নাতবাসী-গণ বেহেশতের কোন ফল যখন তাদেরকে দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে ঃ এতো ইতিপূর্বেও দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে কোন বিশেষ ফলের কথা বলেন নাই। আর যখন আল্লাহ পাক এ সংবাদই দিয়েছেন যে, বেহেশতের ফলের মধ্য হতে তাদেরকে যা কিছু জীবিকা দেওয়া হবে, সে সব ফলের প্রসঙ্গেই তারা এ উক্তি করবে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নাই যে, বেহেশতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সর্বপ্রথম যে ফল প্রদান করা হবে সে সম্পর্কেই তারা এ মন্তব্য করবে যার পূর্বে তাদেরকে তথাকার কোন ফল দেওয়া হয় নাই। আর যখন এতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহাই প্রথম প্রদত্ত ফল সম্পর্কে তাদের উক্তি, যদ্রূপ তা মধ্যবর্তী ও তৎপরবর্তী ফল সম্পর্কে তাদের উক্তি। অতএব ইহা সুবিদিত যে, বেহেশতী ফলের মধ্য হতে তাদেরকে প্রদত্ত জীবিকা সম্পর্কে তারা এরূপ বলা অসম্ভব যে, এতো তাই যা আমাদেরকে ইতিপূর্বে বেহেশতী ফলের মধ্য হতে জীবিকা দেওয়া হয়েছে। আর ইহা কিরূপে বৈধ হতে পারে যে, তাদেরকে প্রথমবারের মত বেহেশতী ফলের মধ্য হতে যে জীবিকা দেওয়া হবে তৎসম্পর্কে তারা বলবে, এতো তাই যা আমরা ইতিপূর্বে জীবিকা স্বরূপ পেয়েছি। অথচ এতদ্ভিন্ন ইতিপূর্বে কোন বেহেশতী ফল তাদেরকে জীবিকা স্বরূপ দেওয়া হয় নাই। হাঁ, তা তখনই হতে পারে যখন কোন মতিভ্রম ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি এমন মিথ্যা বলার প্রতি তাদেরকে সম্পর্কিত করবে, যা হতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পবিত্র করেছেন। অথবা কোন প্রতিশোধকারী বেহেশতী ফলের মধ্য হতে প্রথম বারের মত তাদেরকে উপজীবিকা প্রদত্ত ফল সম্পর্কে তারা এ উক্তি করাকে খণ্ডন করবে। যার ফলে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا (যখনই তারা তথাকার ফলের মধ্য হতে জীবিকা প্রদত্ত হবে) দ্বারা যে কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে—তাতে এই দলীল রয়েছে যে, এতে বেহেশতবাসীদের একটি অবস্থার বিবরণ আছে। এর দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যা আমরা বর্ণনা করেছি যে, আয়াতের অর্থ হলো যারা ঈমানদার ও নেককার তাদেরকে যখনই বেহেশতে কোন বেহেশতী ফল রিযিক হিসাবে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, এ তো সে রিযিক যা ইতিপূর্বে আমাকে দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছে।

অতপর কেউ যদি আমাদেরকে এ প্রশ্ন করে এবং বলে যে, লোকেরা কিরূপে বলবে, এতো তাই যা আমরা ইতিপূর্বে উপজীবিকারূপে প্রদত্ত হয়েছি? অথচ ইতিপূর্বে তাদেরকে যে জীবিকা প্রদত্ত হয়েছিল, তা তাদের ভোগ করার মাধ্যমে বিলীন হয়ে গিয়েছে, আর বেহেশতীগণের কিরূপে এমন কথা বলা বৈধ হতে পারে, যার কোন বাস্তবতা নাই? তদুত্তরে বলা হবে যে, এ প্রসঙ্গে তুমি যে দিক চিন্তা করেছো, বিষয়টি তা নয়। বরং এর অর্থ তা ঐ শ্রেণীভুক্ত, যে শ্রেণীর ফল ও উপজীবিকা ইতিপূর্বে আমাদের দেওয়া হয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলল, অমুক তোমার জন্য রান্না করা, ভুনা করা ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্যের মধ্য হতে এত খাদ্য প্রস্তুত করেছে। তখন সম্বোধিত ব্যক্তিটি বলল, এতো আমার ঘরের খাদ্য। এর দ্বারা কতক এ উদ্দেশ্য করে থাকে যে, তার সাথী যে প্রকার খাদ্য তার জন্য প্রস্তুত করার কথা উল্লেখ করেছে, তাই তার খাদ্য। এ অর্থ নয় যে, তার জন্য হুবহু যে খাদ্য প্রস্তুত করার সংবাদ তাকে দেওয়া হয়েছে, ঠিক সে খাদ্যই তার খাদ্য। পক্ষান্তরে কোন শ্রোতা যে একথা শ্রবণ করেছে তার জন্য, ইহা জায়েয নহে যে, সে এ ধারণা করবে, এর দ্বারা বক্তা তাই উদ্দেশ্য ও সংকল্প করেছে। কারণ তা বক্তার বক্তব্যের মর্মার্থের বিপরীত। আর প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যকে সেই অর্থেই গ্রহণ করা হয় যা সর্বসাধারণের নিকট সহজবোধ্য। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী "তারা বলবে এ তো তাই যা আমরা ইতিপূর্বে উপজীবিকারূপে পেয়েছি, যখন ইতিপূর্বে প্রদত্ত তাদের জীবিকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এখন একথা সর্বজন বিদিত যে, তারা এর দ্বারা এ অর্থ উদ্দেশ্য করেছে যে, এই রিযিক সেই শ্রেণীভুক্ত আমাদেরকে ইতিপূর্বে যা দেওয়া হয়েছে। একই প্রকার নামে ও বর্ণে যা ইতিপূর্বে আমাদের এ কিতাবে উল্লেখ করেছি।

আর কোন কোন আরবী ভাষাবিদ ধারণা করেছেন যে আল্লাহ তা'আলার বাণী وأتوا به متشابها (এবং তারা তাতে সদৃশ বস্তু প্রদত্ত হবে) এর অর্থ হলো তা বৈশিষ্ট্যের বিচারে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। অর্থাৎ তন্মধ্য হতে প্রত্যেকটিরই গুণাগুণ রয়েছে। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ উক্তিটি এমন উক্তি নয় যার অশুদ্ধতা প্রমাণে আত্মনিয়োগ করাকে আমরা বৈধ মনে করতে পারি। যেহেতু তা সমস্ত তাফসীর বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের উক্তি ও মতামত বিরোধী। আর উলামায়ে কেরামের মতামত বিরোধী হওয়াই তার ভুল প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

وأتوا به متشابها-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী وأتوا به متشابها মধ্যস্থিত সর্বনামটি رزق (জীবিকা)-এর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। সুতরাং তার ব্যাখ্যা হবে, وأتوا بالذى رزقوا من ثمارها متشابها বেহেশতের ফলসমূহের মধ্যে যা তাদেরকে উপজীবিকা রূপে দান করা হয়েছে, তা পৃথিবীতে প্রদত্ত ফলের অনুরূপ। আর তাফসীরকারগণ মুতাশাবিহা এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, তার সাদৃশ্য এই যে, তার সমুদয়ই উত্তম, তাতে কোন নিকৃষ্ট কিছু নেই। যাঁরা এ মত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা।

হযরত হাসান (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী مُتَشَابِهًا (সদৃশ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তার সবই উত্তম, তাতে কোন কিছুই নিকৃষ্ট নয়।

হযরত হাসান (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে তিনি সূরা বাকারার কতিপয় আয়াত পাঠ করেন এবং وَاُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন তখন তিনি এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, পার্থিব ফলসমূহের বেলায় কতেকের মধ্যে কিছু নিকৃষ্ট, আর এতে কোন কিছুই নিকৃষ্ট নেই।

হযরত হাসান (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, وَاُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর কতেক অংশের সাথে অপর কতেক অংশের সাদৃশ্য রয়েছে। তাতে কোন নিকৃষ্ট ফল নেই।

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি وَاُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ উত্তম, তাতে কোন কিছুই নিকৃষ্ট নেই। আর ইহ জগতের ফলের মধ্যে কতেক পূত-পবিত্র ও কতেক নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। আর বেহেশতের ফল সবই উত্তম, তাতে কোন কিছুই নিকৃষ্ট নেই।

ইবনে জুরাইজ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, দুনিয়ার ফল ভালোও হয় মন্দও হয়। পক্ষান্তরে বেহেশতের ফল সবই ভালো, তাদের সুগন্ধে একটি আরেকটির অনুরূপ। সেখানে নিকৃষ্ট কিছুই নেই। আর যাঁরা বলেছেন, বর্ণে সদৃশ অথচ স্বাদে বিভিন্ন তাঁদের কথা :—

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত রসূল (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন, বর্ণে এবং দর্শনে একই রকম হবে। তবে স্বাদ হবে ভিন্ন।

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَاُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, উত্তম হওয়ার ব্যাপারে একই প্রকার।

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি وَاُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, উহার রং সদৃশ স্বাদ বিভিন্ন কাঁকড় ফলের ন্যায়।

হযরত রবী ইবনে আনাস (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَاُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের একটি অপরটির ন্যায় হবে, আর স্বাদ বিভিন্ন হবে।

অন্য সূত্রে হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি مُتَشَابِهًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, বর্ণের দিক থেকে অনুরূপ আর স্বাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে, তিনি وَاُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, উত্তম হওয়ার ব্যাপারে একই রূপ।

আর যাঁরা বলেছেন, বর্ণ এবং স্বাদে একই প্রকার, তাঁদের কথা :—

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত—তিনি বলেছেন, বর্ণ ও স্বাদে একই প্রকার।

হযরত মুজাহিদ (রহ) ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা উভয়ে مُتَشَابِهًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, বর্ণ ও স্বাদে ফলগুলো হবে অভিন্ন—জান্নাত ও দুনিয়ার ফলের মধ্যে সাদৃশ্য হলো বর্ণের ব্যাপারে, যদিও উভয়ের স্বাদে পার্থক্য রয়েছে।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা।

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি وأتوا به متشابها-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা পার্থিব ফলের সদৃশ হবে, তবে বেহেশতের ফল অধিকতর পূত-পবিত্র।

হযরত ইকরামা (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি وأتوا به متشابها-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা পার্থিব ফল সদৃশ হবে। হাঁ তবে বেহেশতের ফল অধিকতর সুস্বাদু হবে।

আর তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন যে, বেহেশতের কোন কিছুই পার্থিব কোন কিছুর সদৃশ হবে না। শুধুমাত্র নামের ক্ষেত্রে সদৃশ হবে। যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা।

হযরত আশজাঈ (রহ) হতে বর্ণিত আছে, শুধুমাত্র নাম ব্যতীত বেহেশতের কোন বস্তুই দুনিয়ার কোন বস্তুর সদৃশ হবে না।

হযরত মুয়াম্মাল (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, দুনিয়ায় এমন কোন বস্তু নেই, যা বেহেশতে রয়েছে, শুধুমাত্র নামসমূহ ব্যতীত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, পৃথিবীতে বেহেশতের কোন বস্তু নাই, শুধুমাত্র নামসমূহ।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি وأتوا به متشابها-এর ব্যাখ্যায় বলেন, বেহেশতবাসীগণ তার নামের সাথে পরিচিত হবে। যেমন, তারা পৃথিবীতে আতা ফলকে আতা ফল রূপে, আর দাড়িম্বকে দাড়িম্বরূপে জানতো। বেহেশতে তারা বলবে, এতো তাই যা আমরা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে উপজীবিকা রূপে পেয়েছি। আর তাদেরকে দুনিয়ার ফলের অনুরূপ ফল দেওয়া হবে, যার সাথে তারা পরিচিত। কিন্তু তার স্বাদ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো যাঁরা বলেছেন যে, তাদেরকে বর্ণ ও দর্শনে সদৃশ ফল দেওয়া হবে, অথচ স্বাদ হবে ভিন্ন—এর অর্থ হলো বর্ণ ও দর্শনে বেহেশতের ফল দুনিয়ার ফলের ন্যায়ই হবে, স্বাদ বিভিন্ন হবে, আর তা সে কারণে যা আমরা ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলার বাণী كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل-এর ব্যাখ্যায় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছি। আর এও উল্লেখ করেছি যে, এর অর্থ হলো যখন বেহেশতী কোনো ফল রিযিক রূপে দেওয়া হবে, তখন তারা বলে, এতো তাই যা আমাদিগকে ইতিপূর্বে পৃথিবীতে রিযিক্ রূপে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা এ উক্তি এজন্য করেছে যা, তাদেরকে বেহেশতে এ ফলের মধ্য হতে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা দুনিয়ার ফলের অনুরূপ। আর এর অর্থ হলো তাদেরকে বেহেশতে যা দেওয়া হয়েছে, তা আকৃতিতে ও বর্ণে অনুরূপ। যদিও স্বাদে রয়েছে পার্থক্য। অতএব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। সুতরাং বেহেশতে যা কিছু রয়েছে, তার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই। আমরা তাদের মত অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রমাণ পেশ করেছি, যারা ধারণা করেছে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী قالوا هذا الذى رزقنا من قبل (এতো তাই যা আমাদেরকে ইতিপূর্বে রিযিকরূপে দেওয়া হয়েছে) তা বেহেশতীগণের উক্তি, তথাকার কতেক ফলকে কতেক ফলের সাথে উপমা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। সে উক্তিটির পক্ষে প্রদত্ত দলীলই সে ব্যক্তির মত অশুদ্ধ হওয়ার দলীল, যে وأتوا به متشابها-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ

করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী واتوا به متشابها-তে যে কারণের সংবাদ দিয়েছেন তার প্রেক্ষিতে লোকেরা هذا الذى رزقنا من قبل উক্তি করেছে।

আর যারা তা অস্বীকার করে এবং বেহেশতের বস্তু যে কোন দিকের বিচারেই পার্থিব কোন বস্তুর নজীর হতে পারে না এরূপ ধারণা পোষণ করে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আচ্ছা বলুন তো বেহেশতে ফল, আহার্য ও পানীয় যে সকল বস্তু রয়েছে সেগুলোর নাম সে জাতীয় পার্থিব বস্তুর নামের নজীর হওয়ার কথা বলা যাবে কি? যদি সে তা অস্বীকার করে, তবে সে আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদের স্পষ্ট বাণীর বিরোধিতা করল। কেননা আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর বান্দাগণকে তাঁর নিকট বেহেশতে যে সকল বস্তু রয়েছে, সেগুলোকে পৃথিবীতে সে জাতীয় বস্তুর নামের সাথে পরিচিত করেছেন, সে যদি বলে যে, তা সম্ভব, বরং বাস্তবে তা সেরূপই—তবে তাকে বলা হবে, তুমি বেহেশতে এ জাতীয় যে সকল বস্তু রয়েছে, তার রং পার্থিব সে জাতীয় বস্তুর রং অর্থাৎ সাদা, লাল, হরিদ্রা ও যত প্রকার রং হতে পারে তার নজীর হওয়াকে অস্বীকার কর নাই। যদিও তা পরস্পর বিরোধী হয় এবং দেখার সৌন্দর্য বিচারে একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম হয় না কেন। সুতরাং বেহেশতে এ জাতীয় বস্তু সমূহের হৃদয়-গ্রাহিতা, সৌন্দর্য ও আকর্ষণ দুনিয়ায় এ জাতীয় বস্তুর বিপরীত হবে। যেমন তা নামকরণের ব্যাপারে দৈহিক গুণাবলী ও মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সত্বেও বিবেচনা করা হয়। অতঃপর কথাটিকে তার নিকট বিপরীত দিক হতে উপস্থাপন করা হবে, তখন সে তার কোনটিতেই এমন প্রত্যুত্তর করবে না, যাতে অপরটিতে তার অনুরূপ উত্তরই অনিবার্য হয়।

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ)-কে বেহেশত হতে বহিষ্কার করেন, তখন তিনি তাঁকে বেহেশতী ফলসমূহ থেকে দান করেন এবং তাঁকে সকল বস্তু তৈরী করার পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন। অতএব তোমাদের এসকল ফল বেহেশতী ফলের অন্তর্গত। হাঁ এতটুকু পার্থক্য যে, এগুলো পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়, আর বেহেশতের ফল পরিবর্তন হয় না।

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, لهم-এর মধ্যকার هم সর্বনামটি ঈমানদার ও পুণ্য-বানগণের প্রতি প্রত্যাবর্তিত। আর فيها-এর মধ্যস্থিত ها সর্বনামটি جنات-এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত। আর এর ব্যাখ্যা হলো যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং নেক আমল করেছে, তাঁদেরকে এ সুসংবাদ দান করা যে, তাঁদের জন্য বেহেশতসমূহ রয়েছে, যাতে তাঁদের জন্য পাক বিবিগণ রয়েছেন। আর ازواج শব্দটি زوج-এর বহুবচন। আর যে কোন ব্যক্তির স্ত্রী। বলা হয়, فلانة زوج فلان অমুক মহিলা অমুকের স্ত্রী এবং فلانة زوجته অমুক মহিলা তার স্ত্রী। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী مطهرة-এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, তারা সকল প্রকার কষ্ট, অপবিত্রতা ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত, যা দুনিয়ার মহিলাদের মধ্যে হায়েয-নেফাছ, পায়খানা, পেশাব, কফ-কাশি, থুথু, বীর্য ও এতদ্সদৃশ অন্যান্য যে সকল কষ্ট, ময়লা অপবিত্রতা, দোষ-ত্রুটি ও অপছন্দনীয়তা বিদ্যমান থাকে। যেমন,

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতেন, পাক স্ত্রীগণ হলো এই যে, তারা ঋতুবতী হয় না, বায়ু বা পায়খানা পেশাব নির্গত হয় না, নাক ঝড়ে না তথা নাকের পানি বেরোয় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ازواج مطهرة-এর ব্যাখ্যার বলেন, যারা ময়লা আবর্জনা ও কষ্টদায়ক বস্তু হতে মুক্ত ও পবিত্র।

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ولهم فيها ازواج مطهرة-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা পেশাব পায়খানা করবে না এবং বীর্য নির্গত হবে না।

অপর সনদে মুজাহিদ (রহ) হতে একইরূপে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। কেবল তাতে এতটুকু অতিরিক্ত কথা উল্লেখিত আছে যে, তারা বীর্যপাত করবে না, ঋতুবতী হবে না।

মুজাহিদ (রহ) হতে (অন্য সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী ولهم فيها ازواج مطهرة-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ ঋতুস্রাব, পায়খানা পেশাব, নাক ঝাড়া, থুথু, কাশি ফেলা, ধাতু নির্গত হওয়া ও সন্তান প্রসব করা হতে পবিত্র।

ইবনে জুরাইজ (রহ) মুজাহিদ হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

মুজাহিদ (রহ) হতে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বেহেশতের স্ত্রীগণ পেশাব-পায়খানা করবে না, ঋতুবতী হবে না, সন্তান প্রসব করবে না, ধাতু বা বীর্যস্খলন করবে না, থুথু ফেলবে না।

আবু নাজীহ মুজাহিদ (রহ) হতে মুহাম্মাদ ইবনে আমর আবু হাশিম বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ولهم فيها ازواج مطهرة এর ব্যাখ্যায় বলতেন, অর্থাৎ আল্লাহর শপথ, পাপ ও কষ্টদায়ক বস্তু হতে পবিত্র।

কাতাদা (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী ولهم فيها ازواج مطهرة-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পেশাব পায়খানা, ময়লা আবর্জনা ও সকল প্রকার পাপ হতে পবিত্র করেছেন।

কাতাদা (রহ) হতে একথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ঋতু ও গর্ভধারণ এবং যাবতীয় কষ্টদায়ক বস্তু হতে তারা পবিত্র।

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ঋতু ও গর্ভধারণ হতে পবিত্র।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ولهم فيها ازواج مطهرة-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা এমন পবিত্র স্ত্রী যে ঋতুবতী হয় না। তিনি বলেন, আর দুনিয়ার স্ত্রীগণ পবিত্র নয়। তুমি কি তাদের ব্যাপারটি লক্ষ্য কর নাই যে, তারা রক্তস্রাব করে এবং তখন নামায রোযা পরিত্যাগ করে। ইবনে যায়েদ বলেন, তদ্রূপ হযরত হাওয়া (আ) সৃজিত হন, এমন কি তাঁর দ্বারা পদস্খলন হয়। অনন্তর যখন তাঁর দ্বারা পদস্খলন ঘটে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাকে পবিত্র

অবস্থায় সৃষ্টি করেছি। অচিরেই আমি তোমাকে রক্তস্রাবকারিণী করব, যেমন তুমি এ বৃক্ষ হতে রক্তপাত ঘটিয়েছো।

হাসান (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ঋতুস্রাব হতে পবিত্র।

হাসান (রহ) হতে (আরও) বর্ণিত আছে যে, তিনি وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ঋতুস্রাব হতে পবিত্র।

আতা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সন্তান প্রসব, ঋতুস্রাব, পায়খানা ও পেশাব হতে পবিত্র। আর তিনি এজাতীয় কতিপয় বস্তু উল্লেখ করেন।

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তা দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা বেহেশতে চিরদিন থাকবে। সুতরাং وَهُمْ ঈমানদার ও নেককার ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে فِيهَا সর্বনামটি দ্বারা جَنَّاتٌ বুঝানো হয়েছে। আর তারা তথায় চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে চির শান্তি ও অনন্ত অসীম নি'মাত দান করবেন।

(২৬) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ط فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ○

(২৬) "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মশক কিম্বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট কোন বস্তুর উপমা দানে সঙ্কোচ বোধ করেন না। বস্তুত যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, এ সত্য তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে। কিন্তু যারা কাফের তারা বলে যে, আল্লাহ্ এ উপমা দ্বারা কি উদ্দেশ্য করেছেন? এ দ্বারা তিনি অনেককে বিভ্রান্ত করেন, আবার অনেককে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর তিনি পাপাচারীদের ব্যতীত কাউকে এর দ্বারা বিভ্রান্ত করেন না।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতটিকে আল্লাহ্ তা'আলা কি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন, সে বিষয়ে ও তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারগণের একাধিক মত রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন,

৩৩—

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জন্য এ দু'টি উপমা দান করেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ও او كصيب من السماء হতে তিনটি আয়াত, তখন মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ তা'আলা এরূপ সুমহান যে, তিনি এ ধরনের উদাহরণ-উপমা দেওয়া থেকে অনেক উর্ধে। তখন আল্লাহ তা'আলা ان الله لايستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة হতে اولئك هم الخسرون । পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

অন্যান্যগণ বলেছেন, যেমন—

রবী ইবনে আনাস হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী ان الله لايستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটি একটি উপমা যা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জন্য উপমা দিয়েছেন যে, মশা উদরপূর্তি করে পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকে। অনন্তর যখন মোটাতাজা হয় তখন সে মরে যায়। তদ্রূপ সে সকল লোকের উদাহরণ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এ উপমা দান করেছেন। যখন তারা পার্থিব ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ হয় সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আয়াত فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شئ الاية তিলাওয়াত করেন। "ইয়াহূদীদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিলো, তারা যখন তা ভুলে গেলো তখন তাদের জন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম"—(সূরা আনয়াম, আয়াত সংখ্যা ৪৪)।

রবী ইবনে আনাস হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত রয়েছে। শুধুমাত্র তাতে এতটুকু অতিরিক্ত উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, অনন্তর যখন তাদের মেয়াদকাল ফুরিয়ে যাবে, আর তাদের সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে, তখন তারা মশার ন্যায় হয়ে যাবে, যা পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং পরিতৃপ্তি লাভের পর মরে যায়। তদ্রূপ এ সকল লোকের অবস্থা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ উদাহরণ দান করেছেন। যখন তারা পার্থিব ধনসম্পদে পরিপূর্ণতা অর্জন করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করে তাদেরকে ধ্বংস করেন। আর তাই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذنا هم بغتة فاذا هم مبلسون -এর মর্মার্থ। "অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হলো, যখন তারা তাতে উল্লেখিত হলো, তখন অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম, ফলে তখনি তারা নিরাশ হলো"—(সূরা আনয়াম, আয়াত ৪৪)।

আর অন্যান্যগণ বলেছেন, যেমন—

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ان الله لايستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ সংকোচ বোধ করেন না, চাই তা স্বল্প কিংবা প্রচুর হোক। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কিতাব কুরআন মজীদে মশা-মাছি ও মাকড়সার উল্লেখ করেন তখন বিপথগামীরা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করার মাধ্যমে কি উদ্দেশ্য পোষণ করেন? তখন আল্লাহ তা'আলা ان الله لايستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها আয়াতটি অবতীর্ন করেন।

হযরত কাতাদা (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা মাকড়সা ও মশা-মাছি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, তখন মুশরিকরা বলতে লাগল,

মাকড়সা ও মশামাছির কি গুরুত্ব আছে যে, এদের আলোচনা করা হত? তখন আল্লাহ তা'আলা ان الله لايستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আর এ আয়াতের ব্যাখ্যা ও আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য বা পটভূমি প্রসঙ্গে আমরা যাদের মতামত উল্লেখ করেছি, তাঁরা প্রত্যেকে এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অভিমত পোষণ করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে বিশুদ্ধরূপে উত্তম ও সত্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মত হলো তাই, যা আমরা ইবনে মাসউদ (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে উল্লেখ করেছি। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় ইতিপূর্বে মুনাফিকদের প্রসঙ্গে প্রদত্ত উপমার পর তাঁর বান্দাগণকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মশা-মাছি ও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং তা অপরাপর সূরায় প্রদত্ত উপমা প্রসঙ্গে কাফির ও মুনাফিকদের কটুক্তির প্রত্যুত্তর হওয়া অপেক্ষা এ সূরায় প্রদত্ত উপমা যথা "আল্লাহ তা'আলা মশামাছি ও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না' অত্র আয়াত প্রসঙ্গে তাদের কটুক্তির প্রত্যুত্তর হওয়াই অধিকতর উপযোগী ও অত্যুত্তম।

যদি কোন প্রশ্নকারী এ কথা বলেন যে, এতো অধিকতর সঙ্গত যে, তা সমুদয় সূরায় প্রদত্ত উপমা প্রসঙ্গে তাদের কটুক্তির প্রত্যুত্তর রূপে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরাসমূহে তাদের ও তাদের উপাস্য সমূহের যে উপমা দান করেছেন, তা অত্র আয়াত ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة মধ্যে প্রদত্ত উপমার অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু এর কোনটিতে তাদের উপাস্যকে মাকড়সার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে আর কোনটিতে তার দুর্বলতা ও হীনতাকে মশামাছির সাথে উপমা দান করা হয়েছে। অথচ এ সকল বস্তুর মধ্য হতে কোন কিছুর আলোচনাই এ সূরায় বিদ্যমান নেই যার প্রেক্ষিতে তা বলা শুদ্ধ হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যে কোন রূপ উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না।

কিন্তু ব্যাপারটি তাঁরা যা ধারণা করেছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী "আল্লাহ তা'আলা মশামাছি ও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর উপমা দানে সংকোচবোধ করেন না" তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ সংবাদ দান করা যে, তিনি সত্যের ব্যাপারে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যে কোন রূপ উপমাদানে সংকোচ বোধ করেন না। তদ্বারা তিনি তাঁর বান্দাহগণকে পরীক্ষা করে থাকেন, যাতে তিনি তদ্বারা ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকারী বান্দাগণকে অবাধ্য এবং কাফিরদের থেকে পৃথক করতে পারেন—একদল লোককে পথভ্রষ্ট করা এবং অন্য দলকে পথপ্রদর্শন করার মাধ্যমে। যেমন—

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি مثلا ما بعوضة -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপমাসমূহে মু'মিন মাত্রই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর তারা জানে যে, তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্যরূপে অবতীর্ণ। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে তাদের পথপ্রদর্শন করেন। তদ্বারা তিনি পাপাচারীদেরকে বিভ্রান্ত করেন। হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেন, মু'মিনগণ তা চিনতে পারবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। আর পাপাচারীগণ তা চিনতে পারবে এবং তা অস্বীকার করবে।

ইবনে আবু নাজীহ (রহ) মুজাহিদ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে জুরাইজ (রহ) মুজাহিদ (রহ) হতে একইরূপে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুবহু মশামাছি সম্পর্কে সংবাদ দান করা উদ্দেশ্য করেন নাই যে, তিনি তৎ সম্পর্কে উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না। বরং

তিনি মশামাছি দুর্বলতম সৃষ্টি হওয়ার বিবেচনায় তার উপমা দান সম্পর্কিত সংবাদ দান করা উদ্দেশ্য করেছেন। যেমন—

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মশামাছি হলো আল্লাহ তা'আলার দুর্বলতম সৃষ্টি।

ইবনে জুরাইজ (রহ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বল্পতা ও নগণ্যতা বিবেচনায় উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি সত্যের ব্যাপারে ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম কিম্বা উচ্চাতি উচ্চ উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না। আর তা মুনাফিকদের মধ্য হতে সে ব্যক্তির জবাবে যে ব্যক্তি তাদের প্রসঙ্গে অগ্নি প্রজ্বলন ও আকাশ হতে বারি বর্ষণের যে উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে তা অস্বীকার করেছে।

যদি কেউ এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, মুনাফিকরা উপমা অস্বীকার করেছে কোথায়— যে সম্পর্কে তুমি দাবী করেছো যে, তা তার জবাব? যাতে আমরা জানতে পারব যে, এক্ষেত্রে বক্তব্য তাই যা তুমি বলেছো। তদুত্তরে বলা হবে যে, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا -

"সুতরাং যারা ঈমান এনেছে. তারা জানে এ সত্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, কিন্তু যারা কাফির তারা বলে যে, আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এ উপমা পেশ করেছেন।"

এর মধ্যে নির্দেশনা রয়েছে। আর পূর্ববর্তী আয়াত দু'টিতে যাদের সম্পর্কে উপমা দান করা হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা যে অবস্থায় ছিল, তার সাথে অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী ও আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণের উপমা দান করা হয়েছে। তা অত্র আয়াত "আল্লাহ তা'আলা যে কোন উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না"—এর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে আর মুনাফিকরা সে উপমাকে অস্বীকার করেছে এবং এ উক্তি করেছে যে আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করেছেন? সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তির অশুদ্ধতা-অসারতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আর তারা যা মন্তব্য করেছে, তা তাদের জন্য মন্দরূপে সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের এ কথায় তাদের হুকুম বিষয়ে তাদেরকে সংবাদ দান করেছেন যে, তাদের এরূপ উক্তি করা পথভ্রষ্টতা ও পাপাচার। মু'মিনগণ যা বলেছেন, তাই সঠিক তারা যা বলেছে, তা নয়।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي-এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, আরবী ভাষায় কোন কোন পারদর্শী ব্যক্তি এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي-এর অর্থ হলো, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ভয় করেন না যেকোন উপমা বর্ণনা করতে। একথার প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াত পেশ করেন:

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ('তুমি মানুষকে ভয় করো, অথচ ভয় করা উচিত আল্লাহকে—" (সূরা ৩৩, আয়াত ৩৭)। আর এ ধারণা পোষণ করেন যে, এর অর্থ হলো তোমরা মানুষকে লজ্জা কর, অথচ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই লজ্জা করা অধিকতর সঙ্গত। আর বলেন

যে, الاستحياء (লজ্জা করা) الخشية (ভয় করা) অর্থে এবং الخشية (ভয় করা) الاستحياء (লজ্জা করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ان يضرب مثلا-এর অর্থ হলো বর্ণনা করবেন, বিবরণ দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, ضرب لكم مثلا من انفسكم (আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন) সূরা রূম, আয়াত নং ২৮। আর এর অর্থ হল وصف لكم তোমাদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন। যেমন কবি আল-কুমাইত বলেছেন—

وذلك ضرب اخماس اريدت — لاسداس عسى ان لا تكونا

("এ হলো পাঁচ-ছয়ের উদাহরণ তথা ধোঁকা-প্রতারণার উপমা, যা অচিরেই থাকবে না)।" এখানে اخماس শব্দটি وصف অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর المثل হচ্ছে الشبه সাদৃশ। যেমন বলা হয়, هذا مثل هذا ও مثله তা তার অনুরূপ। যেমন বলা হয়, هذا شبهه ও شبهه তা তারই সদৃশ, কবি কা'ব ইবনে যুহাইর সে অর্থেই বলেছেন—

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا — وما مواعيدها الا الاباطيل

"উরকূবের ওয়াদাগুলো ছিলো প্রিয়ার ওয়াদাসমূহের ন্যায়। তার প্রিয়ার ওয়াদাসমূহ অলীক বই কিছুই নয়। অর্থাৎ مثلا শব্দটি এখানে شبها অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, এক্ষণে আয়াতের অর্থ এই যে, ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا (আল্লাহ উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না)" আল্লাহ যে কোন বস্তুকে কোন কিছুর সাথে তুলনা করতে ভয় করেন না —আলোচ্য আয়াতাংশটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর مثلا-এর সঙ্গে ما যে অব্যয়টি রয়েছে, তা الذى অর্থে ব্যবহৃত। কেননা, বক্তব্যটির অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না, এমন কি ক্ষুদ্রতায় ও স্বল্পতায় মশা মাছির ন্যায় উদাহরণ দিতেও সংকোচ বোধ করেন না। (عرقوب আরবের এক মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ ব্যক্তির নাম)।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, ব্যাপারটি যদি তাই হয়, যা তুমি উল্লেখ করেছো, তা হলে بعوضة শব্দটি যবর বিশিষ্ট হওয়ার কারণ কি? কেননা তুমি জান যে, তোমার ব্যাখ্যা অনুসারে বক্তব্যের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না, যা হলো মশা মাছি। সুতরাং তোমার কথানুসারে بعوضة শব্দটি পেশ বিশিষ্ট স্থলে অবস্থিত। এমতাবস্থায় তাতে যবর হলো কিরূপে? তদুত্তরে বলা হবে যে, তাতে দুই কারণে যবর দেওয়া হয়েছে। একটি হলো ما অব্যয়টি যেহেতু يضرب দ্বারা যবরের স্থলে অবস্থিত, আর بعوضة শব্দটি তার صلة সুতরাং তাকে ما অব্যয়টির হরকতের সাথে হরকত দান করা হয়েছে। এ কারণেই এস্থলে সে, একই হরকত অনিবার্য হয়েছে। যেমন কবি হাসসান ইবনে ছাবিত (রা) বলেছেন—

وَكَفَى بِنَا فَضْلاً عَلَى مَنْ غَيْرِنَا — حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا

"(অন্যদের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আমাদের ভালোবাসেন)।"

এখানে غير শব্দটিতে من অব্যয়টির হরকত দান করা হয়েছে। আরবগণ বিশেষতঃ من ও ما-এর মধ্যে এরূপ করে থাকে এবং তাদের صلة-কে তাদের অনুরূপ হরকত দেওয়া হয়। কেননা এগুলো কখনো معرفة (নির্দিষ্ট) হয়ে থাকে, কখনো نكرة (অনির্দিষ্ট) হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় কারণটি হলো বক্তব্যের অর্থ এরূপ করা হবে যে, ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما بين بعوضة الى ما فوقها "আল্লাহ তা'আলা মশামাছি হতে আরম্ভ করে তদূর্ধ্ব পর্যন্ত উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না।" অতঃপর بين ও الى-এর উল্লেখ করা পরিত্যাগ করা হয়েছে। যেহেতু بعوضة-কে যবর দান ও দ্বিতীয় ما-এর মধ্যে فا প্রবিষ্ট করণে এতদুভয়ের প্রমাণ রয়েছে। যেমন আরবগণ বলে থাকে,

مطرنا ما زبالة فالثعلبية وله عشرون ما ناقة فجملا وهى احسن الناس ما قرنا فقدما

আর এর দ্বারা তারা ما بين قرنها الى قدمها তার শিং হতে পা পর্যন্ত অর্থ উদ্দেশ্য করে। তদ্রূপ যেখানে ما প্রবিষ্ট করণে বক্তব্যের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে তারা বলে থাকে, ما بين كذا الى كذا আর তারা প্রথম ও দ্বিতীয়টিকে যবর দান করে, যাতে এ দু'টির মধ্যস্থিত যবর বক্তব্যের মধ্য হতে উহ্য অংশের প্রতি নির্দেশ করে। তদ্রূপ এখানে আল্লাহ তা'আলার বাণী ما بعوضة فما فوقها মধ্যেও অনুরূপ।

আর কোন কোন আরবী ভাষাবিদ এ ধারণা করেছেন যে مثلا ما শব্দের ما অব্যয়টি সম্বন্ধবোধক অব্যয়—যা বক্তব্যের মধ্যে ব্যাপকতা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মশামাছির এবং তদূর্ধ্ব কোন বিষয়ের উপমা দেওয়ায় সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং এ ব্যাখ্যা অনুসারে بعوضة শব্দটি আরবী ব্যাকরণের ধারানুসারে যবরের অবস্থায় থাকবে। আর فما فوقها-এর মধ্যে যে দ্বিতীয় ما-টি রয়েছে, তা بعوضة এর উপর আতফ হবে, ما-এর প্রতি নহে।

ইমাম তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী فما فوقها-এর ব্যাখ্যা হলো যা তদপেক্ষা বৃহৎ এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে কাতাদা ও ইবনে জুরাইজের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি। নিশ্চয় মশামাছি আল্লাহ তা'আলার দুর্বলতম সৃষ্টি। যখন তা' আল্লাহ তা'আলার দুর্বলতম সৃষ্টি, তখন ত স্বল্পতা ও দুর্বলতার শেষ সীমা। আর ব্যাপারটি যখন এমনই, তখন এতে সন্দেহ নাই যে, দুর্বলতম বস্তুর উর্দ্ধে যা থাকবে, তা তদপেক্ষা শক্তিশালী বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু হবে না। সুতরাং তাঁদের উভয়ের দেওয়া বিবরণের প্রেক্ষিতে فما فوقها-এর অর্থ অনিবার্যরূপে

فما فوقها في العظم والكبر শ্রেষ্ঠত্বে ও বৃহদায়তনে তদূর্ধ্বে। যেহেতু মশামাছি দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতার সর্বশেষ সীমা।

কেউ কেউ فما فوقها-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, فما فوقها في الصغر والقلة (ক্ষুদ্রতা ও স্বল্পতায় যা তদূর্ধ্বে)। যেমন কোন ব্যক্তি যার আলোচনাকারী—তাকে নিকৃষ্টতা ও কার্পণ্যের সাথে বিশেষিত করছে, আর তা শ্রবণকারী ব্যক্তি বলল, হাঁ তারও উর্ধ্বে। অর্থাৎ তার নিকৃষ্টতা ও কার্পণ্য সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে, সে তদপেক্ষা উর্ধ্বে। কিন্তু তা এমন এক বক্তব্য যা জ্ঞানী ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার বিপরীত, যাঁরা পবিত্র কুরআনের মুফাস্সির হিসেবে সুপরিচিত।

অতএব এখানে আমাদের প্রদত্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে আয়াতাংশের অর্থ এ হবে যে, আল্লাহ তা'আলা মশামাছি হতে তদূর্ধ্বের বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না।

আর যদি بعوضة-কে পেশ বিশিষ্ট করা হয়, তবে ما-এর মধ্যে উপরোক্ত ব্যাখ্যা বৈধ হবে না, হাঁ, আমরা যে বলেছি ما অব্যয়টি كطول অর্থে ইসম হবে, صلة নয়, শুধুমাত্র সে হিসাবেই এ ব্যাখ্যা শুদ্ধ হবে।

فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون

ماذا اراد الله بهذا مثلا-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী فاما الذين امنوا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (স) কে সত্য জেনেছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী فيعلمون انه الحق من ربهم-এর অর্থ হচ্ছে, তারা চিনতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা যে উপমাটি প্রদান করেছেন, তা যে বস্তুর জন্য তিনি উপমা দিয়েছেন তার জন্য যথার্থ উপমা। যেমন—

রবী ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা উপলব্ধি করে যে, এ উপমাটি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্যরূপে অবতীর্ণ, আর তা আল্লাহ তা'আলার বাণী ও তাঁরই পক্ষ হতে। আর যেমন.

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তারা জানে যে, তা দয়াময় আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তা সত্যরূপে অবতীর্ণ।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আর আল্লাহ তা'আলার বাণী واما الذين كفروا-এর অর্থ হলো যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে, তারা যা উপলব্ধি করেছে, তাও অস্বীকার করেছে, আর তারা যা জানতে পেরেছে তা গোপন করেছে। আর তা মুনাফিকদের পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বিশেষতঃ তাদেরকে এবং আহলে কিতাব (মুশরিকদের) মধ্য হতে যারা তাদের সমগোত্রীয় ও অংশীদার ছিল, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। অনন্তর তারা বলে যে,

উপমা হিসাবে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কি উদ্দেশ্য করেছেন ? যেমন ইতিপূর্বে আমরা এ মর্মে মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছি। আর তা হলো,

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم الاية-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মু'মিনগণ তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর তারা জানে যে, তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্যরূপে অবতীর্ণ। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে তাদেরকে সুপথগামী করেন এবং তার মাধ্যমে পাপাচারীদেরকে বিপথগামী করেন। তিনি বলেন, মু'মিনগণ তা চিনতে পারে, সুতরাং তারা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে। আর ফাসিকরা চিনতে পেরেও অবিশ্বাস করে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ماذا اراد الله بهذا مثلا-এর ব্যাখ্যা হলো, কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ এ উপমা ব্যবহার করেছেন ? ما অব্যয়টির সাথে ব্যবহৃত ذا শব্দটি الذى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর اراد শব্দটি তার صلة আর هذا ইসমে ইশারা দ্বারা مثل-এর প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী يضل به كثيرا-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তদ্বারা তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে অনেককে বিভ্রান্ত করেন। আর به এর মধ্যস্থিত ه সর্বনামটি مثل-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আর তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত একটি স্বতন্ত্র সংবাদ। বক্তব্যটির অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রদত্ত উপমা দ্বারা মুনাফিক ও কাফিরদের অনেককে বিভ্রান্ত করেন। যেমন—

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসূলুল্লাহ (স) এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন يضل به كثيرا দ্বারা মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। আর ويهدى به كثيرا দ্বারা মু'মিনগণের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে উপমা দান করেছেন, তা সত্যরূপে জানা সত্ত্বেও তারা তাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে। তা তাদেরকে আরও অধিক বিপথগামী করেছে। উপমাটি যে জন্য দেওয়া হয়েছে, তা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অতএব তাই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাদেরকে বিপথগামী করা। আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা অর্থাৎ সে উপমা দ্বারা মু'মিনদের অনেককে সুপথগামী করেন। ফলে তাদের মধ্যে উত্তরোত্তর হিদায়াত বৃদ্ধি হতে থাকে, তাদের ঈমানও বৃদ্ধি হতে থাকে। যেহেতু তারা যা সত্যরূপে জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যার উদ্দেশ্যে উপমাটি দান করেছেন, তা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তারা তা সত্যরূপে বিশ্বাস করেছে এবং তারা তার স্বীকারোক্তি করেছে। আর তাই আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের জন্য হিদায়াত।

তাঁদের কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, তা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর। যেন তারা বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন উপমা দ্বারা কি উদ্দেশ্য করেছেন, যা সকলে চিনতে পারে না ? তার দ্বারা একজনকে বিপথগামী করেন, আর অন্যজনকে সুপথগামী করেন। অতঃপর বক্তব্য ও সংবাদকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পুনর্বার সূচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وما يضل به الا الفسقين (কাফিরদের ব্যতীত তদ্বারা কাউকে তিনি বিপথগামী করেন না)। সূরা মুদ্দাসসির-এর মধ্যে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার বাণী

وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذالك

يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء -

(আয়াত নং ৩১, সূরা নং ৭৪)

"(যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবে, এ উপমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কি উদ্দেশ্য করেছেন? এভাবে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথগামী করেন)"—এর মধ্যে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা বাকারার মধ্যেও তাই একথাই ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا "তার দ্বারা তিনি অনেককে বিপথগামী করেন, আর তার দ্বারা তিনি অনেককে সুপথগামী করেন।"

وما يضل به الا الفسقين o-এর ব্যাখ্যা

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা وما يضل به الا الفسقين-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হলো মুনাফিক।

হযরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وما يضل به الا الفاسقين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা পাপাচার করেছে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে বিপথগামী করেছেন।

রবী ইবনে আনাস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وما يضل به الا الفسقين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হচ্ছে মুনাফিক।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আরবদের ভাষায় মূলতঃ فسق (ফিসক) এর তাৎপর্য হলো কোন বস্তু হতে বের হওয়া, সে অর্থেই বলা হয় فسقت الرطبة "পাকা খেজুর বেরিয়েছে" যখন তা তার ছাল হতে বের হয়েছে। এজন্যই ইঁদুরকে فويسقة নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেহেতু তা স্বীয় গর্ত হতে বের হয়। তদ্রূপ মুনাফিক ও কাফিরকে এজন্য ফাসিক নাম দেওয়া হয়েছে, যেহেতু তারা তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য হতে বেরিয়ে গিয়েছে। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের বিশ্লেষণ উল্লেখ পূর্বক ইরশাদ করেছেন—

الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه

"ইবলীস ব্যতীত, সে জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সে তার প্রতিপালকের আদেশ হতে বেরিয়ে গিয়েছে।" আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই যে, সে তাঁর আনুগত্য ও তাঁর আদেশ পালন করা হতে বেরিয়ে পড়েছে। যেমন.

৩৪—

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী بما كانوا يفسقون -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অর্থাৎ যেহেতু তারা আমার আদেশ হতে দূরে সরে গিয়েছে।

অতএব আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وما يضل به الا الفسقين এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলা বিপথগামী ও মুনাফিকদের জন্য যে উপমা দান করেন, তার দ্বারা তাঁর আনুগত্য হতে বের হওয়া ও তাঁর আদেশ অমান্যকারী আহলে কিতাবের কাফির ও বিপথগামী মুনাফিক ব্যতীত অপর কাউকে বিভ্রান্ত করেন না।

(٢٧) الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض - اولئك هم الخسرون ٥

(২৭) যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে—যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন—তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সেই ফাসিকদের বর্ণনা যাদের সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপমা দ্বারা তাদের ব্যতীত অপর কাউকে বিপথগামী করেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিবৃত উপমা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সে সকল ফাসিক ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না, যারা দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

অতঃপর জ্ঞানীগণ عهد (অঙ্গীকার) শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে মতভেদ করেছেন, যা আল্লাহ্ পাক এ ফাসিকদের ওয়াদা ভঙ্গের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, তা হলো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাব ও তাঁর রসূল (স)-এর মুবারক যবানে তাঁর বান্দাগণের প্রতি যে উপদেশ দান করেছেন এবং তাদের প্রতি তিনি যা আদেশ করেছেন ও নিষেধ করেছেন সে আদেশ ও নিষেধকে অমান্য করেছে এবং আল্লাহ্ তাআলার আদেশ মোতাবেক যারা আমল করেনি।

আর অন্যরা বলেছেন যে, এ আয়াত আহলে কিতাব কাফির মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : ان الذين كفروا سواء عليهم ءانذرتهم ও তাঁর বাণী ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر সুতরাং এ সকল আয়াতে যা কিছু রয়েছে, তা সবই তাদের প্রতি তিরস্কার এবং তাদের প্রতি বর্ণনার শেষ পর্যন্ত ভীতি প্রদর্শন। তাঁরা বলেন, দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তারা আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে কৃত যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, তা হলো সে অঙ্গীকার যা তিনি তাওরাতের প্রতি আমল করার ব্যাপারে ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং তিনি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যা আনয়ন করবেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রসঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাদের তা ভঙ্গ করা, সত্যিকার পরিচয় পাওয়ার পরও তা অমান্য করা এবং লোকদের থেকে হযরত নবী করীম (স)-এর পরিচয় গোপন না করা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট থেকে এতদ সম্পর্কে ওয়াদা আদায় করেছেন যে, তারা মানুষের নিকট তা প্রকাশ করবে, গোপন করবে না। ফলে, আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা সে অঙ্গীকার তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে এবং তার বিনিময়ে নগন্য মূল্য গ্রহণ করেছে।

আর তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা সকল মুশরিক, কাফির ও মুনাফিককে উদ্দেশ্য করেছেন। আর তাদের সকলের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার হলো, তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি, তিনি তাঁর রুবুবিয়াত প্রমাণ করার জন্য দলীলসমূহ সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার হলো, তাঁর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা। যে কারণে তিনি তাঁর রসূলের জন্য এমন মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, যা তাঁরা ব্যতীত অন্য কোন মানুষ তদ্রূপ মু'জিযা আনয়নে অক্ষম এবং যা তাঁদের সত্যবাদীতার পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী। তাঁরা বলেন, তাদের ওয়াদা ভঙ্গের অর্থ হলো, দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে যার সত্যতা স্বপ্রমাণিত হয়েছে, তাদের তা অস্বীকার করা, রসূলগণ ও কিতাব সমূহের প্রতি তাদের অসত্যারোপ করা, তাদের এ বিষয়ে সঠিক অবগতি থাকা সত্ত্বেও যে, নবীগণ (আ) যা আনয়ন করেছেন, তা সত্য ও সঠিক।

অন্য কয়েকজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে অঙ্গীকারের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, তা হলো অঙ্গীকার যা, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তিনি তাদেরকে আদম (আ)-এর পিঠ থেকে বের করেছেন—যার বিবরণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মধ্যে প্রদান করেছেন।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ -

"স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন, এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন।" (সূরা নং ৭, আয়াত সংখ্যা ১৭২)

তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করার অর্থ হলো, ওয়াদা পূরণে অবাধ্য হওয়া।

আমার নিকট এ ক্ষেত্রে উত্তম মত হলো, যাঁরা বলেছেন—তারা সেই ধর্মযাজক কাফির যারা রসূলুল্লাহ (স) এবং মুহাজিরগণের সমসাময়িক কালে বিদ্যমান ছিল বনী ইসরাঈলের অবশিষ্টদের মধ্যে যারা তার নিকটবর্তী ছিল এবং মুনাফিকরা শির্কী আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাদের বিষয়ে আমরা আমাদের এ কিতাবে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, এ আয়াতগুলো তাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা দলীল-প্রমাণ পেশ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী إن الذين كفروا। ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر তাদের এবং তাঁর বাণী سواء عليهم এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অংশী স্থির করণে তাদের অনুরূপ ছিল, তাদের উভয়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য আমার মতে যদিও এ আয়াতগুলো তাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, তথাপি তার দ্বারা সেই সকল লোকও উদ্দেশ্য যারা বিপথগামীতায় তাদের অনুরূপ ছিল। আর তার দ্বারা তারাও উদ্দেশ্য ছিল, যারা মুনাফিকদের সম-স্বভাবের ছিল, বিশেষতঃ সমস্ত মুনাফিকই বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল। আর তারাও উদ্দেশ্য ছিল যারা ইহুদী ধর্মযাজক কাফিরদের ন্যায় ছিল এবং সে সকল লোক যারা কুফরীর মধ্যে তাদের সমগোত্রীয় ছিল, তারা সবাই তার দ্বারা উদ্দেশ্য। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদের সকলকে সাধারণ ভাবে গুণাবলী সহকারে তার উল্লেখ করেন। পূর্বে প্রথমোক্ত আয়াতসমূহ যাতে তাদের কথা আলোচিত হয়েছে, তাতে তাদের সকলের আলোচনা সার্বিকভাবে

বিদ্যমান থাকার কারণে এরূপ করেছেন। আর কখনো তাদের কয়েক জনের সিফাত গুণাবলী বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেন। প্রথমোক্ত আয়াতসমূহে তাদের উভয় দল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রেক্ষিতে এরূপ করেছেন। আর উভয় দল বলতে মূর্তি পূজক, আল্লাহ্র সাথে অংশী সাব্যস্তকারী মুনাফিক দল ও ইহুদী পুরোহিত কাফিরদল উদ্দেশ্য। সুতরাং যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তারা হলো, সে সকল লোক যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকারকে পরিত্যাগ করেছে। আর অঙ্গীকার হলো—হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতকে স্বীকার করা, আর তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন (অর্থাৎ পবিত্র কুরআন) তার সত্যতা মেনে নেওয়া, তাঁর নবুওয়াতের কথা মানুষের নিকট প্রচার করা—এ বিষয়ে অবগত হবার পর ও যারা তা গোপনে রাখে। আর এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তারা তা বর্জন করে। যেমন, আল্লাহ্ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন—

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ -

"আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে কিতাব প্রদত্ত হয়েছে, এমর্মে যে, তারা তা লোকদের নিকট প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। অথচ তারা তা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে।" (সূরা নং ৩, আয়াত নং ১৭৮)

পশ্চাতে নিক্ষেপ করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে তাদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা ভঙ্গ করা এবং তার আমল বর্জন করা। আর আমি যে বলেছি, এ সকল আয়াত দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য করেছেন, তা এজন্য বলেছি যে, সূরা বাকারার প্রথম পাঁচ-ছয় আয়াতে তাদের কাহিনী পূর্ণ হওয়া অবধি তাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আদম (আ) ও তাঁর সন্তানগণের সৃষ্টি সংক্রান্ত সংবাদের পর উল্লেখিত আয়াত

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ۝

"হে বনী ইসরাঈল! তোমার আমার সে সকল নিয়ামত স্মরণ কর যা আমি তোমাদের প্রতি দান করেছি এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর, আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব।"

এর মধ্যে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের প্রতি বিশেষ ভাবে সম্বোধন করেছেন সকল মানব সন্তানের প্রতি নয়। এ অঙ্গীকার পূরণ সম্পর্কে সম্বোধন করার একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ দ্বারা আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির ও মুনাফিক এবং মূর্তিপূজক মুশরিক ও তাদের সমগোত্রীয় তারাই উদ্দেশ্য। যদিও সম্বোধনটি উভয় দল যাদের প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, তাদের সাথে সম্পর্কিত। তথাপি তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যে সতর্কবাণী, নিন্দাবাদ ও ভয় প্রদর্শন

অপরিহার্য করেছেন, তা সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য, তথা যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ নাযিল হয়েছে, তারা সকলেই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এক্ষণে আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র আনুগত্য বর্জনকারী, তাঁর আদেশ নিষেধ পালন থেকে বহির্গত ও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ব্যতীত কেউ তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয় না। আর তাদের থেকে গৃহীত অঙ্গীকার হলো যা তিনি তাঁর রসূলগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে ও তাঁর নবীগণের যবানে এমর্মে তাদের থেকে গ্রহণ করেছেন যে, তারা তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আদেশ এবং তিনি যা আনয়ন করেছেন, তা মান্য করবে, তাওরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাঁর বিষয়টি লোকদের নিকট প্রকাশ করা এবং তাদেরকে এ সংবাদ দান করা যে, তারা তাদের নিকট তা লিখিত আকারে পেয়েছে, তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত রসূল এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করা ও তাদের জন্য তা গোপন না করা ফরয, এতদ সংক্রান্ত যে বিধান ফরয করেছেন, তারা তা যথাযথ পালন করবে। আর তারা তা ভঙ্গ করা হলো, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ না করা যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তিনি তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাদেরকে তা পূরণ করা প্রসঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদান করার পর তারা এ আচরণ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ অভিযোগে অভিযুক্ত করে ইরশাদ করেছেন—

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق -

"অতঃপর তাদের পরে একদল অযোগ্য উত্তরসূরী স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এ তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করে। আর তারা বলে, অচিরেই আমাদের ক্ষমা করা হবে। আর যদি তাদের নিকট অনুরূপ সম্পদ পেশ করা হয়, তবে তারা তা গ্রহণ করবে। তাদের নিকট হতে কি কিতাবের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সত্য ভিন্ন বলবে না ?" (সূরা নং ৭, আয়াত নং ১৬৯)।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী من بعد ميثاقه-এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে অঙ্গীকার পূরণের প্রশ্নে নিশ্চয়তা বিধায়ক স্বীকৃতি আদায় করার পর। অবশ্য توثق শব্দটি আরবী বাগধারা অনুসারে শব্দের মূল উৎস। যেমন— توثقت من فلان توثقا আমি অমুক হতে দৃঢ় অঙ্গীকার আদায় করেছি। আর ميثاق 'অঙ্গীকার' হলো তা থেকে নিষ্পন্ন ইস্‌ম বা বিশেষ্য। আর ميثاقه-এর মধ্যেকার ه সর্বনামটি আল্লাহ তাআলার নামের প্রতি সম্পর্কিত। উপরোল্লিখিত মুনাফিক, কাফির-পাপীষ্ঠদেরকে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ইত্যাদি যে সকল বর্ণনায় জড়িত করেছেন, তারা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন—

হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, সুতরাং তোমরা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাক। কারণ আল্লাহ তা'আলা তা ভঙ্গ করা অপছন্দ করেছেন এবং সে বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্যে দলীল-প্রমাণ, উপদেশ ও নসীহত পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ব্যাপারে যেরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন অন্য কোন গুনাহের জন্য তদ্রূপ সতর্কবাণী করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, সে যেন তা আল্লাহ তা'আলার জন্য পূর্ণ করে।

হযরত রবী ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ○

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে ছয়টি মন্দ স্বভাব রয়েছে। যখন তাদের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তারা এ ছয়টি মন্দ স্বভাব একত্রে প্রকাশ করে। যখন তারা কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন তারা ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে, যখন তাদের নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তারা তাতে খেয়ানত করে, আর তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সুদৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে, আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার আদেশ করেছেন, তারা তা ছিন্ন করে, তারা পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করে। যখন তাদের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তারা তিনটি স্বভাব প্রকাশ করে, যখন তারা কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন তারা ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে, যখন তাদের নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তারা তাতে খেয়ানত করে।

ويقطعون ما امر الله به ان يوصل-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার জন্য আদেশ করেছেন এবং তা ছিন্ন করার নিন্দা করেছেন—তা হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজীদে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন,

فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم

"ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।" (সূরা ৪৭, আয়াত ২২)

রেহেম দ্বারা রেহেমের অধিকারী উদ্দেশ্য। একই মায়ের বাচ্চাদানী যাদেরকে এবং তাকে একত্রিত করেছে। আর তা ছিন্ন করা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তার হক আদায় সম্পর্কে যা অনিবার্য করেছেন

এবং তার সাথে সদাচার করা অপরিহার্য করেছেন তা আদায় না করে তার প্রতি অবিচার করা। আর সে সম্পর্ক বহাল রাখা হলো ওয়াজিব, যা আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি আবশ্যিক করে দিয়েছেন। তার সাথে যেরূপ অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করা সমীচীন, সেরূপ আচরণ করা। আর ان يوصل-এর সঙ্গে যে ان অব্যয়টি রয়েছে তা আরবী ব্যাকরণের নিয়মে যার-এর স্থলে অবস্থিত—এমর্মে যে, তাকে به-এর ه সর্বনামটির স্থলে আরোপ করা হবে। এমতাবস্থায় বক্তব্যের অর্থ এ হবে—তারা ছিন্ন করে সেই সম্পর্ক যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রক্ষা করার আদেশ করেছেন। আর به-এর ه সর্বনামটি ان يوصل বক্তব্যটি উল্লেখের প্রতি ইঙ্গিত স্বরূপ। আর আমরা ويقطعون ما امر الله به ان يوصل-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলেছি এবং তা যে রেহেম বা আত্মীয়তার সম্বন্ধ কাতাদা (রহ) এর ব্যাখ্যায় এরূপই বলেছেন।

কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ويقطعون ما امر الله به ان يوصل-এর ব্যাখ্যায় বলেন—পরে তারা তা ছিন্ন করল। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ তা'আলা যে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখার আদেশ করেছেন, তা হচ্ছে রেহেম বা জন্মগত সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক।

আর ব্যাখ্যাকারগণের কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) ও মু'মিনদের সাথে এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে যারা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আল্লাহ পাক তাদের নিন্দা করেছেন। তাঁরা এর উপর বাহ্যিক আয়াতের সাধারণ অর্থ হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করেছেন। আর এখানে একথার প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই যে, আল্লাহ তা'আলা যা অবিচ্ছিন্ন রাখার আদেশ করেছেন, তাতে কতেক লোক উদ্দেশ্য এবং কতেক লোক উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এই অভিমতটিই সঠিক বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজীদের একাধিক আয়াতে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার সাথে বিশেষিত করেছেন। আর এ আয়াতটিও তারই অনুরূপ। হাঁ, যদিও প্রকৃত ব্যাপার এরূপই, তথাপি তা নির্দেশক হল আল্লাহ তা'আলার নিন্দাবাদের প্রতি ঐসব লোকদের উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ পাকের নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে সম্পর্ক আত্মীয়তার হোক বা না হোক।

وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রঃ) বলেন, আর তাদের অশান্তিও সৃষ্টি করার কথা যা আমরা ইতি-পূর্বে বলেছি, তার তাৎপর্য হলো—মুনাফিকদের আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা, তাঁর অবাধ্য হওয়া, তাঁর রসূলকে মিথ্যা জ্ঞান করা, তাঁর নবুওতকে অস্বীকার করা, তিনি আল্লাহ পাকের তরফ হতে যা কিছু এনেছেন তাও অস্বীকার করা।

اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রঃ) বলেন, الخاسرون শব্দটি خاسر-এর বহুবচন। আর خاسرون বা ক্ষতিগ্রস্ত হলো তারা যারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণের কারণে তাঁর রহমত থেকে নিজেদের

বঞ্চিত করেছে। যেমন কোন ব্যক্তি তার ব্যবসায়ে তার মূলধন অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তদ্রূপ কাফির ও মুনাফিকদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ রহমত হতে বঞ্চিত করার ফলে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা তিনি তাঁর বান্দাগণের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যার প্রতি তারা সেদিন সর্বাধিক মুখাপেক্ষী থাকবে। এ অর্থেই বলা হয়, خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسرا "লোকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর خسار শব্দটি خسارا ও خسرانا শব্দ মূল হতে এসেছে। যেমন, কবি জারীর ইবন আতিয়্যা বলেছেন—

إن سليطا في الخسار إنه — أولاد قوم خلقوا أقنه

"নিশ্চয় সালীত ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা সে ক্রীতদাস সম্প্রদায়ের সন্তান।" এখানে الخسار দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা এমন অবস্থায় আছে, যা সম্মান-মর্যাদা ও সম্ভ্রমে তাদের অংশে ঘাটতি সৃষ্টি করে, তাদের মর্যাদাহানি ঘটায়।

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, أولئك هم الخاسرون-এর অর্থ হলো, এরাই ধ্বংস প্রাপ্ত। আমরা যে বলেছি তার অবাধ্যতা ও কুফরীর কারণে আল্লাহ তাকে রহমত হতে বঞ্চিত করেছেন, আর তাই তার ধ্বংস প্রাপ্তির কারণ—আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তা বর্ণনা করেছেন। আর এ হলো বক্তব্যকে হুবহু শাব্দিক ব্যাখ্যা না করে, উহাকে ভাবার্থের সহিত ব্যাখ্যা করা। কেননা ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অপরিহার্য কারণে এ ধরনের ব্যবস্থা করে থাকেন। আর কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুসলমানগণ ব্যতীত অন্য যে কারো প্রতি خاسر (ক্ষতিগ্রস্ত) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সে ক্ষেত্রে كفر (কুফর) উদ্দেশ্য করা হয়েছে মুসলমানের প্রতি প্রয়োগ হলে তার দ্বারা ذنب (পাপ) উদ্দেশ্য হবে।

(٢٨) كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ○

(٢٩) هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ○ ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سموت - وهو بكل شيء عليم ○

(২৮) তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার করো? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন দান করবেন, পরিণামে তোমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।

(২৯) তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনসংযোগ করেন এবং তাকে সাতটি আকাশে বিন্যস্ত করেন। তিনি সকল বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার বাণী كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা কোন বস্তু ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা তদ্রূপ যেমন সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم "তোমরা মৃত ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন এবং পুনশ্চ জীবিত করবেন।"

হযরত আবু মালেক (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, অথচ আমরা কোন বস্তুই ছিলাম না, অতঃপর আপনি আমাদের মৃত্যু দান করেছেন, তৎপর আবার পুনর্জীবিত করেছেন।

হযরত আবু মালেক (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মৃত ছিল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবন দান করেছেন, তৎপর তিনি তাদেরকে মৃত্যু দান করেছেন, আবার তিনি তাদেরকে জীবিত করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা কোন বস্তু ছিলে না যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সত্যিকার মৃত্যু দান করবেন, তৎপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين-এর ব্যাখ্যাও একইরূপ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين "আপনি আমাদের দু'বার মৃত্যু দান করেছেন, এবং দুবার জীবিত করেছেন।

হযরত আবুল আলিয়া হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা কোন বস্তু ছিল না, অতঃপর তিনি তাদেরকে জীবন দান করেছেন, যখন তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তাদেরকে মৃত্যু দান করেছেন, পুনরায় তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন জীবিত করবেন তারপর তারা জীবন লাভ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

৩৫—

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টির পূর্বে মাটি ছিলে, সুতরাং এ হলো একটি জীবনহীন অবস্থা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এ হলো একটি জীবন্ত অবস্থা, তারপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, তখন তোমরা কবরে গমন করবে, সুতরাং এ হলো আরেকটি মৃত্যু। তৎপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন, সুতরাং এ হলো আরেকটি জীবিতাবস্থা। এই হলো দুইবার মৃত্যু ও দুইবার জীবন লাভ। আর এই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী—

كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ○

-এর মর্মার্থ। আর অন্যান্যগণ বলেছেন, যেমন—

হযরত আবু ছালেহ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী

كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون

-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তোমাদেরকে কবরে জীবিত করবেন, আবার মৃত্যুদান করবেন।

অপর কয়েকজন বলেছেন, যেমন —

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাদের পিতার পিঠে প্রাণহীন ছিল, তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবন দান করেন এবং সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে অনিবার্য মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যু দান করেন। তৎপর পুনরায় তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের জন্য জীবিত করেন। সুতরাং তারা দুইবার জীবন ও মৃত্যু লাভ করে।

তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন, যেমন—হযরত ইবনে যায়েদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ থেকে সৃষ্টি করেন, যখন তিনি তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আর তিনি (ইবনে যায়েদ) আয়াত

واذ اخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ج

الست بربكم ط قالوا بلى ج شهدنا ج ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا

غٰفِلِيْنَ ٥ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ٥

"স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাঁর বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলে, নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষ্য রইলাম। এ স্বীকৃতি গ্রহণ এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম। কিম্বা তোমরা যেনো না বলো, আমাদের পূর্ব পুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করেছিলো, আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে" (সূরা—৭, আয়াত ১৭২—১৭৩) পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে আকল বা জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেন এবং তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আদম (আ)-এর বাম পাঁজরের ক্ষুদ্র হাড়টি খুলে ফেলেন এবং তা থেকে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেন। তিনি তা রসূলুল্লাহ (স)-থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আর এ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী—

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً -

("হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তার থেকে তার সঙ্গীনিকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁদের উভয় হতে অনেক পুরুষ ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন"—(সূরা নিসা—৪, আয়াত নং ১)-এর মর্মার্থ। তিনি বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের গোত্রে অগণিত সন্তানাদি সৃষ্টি করেন। আর তিনি আয়াত— يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ "তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন"—(সূরা যুমার, আয়াত সংখ্যা ৬)—তিলাওয়াত করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ পাক তাদের হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর তাদেরকে মৃত্যু দান করেছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে মায়ের গর্ভে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি তাদেরকে মৃত্যু দান করেন। আবার তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করেন। সুতরাং এ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا ("হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দুবার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করতেছি"—গাফির ৪০/১১)—এর মর্মার্থ। আর তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী— وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ...... (এবং আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম— নিসা; ৪/১৫৪; আহযাব; ৩৩/৭) তিলাওয়াত করেন।

তিনি বলেন, অর্থাৎ সেদিন। বর্ণনাকারী বলেন, আর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী—

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا

"(আর স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর সে অঙ্গীকার যা তিনি তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছেন। যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি"—মায়েদা : ৫/৭)—তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, এ সকল বক্তব্য ও মতামতের মধ্য হতে যা আমরা উদ্ধৃত করেছি এবং যাদের থেকে তা উদ্ধৃত করেছি এর প্রত্যেকটি মতের জন্য ব্যাখ্যাগত কারণ রয়েছে। বস্তুতঃ যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم -এর এ ব্যাখ্যা করেছেন তোমরা কোন বস্তুই ছিলে না—তাদের এ ব্যাখ্যার কারণ, তাঁরা আরবদের এরূপ উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। যেমন আরবগণ অবলুপ্ত বস্তু ও বিস্মৃত বিষয় সম্পর্কে বলে থাকে, هذا شئ ميت (এ একটি মৃত বস্তু), هذا امر ميت (তা একটি মৃত ব্যাপার)। তারা একে মৃত বলে বর্ণনা করার দ্বারা তার আলোচনা বিস্মৃত হওয়া ও লোকজন থেকে তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য করেন। অনুরূপ ভাবে তারা তার বিপরীতও বলে থাকেন : هذا امر حى (এ একটি জীবিত ব্যাপার) هذا ذكر حى (এ একটি প্রাণবন্ত আলোচনা)।

তারা এরূপ বর্ণনার দ্বারা এ উদ্দেশ্য করে থাকে যে, তা মানুষের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। যেমন, কবি আবূ নুখায়লা, সাদী বলেছেন,

فاحييت لى ذكرى وما كنت خاملا —

ولكن بعض الذكر انبه من بعض ٥

"অবশ্য আমি আমার স্মরণকে সজীব রেখেছি। কিন্তু আমি বিস্মৃত ছিলাম না। হাঁ, কোন কোন স্মরণ কোন কোন স্মরণ অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ।"

উল্লেখিত কবিতা দ্বারা কবি যা উদ্দেশ্য করেছেন তা হলো : আমার স্মরণকে আমি জীবন্ত করে রেখেছি। তথা মানুষের মধ্যে আমার খ্যাতিকে আমি অব্যাহত রেখেছি। এভাবে আমি হয়েছি আলোচিত, রয়েছি জীবন্ত, বিস্মৃত ও মৃতপ্রায় হওয়ার পর।

وكنتم امواتا —(আর তোমরা মৃত্যু ও নির্জীব ছিলে) এমনি ভাবে যাঁরা وكنتم امواتا -এর অর্থ করেছেন, তোমরা কিছুই ছিলে না, তাঁদের উক্তির উদ্দেশ্যও অর্থাৎ তোমরা ছিলে বিস্মৃত, ও অনুল্লেখ্য, কোথাও তোমাদের কোন আলোচনা ছিল না। আর এটাই ছিল তোমাদের মৃত্যুর অবস্থা। ঐ অবস্থাই ছিল তোমাদের মৃত্যু। তখন তিনি তোমাদের জীবন দিলেন—অর্থাৎ তোমাদের এমন ভাবে জীবন্ত মানুষ রূপে গড়ে তুললেন যাতে তোমরা আলোচিত ও পরিচিত হতে লাগলে। অতঃপর

তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন—তোমাদের রূহ কবয করার মাধ্যমে এবং জীবন লাভের পূর্ববর্তী অবস্থায় তোমাদের ফিরিয়ে নিবার মাধ্যমে। অর্থাৎ তোমাদের জীবিত করবেন তোমাদের দেহগুলিকে পূর্বাকৃতি ফিরিয়ে দিয়ে, সেগুলিতে আত্মা প্রবিষ্ট করে এবং মেরে ফেলার আগে তোমরা যেমন ছিলে, তেমন পূর্ণাংগ মানব রূপে রূপান্তরিত করে। যার ফলে তোমরা হাশর ও পুনরুত্থান কালে পারস্পরিক পরিচয় সূত্র খুঁজে পাবে।

আর উল্লেখিত আয়াতে মৃত্যুর ব্যাখ্যায় যারা বলেছেন, দেহ হতে আত্মার বিচ্ছিন্নতা প্রয়োগ করেছেন তাদের বক্তব্যের ব্যাখ্যা এমন হওয়াই সমীচীন যে, তারা وكنتم امواتا আয়াতাংশকে কবরে মৃতদের জীবিত করার পরে কবরবাসীদের প্রতি সম্বোধন সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা অতিশয় দুর্বল। কেননা এখানে ভংর্সনা হলো পূর্বকৃত অন্যায়ের কারণে আর কবর জগতে পৌঁছার পর তিরস্কার করার অর্থ দাঁড়ায় বিগত অবহেলা-অবজ্ঞা ও অপকর্মে হুমকী প্রদান করা। কারণ মৃত্যুর পরে তওবার সুযোগ থাকে না। كيف تكفرون الخ কিভাবে তোমরা আল্লাহ্র নাফরমানী করো, অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিলো না। এ আয়াত নাযিল করার উদ্দেশ্য বান্দাদের অনুতাপে উদ্বুদ্ধকারী তিরস্কার এবং পাপ ও অবাধ্যতা হতে পুণ্য ও আনুগত্যের দিকে, ভ্রান্তি ও বিমুখীতা হতে হিদায়াত ও আল্লাহ্মুখী হওয়ার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী সতর্কবাণী উচ্চারণ করা। মৃত্যুর পরে কবরে অবস্থান কালে ইনাবাত ও আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হওয়ার অবকাশ নাই মৃত্যুর পর তওবা করার সুযোগ থাকে না।

আর আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদা (রঃ) উক্তি 'তারা তাদের পিতৃঔরসে মৃত ছিল'—এর অর্থ পিতৃঔরসে তারা ছিল প্রাণবিহীন বীর্য। সুতরাং তারা ছিল অন্যান্য প্রাণবিহীন জড় জগতের যাবতীয় বস্তুর সমপ্রকৃতি সম্পন্ন। অতএব, মহান আল্লাহ্ কর্তৃক সেগুলিকে জীবন দেয়ার অর্থ হল, সেগুলিতে রূহ প্রবিষ্ট করা এবং জীবন দানের পরে তাঁর মৃত্যু দানের অর্থ হল রূহ কবয করে নেওয়া। আবার পরবর্তীতে তাদেরকে জীবন দানের অর্থ হল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের দেহে পুনরায় রূহ ও আত্মা প্রবিষ্ট করানো। আর তা হবে প্রতিশ্রুত (কিয়ামত) দিবসে—সৃষ্ট জগতের পুনরুত্থান ও শিংগায় ধ্বনি দেওয়ার দিন।

ইবনে যায়দ (রঃ) এর তাফসীর প্রসংগ : এ আয়াতের তাফসীরে প্রদত্ত ইবনে যায়দে (রঃ) উক্তির উদ্দেশ্য তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। তা এই যে, তাঁর মতে প্রথম বারের মৃত্যু দান হল হযরত আদমের (আঃ) ঔরস হতে বান্দাদের নিষ্কাশণ ও উৎপাদনের পরে প্রতিটি বান্দাকে তার পিতার ঔরসে পুনস্থাপন করা। আর এর পরবর্তী জীবন দান হল মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে বান্দাদের দেহে রূহ ফুঁকে দেওয়া। দ্বিতীয় বারের মৃত্যুদান হল কবরের মাটিতে ফিরে যাওয়া এবং পুনরুত্থান পূর্বকাল পর্যন্ত বারযাখে অবস্থানের উদ্দেশ্যে তাদের রূহ কব্য করে নেওয়া। আর তৃতীয় ও শেষ বারের জীবন দানের অর্থ কিয়ামতের পুনরুত্থান ও হাশর-নশরের উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে পুনরায় রূহ ফুঁকে দেওয়া। কিন্তু চিন্তা-শীল-পর্যালোচনাকারী গভীর চিন্তার পরে এই ব্যাখ্যার যথার্থতা মেনে নিতে পারে না। কারণ এই ব্যাখ্যা প্রদানে ইবনে যায়দ (রঃ) যে আয়াতের উদ্ধৃতির আশ্রয় নিয়েছেন, সে আয়াতের বাহ্যিক ভাষ্যও এর বিপরীত। সে আয়াত খানি হল কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব দর্শনে ভীত-বিহবল বান্দাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাক সমীপে পেশকৃত আরজীর বিবরণ যা পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন—ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين "হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদের দু'বার জীবন

দিয়েছেন, আর দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন"——(৪০:১১)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায়ও ইবনে যায়দ (রঃ) অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাদের তিনবার জীবন দিয়েছেন এবং তিনবার মরণ দিয়েছেন।

আমাদের মতে আদম (আ)-এর ঔরস হতে তার সন্তানদের আহরণ, উৎপাদন এবং তাদের নিকট হতে অংগীকার-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ বিষয়ক ইবনে যায়দ (রঃ)-এর বর্ণনা স্বস্থানে স্বীকৃত ও যথার্থ, কিন্তু তাই বলে বিষয়টি এ আয়াতদ্বয় (ربنا امتنا ও كيف تكفرون بالله)-এর ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। বরং বিষয়দ্বয় পরস্পর সংগতিবিহীন। কারণ মুফাস্‌সির ও দার্শনিকবর্গের মাঝে কেউ এমন দাবী করেননি যে, আল্লাহ পাক অংগীকার গ্রহণের দিন যাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তাদেরকে কবর গমন ও বারযাখে অবস্থানের পূর্বে প্রদত্ত প্রচলিত মৃত্যু ব্যতীত আর কোন মৃত্যু দিয়েছেন। তেমন কোন দাবীর প্রমাণ থাকলে না হয় আয়াতে ইবনে যায়দ (রঃ)-এর তিনবার জীবনদান সম্পর্কিত ব্যাখ্যা মেনে নেয়া যেত। কিন্তু প্রচলিত অর্থে মৃত্যুর পূর্বে উল্লেখিত রূপে কোন মৃত্যুর কথা প্রামাণ্য দাবীরূপে স্বীকৃত হয়নি।

কোন কোন মনীষী বলেছেন, প্রথম মৃত্যু হলো পুরুষের বীর্য তার দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে নারী গর্ভে অর্পিত হওয়া। পুরুষ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হতে মাতৃগর্ভে তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত হল এ বীর্যের মৃত্যুকালীন অবস্থা। অতঃপর আল্লাহ পাক ঐ বীর্যকে বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করাবার পর মাতৃগর্ভে তাতে রূহ প্রবিষ্ট করে দিয়ে তাকে একটি পূর্ণ অবয়ব মানবে পরিণত করবেন। এ হলো তাকে জীবন দেওয়া। অতঃপর তার রূহ কব্‌য করে তাকে পুনঃ মৃত্যু দিবেন এবং তখন তার অবস্থান হবে কবরে-বারযাখে—শিংগায় ফুঁ-দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বারযাখে অবস্থান তার মৃত্যুকালীন অবস্থা। শিংগায় ফুঁ দেয়ার পর তার দেহে আত্মার প্রত্যাবর্তন ও কিয়ামতের পুনরুত্থান কালে তার পূর্ণাংগ মানবাকৃতিতে উপস্থিতি হলো তাকে পুনঃ জীবন দান। সুতরাং এখানেও রয়েছে দু-দুবারের জীবন ও মরণ। প্রাণী বাচকের মৃত্যু সম্পর্কিত ধ্যানধারণাই সম্ভবতঃ এ অভিমতের প্রবক্তাদের এ অভিমত পোষণে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা তাদের মতে রূহধারী ও প্রাণী বাচকের মৃত্যু হলো দেহ হতে রূহ ও প্রাণের বিচ্ছিন্ন হওয়া। সুতরাং তারা দাবী করেছে যে, মানব দেহের প্রতিটি অংশ প্রাণ সম্পন্ন ও জীবন্ত; যতক্ষণ না তা তার প্রাণধারী মূল জীবন্ত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। অতএব কোনও অংগ তার প্রাণধারী ও জীবন্ত মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র ঐ অংগের হায়াত ও প্রাণ সংযোগ নিঃশেষ হয়ে সে মৃতে পরিণত হবে। যেমন মানব দেহের যাবতীয় অংগ প্রতংগ তথা দু'হাত কিংবা দু'পায়ের একখানি হাত বা পা কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলে যে মূল দেহ হতে কর্তন ও বিচ্ছিন্ন করা হলো তা জীবনযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন অংগ মৃত সাব্যস্ত হবে। কারণ রূহ সম্পন্ন অবশিষ্ট পূর্ণ দেহের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে এ অংগটি রূহবিহীন হয়ে পড়েছে। এ অভিমতের সারকথা, বীর্যও মানবদেহের একটি অংগ; যেমন হাত-পা মানবদেহের অংগ। হাত-পা মূল দেহ থেকে কর্তিত বা বিচ্ছিন্ন হলে যেমন রূহহারা মৃত সাব্যস্ত হয়; অনুরূপ প্রাণধারী প্রাণীর জীবন্ত দেহে অবস্থিতি পর্যন্ত বীর্যকে মূল দেহের জীবনে জীবন সম্পন্ন বলা হবে। কিন্তু প্রাণধারী দেহ হতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হওয়া মাত্র সে মৃত হয়ে যাবে। এই উক্তি ও ব্যাখ্যাও আয়াতের অন্যতম গ্রহণযোগ্য তাফসীর রূপে স্বীকৃত হতে পারে। যদি তা আল-কুরআনের স্বীকৃত ও পসন্দনীয় ব্যাখ্যাদানকারী তাফসীর বিশেষজ্ঞগণের কারো অভিমত ও উক্তি

সাব্যস্ত হয়। اموانا । وكنتم بالله تكفرون كيف আয়াতের ব্যাখ্যা বিষয়ে এ যাবৎ উল্লেখিত উক্তি-সমূহের মধ্যে সহজতর ও সর্বোত্তম উক্তি হলো হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত বক্তব্য। তাদের অভিমতের সারকথা হলো كنتم اموانا অর্থাৎ তোমরা অপরিচিত ও অনুল্লেখ্য রূপে মৃত এবং পিতৃ ঔরসে বীর্যরূপে নির্জীব নিস্পৃহ ছিলে। ফলে কেউ তোমাদের উল্লেখ করত না। কারণ কিয়ামত ময়দানে সমবেত করার আগেই আল্লাহ পাক কবরে তাদের জীবিত করে তুলবেন। তারপর হিসাব নিকাশের প্রয়োজনে তাদের সমবেত করবেন। এর প্রমাণ রয়েছে মহান আল্লাহর অন্য কালাম يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون "যে দিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে যেন তারা একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে" (৭০/৪৩)। এ তাফসীর ও ব্যাখ্যা গ্রহণের যুক্তি আমরা ইতিপূর্বে এ অভিমত পোষণকারীদের বক্তব্য উদ্ধৃতিকালে উল্লেখ করেছি, সে সাথে এর বিপরীত অভিমতগুলির অসারতাও সেখানে আমরা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত করেছি।

এই আয়াত হল সে সব লোকের জন্য ভৎর্সনা ও প্রচ্ছন্ন হুমকি, যারা মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে থাকে, অথচ তাদের বিষয়ে আল্লাহ পাক খবর দিয়েছেন যে, তাদের এ মৌখিক দাবী সত্ত্বেও বাস্তবে তারা ঈমানদার নয়। বরং তাদের এ ঘোষণার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল আল্লাহ পাক ও ঈমানদারদের সাথে প্রতারনা করা। তাই আল্লাহ তাদের তিরস্কার করলেন এ কথা বলে যে, আল্লাহর সাথে কুফরী করতে তোমরা লজ্জাবোধ করনা, অথচ এক সময় তোমরা ছিলে মৃত। অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করলেন। আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের ব্যাধিগ্রস্ত মনের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানকে লক্ষ্য করে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিলেন যে, তোমাদের কেন এত দুঃসাহস যে, তোমরা আল্লাহর অসীম কুদরতে বিশ্বাস কর না, এবং তোমাদের মৃত্যু দানের পর আবার জীবন দান, বিলীন করে দেয়ার পর পুনঃ অস্তিত্ববান করা এবং তোমাদের আমলের বিনিময় দানের উদ্দেশ্য তাঁর দরবারে তোমাদের সমবেত করা যে তাঁর কর্তৃত্বাধীন রয়েছে—তা তোমরা স্বীকার করতে চাও না।

এই ভৎর্সনার পরপরই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের জন্য এবং তাদের পূর্বসূরী ইয়াহূদী ধর্মযাজকদের দেওয়া নিয়ামত ও প্রাচুর্যের বিবরণ দিয়েছেন, যে সব নি'য়ামত ও প্রাচুর্য তাদের ও তাদের পূর্ব পুরুষদের দেওয়া হয়েছিল পরিধি ও পরিমাণের বিশালতার সাথে। কিন্তু পরে তাদের পাপাচার, অপরাধ সংঘটন ও আনুগত্য বর্জন করে অবাধ্যতার পরিণতিতে বহু জনের ভাগ্য হতে অনেক নি'য়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। এই বিবরণের যোগসূত্র হল এই যে, এ সূরা (বাকারা)-র অনেক আয়াতে আল্লাহ পাকই য়াহূদী ও মুনাফিকদের সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ঘটনা বিবৃত করেছেন এবং বিষয়টির শুরুও নাযিল করেছেন—

ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون -

এ বিবরণ দ্বারা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য হল অবিলম্বে তাদের উপরে শাস্তি নেমে আসার ব্যাপারে সতর্ক করা—যেমন তাদের পূর্বসূরী অপরাধ প্রবণ লোকদের উপরে অবিলম্বে আযাব নেমে এসেছিল। এবং তাদের বাসস্থানে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দুর্যোগ দুরবস্থা জেঁকে বসার ব্যাপারে ভীতি

প্রদর্শন করা-যেমন তাদের পূর্বগামীদের উপরে জেঁকে বসেছিল। সেই সঙ্গে এ বিধানের সাথে তাদের পরিচিত করে তোলা যে, আল্লাহ্‌র পানে ধাবিত হওয়ার মাঝেই নিহিত রয়েছে নাজাত ও মুক্তি এবং অবিলম্বে তওবা করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে কিয়ামতের আযাব থেকে নাজাত ও পরিত্রাণ।

এ পর্যন্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে বিদ্যমান নি'মাতের যা তারা ভোগ করছিল। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক আলোচনা আরম্ভ করেছেন –(ক) আমাদের সকলের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের (জন্ম) বৃত্তান্ত, (খ) তাঁকে প্রদত্ত অফুরন্ত ইযযত-মর্যাদা ও অফুরন্ত জান্নাতী নি'মাত ভান্ডার, (গ) প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করায় এবং তাঁর সাথে অবাধ্যতার আচরণ যথাক্রমে হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর চিরশত্রু ইবলীসের উপরে আপতিত আশু বিপদ ও শাস্তির বৃত্তান্ত; (ঘ) তওবা ও ইনাবাত এবং আল্লাহগামী হওয়ার ফলে হযরত আদম (আঃ)-কে রহমাতে আচ্ছাদিত করার বৃত্তান্ত এবং (ঙ) তওবার অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখানের ফলে ইবলীসের প্রতি বর্ষিত আশু লা'নাত ও অভিশাপ বার্তা এবং চিরকালীন স্থায়ী আযাব রূপে স্থিরীকৃত শাস্তির বিবরণ। ঐ বিবরণের উদ্দেশ্য হল তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পানে ধাবিত লোকদের বিধান ও তওবা-ইনাবাতে অনীহা অহংকারীদের বিষয়ে ফয়সালার ঘোষণা দেওয়া–যাতে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার হয়ে যায় এবং আইন প্রয়োগের অবকাশ সৃষ্টি হয়। আর একটি উদ্দেশ্য হল জ্ঞানের দাবীদার বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকারী বিশেষত আহলে কিতাবকে হযরত আদমের (আঃ) ঘটনাবলী এবং পরবর্তী সংশ্লিষ্ট ঘটনাপঞ্জী উল্লেখের মাধ্যমে গভীর চিন্তা ও উপদেশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। কারণ এ ঘটনাগুলো আহলে কিতাবের জ্ঞান বিষয় অথচ মূর্তি পূজারী নিরক্ষর উম্মী মুশরিকরা এ বিষয়ে ছিল নিরেট মূর্খ। তাই বিষয়টি দ্বারা চাপ সৃষ্টি করা যায় অন্যান্য উম্মাতকে বাদ দিয়ে শুধু কিতাবীদের উপরেই।

মোটকথা এসব ঘটনা সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবগত করালেন এবং তাঁর মুখে কিতাবধারী বিদ্বানদের সামনে তিলাওয়াত করালেন। উদ্দেশ্য, উম্মী নবীর মুখে এসব ঘটনা ও সংবাদ শুনে তারা অবগতি লাভ করবে যা তিনি আল্লাহ্‌র-ই প্রেরিত রসূল এবং তাঁর আনীত যাবতীয় বিষয় আল্লাহ্‌রই তরফ থেকে প্রাপ্ত। কারণ নবী আলাইহিস সালামের পবিত্র মুখে বিবৃত এ সব বিষয় ছিল তাদের গোপন বিদ্যা ভান্ডার ও সুরক্ষিত গ্রন্থমালা এবং লুকায়িত গুপ্ত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত–যেগুলির অবগতির দাবী তারা কিংবা তাদের কিতাব অধ্যয়নকারী শিষ্যশাগিরদ ব্যতিরেকে অন্য কেউ করতে পারেনি। আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে একথা সর্বজন বিদিত ছিল যে, তিনি কখনো অক্ষর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, কখনো তাদের পুঁথি-পুস্তক পাঠ করেননি এবং এমনকি তাদের মধ্য হতে কারো সঙ্গে-সান্নিধ্যে উপবেশনকারী বা সহচরও ছিলেন না। তেমন হলে অবশ্য তাদের কিতাবপত্র হ চ কিংবা তাদের কারো শিষ্যত্ব বরণের মাধ্যমে আহরণের দাবী উত্থাপন করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হত।

কাফির-মুনাফিক-কিতাবীদের কুফরী এবং আল্লাহ্ পাকের সমীপে তাদের অপরিহার্য আনুগত্যরূপ শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা বর্জন সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি নি'মাত বর্ষণ অব্যাহত

রেখেছেন। ছায়ারূপে বিরাজমান এই নি'য়াত ধারার বর্ণনা প্রদানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন

هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا ق ثم استوى الى السماء فسوٰهن سبع
سموٰت ط وهو بكل شيئ عليم o

তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"

তিনিই তাদেরই নিমিত্তে যমীনে যাবতীয় সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। কারণ ভূমণ্ডল ও তার বুকে সব কিছুই মানব জাতির জন্য উপকারী ও কল্যাণ কর। এ সবের দীনি কল্যাণ হল, এই যে এগুলি তাদের সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালকের একত্ববাদের প্রমাণ স্বরূপ। জাগতিক কল্যাণ হল এই যে, সব বিষয় জীবিকা নির্বাহের উপায় এবং প্রতিপালকের আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশিত ফরয বিষয়গুলি সাব্যস্ত করার মাধ্যম। এ মহান উদ্দেশ্য সাধনেই তিনি ইরশাদ করেছেন—"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরই কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সব কিছু। আয়াতের هو শব্দটি একটি সর্বনাম। এ তৃতীয় পুরুষ একবচন সর্বনাম দ্বারা নির্দেশিত বিশেষ্য হল كيف تكفرون بالله আয়াতে মহান সৃষ্টিকর্তার নাম জ্ঞাপক আল্লাহ শব্দটি, আর মহীয়ান সত্তার কোন সৃজনযোগ্যকে সৃজনের অর্থ হল অস্তিত্বহীনতার অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিষয়টিকে অস্তিত্ববান করে তোলা। ما (মা) শব্দটি الذى (ইসমে মাওসূল) অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং এ বিশ্লেষণ অনুসারে উল্লেখিত কালামের তাফসীর হবে— কিভাবে তোমরা আল্লাহর নাফরমানী করছ। অথচ অবস্থা এই যে, ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে তোমাদের পিতৃ ঔরসে (প্রাণহীন) বীর্যরূপে, অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন্ত মানব আকৃতি দান করলেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু-মুখে পতিত করলেন। অতঃপর কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং হাশরের দিনের বিচার-আচার ও ছাওয়াব-আযাবের জন্য তিনি তোমাদের জীবন দানকারী ও পুনরুত্থানকারী হবেন। তিনিই পৃথিবীর বুকে তোমাদের জীবিকার উপকরণ দান করেন এবং তাতে তাঁর একত্ববাদের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

বাক্য বিন্যাস: كيف শব্দটি প্রধানত অবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখানে সে অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বিস্ময় ও ভৎর্সনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেন তিনি ইরশাদ করছেন—আফসোস! কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করো? যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন فاين تذهبون (সুতরাং তোমরা কোথায় যাবে" সূরা তাকভীর ৮১, আয়াত সংখ্যা ২৬)। وكنتم امواتا فاحياكم বাক্য حال ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। তবে এর শুরুতে قد শব্দটি উহ্য রয়েছে। দলীল ও নির্দেশক থাকায় قد শব্দটিকে উহ্য রাখা হয়েছে। ইতিবাচক অতীতকালীন ক্রিয়া দ্বারা গঠিত বাক্য حال রূপে ব্যবহৃত হলে তার পূর্বে একটি قد (মাযীতে হাল-এর নিকটবর্তী সাব্যস্তকারী অব্যয়)-এর চাহিদা যুক্ত হবে। যেমন আল্লাহ পাকের কালাম او جاؤ وكم حصرت صدورهم। ("অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে যে, যখন তাদের মন সংকোচিত হয়ে যায়"—সূরা নিসা—৪, আয়াত—৯০)

৩৬—

আয়াতে মূলতঃ تلد حضرت صدو رهم হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুরূপ, পশুপালের মালিককে আরবীর প্রচলিত বাক্যে তুমি বলতে পার اصبحت كثرت ماشيتك যার মূল রূপ ছিল... تلد كثرت (তুমি আজকাল বেশ পশুর মালিক হয়ে গিয়েছো)।

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ০ আয়াতে আমি যে তাফসীর পেশ করেছি, হযরত কাতাদা (রহ) ও অনুরূপ অভিমত পেশ করেছেন।

কাতাদা (রহ) হতে ... هو الذى خلق لكم-এর তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, হাঁ, আল্লাহ পাক তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন পৃথিবীর সবকিছু।

ثم استوى الى السماء فسوا هن سبع سموت-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, ثم استوى الى السماء আয়াতাংশের তাফসীরে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, استوى الى السماء-এর অর্থ اقبل عليها তৎপ্রতি মনোযোগ করলেন। যেমন আরবী ব্যবহারে বলা হয় - كان فلان مقبلا على فلان ثم استوى على يشاتمنى او استوى الى يشا تمنى – অমুক অমুকের প্রতি মনোযোগী ছিল, অতঃপর আমার দিকে মুখ করে আমাকে গালাগালি করতে লাগল। এ বাক্যের استوى على বা استوى الى অর্থ اقبل মনোযোগ দিল। استواء শব্দটি اقبال ও মনোযোগ দেয়ার অর্থে ব্যবহারের দাবীদারগণ তাদের অভিমতের অনুকূলে কাব্যিক প্রমাণ পেশ করেছেন।

اقول و قد قطعن بنا شرورى — سوامد واستوين من الضجوع

"আমি বলছিলাম, যখন আমার বাহনগুলো (উট, ঘোড়া) বিপদাপদ অতিক্রম করেছিল দুর্বিনীত ভাবে আর তারা সোজা বেরিয়ে এসেছিল যাজু (চারন ভূমি) থেকে।" এর দ্বারা প্রমাণ পেশকারীদের দাবী হল এ পংক্তির استوين من الضجوع অংশ خرجن من الضجوع যাজু প্রান্তর হতে বেরিয়ে পড়েছে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরবী ভাষাভাষীদের দৃষ্টিতে خرجن ও اقبلن অভিন্ন অর্থবোধক।

তবে আমার মতে এ চরনের উল্লেখিত ব্যাখ্যা ত্রুটিযুক্ত। আমার ধারণায় استوين من الضجوع এর অর্থ হবে যাজু চারণভূমি বা রাত্রিবাস ক্ষেত্র থেকে বহির্গমনকারী বেশে রাস্তায় উঠে স্থির দাঁড়ানো। সুতরাং استوين অর্থ হবে استقمن (স্থির দাঁড়ানো)।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, মহান আল্লাহ পাকের জন্য استوى শব্দ تحول স্থান বা অবস্থান পরিবরতর্ন অর্থে প্রযোজ্য নয়। বরং তা কাজ শুরু করা অর্থে প্রযোজ্য। যেমন, খলীফা ইরাকের বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ثم تحول الى الشام 'অতঃপর সিরিয়ার দিকে ফিরলেন। এখানে সিরিয়ার দিকে ফেরার অর্থ সেখানকার সরকারী কর্মকাণ্ডে মনোযোগ দেয়া।

কারো কারো মতে استوى الى السماء অর্থ (استوت السماء) স্থির হল, যথাযথ রূপ পেল। যেমন, কবির ভাষায়—

اقول له لما استوى في ترابه - على اى دين قبل الراس مصعب

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যখন সে মাটির উপর স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তা হলে কোন ধর্মনীতির ভিত্তিতে মুসআব মাথায় চুমু খেলেন?" কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, استوى الى السماء অর্থ عمد الى السماء অর্থাৎ আসমানের কর্মসম্পাদনের সংকল্প করলেন। এ অভিমতের দাবীদারগণ দাবী করেছেন যে, (অর্থটি এতই ব্যাপক ব্যবহার সম্বন্ধে যে,) যে কোন কাজের নিমগ্নতা বর্জন করে অন্য কোন কাজ শুরু করলে নতুন কাজটি সম্পর্কে استوى لما عمد له বা استوى لما عمد اليه বলা যাবে। অর্থাৎ استواء শব্দমূলে 'লাম' (ل) বা 'ইলা' (الى) অব্যয় সংযোগে কাজ শুরু করার সংকল্প বুঝায়।

কেউ কেউ বলেন استواء যা ব্যবহৃত হয়েছে العلو অর্থে। আর العلو অর্থ হল ارتفاع যা উর্ধগমন, উর্ধারোহণ। এ অভিমত পোষণকারীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। রবী ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত : ثم استوى الى السماء অর্থ ارتفع الى السماء আকাশ মুখে উর্ধগমন করলেন বা আকাশের উপরে উঠলেন। তবে علو ও ارتفاع দ্বারা استواء-এর ব্যাখ্যা প্রদানকারীগণ এর কর্তা অর্থাৎ আসমানের উপরে কে গমন করলেন—এ বিষয় একাধিক বক্তব্য রেখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, যিনি আসমানের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন ও অবস্থান গ্রহণ করেছেন, তিনিই আসমানের সৃষ্টিকর্তা। আর কারো কারো মতে ত নয়, বরং উর্ধারোহণকারী হল সেই বাষ্পীয় স্তর ও ধুঁয়া যাকে আল্লাহ্ পাক যমীনের জন্য আসমান ও চাঁদোয়ারূপী ছাদ নির্ণয় করেছেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আরবী সাহিত্যে استواء যা বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন (১) পুরুষের পৌরুষ ও যৌবন শক্তি পরিপক্ক হওয়া ও পরিণত রূপ লাভ করা। এরূপ ক্ষেত্রে বলা হয় استوى الرجل সে এখন পূর্ণাংগ পুরুষ ও পরিপূর্ণ সক্ষম যুবক। (২) অবিন্যস্ত ও কঠিন বিষয় উপকরণের বিন্যস্ত ও সহজ-সাবলীল রূপ লাভ করা। এরূপ ক্ষেত্রে বলা হয়— استوى فلان لامره সে তার অবিন্যস্ত ও ছড়ানো কাজগুলি গুছিয়ে নিয়েছে। এ অর্থেই কবি তিরমাহ ইবনে-হাকিম বলেছেন—

طال على رسم مهدد ابده — عفا واستوى به بلده

(বিধ্বস্ত স্মৃতিভিটার তার বিরক্তিপূর্ণ অবস্থান সুদীর্ঘ হল, আর তা মুছে বিলীন হল; আর (তখন) তার বসতনগর যথার্থ বিন্যস্ত হল)। এখানে استوى অর্থ হবে استقام به।

(৩) কোন কিছু করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা বিষয় অভিমুখী হওয়া। যেমন বলা হয়— استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوئه بعد الاحسان اليه (অমুক অমুকের সাথে সদাচরণ করার পর এমন আচরণ শুরু করেছে যা তার কাছে অপসন্দনীয় ও পীড়াদায়ক)।

(৪) নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা। যেমন আরবী ব্যবহারে استوى فلان على المملكة সে রাজক্ষমতা দখল করেছে— অর্থাৎ রাজ্যের যাবতীয় ব্যাপার স্বীয় আয়ত্বে ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে।

(৫) উন্নত হওয়া ও উপরে উঠা : যেমন, استوى فلان على سريره সে তার পালংকে চড়েছে। অর্থাৎ স্বীয় উচ্চাসনে জেঁকে বসেছে ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

আল্লাহ্ পাকের কালাম ثم استوى الى السماء আয়াতে প্রযোজ্য সর্বাধিক বিশুদ্ধ অর্থ হল 'তিনি আসমানসমূহের উপরে উঠলেন এবং উন্নত হয়ে স্বীয় কুদরতে সেগুলির সৃজন, বিন্যাস, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করে সেগুলিকে সাত আসমানরূপে সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ্ পাকের কালাম ثم استوى الى السماء আয়াতের উল্লিখিত অর্থ উর্ধারোহণ আরবী ভাষার পূর্ণ অনুকূলে। কিন্তু কেউ কেউ এ অর্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ উর্ধগমনের পূর্বে আল্লাহ্ পাকের জন্য 'নিম্ন অবস্থান' অপরিহার্য সাব্যস্ত হওয়ার আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এ ব্যাখ্যা থেকে দূরে পলায়নে তৎপর হয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তিনি পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারেননি। বরং তাঁর এ অপসন্দনীয় ব্যাখ্যার তুলনায় অখ্যাত এক ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি বৃষ্টি থেকে পালিয়ে নালায় পতিত হয়েছেন। কারণ, তিনি এ ক্ষেত্রে অর্থ করেছেন اقبل অভিমুখী ও অগ্রবর্তী হলেন। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, তা হলে কি তিনি ইতিপূর্বে আসমানের প্রতি প্রতিমুখী বা পশ্চাদমুখী ছিলেন, আর তার পরে অভিমুখী হলেন? সে ক্ষেত্রে যদি জবাব দেয়া হয় যে, এ অগ্রগমন ও অভিমুখ যাত্রা দৃশ্যতঃ ও দেহজ নয়, বরং তা তত্ত্বগত ও রূপক অর্থাৎ পরিচালন ও তত্ত্বাবধানরূপে হয়েছে। তা হলে আমরা বলব যে, 'উর্ধগমন ও উন্নত হওয়া' অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে ও আপনি 'প্রভাব সৃষ্টি ও প্রতিপত্তি বিস্তার' বা 'রাজক্ষমতা প্রতিষ্ঠার' রূপক অর্থ অনায়াসে নিতে পারেন। স্থান ত্যাগ ও স্থানান্তররূপে উর্ধগমনের অর্থ নেয়া জরুরী নয়। এ ছাড়া, ভিন্নমত পোষণকারীরা যে কোন বক্তব্য মন্তব্য পেশ করবেন, আমি সরাসরি তা-ই তাদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিব, অপ্রাসংগিক আলোচনায় কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির আশংকা না থাকলে এ অনুচ্ছেদে আমি হকপন্থীদের প্রতিকূলে মত পোষণ-কারী যে কোন ব্যক্তির উক্তি-অভিমতের অসারতা প্রমাণে সচেষ্ট হতাম। তবে আমার বিবৃত উল্লেখিত খন্ডনমূলক দৃষ্টান্তে রুচিশীল ও সুবোধ পাঠকের জন্য শিক্ষণীয় নমুনা রয়েছে। এবং ইনশা'- আল্লাহ এ নমুনাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট মনে করি।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, কেউ যদি আমাকে এ প্রশ্ন করে যে, বলুন তো মহীয়ান আল্লাহ্‌র আসমানে উর্ধগমন আসমান সৃষ্টির আগে হয়ে ছিল না পরে? তা হলে জবাব হবে আসমান সৃষ্টির পরে; তবে তাকে সাত আসমান রূপে পূর্ণাঙ্গতা দান ও সুবিন্যস্ত করার আগে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا

"অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন তখন তা ছিল ধোঁয়ার কুন্ডলী বিশেষ, অতঃপর তিনি তাকে ও যমীনকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আনত (ও আজ্ঞাধীন) হও...।" এ استواء (অধিষ্ঠান) ছিল আসমানকে বাষ্প ও ধোঁয়ার আকৃতিতে সৃষ্টি করার পরে এবং তাকে সাত আসমান রূপে বিন্যস্ত করার আগে।

কেউ কেউ বলেছেন, যদিও তখন আসমান সৃষ্টি হয় নি, এতদসত্ত্বেও استواء الى السماء বলা হয়েছে রূপক অর্থে। যেমন কেউ কাউকে বলল, 'এ কাপড়টি বুনে দাও' অথচ লোকটির কাছে তো আর কাপড় নেই, আছে কতকগুলো সুতো। যেমন سواهن এ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন প্রস্তুত করলেন, সৃষ্টি করলেন, সুবিন্যস্ত ও সুপরিচালিত করলেন এবং সুগঠিত করলেন।

আরবী ভাষায় التسوية শব্দমূলে সঠাম ও সুগঠিত করণ (التقويم), সংস্কার সাধন. সুশৃংখল ও মার্জিত করণ (الاصلاح) এবং বুনিয়াদ রচনা ও ভিত্তি স্থাপন (التوطئة) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কেউ কারো কোন কাজ গুছিয়ে সুবিন্যস্ত ও সুচারু রূপে সম্পন্ন করে দিলে বলা হয় سوى فلان لفلان هذا الامر (অমুক অমুকের এ কাজটি সুচারু রূপে সমাধা করে দিয়েছে)। অনুরূপ ভাবে মহান আল্লাহ পাকের আসমানকে সুসামঞ্জস করার অর্থ হল তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে সেগুলিকে সুগঠিত রূপ প্রদান; তাঁর সংকল্প অনুসারে সেগুলির সুবিন্যস্ত পরিচালন এবং তাকে মণ্ডরূপী জমাট অবস্থা থেকে বিদীর্ণ করে বিকশিত করে তোলা।

রাবী ইবনে-আনাস (রা) থেকে বর্ণিত فسوا هن سبع سموت অর্থ সেগুলির গঠন ও সুসামঞ্জস করলেন। আর তিনি তো সব বিষয়ে সুবিজ্ঞ।

فسو هن-তে আসমানের অর্থ নির্দেশক সর্বনাম (هن) বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা سماء শব্দটি সমষ্টিবাচক। এর এক বচনে হল سماوة সুতরাং বলা যায় যে, শব্দটির একবচন ও বহুবচনে আকৃতিগত ব্যবধান بقرة ও بقر এবং نخلة ও نخل ধরনের গোল 'তা' (ة) সংযুক্ত একবচন ও 'তা' বিযুক্ত বহুবচনের ব্যবধানতুল্য। আরবী ব্যাকরণ বিধি অনুসারে যে সব সমষ্টিবাচক (اسم الجمع) শব্দ ও তাদের একবচনের মাঝে গোল তা (ة) যুক্ত হওয়া না হওয়ার মাধ্যমে ব্যবধান নিরূপিত হয়, সে শব্দগুলিতে পুং ও স্ত্রী লিংগ সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন, هذا بقر ও هذه بقر — هذا نخل ও هذه نخل ইত্যাদি। সুতরাং السماء শব্দটিও কখনো স্ত্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন السماء انفطرت هذه سماء আবার কখনো পুং লিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন السماء منفطر به কোন কোন আরবী ভাষাবিদ অভিমত পোষণ করতেন যে, السماء শব্দটি মূলতঃ একবচন হলেও তা বহুবচন (سموت) বুঝায়। তবে শব্দটি মূলতঃ স্ত্রীলিঙ্গের এবং কোথাও পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হলে তা স্ত্রী লিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহারের পদ্ধতিতে হবে। সুতরাং السماء منفطر به আয়াতাংশে শব্দটি পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহার করা আরবী ব্যাকরণ বিধির অনুকূল এবং তা আরবী কাব্য সাহিত্য দ্বারা সমর্থিত। যেমন :

فلا مزنة ودقت ودقها — ولا ارض ابقل ابقالها

(কোন মেঘ বারিধারা বর্ষায় না; আর কোন ভূমি তার ফসল ফলায় না)। এই পংক্তিতে ارض স্ত্রী লিঙ্গের শব্দ দ্বারা ابقل পুংলিঙ্গের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সা'লাবা গোত্রের আশা নামক কবিও বলেছেন :

فاما ترى لمتى بدلت — فان الحوادث ازرى بها

(যদি দেখতে পাও—আমার বাবরী চুলের রং বদল (হয়ে সাদা) হয়েছে। তবে তা বয়সের বোঝা নয়; বরং) কালের কুটিল চক্র ও উপর্যুপরি আঘাত সে (চুল)-গুলিকে বিবর্ণ করেছে)। এখানে حوادث শব্দ (বহুবচন হওয়ায়) স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য ازرى পুংলিঙ্গের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোন কোন মনীষী বলেছেন, একাধিক আসমান এবং যমীনের বিন্যাস একের উপরে আর একটির অবস্থান রূপে হলেও তাকে 'এক' রূপে আখ্যায়িত করা যায় এবং পুনরায় সে

'এক-কে তার খন্ড ও অংশ বিস্তৃতির দৃষ্টিতে বহুবচন রূপে ব্যবহার করা যায়। যেমন ثواب أسمال ثوب اخلاق (অনেক ছেঁড়া-ফাঁড়া একটি কাপড়) برمة أعشار (দশ খন্ড হয়ে যাওয়া ডেকচী) برمة أكسار (টুকরো টুকরো ডেকচী) এবং ثوب برمة জোড়াতালি দেয়া ডেকচী ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে একবচন হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য বহুবচনের বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা করা হয়েছে কাপড় ও পাত্রের চারপাশ ও বিভিন্ন অংশের প্রতি লক্ষ্য করে।

কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, মহীয়ান আল্লাহ্‌র আসমানে অধিষ্ঠান হয়েছিল তখন, যখন তা ছিল বাষ্পরূপে—অর্থাৎ তাকে সাত আসমানরূপে সুগঠিত করার আগে। অধিষ্ঠানের পরে তিনি তাকে সাত আসমানের আকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তা হলে (অধিষ্ঠানের আগেই) আপনি কোন যুক্তিতে তার বহুবচন রূপে দাবী করেন? জবাবে বলা যেতে পারে যে, বাষ্পরূপে থাকাকালেও তা সাত আসমান-ই ছিল; তবে তখন তা সুগঠিত ও বিন্যস্ত ছিল না। এ কারণে আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেছেন—"তাকে সাতটির রূপে 'সুগঠিত করলেন।"

মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়দ আমাকে বর্ণনা শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, সালামা ইবনুল ফযল আমাদের বর্ণনা শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, আল্লাহ পাক সব কিছুর আগে 'নূর ও জুলমাত (আলো ও আঁধার বা জ্যোতি ও তমশা) সৃষ্টি করে এ দুয়ের মাঝে ব্যবধান রচনা করলেন। তিনি আঁধারকে তিমিরাচ্ছন্ন কাল রাতে এবং নূর বা জ্যোতিকে উজ্জ্বল আলো ঝলমল দিনে পরিণত করলেন। অতঃপর 'দুখান' (মূল) হতে একের উপরে এক করে সাত আসমান সৃষ্টি করলেন, 'আল্লাহ্‌-ই সমধিক অবগত—তবে, প্রবল ধারণা এই যে, ঐ দুখান ছিল পানি থেকে উত্থিত 'বাষ্পীয় স্তর' যা ক্রমান্বয়ে স্বকীয় অবস্থানে স্থির কঠিন পদার্থের রূপ লাভ করে। কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি সেগুলিকে পরিকল্পিত ব্যবধান যুক্ত উপর্যুপরি রূপ (কিংবা কক্ষপথ যুক্ত রূপ) দান করেননি। তবে দুনিয়ার নিকটবর্তী (প্রথম) আসমানে তিনি আঁধারপূর্ণ রাত বিস্তৃত করলেন এবং রাতের অবসানে উজ্জল ভোর ও দিবসের ব্যবস্থা করে রাখলেন। ফলে তখন চাঁদ-সূরুজ ও তারকা বিহীন আকাশ তলে পালাক্রমে দিন রাত হতে থাকল। তখন তিনি ভূমিকে বিস্তৃত করে দিয়ে তার দেহে পাহাড় -পর্বতের পেরেক গেঁথে দিলেন এবং তার বুকে পরিমিত খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করে তাঁর সৃজন সংকল্পিত সৃষ্টি কুল ছড়িয়ে দিলেন। এ ভাবে তিনি চার দিনের পরিমাণ সময়ে যমীন এবং তাতে বিদ্যমান খাদ্য পানীয় ও প্রাণীকুল সৃষ্টির পর্যায় সমাপ্ত করলেন। তখন তিনি আসমানে অধিষ্ঠান নিলেন, আর তা তখন পর্যন্ত ছিল 'বাষ্পরূপী'। এবং তাদের পরিকল্পিত সুগঠিত আকৃতি প্রদান করে নিকটবর্তী প্রথম আসমানকে চাঁদ, সূর্য এবং তারকামালায় সাজিয়ে দিয়ে প্রতিটি আসমানের কাছে (তার দায়িত্বে অর্পিত বিষয়ে) ঐশী নির্দেশ পাঠালেন। এ ভাবে দু'দিনে আসমান সৃষ্টির পূর্ণাংগতা বিধান করলেন। ফলে মোট ছয় দিনের পরিমাণ সময়ে সব আসমান যমীন সৃষ্টি সমাপ্ত হল। সপ্তম দিনের স্বরচিত সাত আসমানের দিকে ঊর্ধ্বে মনোনিবেশ করে অধিষ্ঠান নিয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে লক্ষ্য করে বললেন—তোমাদের দু'জনের দ্বারা আমার উদ্দীষ্ট বিষয়গুলি পালনে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় অনুগত হও, সন্তুষ্ট চিত্তে স্থিরতা অবলম্বন কর। উভয়েই স্বতস্ফূর্ত জবাব দিল—আমরা অনুগত হয়ে হাজির হলাম।

ইবনে ইসহাকের এ বর্ণনা প্রমাণ করে যে, মহীয়ান আল্লাহ যমীন ও তাতে বিদ্যমান বস্তুসমষ্টি সৃষ্টির পরে যখন আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন তখনও আসমান বাষ্পীয় স্তর রূপে সাতটি সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। তারপরে আল্লাহ পাক আসমানের পূর্ণাংগ রূপ দিলেন। –যার বর্ণনা ইবনে ইসহাক দিয়েছেন।

আমার বক্তব্য প্রমাণে ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি পেশ করার উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত আল্লাহ পাকের আসমানের দিকে মনোনিবেশ করার ও অধিষ্ঠানের আগেও আসমান যে বাষ্পরূপে সাত সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল—এ বিষয়টি ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় অধিকতর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। দ্বিতীয়ত السماء শব্দটি আমাদের দাবীকৃত সমষ্টি বাচক বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত হওয়া এবং শব্দটিতে বহুবচনের অর্থ থাকার কারণেই যে-আল্লাহ পাক فسواهن-তে সর্বনামটি বহুবচন উল্লেখ করেছেন—এ বিষয়টি প্রমাণে ও ইবনে ইসহাকের বিবরণ অধিকতর স্পষ্ট।

এ ক্ষেত্রে কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, আসমানের সুগঠিত রূপ বিধানের আগেই যেহেতু তা সাত সংখ্যায় সৃষ্ট হয়েছিল, তা হলে যমীন সৃষ্টির পরে পুনরায় আসমান সৃষ্টি করার কথা বিবৃত করার কারণ কি? এ অবস্থায় আসমানের তাসবিয়া বা সুসামঞ্জস্য করার প্রকৃতি-ই বা কি ছিল? অর্থাৎ তা কি 'যমীনের আগেই আসমাদের সৃষ্টি হয়েছিল? শুধু এতটুকু অবগত করার উদ্দেশ্য না এতে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে?

জবাবে আমরা বলব যে, ইবনে ইসহাক থেকে গৃহীত রিওয়ায়াতে এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব বিদ্যমান। তদুপরি পূর্বসূরী মনীষীবৃন্দের আরও কতিপয় ব্যাখ্যা—বিবৃতি পেশ করে আমি বিষয়টিকে দৃঢ় ও সমৃদ্ধ করছি।

হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে এবং হযরত ইবনে মাসাউদ (রা) ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (আরও) কয়েকজন সাহাবী থেকে উল্লেখ রয়েছে যে,

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموت

মহান বরকতময় আল্লাহ পাকের আরশ পানির উপরে অবস্থিত ছিল। পানি সৃষ্টির আগে তিনি তাঁর ইলমে সৃজিত বিষয় ব্যতিরেকে (আমাদের জানা মতে) আর কোন কিছু সৃষ্টি করেন নি। তিনি তাঁর পরিকল্পিত সৃষ্টিকুল সৃজনের সংকল্প করলে পানি থেকে বাষ্প উত্থিত করলেন। বাষ্প পানির উপরে একটি স্তররূপে অবস্থান নিল। এ ধরনের উপরে অবস্থান প্রকাশের জন্য আরবীভাবার অন্যতম শব্দ হল—سما (যা বাবে نصر-এর سمو ধাতুমূল থেকে নির্গত) তখন থেকে সে বাষ্পের নাম দেয়া হল سماء যা উপরে অবস্থান করে। অতঃপর পানির অংশ বিশেষ শুকিয়ে তা দিয়ে একটি ভূমি-মণ্ডল তৈরী করলেন। পরে এ একটিকে বিদীর্ণ ও বিভক্ত করে সাতটি ভূমি বা পৃথিবী বানিয়ে ফেললেন। এ কর্মকাণ্ড হয়েছিল রবি ও সোমবার—এ দুই দিনে। ভূমি সৃষ্টি করলেন 'হূত' (الحوت মাছ)-এর উপরে। 'হূত' হল আল-কুরআনের সূরা কলমে উল্লেখিত 'নূন' (ن - والقلم) তথা বিশাল মাছ। এ মাছের অবস্থান পানিতে আর সমুদয় পানি রয়েছে একটি কঠিন ও পুরু শিলাখণ্ডের উপরে। শিলাখণ্ড রয়েছে একজন ফেরেশতার পিঠে। আর ফেরেশতার অবস্থান এক বিশাল বিস্তৃত নিরেট পাথরের উপরে। আর সে পাথর রয়েছে হাওয়ায়—(মহাশূন্যে ভাসমান)। হাকীম লুকমান সে পাথরের কথাই এ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'তা আসমানও নয়,

যমীনও নয়',—অর্থাৎ মহাশূন্যে। এক সময় মাছ নড়েচড়ে উঠলে যমীন থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল এবং ভূমিকম্প দেখা দিল। তখন পাহাড় পর্বত দিয়ে যমীনের নোংগর বেঁধে দিলে তা স্থিরতা লাভ করল। এতে পাহাড় যমীনের কাছে গর্ব করতে লাগল। আল্লাহ্ পাকও এর বিবরণ দিয়েছেন وجعل لها رواسى ان تميد بكم "পৃথিবীর জন্য অনেক নোংগরের ব্যবস্থা করলেন, যা তোমাদেরকে দৃঢ় করে রাখে।" তাই পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাক পাহাড় পর্বত, পৃথিবীবাসীর বাসিন্দাদের খোরাক, তার গাছপালা তরুলতা এবং আনুসংগিক বিষয়াদি সৃষ্টি করলেন। এ সব কাজ সমাধা হল—মঙ্গল ও বুধবার দুদিনে। এবিষয় সম্বলিত বর্ণনায় ইরশাদ করেছেন—

أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له اندادا ط ذلك رب العلمين ٥ وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها ـ

"তোমরাই কি কুফরী করে চলছো সে মহান সত্তার সাথে, যিনি ভূমি সৃষ্টি করেছেন দুদিনে, আর তোমরাই তাঁর শরীক ও প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করে চলছো? ঐ সত্তাই রব্বুল আলামীন—বিশ্বজগতের স্রষ্টা-প্রতিপালক। তোমাদের কল্যাণে তিনি সে পৃথিবীর উপরে পর্বতরূপী নোংগর স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত ছড়িয়েছেন" (সূরা হা-মীম সাজদা : ৯-১০)। অর্থাৎ গাছপালা তরুলতা উৎপাদন করেছেন। আর তাতে খোরাক—অর্থাৎ তার বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয়—পরিমিতরূপে প্রদান করেছেন। এ সব করেছেন চারদিনে, (আর এবিবরণ) প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের সরাসরি ও সোজা জবাব। অর্থাৎ আপনার কাছে প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে বলে দিন যে, এ ব্যাপারটি হুবহু এমনই ঘটেছে। অতঃপর তিনি আসমানের প্রতি মনোযোগ দিলেন। তখন তা ছিল বাষ্প। আর সে বাষ্প ছিল পানির উৎক্ষেপন প্রক্রিয়ার ফল। এ বাষ্পীয় স্তরকে একটি 'উপরি আচ্ছাদন' (আসমান) বানালেন। পরে তাকে বিদীর্ণ ও বিভক্ত করে সাতটি আসমান বানালেন। এ কাজ হল দুদিনে—বৃহস্পতি ও জুমু'আর দিনে, দিনটির নাম 'জুমু'আ'—'সমষ্টি ক্ষেত্র' হওয়ার কারণও এখানে নিহিত। কারণ আসমান-যমীনের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সম্মিলিত সমাপ্তি হয়েছিল এ দিনে। তখন আল্লাহ্ প্রতিটি আসমানে তাঁর নির্দেশের ওহী পাঠালেন, অর্থাৎ প্রতিটি আসমানে বসবাস ও অবস্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফেরেশতা দল সৃষ্টি করলেন এবং সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত ও অজ্ঞাত কত কিছু—যা সৃষ্টি করার ছিল, তা সৃষ্টি করলেন। এ সময় দুনিয়ার নিকবর্তী আসমানকে সাজিয়ে দিলেন গ্রহনক্ষত্রমালা দিয়ে। ফলে সে আসমান হল সুশোভিত এবং শয়তানের কবল হতে সুরক্ষিত মাহাফিজখানা। পরিকল্পিত বিষয়াদির সৃষ্টি সমাপনান্তে তিনি মনোযোগ দিলেন আরশে।

এ উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত একটি বিষয়ে ছয় দিনে সৃষ্টি করা-র প্রমাণ রয়েছে। অন্য এক আয়াতে রয়েছে—(الانبياء : ২১/৩০) كانتا رتقا ففتقناهما "আসমান ও যমীন ছিল জমাটবদ্ধ।—ছয় দিনে আসমান যমীন (ইত্যাদি) সৃষ্টি করার সময় ঐ দুটিকে বিদীর্ণ ও বিভক্ত করে (সাত সাতটি করে বানিয়ে দিলাম)।" আল্লাহ পাকের বাণী هو الذى خلق لكم ما فى لأرض جميعا-এর ব্যাখ্যা ثم استوى الى السماء প্রসংগে মুজাহিদ (রহ) বলেন, আসমানের আগে যমীন সৃষ্টি করলেন,

যমীন সৃষ্টি হলে তা থেকে বাষ্প-ধোঁয়া উঠতে লাগল। এ বিষয়ের বিবরণে আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ "অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোযোগ দিয়ে সেগুলিকে সাতটি আসমানরূপে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত করলেন।" অর্থাৎ এক আসমান অন্য এক আসমানের উপরে এবং এক যমীন অপর যমীনের নীচে।

কাতাদা (রহ) فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন: একটি আকাশ অন্য একটির উপর এবং প্রতি দুই আকাশের মাঝে দূরত্বের ব্যবধান হল পাঁচশত বছরের ভ্রমণ পথ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আসমানের আগে যমীন আবার যমীনের আগে আসমান সৃষ্টির উল্লেখ যুক্ত আলোচনা প্রসংগে। তিনি বলেছেন—"তা হল এ ভাবে যে, আল্লাহ পাক যমীনকে তার অভ্যন্তরীণ ভাণ্ডার সহ আসমানের আগে সৃষ্টি করেন। তবে তখন তাকে বিস্তৃতি দেন নি। তারপর আসমানে অধিষ্ঠান গ্রহণ করে তাকে সাতটি আসমান রূপে সুবিন্যস্ত করেন। এরপর যমীনের বিস্তৃতি দান করেন। এ বিবরণ বিবৃত হয়েছে আল্লাহ পাকের وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (النازعات: ৭৯/৩০) (তারপর যমীন-কে বিস্তৃত করে দিলেন) বাণীতে।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আল্লাহ পাক রবিবারে তাঁর সৃজন কর্ম আরম্ভ করে রবি ও সোমবার সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল সৃষ্টি করলেন; ভূমিতে বিদ্যমান খাদ্য সামগ্রী ও পর্বতমালা সৃষ্টি করলেন মংগল-বুধবারে। আসমানসমূহ তৈরী করলেন বৃহস্পতি-শুক্রবারে। এ ভাবে জুমুআ বারের শেষ অংশে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল—সৌরজগত—সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করে ঐ সময় 'ব্যস্ততার' সাথে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। এ মুহূর্তটিই কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত সময়।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, উল্লেখিত আয়াতটির মর্ম এই দাঁড়ায় যে, মহান আল্লাহই সে সত্তা, যিনি তোমাদের নি'মাত-প্রাচুর্যে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। নি'মাত স্বরূপে তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা আছে সব এবং অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যে কৃপা করে সব কিছু তোমাদের বশীভূত ও নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন যেন এগুলি দুনিয়ার বুকে তোমাদের কাছে আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ হয়। নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেগুলি তোমাদের উপভোগ-উপকরণ হয় এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালকের তাওহীদ-এর প্রমাণবাহী হয়। তারপর তিনি সাত আসমানের উপরে মনোযোগ দেন। তখনও তা ছিল বাষ্পীয় স্তর রূপে। তিনি তখন সেগুলির গঠন-বিন্যাস সমাধা করলেন এবং স্তর ও কক্ষপথবিশিষ্ট এবং সুদৃঢ় রূপে তৈরী করে সেগুলির কোনটিকে চন্দ্র-সূর্য-তারকা খচিত করলেন আর প্রতিটিতে তাঁর সৃজন পরিকল্পনা অনুসারে যা নির্ধারণ করার তা নির্ধারণ করে রাখলেন।

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-এর ব্যাখ্যা

هو (সে) সর্বনাম দ্বারা মহীয়ান আল্লাহ পাক স্বীয় সত্তাকে নির্দেশ করেছেন। بكل شيء عليم (সব বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত) দ্বারা ইতিপূর্বে উল্লেখিত মানব সৃষ্টি এবং মানব জাতির জন্য যাবতীয় বিষয় ও বস্তুর সৃষ্টি, পানি থেকে উত্থিত বাষ্প দিয়ে মযবুত সাত আসমান সৃষ্টি, প্রতিটি আসমানে বিদ্যমান বস্তু-নিচয়ের সৃজন এবং আসমান সৃজনের অভিনব প্রকৌশল প্রজ্ঞা—এ সবই আল্লাহর ইলমের বহিঃপ্রকাশ। আর মুনাফিক ও আহলে কিতাবভুক্ত নাস্তিকের দল

তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর, কিংবা যা গোপন কর; তোমাদের মুনাফিক শ্রেণী অন্তরে মিথ্যা কুফরীর ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়ে ও মুখে যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমানের দাবী করছ তোমাদের বিদ্বান শ্রেণী আমার রাসূলের আনীত নূর ও হিদায়াতের সত্যতা-যথার্থতা উপলব্ধি করেও যে মিথ্যার বেসাতি চালিয়ে যাচ্ছে এবং মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত রিসালত পরবর্তীদের কাছে প্রকাশ করা সম্পর্কীয় যে অংগীকার চুক্তি—নবুয়তের যথার্থতা ও চুক্তির বাস্তবতার অবগতি সত্ত্বেও—অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলছে এ সবের কোন কিছুই আল্লাহ্‌র 'ইলম হতে গোপন নয়। এগুলি তারা যেমন জানে, আল্লাহ্‌ও জানেন। বরং আমি তো এ সব ব্যাপার সহ অন্যান্য সব বিষয়ে তোমাদের ও অন্যান্য সকলের সব বিষয়ে অবহিত। কারণ আমি সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। عليم শব্দটি عالم (জ্ঞানবান, বিদ্বান) অর্থে ব্যবহৃত। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, তিনিই সেই সত্তা যাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, عليم (আলীম) সেই সত্তা যিনি তাঁর জ্ঞানে পরিপূর্ণতার অধিকারী।

আল্লাহ পাকের বাণী :

(৩০) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

(৩০) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন : আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি, তখন তারা বলল : আপনি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করছেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আর আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করি। তিনি বললেন : আমি জানি তোমরা যা জান না।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, বসরার জৈনক আরবী ভাষাবিদ ধারণা করেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ-এর অর্থ وَقَالَ رَبُّكَ তাঁর এ দাবীর সারমর্ম হল إذ অব্যয়টি অতিরিক্ত এবং অব্যয়টিকে উহ্য রেখেই বিশুদ্ধ অর্থ পাওয়া যাবে।

তথাকথিত এ বিশেষজ্ঞ তাঁর এ দাবী প্রমাণে দু'জন কবির দু'টি পংক্তি পেশ করেছেন। প্রথমত আসওয়াদ ইবনে ইয়া'ফার-এর কবিতা :

فَإِذَا وَذَلِكَ لَا مَهَاهَ لِذِكْرِهِ — وَالدَّهْرُ يُعْقِبُ صَالِحًا بِفَسَادِ

(সে-ও ছিল জীবন, আর এ-ও জীবন; সে জীবনের আলোচনায় কোন উপকার নেই। কারণ যুগধর্ম হল কল্যাণের বিনষ্টতা নিয়ে আসা)। উক্ত বিশেষজ্ঞের মতে এ পংক্তির إذا অব্যয় অতিরিক্ত এবং পংক্তির অর্থ হল 'ঐ বিষয়টির উল্লেখে কোন কল্যাণ নেই।'

দ্বিতীয় পংক্তি হল কবি আবদে মানাফ ইবনে রাব আবদ হুযালীর

حتى اذا اسلكوهم في قتائدة — شلا كما تطرد الجمالة الشردا

(অবশেষে তারা যখন ওদের কুতাইদা-য় প্রবেশ করাল ওরা লেজ উঁচিয়ে দৌড়াল, যেমন উটের রাখাল পালহারা, ছন্নছাড়া উটকে তাড়া করে)। এ দাবীদারের মতে এখানেও اذا শব্দ অতিরিক্ত এবং মূল বক্তব্য حتى اسلكوهم।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, প্রকৃত ব্যাপার এ দাবীর বিপরীত। কারণ اذ একটি অব্যয় যা কর্মফল নির্দেশক এবং অনির্দিষ্ট কাল বুঝায়। সুতরাং বক্তব্যের অন্তর্নিহিত কোন ভাব-বিষয়ের নির্দেশক হতে পারে এমন কোন হরফকে বাতিল ও অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করা বিশুদ্ধ হতে পারে না। কারণ, শব্দটি تطول ও অনুগ্রহ প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার যে খ্যাতি রয়েছে—তা (নিকটবর্তী) বক্তব্য হতে বোধগম্য বিষয়ের দলীলরূপে হোক, কিংবা বিবৃত সমুদয় বক্তব্যের দলীলরূপেই হোক—এ উভয় প্রকার প্রয়োগ ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ অভিন্নই থেকে যায়—তাতে কোন হের-ফের হয় না। অথচ কবি আসওয়াদ ইবেন ইয়াফার-এর কবিতা সম্পর্কে যে তথাকথিত বিশেষজ্ঞের বক্তব্য আমি উদ্ধৃত করেছি—তাতে 'অনুগ্রহ প্রকাশ' অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কোন বোধগম্য দিক নেই। বরং আমি তো বলেছি যে, বক্তব্য হতে শব্দটিকে উহ্য সাব্যস্ত করলে কবি আসওয়াদের উদ্দীষ্ট অর্থই ব্যহত হয়ে পড়বে। কারণ, اذا দ্বারা কবির উদ্দেশ্য হল—"জীবনের যে পরিস্থিতিতে বর্তমানে আমরা রয়েছি এবং যা অতিবাহিত হয়েছে" আর ذلك দ্বারা কবি ইংগিত করেছেন তার জীবন সম্পর্কে প্রদত্ত পূর্ববর্তী বিবরণের প্রতি। সে আলোচনায় কোন ফায়দা নেই—অর্থাৎ তাতে কোন স্বাদ বৈচিত্র নেই এবং নেই কোন শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ব। ফলে তার কল্যাণময় অংশের স্থলে অকল্যাণের কারণ ঘটায়। আর অনুরূপ অর্থেই বিবৃত হয়েছে 'আবদে মানাফ ইবনে রাবু-এর পংক্তি حتى اذا اسلكوهم في قتائدة — شلا এ। এক্ষেত্রে ও اذا শব্দটি তুলে দিলে অর্থ বিকৃতি ঘটতে বাধ্য। কারণ, পংক্তিটির অর্থ হল—কুতাইদাঃ চারন ক্ষেত্রের কোথাও তাদের প্রবেশ করিয়ে দিলে তারা অবাধ্য দুর্বিনীত পালের ন্যায় হয়ে পথ চলতে শুরু করে। তবে যেহেতু اسلكوهم — شلا বাক্যাংশ উহ্য শব্দ (سلكوا)-র অর্থ প্রকাশে সক্ষম এবং اذا সে অর্থের নির্দেশকরূপে বিদ্যমান রয়েছে, তাই তা উল্লেখ করা অপরিহার্য থাকে নি এবং তাকে উহ্যই রাখা হয়েছে।

এ ধরনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আরবদের বিলুপ্ত করণে অভ্যস্ত হওয়ার কথা আমার এ গ্রন্থে ইতি-পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি (এখানে দু'একটি নযীর পেশ করছি)। যেমন, নযর ইবনে তাওওয়ার এর কবিতায়

فان المنية من يخشها — فسوف تصادفه اينما

(মরন তাকেই ধরে, যে তার ভয়ে ভীত, পেয়েই বসবে তাকে, যেথায়ই হোক সে)—অর্থাৎ اينما ذهب যে দিকেই সে যাক না কেন। এখানে ذهب শব্দ বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপ, আরবদের

বহুল ব্যবহৃত উক্তি جئتك من قبل ومن بعد। (আগে ও পরে তোমার কাছে এসেছি।) মূল বক্তব্য ছিল من قبل ذالك এবং ومن بعد ذالك অর্থাৎ 'এর' আগে এবং 'এর' পরে। এখানে ذالك শব্দ বিলুপ্ত করা হয়েছে। اذا-র ক্ষেত্রেও অনুরূপ হয়ে থাকে। যেমন কেউ বলল, اذا اكرمك اخوك فاكرمه واذا لا فلا।(তোমার ভাই-বন্ধু তোমাকে 'ইযযত দিলে তুমিও তাকে 'ইয্যত দিবে; অন্যথায় নয়)। এ ক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য واذا لم يكرمك فلا تكرمه (সে তোমাকে ইয্যত না দিলে তুমিও তাকে ইয্যত দিও না।) এখানেও এ দীর্ঘ বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে। অনুরূপ-ই অবস্থা হয়েছে অন্য এক কবির পংক্তিতে فاذا وذالك لايضرك ضره فى يوم اسأل نائلا او انكرا। (এ হেন পরিস্থিতি আর উল্লিখিত অবস্থায় তার অনিষ্ট সাধন তোমাকে স্পর্শ করবে না। দিনটি কোন বড় দান-দক্ষিনা বা অঢেল সম্পদ প্রাপ্তির দিন হোক, কিংবা নিঃস্বতা চরম দুরবস্থার দিন হোক)। এ পংক্তির اذا-ও পূর্বোল্লিখিত কবি আসওয়াদের পংক্তির দৃষ্টান্ত এবং তদনুরূপ অর্থবহ। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ পাকের কালাম واذ قال ربك للملائكة-এর অর্থের অবস্থাও অনুরূপ। এখানে اذ শব্দটিকে অপ্রয়োজনীয় এবং আয়াত হতে বিলুপ্ত সাব্যস্ত করলে আয়াতের অর্থ-ই বিকৃত হয়ে পড়বে এবং اذ অব্যয় দ্বারা নির্দেশিত বিষয় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তাহলে এখানে اذ অব্যয়-এর অর্থ কি এবং সে অর্থ গ্রহণকারী কে? পূর্ববর্তী কালামে এমন কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি যার সাথে اذ অব্যয় সম্পর্কিত করা যায়। জবাবে বলা যাবে যে, ইতিপূর্বে আমরা বলেছি আল্লাহ পাক كيف تكفرون بالله হতে পরবর্তী আয়াতসমূহ দ্বারা এক দল লোককে সম্বোধন করে তাদের ভর্ৎসনা করেছেন এবং তাদের নিজেদের ও পূর্ব পুরুষদের প্রতি আল্লাহ পাক যে নিয়ামত দান করেছেন তা সত্ত্বেও তাদের অপকীর্তি ও গোমরাহীতে দৃঢ় অবস্থিতির নিন্দা করেছেন এবং পূর্বপুরুষ সহ তাদের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতের ফিরিস্তি দিয়ে তাঁর কঠিন শাস্তির কথা এভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর প্রতি অবাধ্য আচরণের পরিণামে ধ্বংসে পতিত তাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করলে পূর্ব পুরুষদের ন্যায় তাদেরকেও ধ্বংস করে দিবেন। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্ট বিধানে সচেষ্ট হয়ে তওবা করলে তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, আল্লাহ পাক যে সব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো যমীনে যা কিছু আছে তা তিনি মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন।

আসমানে যা কিছু রয়েছে সবগুলোকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন, যথা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ এবং এতদ্ব্যতীত যা কিছু তাদের জন্যে, তথা সমগ্র মানবজাতির উপকারার্থে তিনি সৃষ্টি করেছেন অতএব আলোচ্য আয়াত كيف تكفرون بالله ... ثم اليه ترجعون এর অর্থ হলো—তোমরা আমার সেই নিয়ামতসমূহ স্মরণ করো যা তোমাদের দান করেছি। কেননা, আমি তোমাদের এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছি যখন তোমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না এবং পৃথিবীর সব কিছুই তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছি। আর আসমানে যা কিছু আছে তা তোমাদের জন্যই বিনাস্ত করে রেখেছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ইরশাদ করেছেন واذ قال ربك সুতরাং كيف تكفرون আয়াতের মর্ম এখানেও বিদ্যমান। পূর্ববর্তী আয়াত যেমন—"স্মরণ কর আমার নিয়ামত" যখন তোমাদের জন্য করলাম এত কিছু—অর্থের চাহিদা সৃষ্টি করে। এ আয়াতও স্মরণ কর আমার

অনুগ্রহ অবদান তোমাদের আদি পিতা আদমের প্রতি, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম যে, পৃথিবীর বুকে আমি প্রতিনিধি নিয়োগ করবো এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তুমি যা বলেছো, তার সমর্থনে আরবী ভাষায় কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? জবাবে বলা হবে, হ্যাঁ, এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন কবির ভাষায়

اجدك لن ترى بثعيلبات ولا بيدان ناجية ذمولا

ولا متدارك والشمس طفل ببعض نواشغ الوادى حمولا

(দোহাই লাগে, ছুআ'য়লাবাতে তুমি কোন দ্রুতগামী কোমল বাহন উষ্ট্রী দেখতে পাবে না বাইদানেও নয়; আর তুমি সাক্ষাত পাবে না উষা কালে উপত্যকার কোন নালার কাছে কোন হাওদাবাহীর)। এখানে ولا متدارك-কে পূর্ববর্তী বাক্যাংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, অথচ তার আগে তাকে সংযুক্তকারী কোন শব্দ ক্রিয়া নেই এবং এমন কোন অক্ষরও নেই যা অনুরূপ 'ইরাব' প্রদান করতে পারে; তেমন হলে না হয় সহজেই متدارك শব্দটিকে সে হরফের হরকতের অধীন করে দেয়া যেত, যেহেতু পূর্বে একটি لن যুক্ত নেতিবাচক ক্রিয়া রয়েছে, যা বক্তব্যের মর্মার্থ প্রকাশ করে। সুতরাং প্রকাশ্য শব্দের ভিত্তিতে উহ্য উক্তিকে উহ্যই রাখা হয়েছে এবং অর্থ প্রদান ও ইরাবের ক্ষেত্রে বাক্যটির সাথে উহ্য উক্তি উল্লেখ থাকায় এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ اجدك لن ترى بثعيلبات বাক্যটি اجدك لست براء অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই متدارك শব্দটি বিশেষ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে ترى-ক্রিয়ার অধীনে সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ধরে নেয়া হয়েছে যে, এখানেও যেন لست ক্রিয়া এবং ب অব্যয় বর্তমান রয়েছে, আর বাক্যটি لست بمدارك পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে واذ قال ربك আয়াতের অবস্থা উপরোক্ত পংক্তিটির অনুরূপ অর্থাৎ এ আয়াতে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের প্রতি এবং তাদের পূর্বপুরুষের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থ রয়েছে। সুতরাং واذ قال ربك এবং পরবর্তী আয়াত সমূহে বর্ণিত নিয়ামাত ও সে সবের ক্ষেত্র সমূহের বিবরণ পূর্ববর্তী وكنتم امواتا فاحياكم আয়াতের গূঢ় অর্থের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। কারণ, মূল মর্ম হলো "আমার উল্লেখিত নিয়ামতগুলি স্মরণ কর।

আর ফেরেশতাদের সামনে তোমাদের আদি পিতার সৃষ্টি ঘোষণার এ নিয়ামতটির কথাও স্মরণ কর। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, যেহেতু আগের আয়াত একটি اذ-এর চাহিদা প্রকাশ করে তাই পরবর্তী اذ-কে পূর্ববর্তী উহ্য اذ-এর সাথে সংযুক্ত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে—যেমন করা হয়েছে আরবী কবিতায়।

للملائكة-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, ملائكة শব্দটি ملك-এর বহুবচন, আরবদের ব্যবহারে একবচনের ক্ষেত্রে হামযা বিহীন (ملك) হামযা যুক্ত (ملأك)-এর চাইতে অধিক পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত। কারণ তারা একবচন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ملك من الملائكة বলে থাকে, অর্থাৎ হামযা বিলুপ্ত

করে দিয়ে পূর্ববর্তী 'লাম' হরফকে হরকত দেয়, যা শব্দটি হামযাযুক্ত থাকাকালে সাকিন ছিল। লামের হরকত যবর হওয়ার কারণ হল এই যে, এটি মূলতঃ বিলুপ্ত হামযার হরকত। কারণ আরবী-ভাষীরা কোথাও হামযা বিলুপ্ত করলে তার হরকতটি সরাসরি পূর্ববর্তী সাকিন হরফে স্থানান্তরিত করে থাকে, এরূপ শব্দেরই বহুবচন তৈরী কালে তারা আবার হামযাটি ফিরিয়ে এনে ملائكة ইত্যাদি উচ্চারণ করে। এ হামযা বিলুপ্তিকরণ আরবী ভাষার একটি সাধারণ রীতি আরবী-ভাষীরা অনেক শব্দেই এমন করে থাকে। তাই তারা অনেক হামযা যুক্ত শব্দে কখনো হামযা বিলুপ্ত করে দেয়, আবার কখনো হামযা সহ উচ্চারণ করে। যেমন رأيت এ শব্দের অতীত ক্রিয়া হামযা যুক্ত رأيت - رأيت ইত্যাদি। আর বর্তমান ক্রিয়ায় তারা বলে يرى - ترى - نرى ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় যে, يسأل (য়ুষালু) ও তার সদৃশ ওযন ক্ষেত্রে হামযা বিলুপ্ত হয়ে শব্দ উচ্চারিত হয়। এমনকি এ সব শব্দে একটি মূল হরফ হওয়া সত্ত্বেও হামযা থাকাটাই এখন বিরল ও পরিত্যক্ত উচ্চারণ হয়ে গিয়েছে। ملك ও ملائكة এর ক্ষেত্রে ও অবস্থা সেরূপই একবচনে হামযা বিলোপ করা আর বহুবচনে তা বিদ্যমান রাখাই এখন নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তবে একবচন কোথাও কোথাও হামযাসহও পরিদৃষ্ট হয়, যেমন কবি বলেছেন :—

فلست لانسي ولكن لملأك — تنحدر من جو السماء يصوب

(মানুষের তরে নহ তুমি বরং কোন পূত ফেরেশতার তরে নেমে আসে যে মহাকাশ থেকে ধীরে ধীরে)।" কেউ কেউ শব্দটির একবচনীয় রূপ مالك বলেছেন, তা হবে আরবী ভাষার ব্যবহৃত جبذ ও جذب এবং شأمل ও شمأل সদৃশ শব্দের তুলনীয় অর্থাৎ যে সব শব্দে হরফের পরিবর্তন হয়, সেখানে লক্ষণীয়। একবচন مالك হলে তার বহুবচন مالك হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আরবদের কাছ থেকে এ ধরনের বহুবচন আমি শুনেছি বলে মনে হয় না। তবে পূর্ববর্তী বহুবচন ملائكة-র ক্ষেত্রে ملائك (শেষে তা' (ة) বিহীন) শ্রুত হয়েছে। যেমন شمأل-এর বহুবচন شمائل ও شمائلة এবং مسمع-এর বহুবচন مسامع ও مسامعة হয়ে থাকে, কবি উমায়্যাতু ইবনুস্-সালত-এর কবিতায় এ দ্বিতীয় বহুবচনটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

وفيها من عباد الله قوم — ملائك ذللوا وهم صعاب

(সে নগরীতে রয়েছে আল্লাহ্‌র বান্দাদের এমন একটি গোষ্ঠী, যারা কোমলতায় ফেরেশতা তুল্য, অথচ শক্তি সাহসে তারা দুর্ধর্ষ)। ملائك শব্দের মূল অর্থ রিসালাত ও পয়গাম, যেমন 'আদী ইবনে যায়দ আল-'উবাদীর কবিতায় রয়েছে।

ابلغ النعمان عني ملأكا — انه قد طال حبسي وانتظار

(নু'মানকে আমার পক্ষ হতে পয়গাম পৌঁছে দাও-আমার প্রতীক্ষার দিন দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে)। এ পংক্তিতে শব্দটি (ভিন্ন উচ্চারণ) الكا, রূপে ও উদ্ধৃত হয়েছে, যারা ملكا পড়েছেন, তাদের

মতে শব্দটি الوكة ملك لأك ব্যবহার রীতি হতে مفعل ওযনে গৃহীত এবং ইস্মে মাফউল—(কর্ম বিশেষ্য) অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ একটি 'মালুআকা' পত্র পাঠিয়েছে, আর ملك হলে শব্দটি الكت الوكة ব্যবহারের مفعل ওযনে 'মা'লাকাহ্' পত্র পাঠানো অর্থে ব্যবহৃত, (অর্থাৎ ملاكة - مألكة - ألوك এসব শব্দ পত্র অর্থে সমার্থক) লাবীদ ইবনে আবু রাবীআর কবিতায়

وغلام ارسلته أمه — بألوك فبذلنا ماسأل

(কোন কিশোরকে তার মা পাঠালো একটি 'চিরকুট' দিয়ে; আমি তাকে প্রার্থীত সম্পদ দিয়ে বিদায় করলাম)। এপংক্তির الوك শব্দ উপরে বর্ণিত ألك ব্যবহার থেকে গৃহীত। বনু যুবইয়ান গোত্রের কবি নাবিগাহ্ তার কবিতায়

ألكني يا عيين اليك قولا — ستهديه الرواة اليك عني

(হে উয়াইনা! আমার পক্ষ হতে একটি পয়গাম গ্রহণ কর; বর্ণনাকারীরা তা তোমার নিকটে নিয়ে যাবে)। আর হাসু হাস্ গোত্রের কবি আবদ তার কবিতায় বলেছেন,

ألكني اليها عمرك بالله يافتي — بآية ماجاءت الينا تهاديا

"হে যুবক'! আমার পক্ষ থেকে তাকে পয়গাম পৌছে দাও—সে আয়াত ও নিদর্শনের যা এসেছে আমাদের পরিচালনা করতে।" কবির উদ্দেশ্য-তাঁকে আমার পয়গাম পৌছে দাও। যেহেতু শব্দটিতে 'রিসালাত' ও পয়গাম পৌছাবার অর্থ রয়েছে, তাই পয়গামবাহী ফেরেশতাদের 'মালায়িকাহ্' নাম দেয়া হয়েছে।

اني جاعل في الارض خليفة-এর ব্যাখ্যা।

এ আয়াতের جاعل শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে جاعل শব্দ فاعل অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা এ মত পোষণ করেন, তাদের বক্তব্য—

হযরত হাসান (রহ) ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত, আল্লাহপাক ফেরেশতাদের বললেন اني جاعل في الارض خليفة অর্থাৎ তিনি তাদের বললেন اني فاعل আমি একাজ করতে যাচ্ছি।' অন্য তাফসীরকারগণের মতে اني جاعل বাক্য اني خالق 'আমি সৃষ্টি করবো' অর্থে। হযরত আবু রিওক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, পবিত্র কুরআনে جعل শব্দটি خلق (সৃষ্টি করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন...اني جاعل আয়াতের ব্যাখ্যায় সঠিক বক্তব্য হলো পৃথিবীর বুকে প্রতিনিধিকে প্রেরণ করবো। এবং এ ব্যাখ্যা হাসান ও কাতাদার অভিমতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারো কারো মতে, এ আয়াতে উল্লেখিত الارض-এর উদ্দেশ্য 'মক্কা শরীফ'। ইবনে সাবিত থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—মক্কাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর

বিস্তার ঘটানো হয়েছে, ফেরেশতাগণ তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতেন। কাজেই ফেরেশতাগণই বাইতুল্লাহ্‌র প্রথম তাওয়াফকারী আর মক্কাই সে ভূমি যার বিষয়ে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেনঃ انى جاعل فى الارض خليفة (আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে যাচ্ছি)। আর (পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ম চলে আসছে) কোন নবীর কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে নবী ও তাঁর পুণ্যবান অনুগামীগণ নাজাত পেয়ে যেতেন। তখন নবী এবং তাঁর সংগীগণ মক্কায় চলে আসতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এখানে ই'বাদতে লিপ্ত থাকতেন। এ কারণেই (হযরত) নূহ, হূদ, সালিহ ও শুআয়ব (আ)-এর কবর রচিত হয়েছে যামযাম, রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীম-এর মধ্যবর্তী স্থানে।

خليفة (স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি) শব্দটি فعيلة ওযনে ব্যবহৃত হয়। কেউ অন্য কাউকে কোন বিষয়ে তার স্থলাভিষিক্ত বানালে বলা হয় خلف فلان فلانا فى هذا الامر অমুক অমুককে একাজে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাকের ইরশাদ রয়েছে ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ "তৎপর আমি তাদের পরে তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি মনোনীত করেছি যেনো আমি দেখি তোমরা কেমন কাজ কর" (ইউনুস—১০/১৪)। এ আয়াতের অর্থ হল—তোমাদেরকে তাদের প্রতিনিধি করলেন এবং তাদের পরে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করলেন। এ অর্থেই সুলতানে আযমকে খলীফা নামে অভিহিত করা হয়। কারণ তিনি তার পূর্ববর্তী সুলতানের স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরসূরী হয়ে থাকেন এবং তাঁর স্থানে কার্য সম্পাদন করে থাকেন তাই তিনি উত্তরসূরী। আর এ অর্থেই আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয় —خلف الخليفة يخلف خلافة وخلفا (উত্তরসূরীকে স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছেন, তাই প্র তিনিধিত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন)। আল্লাহ পাকের বাণী انى جاعل فى الارض خليفة -এর ব্যাখ্যায় ইবনে ইসহাক বলেন, বসবাসকারী ও আবাদকারী যারা সেখানে বসবাস করবে এবং তা আবাদ করবে; তাঁরা এমন মাখলুক যা তোমাদের (ফেরেশতা জাতির) অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে خليفة শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইবনে ইসহাক বলেছেন, তা শব্দটির প্রকৃত বিশ্লেষণ নয়। যদিও আল্লাহ পাক তার ঘোষণায় ফেরেশতাদের এ সংবাদই পরিবেশন করেছিলেন যে, পৃথিবীতে বসবাসকারী এমন একজন খলীফা তিনি প্রেরণ করবেন। বরং শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তা-ই যা ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে বনী আদমের আগে পৃথিবীকে আবাদ করার কাজে কোন জাতি নিয়োজিত ছিল, যাদের জায়গায় বনী আদমকে স্থলবর্তী করা হল? জবাবে বলা যায় যে, তাফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পৃথিবীর প্রথম বাসিন্দা ছিল জিন জাতি। তারা এখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করল, খুন খারাবী করল এবং পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হল। তখন আল্লাহ পাক তাদের শাস্তি বিধানের জন্য ফেরেশতাদের একটি বাহিনী সহ ইবলীসকে পাঠালেন। ইবলীস ও তার সংগীরা তাদের হত্যা করতে থাকল এবং সাগর মাঝের দ্বীপসমূহে ও পাহাড় পর্বতে তাদের তাড়িয়ে দিল, অতঃপর আল্লাহ পাক আদমকে সৃষ্টি করে তাঁকে পৃথিবীর বাসিন্দা বানালেন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ আমি পৃথিবীতে খলীফা প্রেরণ করবো। এ বর্ণনা মতে আয়াতের অর্থ হবে, আমি পৃথিবীতে জিন জাতির স্থলাভিষিক্ত সৃষ্টি করবো যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পৃথিবীতে বসবাস করবে এবং তা আবাদ করবে।

রবী ইবনে আনাস (রহ) انى جاعل فى الارض خليفة-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে বুধবারে, জিন জাতিকে বৃহস্পতিবারে, হযরত আদম (আ)-কে শুক্রবারে সৃষ্টি করেন। জিনদের একটি দল কাফির হয়ে গেলে ফেরেশতারা তাদের শাস্তির জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করতে লাগল, এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করল, তখন খুন-খারাবী হল এবং পৃথিবীর শৃংখলা বিনষ্ট হল।

انى جاعل فى الارض خليفة-এর ব্যাখ্যায় অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বনী আদম অন্য কারো স্থলবর্তী নয়, বরং তারা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হবে। অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-এর সন্তানেরা তাদের পিতার স্থলবর্তী এবং হযরত আদম (আ)-এর সন্তানের প্রতিটি যুগের লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হবে। এ অভিমত হাসান বসরী (রহ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এর নযীর ইবনে সাবিত (রহ)-এর বর্ণনায় বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি আল্লাহ পাকের বাণী

اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

-এর প্রসঙ্গে বলেন, ফেরেশতারা এখানে হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। আর ইউনুস (রহ) আমাকে বর্ণনা শুনিয়েছেন তিনি বলেন, ইবনে ওয়াহ্ব (রহ) আমাদের খবর দিয়েছেন।

ইউনুস (রহ) ইবনে যায়েদ (রহ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি ইচ্ছা করছি যে, পৃথিবীতে একটি (নতুন) জাতি সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে আমার প্রতিনিধি বানাব, খলীফা নিয়োগ করব। ঐ সময় ফেরেশতাগণ ছাড়া আল্লাহ পাকের আর কোন মাখলুক ছিল না এবং পৃথিবীর বুকেও কোন সৃষ্ট জীব ছিল না। এ বিবরণটি হাসানের (রহ) নামে উদ্ধৃত অভিমতের অনুকূল হতে পারে, আবার ইবনে যায়েদের (রহ) বক্তব্যের সদৃশও হতে পারে। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ খবর দিয়েছিলেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাঁর খলীফা সৃষ্টি করবেন। তারা সেখানে তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে আল্লাহ পাকের বিধান কার্যকর করবে।

ইবনে মাসউদ (রা) ও নবী (স)-এর অন্য কয়েক জন সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা সৃষ্টি করব। তখন ফেরেশতারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! ঐ খলীফা কি (প্রকৃতির) হবে? ইরশাদ করলেন, তার কতক এমন সন্তান সন্ততি হবে, যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হবে এবং একে অপরকে হত্যা করবে।

ইবনে মাসউদ ও ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে উদ্ধৃত এ রিওয়ায়াত মতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, আমি পৃথিবীতে আমার মাখলুকের মাঝে আইন পরিচালনায় আমার খলীফা নিয়োগ করব। সে খলীফা হবে আদম এবং ঐ সব বনী আদম যারা আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করবে ও মাখলুকের মাঝে ইনসাফ কায়েম করবে। তবে ফাসাদ সৃষ্টি ও অন্যায় কাজ সংঘটিত হবে খলীফা ভিন্ন অন্যদের দ্বারা এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে যারা আদমের স্থলাভিষিক্ত হবে, এদের ব্যতীত অন্যদের দ্বারা। কারণ সাহাবীদ্বয় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) খবর দিয়েছেন, খলীফার সম্পর্কে ফেরেশতাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, খলীফার বংশধরদের একটি অংশ ফাসাদ ও হানাহানিতে লিপ্ত হবে একে অপরকে হত্যা করবে। এর জবাবে তিনি ফাসাদ

৩৮—

সৃষ্টি ও অন্যায় খুনাখুনির বিষয়টি খলীফার বংশধরদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং খোদ খলীফাকে এ অপবাদ থেকে দূরে রেখেছেন। এই ব্যাখ্যাটি একটি দৃষ্টিকোণ থেকে খলীফার অর্থে হাসান (রহ) হতে উদ্ধৃত অভিমতের প্রতিকূল। অনুকূলের দিকটি হল এই যে, ব্যাখ্যাকারীরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি ও খুনাখুনির ব্যাপারটিও খলীফার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। আর প্রতিকূল দিক হল এই যে, তারা আদমের (আ) সাথে খেলাফতের সম্বন্ধ সাব্যস্ত করেছেন আল্লাহ্ পাক তাকে তাঁর (নিজের) খলীফা মনোনীত করেছেন এ অর্থে। অথচ হাসানের (রহ) অভিমতে আদমের (আ) সন্তানের সাথে খিলাফতের সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ ছিল তাদের একে অপরের খলীফা হওয়া এবং পরবর্তী যুগের ব্যক্তিগণ পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। এ ছাড়া হাসানের (রহ) অভিমত অনুযায়ী পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি ও খুন খারাবীর সম্বন্ধ খলীফার সাথে করা হয়েছে।

আর انى جاعل فى الارض خليفة আয়াতের তাফসীরকারগণ হাসান হতে উদ্ধৃত অভিমতকে যে উল্লেখিত ব্যাখ্যায় পর্যবসিত করেছেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ পাকের انى جاعل فى الارض... ঘোষণার জবাবে ফেরেশতারা যে اتجعل ... ... الدماء (আপনি কি এমন মাখলূক সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে ?) বলেছিলেন ; তা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা প্রদত্ত খলীফার বিষয়ে নিজেদের প্রতিক্রিয়ার খবর দেওয়া, অন্য কিছু নয়। কেননা ফেরেশতা ও তাদের প্রতিপালকের মাঝে কথাবার্তা চলেছিল সে খলীফার বিষয়েই, তাই তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, যেহেতু ব্যাপার এমনই ছিল এবং আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আ)-কে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছিলেন। এর দ্বারা জানা গেল যে, এতদ্বারা হযরত আদম (আ) ব্যতীত তার বংশধরদের কিছু লোককে বুঝানো হয়েছে। এতদ্বারা আরও প্রমাণিত হলো যে, যে খলীফা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে সে আদম নয়। আর তারা হলো তাঁর সেই সব সন্তান যারা এই সব করছে। আর এ কথাও প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ পাকের বর্ণিত খিলাফতের অর্থ হলো—এক যুগের আদম সন্তান পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া, যেমন আমি বর্ণনা করেছিলাম।

কিন্তু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ভিন্নমত পোষণকারী মনীষিগণ তাদের ব্যাখ্যাকালে সঠিক ব্যাখ্যা পদ্ধতির প্রতি মনযোগ দেননি। কারণ আল্লাহ্ পাক যখন ফেরেশতাদের বললেন, انى جاعل فى الارض তখন ফেরেশতারা আল্লাহ্ পাকের ঐ কথার প্রতিউত্তরে তাঁর প্রতিনিধির প্রতি রক্তপাত ও অশান্তি সৃষ্টির কথা আরোপ করেনি। বরং তারা বলেছে আপনি কি পৃথিবীতে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন—যে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে ? আর এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, হয়ত আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিনিধির কিছু বংশধর অশান্তি সৃষ্টি এবং রক্তপাতে লিপ্ত হবে। তাই তারা বলেছে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাতে লিপ্ত হবে ? যেমন এই কথাটি বলেছেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উস এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা), যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আল্লাহ পাক যখন পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণের খবর দিলেন, তখন ফেরেশতারা এ কথা কিভাবে বললেন

"أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء"

অথচ হযরত আদম (আ)-কে তখনও সৃষ্টি করা হয়নি যা থেকে তারা জানতে পারতো যে, হযরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরগণ কি করে ? তবে কি ফেরেশতারা গায়েব জানতো যার ভিত্তিতে এ কথা বলল ? অথবা তারা কি শুধু ধারণার বশীভূত হয়েই এই কথা বলল ? দ্বিতীয় অবস্থায় তো ধারণার ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান ও অজ্ঞাত বিষয়ে কথা বলা সাব্যস্ত হবে, অথচ তা তাদের প্রকৃতি বহির্ভূত কাজ। তা হলে প্রতিপালক সমীপে তাদের এ বক্তব্য পেশ করার উৎস কি ?

জবাবে বলা যায় যে, তাফসীরকারগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। আমি এখানে তাঁদের উক্তিগুলি উল্লেখ করার পর সেগুলির মধ্য হতে যুক্তি প্রমাণের নিক্তিতে বিশুদ্ধতম ও স্পষ্টতম উক্তির প্রতি দিক নির্দেশ করব। এ বিষয় হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, ফেরেশতাদের (ও ভিবিন্ন গোত্র রয়েছে এবং সে) গোত্রগুলির মাঝে একটি গোত্র জিন নামে অভিহিত হত, ইবলীস ছিল এ বিশেষ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, ফেরেশতাকুলের মাঝে এ গোত্রটি সৃষ্টি করা হয়েছিল অগ্নির তাপ থেকে তখন ইবলীসের নাম ছিল 'আল-হারিছ'। সে তখন জান্নাতের অন্যতম মুহাফিয ছিল। তিনি (আরও) বলেন, এ বিশেষ গোত্রটি ব্যতীত অন্য ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনে যে জিন জাতির উল্লেখ রয়েছে, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নিধূম অগ্নিশিখা থেকে। مارج অর্থ জিহবা বা শিখা—আগুন যখন প্রজ্জ্বলিত হয় তখন আগুনের যে লেলীহান শিখা হয় তাকেই مارج বলা হয়।

তিনি (আরও) বলেন, মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা। আর পৃথিবীর প্রথম বাসিন্দা হয়েছিল জিন জাতি তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং রক্তপাত করে এবং একে অপরকে হত্যা করে। (তিনি বলেন,) তখন আল্লাহ পাক তাদের শাস্তি বিধানের জন্য ইবলীসের পরিচালনায় ফেরেশতাদের একটি দল প্রেরণ করলেন। তারা এ দলই যাদেরকে জিন বলা হয়।

ইবলীস ও তার সহযোগীরা পৃথিবীর জিনদের মেরে কেটে সাগর মাঝের দ্বীপগুলোতে এবং পাহাড়ে পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। যখন ইবলীস একাজ করল তখন তার অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি হল। সে বললও যে, আমি এমন কাজ করেছি যা আর কেউ করতে পারেনি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ পাক তার অন্তরের একথা সম্পর্কে অবগত হলেন। কিন্তু ফেরেশতা-গণ যারা তার সঙ্গে ছিল তারা এ বিষয় জানতে পারল না। তখন আল্লাহ পাক তার সাথী ফেরেশতা-দেরকে বললেন : اني جاعل في الأرض خليفة তখন ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের কথার জবাবে আরয করল : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء অর্থাৎ ইতিপূর্বে জিনেরা যেভাবে অশান্তি সৃষ্টি করেছে এবং রক্তপাত করেছে এবং আমাদেরকে তাদের শাস্তি বিধানের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে; তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন—اني أعلم ما لا تعلمون।

(আমি যা জানি তোমরা তা জান না)। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই—আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, ইবলীসের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আমি জানি। তোমরা জান না যে, তার অন্তরে রয়েছে অহংকারদম্ভ। অতঃপর আল্লাহ পাক আদম তৈরীর (উপকরণ) মাটি নিয়ে আসার হুকুম দিলে তা তুলে আনা হল। তখন আল্লাহ পাক আঠাল মাটি দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করলেন। (সূরা ছাফ্‌ফাতঃ ৩৭/১১)। এখানে لازب অর্থ শক্ত এঁটেল। সে মাটি ছিল দুর্গন্ধযুক্ত ও কাল বর্ণের কাদা জাতীয়। অর্থাৎ প্রথমে ছিল ধূলি মাটি। পরে তাকে দুর্গন্ধযুক্ত কাল কাদায় পরিণত করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক তা দিয়ে আপন (কুদরতী) হাতে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। তৈরী প্রতিকৃতিটি চল্লিশ রাত (পতিত অবস্থায়) পড়ে থাকল। ইবলীস এ আকৃতিটির কাছে এসে তাকে পা দিয়ে আঘাত করত। ফলে তা ঠনঠন আওয়াজে বেজে উঠত। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহ পাকের কালাম من صلصال كالفخار (পোড়া মাটির মত শুকনা মাটির) দ্বারা এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বায়ু ভর্তি ছিদ্রযুক্ত বস্তু যাতে আঘাত করলে নিঃশব্দ থাকে না। ইবলীস এ প্রতিকৃতির মুখ দিয়ে ঢুকে গুহ্যদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যেত, আবার গুহ্যদ্বার দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত আর বলতে থাকত—তুমি কিছুই হওনি, ঝন্ ঝন্ শো শো আওয়াজ সৃষ্টির কাজেও তুমি যথোপযোগী হওনি, আর যে উদ্দেশ্যে তোমার সৃষ্টি, সে কাজেরও উপযোগী তুমি হওনি। আমি যদি তোমাকে বাগে পেয়ে যাই, তা হলে অবশ্যই তোমাকে হালাক করে দিব। আর আমার উপরে তোমাকে ক্ষমতা দেয়া হলে অবশ্যই তোমার অবাধ্য হব।

অতঃপর যখন আল্লাহ পাক তাতে রূহ ফুঁকে দিলেন, তখন মাথার দিক হতে রূহের প্রতিক্রিয়া (প্রাণশক্তি) সঞ্চারিত হতে লাগল। রূহ সে দেহাকৃতির যে অংশে সঞ্চারিত হত, সে অংশে গোশ্‌ত ও রক্তের ধারা বয়ে যেত। এভাবে রূহ তার নাভি পর্যন্ত পৌঁছলে সে তার দেহের দিকে নজর করল। তার সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত ও অভিভূত করল এবং সে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ, দেহের নিম্নাংশে তখনও রূহের প্রতিক্রিয়া পৌঁছে নি। এ ইংগিত হয়েছে আল্লাহ পাকের কালাম وكان الانسان عجولا (মানুষ তাড়াহুড়া প্রিয়)। অর্থাৎ অস্থির প্রকৃতির এবং সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ধৈর্য রাখতে পারে না। এ ভাবে রূহ (-এর ক্রিয়া) সারা দেহে ব্যাপ্ত হয়ে পূর্ণতা পেলে সে হাঁচি দিল এবং আল্লাহ পাকের বিশেষ নির্দেশে 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' বললে। আল্লাহ বললেন, يرحمك الله (হে আদম। আল্লাহ তোমাকে রহম করুন)! অতঃপর আল্লাহ পাক ইবলীসকে ও তার সাথী—ফেরেশ্‌তাগণকে হযরত আদম (আ)-কে সিজদহা করার জন্য আদেশ করেন। বিভিন্ন আসমানে অবস্থানরত ফেরেশতাকুলকে নয়। তোমরা আদমকে সিজদা কর।" তখন সে ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হল; কিন্তু ইবলীস তাতে অস্বীকৃতি জানাল এবং অহংকারের শিকার হল। কারণ তার মনে আত্মম্ভরিতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। সে বলেই ফেলল, 'ওকে' আমি সিজদা করতে পারি না, আমি যে ওর চেয়ে উত্তম, বয়সে বড় এবং সৃষ্টিতে সবল, কারণ আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। অর্থাৎ, মাটির তুলনায় আগুন শক্ত-সবল। ইবলীস সিজদায় অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহ তাকে অকল্যাণকর বানিয়ে দিলেন এবং যাবতীয় শুভ ও কল্যাণ থেকে নিরাশ করে

দিয়ে তাকে দুষ্কর্মের হোতা ও 'শয়তান' বানালেন এবং বিতাড়িত করে দিলেন। এটা ছিল তার অবাধ্যতার শাস্তি।

অতঃপর আদম (আ)-কে সব (বিষয়-বস্তুর) নাম শিখিয়ে দিলেন—যে সব নাম দিয়ে মানুষ সব বিষয়-বস্তুর পরিচয় লাভ করে। যেমন—মানুষ, পশু, ভূমি, স্থল, জল, পাহাড়, পর্বত, গরু, গাধা, বকরী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী প্রভৃতির নাম। এর পরে সে নামগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করেছেন অর্থাৎ সেই ফেরেশতা যারা ইবলীসের সঙ্গে ছিল—যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নি উত্তাপ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক বলেছেন, انبؤنى باسماء هؤلاء এতদ্বারা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমাকে এই সব বস্তুর নাম জানাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও (ان كنتم صدقين)। নিশ্চয়ই তোমরা জান আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করব। যখন ফেরেশতারা জানতে পারল যে, ইলমে গায়েব সম্পর্কে তারা কিছু জানে না সে সম্পর্কে তাদের মন্তব্যের উপর আল্লাহ পাক কৈফিয়ত তলব করবেন। তখন তারা বলল, পবিত্র তুমি হে আল্লাহ। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গায়েব জানতে পারে না। আমরা তোমার দরবারে তওবা করি। لاعلم لنا الا ما علمتنا (البقرة : ٣٢/٢) (আপনি যে জ্ঞান আমাদের দান করেছেন তা ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নেই)। এতদ্বারা অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) কে যেমন অদৃশ্য বিষয় শিখিয়ে দিয়েছেন, তেমনভাবে আমাদেরও যতটুকু শিখিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কোন ইল্‌ম থাকার দাবী হতে আমরা অব্যাহতি চাই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, ও আদম! এদেরকে এ সবের নাম বলে দাও।" যখন হযরত আদম (আ) ঐ নামগুলো বলে দিলেন, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, হে ফেরেশতাগণ! আমি কি ইতিপূর্বে তোমাদের বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমান যমীনের সমস্ত গায়বী খবর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, আমি ব্যতীত সে সম্পর্কে আর কেউ অবগত নয়, আর আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর। আল্লাহ পাক এতদ্বারা একথা ঘোষণা করছেন যে, আমি জানি গোপন কথা যেমন জানি প্রকাশ্য কথা, অর্থাৎ ইবলীসের অন্তরের গোপনীয় অহংকার এবং অহমিকা সম্পর্কে আমি পুরাপুরি ওয়াকেফহাল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, انى جاعل فى الارض خليفة এ আয়াতে আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণের মধ্য হতে বিশেষ এক জামাআতকে সম্বোধন করেছেন, সমস্ত ফেরেশতাদেরকে নয়। সম্বোধিত সে বিশেষ দলটি ইবলীসের নিজস্ব গোত্র ছিল—যারা আদম সৃষ্টির আগে ইবলীসের সহগামী হয়ে পৃথিবীতে বসবাসরত জিনদের দমনে যুদ্ধ করেছিলেন। আর এ বিশেষ সম্বোধনে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে পরীক্ষা করা। যাতে তারা তাদের ইলমের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারে এবং এ জ্ঞান লাভ করতে পারে যে, আল্লাহ পাকের সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাদের চাইতে দুর্বল কোন মাখলুক তাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ হতে পারে। সেই সাথে তাদের এ জ্ঞানও হাসিল হয়ে যায় যে, দৈহিক সামর্থ ও সুঠাম দেহ দ্বারা আল্লাহ্‌র দেওয়া মর্যাদা হাসিল করা যায় না—যেমন আল্লাহ পাকের দুশমন শয়তান ধারণা করেছিল। এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বুঝায় যে, আল্লাহ পাকের প্রতি এ কথাও ফেরেশতাদের মন্তব্য اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء (আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে)। এছিল একটি অপ্রয়োজনীয় কথা এবং অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। মহান আল্লাহ পাকই তাদের সে বক্তব্যের অপছন্দনীয়

দিক তাদেরকে দিলেন এবং সেবিষয়ে তাদের অবগত করলেন। ফলে তারা তওবা করলো এবং বক্তব্যের ব্যাপারে তারা অনুতপ্ত হলো। এবং গায়বী ইলমের দাবী প্রত্যাহার করে অভিযোগ মুক্ত হল। আর আল্লাহ পাক ইবলীসের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে লালিত অহংকারের কথাও তাদের নিকট প্রকাশ করে দিলেন।

কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এর বিপরীত আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর পসন্দ মুতাবিক সৃষ্টি সমাপ্তির পর 'আরশের দিকে মনোনিবেশ করলেন। তখন তিনি ইবলীসকে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানের রাজ্যে কর্তৃত্ব দিলেন। ইবলীস ছিল ফেরেশতাদের সে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যারা 'জিন' নামে অভিহিত হত। 'জান্নাত'-এর রক্ষীদল রূপে নিয়োজিত হওয়ার কারণে তাদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছিল। ইবলীস তার পরবর্তী পদ জান্নাতের 'রক্ষী' পদেও নিয়োজিত ছিল। এতে তার মনে অহংকারের উদ্রেক হল। সে ভাবল, আমার বিশেষ যোগ্যতার কারণেই আল্লাহ আমাদের এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। মূসা ইবনে হারূন (রহ)-এর বর্ণনায় বাক্যটি এভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে। তবে মূসার ব্যতীত অন্যরা আমাকে যে বর্ণনা শুনিয়েছেন, তাতে রয়েছে—'ফেরেশতাদের মধ্যে বিশেষ যোগ্যতার কারণে শয়তানের মনে এ অহংকারের উন্মেষ ঘটলে সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা অবগত হলেন।

তখন তিনি ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ফেরেশতারা আরয করল, হে আমাদের প্রতিপালক! প্রতিনিধি কেমন হবে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, তাঁর সন্তান-সন্ততি হবে, যারা পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করবে, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হবে এবং একে অপরকে হত্যা করবে। ফেরেশতারা বলল—হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি কি সেখানে এমন জাতি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তির সৃষ্টি করবে আর রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো আপনার হামদের তাসবীহ পাঠে নিরত রয়েছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, আমি জানি এমন বিষয় যা তোমরা জান না, অর্থাৎ—ইবলীসের অবস্থা। এরপর আল্লাহ পাক পৃথিবীর বুক থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করে আনার জন্য হযরত জিবরাঈল (আ)-কে সেখানে পাঠালেন। যমীন বলে উঠলো, আল্লাহর নামে তোমার হাত হতে নিষ্কৃতি চাই তুমি আমার কোন অংশ ঘাটতি কর না, কিংবা আমার মধ্যে খুঁত সৃষ্টি কর না। হযরত জিবরাঈল (আ) মাটি না নিয়েই ফিরে গিয়ে আরয করলেন, হে প্রতিপালক! সে আপনার নামে দোহাই দিয়েছে তাই আমি তার দোহাই রক্ষা করেছি। এখন আল্লাহ পাক হযরত মীকাঈলকে (আ) পাঠালে এ বারও যমীন অনুরূপ দোহাই দিল। হযরত মীকাঈল (আ) তার দোহাই মেনে নিয়ে ফিরে গেলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ)-এর অনুরূপ আরয করলেন। তখন আল্লাহ পাক মালাকুল মাওত হযরত (আজরাঈল)-কে পাঠালেন। যমীন এবারও দোহাই দিল। হযরত আজরাঈল (আ) বললেন, আমিও এ ব্যাপারে তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি। আমি কি তাঁর হুকুম বাস্তবায়িত না করেই ফিরে যাব? তিনি পৃথিবীর বুক থেকে মিশ্রিত করে মাটি তুলে নিলেন। অর্থাৎ এক জায়গা থেকে নিলেন না। বরং এখান সেখান থেকে লাল-কাল-সাদা বিভিন্ন বর্ণ-প্রকৃতির মাটি তুলে নিলেন। এ কারণেই হযরত আদম (আ)-এর সন্তানগণ বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। তিনি মাটি নিয়ে উর্ধ্বে

চলে গেলেন। সে মাটি ভেজানো হলে তা লাযিব' এঁটেল (لازب) মাটিতে পরিণত হল। لازب অর্থ চটচটে আঠাল, যা একাংশ আরেকাংশের সাথে মিলে থাকে। অতঃপর বিকৃত হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া পর্যন্ত তা ফেলে রাখা হল। এ দিকেই ইংগিত রয়েছে من حمإ مسنون—(দুর্গন্ধযুক্ত কাল কাদা দিয়ে) আয়াতাংশে। এখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন, "আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ সৃষ্টি করছি, তাকে আমি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে দিলে এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিলে তোমরা তার সম্মানে সিজদাবনত হবে। তখন আল্লাহ পাক তার কুদরতী মুবারক হাত দিয়ে তাকে সৃষ্টি করলেন, যাতে ইবলীস তার ব্যাপারে অহংকারী হতে না পারে। অর্থাৎ যাতে তিনি বলতে পারেন যে, আমার নিজ হাতে তাকে আমি তৈরী করেছি তুমি তার সাথে অহংকার করছ? অথচ আমি তার ব্যাপারে অহংকার করছি না। তিনি তাকে মানুষরূপে সৃষ্টি করলেন। মাটির দেহরূপে তা চল্লিশ বছর অতিবাহিত হলো। তা এক জুমুআর দিনের সমান। ফেরেশতারা তার পাশ দিয়ে চলাচলের সময় তাকে দেখে ভীত হত। ইবলীসের অস্থিরতা ছিলো সর্বাধিক। তাই আসা যাওয়ার সময় সে পা দিয়ে তাকে আঘাত করত। এতে এ দেহ থেকে ভাংগা হাঁড়ির ন্যায় ঝনঝন আওয়াজ বের হতো এবং তা ঝনঝন করে উঠত। এ বিষয়েই আল কুরআনে বর্ণিত রয়েছেঃ من صلصال كالفخار (পোড়া মাটির মত শুকনা মাটি থেকে)। ইবলীস ঐ দেহকে বলতো, কি কাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? সে তার মুখ দিয়ে ঢুকে পিছন দিয়ে বেরিয়ে পড়ত আর সংগী ফেরেশতাদেরকে অভয় দিয়ে বলত—একে দেখে ঘাবড়ে যেও না। কেননা তোমাদের প্রতিপালক কারো মুখাপেক্ষী নন। আর এটি একটি খোকলা জিনিস। আমি তাকে বাগে পাওয়া মাত্রই তার সর্বনাশ করে দিব।

অতঃপর যখন আল্লাহ পাকের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাতে রূহ ফুঁকে দেয়ার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়ে গেল। তখন ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন, আমি তাতে আমার 'রূহ' ফুঁকে দিলে তোমরা তাকে সিজদা করবে। যখন তাতে রূহ প্রবেশ করান হল তখন রূহ ও জীবাত্মা তার মাথায় পৌঁছলে সে হাঁচি দিল। তখন ফেরেশতারা তাকে বলল—বল আলহামদু লিল্লাহ। সে বলে ফেলল, আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ তখন তাকে বললেন, তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমাকে রহম করুন। রূহ তার দু' চোখে প্রবেশ করলে সে জান্নাতের ফল ফলাদির দিকে তাকিয়ে দেখল। রূহ তার বুকে-পেটে প্রবেশ করলে তার খাবারের চাহিদা হল এবং তার দু পায়ে রূহ পৌঁছার আগেই সে তাড়াহুড়া করে জান্নাতের ফল আহরণের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে গেল। এ অবস্থার বিবরণে আল কুরআনের ভাষা—خلق الانسان من عجل (মানুষের সৃষ্টি উৎসে তাড়াহুড়ার বাজী সুপ্ত রয়েছে)। তখন ফেরেশতারা সকলেই এক যোগে সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের দলভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানালো। আর অহংকার করল এবং কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ পাক তাকে ডেকে বললেন, আমার নির্দেশ পাওয়ার পরও আমার নিজ হাতের সৃষ্টিকে সিজদা করতে কোন্ বিষয় তোমাকে বাধা দিল? ইবলীস বলল, আমি তার থেকে উত্তম, আমি এমন মানুষকে সিজদা করতে প্রস্তুত নই যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তখন আল্লাহ পাক তাকে বললেন, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও! এখানে তোমার অহংকার করা কোনক্রমেই উচিত হয় নাই। তাই বেরিয়ে যা, তুই অপদস্থদের অন্তর্ভুক্ত। صلصال শব্দের অর্থ

অপমান। (বর্ণনাকারী বলেন) আর আল্লাহ্ পাক তখন আদমকে সব (বিষয় বস্তুর) নাম শিখিয়ে দিলেন। তারপর সৃষ্টিগুলি ফেরেশতাদের সামনে রেখে বললেন, আমাকে এ সব জিনিসের নাম বলে দাও তো দেখি—যদি তোমরা তোমাদের এ কথায় সত্যবাদী হও যে, আদম সন্তানরা পৃথিবীতে দাংগা-ফাসাদ করবে আর রক্ত ঝরাবে। প্রতি উত্তরে ফেরেশতাগণ বললেন سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم (তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুতঃ আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়)। তখন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন, হে আদম! তুমিই এদেরকে এসবের নাম জানিয়ে দাও। যখন আদম (আ) তাদেরকে সে সবের নাম জানিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন,

قال يـا ادم انـبئهم باسمائهم ج فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انى اعلم غيب السموت والارض واعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون ০

"তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম জানিয়ে দাও। যখন তিনি তাদেরকে ঐসবের নামসমূহ জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ পাক বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ভাবে অবহিত। আর তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, আমি তাও জানি।" বর্ণনাকারীর মন্তব্য ঃ

ফেরেশতাদের উক্তি ঃ اتجعل فيها من يفسد فيها (আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে?) —এটাই সেই উক্তি واعلم ماكنتم تكتمون এর উদ্দেশ্য, যা তাঁরা প্রকাশ করছিলেন। আর ইবলীস তার মনে যে অহংকার লুকিয়ে রেখেছিল।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ বর্ণনার প্রথম অংশের ভাষ্য আমার পূর্বোল্লেখিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে গৃহীত। দাহ্হাক (রহ)-এর বর্ণনা ভাষ্যের বিপরীত। আর শেষ অংশের ভাষ্য পূর্ব বর্ণনার অনুকূলে। কারণ, এ (শেষোক্ত) বর্ণনার প্রথম অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক যখন পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা প্রতিপালক সমীপে ঐ খলীফার প্রকৃতি সম্পর্কে অবগতি প্রার্থনা করেছিলো। আল্লাহ পাক জবাব দিয়েছিলেন যে, খলীফার এমন কতক বংশধর হবে যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে। তখন ফেরেশতারা বলেছিলো, আপনি কি এমন কাউকে সেখানে নিয়োগ করবেন যারা অশান্তির সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? খলীফার সন্তানদের মাধ্যমে যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেওয়ার পরেই ফেরেশতাগণ এ মন্তব্য করেছিলেন। সুতরাং প্রথম অংশে এ ভাষ্যটি পূর্বোল্লেখিত দাহ্হাক (রহ) বর্ণিত বর্ণনার বিপরীত হল। আর দ্বিতীয় বর্ণনার শেষাংশ প্রথম বর্ণনার অনুকূলে হয়েছে انبؤنى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين অংশ এবং سبحانك لاعلم لنا অংশের ব্যাখ্যায়। তা এভাবে যে, (উভয় বর্ণনায়) ... انبؤنى। অর্থ—পৃথিবীতে আদম সন্তানের অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত সম্পর্কিত অবগতির দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হলে এ বিষয়ও বস্তুগুলির নাম আমাকে বলে দাও। আর سبحانك অর্থ হল আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জবাবদিহি করতে বলছেন, তারা গায়বী ইল্ম—থাকার দাবীর অভিযোগ হতে মুক্তি লাভের

উদ্দেশ্যে বলল—"আপনি নিষ্কলুষ পবিত্র। আপনি আমাদের যতটুকু ইল্‌ম দিয়েছেন তার বাইরে আমাদের কোন ইল্‌ম নেই। নিশ্চিতই আপনি মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাবান। এখন যে কোন বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, এ বর্ণনার প্রথম অংশ শেষ অংশকে অসার প্রতিপন্ন করে, আর শেষাংশ প্রথমাংশকে বাতিল করে দেয়। কারণ, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের খবর দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে প্রেরিত খলীফার বংশধরেরা সেখানে অশান্তির সৃষ্টি করবে আর রক্তপাত করবে। আর এ খবরের পরিপ্রেক্ষিতে ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালককে বলেছিল যে, আপনি কি সেখানে অশান্তি সৃষ্টিকারী ও রক্তপাতকারী কাউকে নিয়োগ দিবেন? তা হলে ভৎর্সনা করা ও হুমকী দেয়ার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে না। কারণ তারা তো অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাতের বিষয় তেমনই খবর দিয়েছিলো, যেমন খবর আল্লাহ পাক তাদেরকে সে বিষয়ে দিয়েছিলেন। এটা যুক্তিযুক্ত হলে অবশ্য তাদের কাছে অনুল্লেখিত ইল্‌মের বিষয়ে তাদেরকে এভাবে বলার বৈধতা পাওয়া যেত যে, কোন কোন সংঘটিতব্য বিষয়ে আল্লাহ পাকের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে তোমরা যে ইল্‌ম হাসিল করেছো এবং সে মতে খবর দিয়েছ, তাতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তা হলে যে বিষয়ের ইল্‌ম আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন সে বিষয় যেমন খবর দিয়েছ তেমনি ভাবে যে বিষয়ের ইল্‌ম আল্লাহ পাক তোমাদের কাছে অনুল্লেখিত রেখেছেন সে বিষয়ও খবর প্রদান কর। বরং এ ব্যাখ্যা বিরূপ ও বিকৃত ব্যাখ্যা এবং এটা আল্লাহকে অসমীচীন গুণে গুণান্বিত করার অবৈধ দাবী।

আমার আশংকা এই যে, এ বর্ণনার পর পরবর্তী বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে কেউ পূর্ববর্তী সাহাবী বর্ণনাকারীর নামে এ বিভ্রান্তি আরোপ করেছে এবং সাহাবার দেওয়া প্রকৃত ব্যাখ্যা ছিলো নিম্নরূপ যে, "আদম সন্তানেরা পৃথিবীতে অশান্তি ও রক্তপাত করবে" আমার দেওয়া এ খবরের ভিত্তিতে তোমরা যে ইল্‌ম আহরিত হওয়ার ধারণা করেছ এবং তা বিশ্লেষণ করে এ কথা বলার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ যে, আপনি কি সেখানে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাতকারী একটি জাতি সৃষ্টি করবেন, এতে যদি তোমরা বাস্তবানুগ সত্যবাদী হও, তা হলে আমাকে এ সবের নামধাম বলে দাও। এরূপ ব্যাখ্যা করলে ভৎর্সনা ও হুমকির প্রতিপাদ্য বিষয় হবে, ফেরেশতাদের এ ধারণা যে, আল্লাহ পাকের কালাম থেকে তারা এ জ্ঞান আহরণ করেছে যে, ঐ খলীফার এমন বংশধর হবে যারা (সকলেই) পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে। সংঘটিতব্য বিষয়ে আল্লাহ পাকের দেওয়া খবরকে ভিত্তি করে তাদের খবর প্রদান ভৎর্সনার বিষয় হবে না। আমার এ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের যুক্তি এই যে, আল্লাহ পাক যদিও তাঁর খলীফার কতক বংশধরের মাধ্যমে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাতের খবর ফেরেশতাদের দিয়েছিলেন কিন্তু তার বিপুল সংখ্যক বংশধর যে তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য, পৃথিবীর বুকে শৃংখলা বিধান ও রক্তের হেফাজতে আত্মনিয়োগ করবে এবং তিনি তাদের সম্মানিত করবেন ও উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করবেন এ খবর আল্লাহ পাক তাদের কাছে অনুল্লেখিত রেখেছিলেন এবং এ বিষয় তাদের কোন আভাষ দেননি। ওদিকে ফেরেশতারা ঢালাও মন্তব্য করে বসল যে, আপনি কি এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে? অথচ এ উক্তির ভিত্তি ছিলো শুধু ধারণা মাত্র। প্রসংগতঃ এ বক্তব্য উল্লেখিত বর্ণনাদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধায়ক ব্যাখ্যা হতে পারে। কারণ বর্ণনাদ্বয়ের বাহ্যভাষ্য

হল এই যে, পৃথিবীতে প্রেরিতব্য খলীফার বংশধররা সকলেই সেখানে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে।

এ ঢালাও মন্তব্যে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক আদম (আ)-কে সব কিছুর নাম পরিচয় শিখিয়ে দেওয়ার পর ফেরেশতাদের বললেন, আমাকে এসব কিছুর নামধাম বলে দাও তোমাদের যদি তোমরা 'আদম সন্তানদের সকলেই পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে আর রক্ত ঝরাবে; তোমাদের এমন অবগতির দাবীতে সত্যবাদী হও—যেমন তোমরা ধারণা পোষণ করেছ। এখন এ কালাম হবে ব্যাপকভাবে সকলকে জড়িয়ে ফেরেশতাদের মন্তব্যের জবাবে মহান আল্লাহ পাকের অস্বীকৃতি। কারণ এ মন্তব্যটি সকলের জন্য সমান প্রযোজ্য নয়। বরং উক্ত দোষ খলীফার কতক বংশধরের ক্ষেত্রে সীমিত। তবে এখানে আমি যা কিছু উল্লেখ করলাম তা উদ্ধৃত বর্ণনার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা মাত্র। এ বক্তব্য আয়াতের তাফসীর বিষয়ে আমার পছন্দনীয় ব্যাখ্যা নয়। আল্লাহর প্রতিনিধির বংশধরদের দ্বারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হবে এবং রক্তপাত ঘটবে ফেরেশতাদের এ খবরের যে ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি, তা পূর্ববর্তী তত্ত্বজ্ঞানীদের দ্বারা সমর্থিত। আবদুর রহমান ইবনে সাবিত تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন—ফেরেশতারা সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। আর একদল তত্ত্বজ্ঞানী অভিমত পোষন করেছেন।

হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের এই কালাম সম্বন্ধে তিনি বলেন وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة এতে হযরত আদম (আ) এর সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মতামত জানতে চাইলেন। ফেরেশতারা বলল—"আপনি কি সেখানে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে ফেতনা ফাসাদ করবে আর রক্তপাত করবে?" এরূপ বলার কারণ এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম, থেকে ফেরেশতাগণ অবগত হয়েছিল যে, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাতের চেয়ে অধিকতর অপ্রিয় কোন কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছু নেই। "অথচ আমরাই তো আপনার হামদের তছবীহ পাঠ করছি ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জানো না" অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইলমে একথা ছিল যে, ঐ খলীফার বংশধরদের মাঝে অনেকে নবী রাসূলের মর্যাদায় ভূষিত হবেন এবং তাদের মাঝে জান্নাতে বসবাসের উপযোগী অনেক পুন্যবান সম্প্রদায়ের জন্ম হবে। বর্ণনাকারী (কাতাদা) বলেন যে, ইবনে 'আব্বাস (রা) বলতেন যে, আল্লাহ পাক যখন আদম (আ)-এর সৃষ্টির সূচনা করেন তখন ফেরেশতারা বললো—আল্লাহ নিশ্চয় এমন কোন মাখলুক সৃষ্টি করবেন না, যারা তাঁর কাছে আমাদের চাইতে মর্যাদাশীল হবে কিংবা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞানের অধিকারী হবে। ফলে আদম (আ) এর সৃষ্টির ব্যাপারে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হল। মাখলুক মাত্রই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যেমন, আকাশ ও পৃথিবীকে আনুগত্য বিষয় পরীক্ষা করা হয়েছিল এভাবে যে আল্লাহ পাক (আসমান-যমীনকে) বলেছিলেন ائتيا طوعا أو كرها। "ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এগিয়ে আসো।" জবাবে তারা বলেছিলো قالتا أتينا طائعين ৪১/১১ "আমরা হাজির হয়েছি অনুগত হয়ে।" হযরত কাতাদা (রহ) হতে উদ্ধৃত এ ব্যাখ্যা একথা প্রমাণ করে যে, তিনি এ অভিমত পোষণ করতেন যে—ফেরেশতারা তাদের أتجعل فيها। উক্তিটি এ বিষয়ে তাদের কোন প্রকার পূর্ববর্তী কোন প্রকার জ্ঞান ব্যতীতই পেশ করেছিল। এবং তা ছিলো নিছক

অনুমান ভিত্তিক অভিমত এবং আল্লাহ পাক তাদের অনুমান খণ্ডন ও তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে ইরশাদ করলেন اني اعلم مالا تعلمون "আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" এ মর্মে যে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির বংশধরদের ঔরসজাত মধ্যে হবে অনেক নবী-রসূল এবং তত্ত্বজ্ঞানী-সাধক। কিন্তু স্বয়ং কাতাদা (রহ) হতেই এ ব্যাখ্যার বিপরীত একটি বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ পাকের কালাম اتجعل فيها من يفسد فيها সম্পর্কে—আল্লাহ পাক তাদেরকে অবগত করেছেন যে, পৃথিবীতে এমন একটি সম্প্রদায় ছিল, যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করেছে, রক্তপাত করেছে। এজন্যেই ফেরেশতাগণ বলেছেন اتجعل فيها من يفسد فيها কাতাদার অভিমতের অনুরূপ মত পোষণ করেছেন একদল তাফসীরবিদ মনীষী, তাদের মধ্যে রয়েছেন হাসান বসরীর ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিত্ব।

হাসান (বসরী) ও কাতাদা (রহ) বলেছেন, 'আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি তৈরী করতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা তাদের মতামত পেশ করল। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের একটি বিষয়ের ইলমে দিলেন, আর একটি বিষয়ের ইল্‌ম সংরক্ষিত রাখলেন—যা তারা জানত না। যে ইল্‌ম ফেরেশতাদের তিনি শিখিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে তারা বলল—"আপনি কি সেখানে এমন জাতি তৈরী করবেন, যারা সেখানে ফেতনা-ফাসাদ করবে আর রক্ত-পাত করবে? একথা বলার কারণ এই যে—ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত ইল্‌ম দ্বারা অবগত হয়েছিলো যে, আল্লাহ্‌র নিকটে রক্তপাতের চেয়ে বড় কোন পাপ নেই। (তারা আরও বলল) অথচ আমরাই আপনার হামদের তসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জান না। এরপর মানব সৃষ্টির কাজ শুরু করলে ফেরেশতারা তাদের মাঝে সে বিষয়ে চুপে চুপে বলল যে, আমাদের প্রতিপালক যেমন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। তবে (আমাদের বিশ্বাস যে,) তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করবেন, আমরা তাদের থেকে অধিকতর জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারী থাকব।

আল্লাহ পাক আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিলেন এবং ফেরেশতাদেরকে তাকে সিজদা দেওয়ার আদেশ দিলেন। তখন তারা বলল, "আল্লাহ তাকে আমাদের উপর মর্যাদা-সম্পন্ন করেছেন।" তখন তারা উপলব্ধি করল যে, মানব থেকে তারা উত্তম নয়। এ পর্যায়ে তারা বলল যে, মানব থেকে আমরা যদি উত্তম নাও হই; তবে তার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। কেননা, আমরা তার পূর্বে ছিলাম এবং তার পূর্বে বহু উম্মত সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন তারা তাদের জ্ঞানের ব্যাপারে অহংকার বোধ করল। তখন তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হল।

(৩১) وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صدقين -

(৩১) "এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিখিয়ে দিলেন, তৎপর সেসমুদয় ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, এসমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

যদি তোমরা এই দাবীতে সত্যবাদী হও যে, যে কোন মাখলূক সৃষ্টি করি না কেন, তোমরাই থাকবে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। তা হলে এসব বস্তুর নাম সমূহ বল। তখন ফেরেশতারা ভীত সন্ত্রস্ত হল এবং তওবা করতে লাগল। আর মু'মিন মাত্রই এমন অবস্থায় তওবা করতে ব্যাকুল হয়। এমনি অবস্থায় তারা বললো, পবিত্র তুমি হে আল্লাহ। তুমি যা কিছু আমাদেরকে শিখিয়েছ তা ব্যতীত আমাদের কোন ইলম নেই। নিশ্চয়ই তুমি মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে এসব বস্তুর নাম বল। যখন আদম (আ) সে সমুদয়ের নামসমূহ বলে দিলেন, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন—নিশ্চয়ই আমি আসমান যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ জানি। আর যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং গোপন-সে সম্পর্কেও আমি অবহিত তাদের উক্তি "আমাদের প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চয় এমন মাখলূক সৃষ্টি করবেন না, যারা তাঁর কাছে আমাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান ও অধিকতর বিদ্বান হবে। বর্ণনাকারী বলেন—আর হযরত আদম (আ) কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো তা ছিলো প্রতিটি বস্তুর নাম। যেমন এই পাহাড় পর্বত, এই গরু গাধা খচ্চর ও বন্য প্রাণী, জিন ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরত আদমের (আ) সামনে প্রতিটি সৃষ্ট জাতিকেই পেশ করা হয়েছিল আর তিনি সহজেই প্রতিটির নাম বলে যাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ পাক বললেন—আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমিই অবগত রয়েছি আসমানসমূহ ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়াবলী এবং আমিই জানি—যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন করেছিলে। তারা যা প্রকাশ করেছিলো তা হলো তাদের উক্তি—আপনি কি সেখানে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা অশান্তির সূত্রপাত করবে এবং রক্তপাত করবে? আর তারা যা গোপন করছিলো তা হলো তাদের পারস্পরিক উক্তি, "আমরা এর চেয়ে উত্তম এবং অধিক জ্ঞানী।"

রবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাকের বাণী انى جاعل فى الارض خليفة সম্পর্কে—তিনি বলেন, আল্লাহ ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন বুধবার, বৃহস্পতিবার সৃষ্টি করেছেন জিনদের আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন শুক্রবার, তারপর জিনদের একটি দল কুফরী করে অবাধ্য হলে ফেরেশতারা তাদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে নেমে আসতেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। এতে খুন খারাবী হল এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা দেখা দিল। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ফেরেশতারা মন্তব্য করেছিলো, "আপনি কি সেখানে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে।"

রাবী' থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে: "অতঃপর তিনি সে নামের বিষয়গুলি ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন—আমাকে এসবের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

انبئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صدقين ○ قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا ط انك انت العليم الحكيم ○

নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়" পর্যন্ত। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তখন, যখন তারা বলেছিল—"আপনি কি সেখানে এমন কোন জাতি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে; অথচ আমরাই তো আপনার হামদের তাসবীহ পাঠ করছি আর আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। অর্থাৎ ফেরেশতারা যখন বুঝতে পারল যে, আল্লাহ পাক পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন-ই, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করল—"আল্লাহ যে কোন মাখলুকই সৃষ্টি করুন না কেন, আমরা তার চাইতে অধিক বিদ্বান ও মর্যাদাবান থাকবই।" তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ খবর দেয়ার ইচ্ছা করলেন যে, তিনি হযরত আদম (আ)-কে তাদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তাই আদম (আ)-কে সব বস্তুর নামগুলি শিখিয়ে দিয়ে ফেরেশতাদের বললেন, তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলো দেখি, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক"'। আমি অবগত রয়েছি তোমরা যা প্রকাশ করছ, আর তোমরা যা গোপন করছো"—পর্যন্ত।, তারা যা প্রকাশ করছিলো, তা তাদের উক্তি—আপনি কি সেখানে এমন সৃষ্টি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টিও রক্তপা করবে?" আর তারা যা গোপন করছিল তা তাদের অভ্যন্তরীণ আলোচনা—"আল্লাহ যে কোন মাখলুকই সৃষ্টি করুন না কেন, আমরা অবশ্যই তার চাইতে অধিকতর বিদ্বান ও অধিক মর্যাদাবান থাকব।" অবশেষে তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে ইলম ও মর্যাদায় তাদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

ইবনু যায়দ বলেছেন, "আল্লাহ পাক আগুন সৃষ্টি করলে ফেরেশতারা তা দেখে অত্যধিক ভয় পেয়ে গেল এবং তারা আরয করল—হে আমাদের প্রতিপালক, এ আগুনকে আপনি কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? কি কাজে এর ব্যবহার হবে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার বান্দাদের মধ্যে যারা অবাধ্য হবে, তাদের (শাস্তি বিধানের) উদ্দেশ্যে। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ সময় ফেরেশতাদের ব্যতীত আল্লাহ পাকের আর কোন সৃষ্টজীব ছিল না। আর পৃথিবীর বুকেও তখন কোন মাখলুক ছিল না। আদম (আ -এর সৃষ্টি হয়েছে তার (অনেক) পরে। এর প্রমাণে তিনি আয়াত তিলাওয়াত করলেন—(৭৬/১)

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ـ

"কাল-প্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিলো যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।" বর্ণনাকারী বলেন, এ আয়াত শুনে হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)। হায় যদি সে সময়টিই থেকে যেত (তাহলে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হত না)। অতঃপর ফেরেশতারা বলল—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জীবনে কি এমন সময় আসবে, যখন আমরা আপনার অবাধ্য হব?—এ প্রশ্নের কারণ, তখন তারা অপর কোন সৃষ্টজীব দেখতে পায়নি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, তেমন হবে না। তবে পৃথিবীতে এমন একটি (নতুন) মাখলুক সৃষ্টি এবং সেখানে প্রতিনিধি প্রেরণের ইরাদা করছি, যারা রক্তপাত করবে আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে। তখন ফেরেশতারা নিবেদন করল, আপনি কি সেখানে এমন কোন সৃষ্টিকে প্রেরণ করবেন যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করে বেড়াবে? অথচ আপনি আমাদের পসন্দ করেছেন, তাহলে আমাদেরই সেখানে প্রেরণ করুন। আমরা তো আপনার হামদের তাসবীহ পাঠে ও আপনার

পবিত্রতা বর্ণনায় অভ্যস্ত রয়েছি, আর আমরা সেখানে আপনার অনুগত থেকে বন্দেগী করব। কারণ, আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে এমন কোন সৃষ্টিকে প্রেরণ করবেন যারা তার অবাধ্য হবে—এব্যাপারটি ফেরেশতাদের দৃষ্টিতে ভারী ঠেকছিল। তখন তিনি ইরশাদ করলেন—আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। হে আদম। তাদেরকে এসবের নামগুলি বলে দাও। আদম (আ) বলতে লাগলেন, অমুক অমুক, এটা এই, এটা এই,...। যখন ফেরেশতারা আল্লাহ্ পাকের দেওয়া হযরত আদম (আ)-এর জবান অনুভব করতে পারলো তখন তারা তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলো। কিন্তু খবীছ ইবলীস এ স্বীকৃতিদানে অস্বীকার করলো। সে বলে বসল—আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। আল্লাহ্ পাক হুকুম করলেন, "তুই এখান থেকে নেমে যা, এখানে অহংকার দেখাবার তোর কোন সংগত অধিকার নেই।"

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, ফেরেশতারা প্রথম যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, তা ছিল তাদের পসন্দ-অপসন্দের বিষয়ে। এ পরীক্ষা হয়েছিল এমন একটি বিষয় নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে বিষয়ে তাদের পূর্ব-অবগতি ছিল না। অথচ তা ছিল আল্লাহ পাকের ইলমের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ পাক যেহেতু ফেরেশতাদের এবং অন্যসব মাখলুকের গতি প্রকৃতির ইল্ম রাখেন, তাই তিনি যখন আদম (আ)-কে এবং তার মাধ্যমে অন্যদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বীয় কুদরত বলে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টির সংকল্প করলেন, তখন আসমান যমীনে অবস্থানরত সকল ফেরেশতাকে সমবেত করে ঘোষণা করলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে পৃথিবীতে বসবাস করবে এবং সেটিকে আবাদ করবে এবং সে প্রতিনিধি তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন এক সৃষ্টি। অতঃপর তিনি এ নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর ইল্মের খবর দিয়ে ফেরেশতাদের বললেন, তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে, রক্তপাত করবে আর বহুবিধ অবাধ্যতা প্রকাশ করবে। তখন ফেরেশতারা সকলেই আরয করলেন—আপনি কি সেখানে এমন কোন সৃষ্টি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরা তো আপনার হামদের তাসবীহ পাঠ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনায় নিরত রয়েছি। আমরা নাফরমানী করি না এবং আপনার অপসন্দনীয় কোন আচরণ করি না।—তিনি ইরশাদ করলেন, অবশ্যই আমি অবগত রয়েছি এমন বিষয়, যা তোমরা জান না। আমি তোমাদের সম্বন্ধে এবং তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। কিন্তু বিষয়টি তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না। সে সব কথা যা মানবজাতি দ্বারা পৃথিবীতে সংঘটিত হবে, যেমন পাপাচার, অশান্তি রক্তপাত এবং যাবতীয় নিন্দনীয় কাজ—যা আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন—

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ○ إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا
أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ○ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ○ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ -

"ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, আমার নিকট তো এ ওহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কাদা থেকে। যখন আমি তাকে সুষম করবো এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সেজদাহ করবে।" এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টিকালীন ঘটনাবলী, আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত, ফেরেশতাদের সাথে এবিষয়ে আলোচনা এবং সে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ফেরেশতাদের জবাব ইত্যাদি তাঁর নবীকে অবহিত করেছেন।

আল্লাহ্ পাক যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুকনা ঠনঠনে মাটি দ্বারা মানব সৃষ্টি করবো। তাকে সম্মান, মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে আমি আপন কুদরতী হাতে সৃষ্টি করবো। তখন থেকে ফেরেশতারা আল্লাহ্ পাকের এ নির্দেশ-ঘোষণা সংরক্ষণ করে রাখল এবং তাঁর বাণী মনে গেঁথে নিয়ে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে তার আনুগত্যে নিমগ্ন হল। কিন্তু আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস ছিল ব্যতিক্রম। সে তার মনের মাঝে সুপ্ত অবাধ্যতা, অহংকার ও বিদ্রোহ এবং হিংসা-বিদ্বেষ নিয়ে চুপ মেরে গেল। ওদিকে আল্লাহ্ পাক ছাঁচে ঢালা শুকনা ঠনঠনে মাটি যা আহরিত হয়েছিল পৃথিবীর উপরিভাগের আস্তরণ হতে—তা দিয়ে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে ফেললেন। এবং তাঁর সব মাখলুকের উপর মর্যাদা-সম্মান ও মহত্ব দানের উদ্দেশ্যে তাকে আপন কুদরতী হাতে সৃষ্টি করলেন। ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, আরও বলা হয়েছে—তবে আল্লাহ্ পাকই সমধিক অবগত যে, আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টির পর তার দেহে রূহ প্রবিষ্ট করাবার আগে চল্লিশ বছর তাকে রেখে দিয়ে—তার হাল অবস্থার প্রতি নজর রাখলেন; অবশেষে তা পোড়া মাটির মত শুকনা মাটি হল; অথচ কোন আগুনের ছোঁয়া তাতে লাগেনি। বর্ণনাকারী বলেন এ বিষয়ে আরও কথা বলা হয়েছে,—তবে আল্লাহ্ই সমধিক অবগত যে, রূহ আদমের মাথায় পৌঁছলে সে হাঁচি দিল এবং বলল—আলহামদু লিল্লাহ! তখন তাঁর প্রতিপালক বললেন, يرحمك ربك "তোমার প্রতিপালক তোমাকে রহম করুন।" আর আদম (আ) পর্যায়ক্রমে পরিগ্রহ করলে ফেরেশতারা তাদের প্রতি জারীকৃত আল্লাহ্‌র নির্দেশের বাস্তবায়নে এবং তাদের প্রতি আরোপিত আজ্ঞা পালন ও আনুগত্য প্রকাশে সিজদা করলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকলো এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মম্ভরিতা-অহংকারের শিকার হয়ে সিজদা করল না। তখন আল্লাহ পাক তাকে বললেন, হে ইবলীস যাকে আমি নিজ হাতে তৈরী করেছি, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল? ··· ··· অবশ্যই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব তোকে দিয়ে এবং এ আদমের সন্তানদের মাঝে যারা তোর অনুগামী হবে তাদেরকে দিয়ে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ পাক যখন ইবলীসকে জবাবদিহি তলব করা ও তিরস্কার করা শেষ করলেন, আর ইবলীসও অবাধ্যতায় অনমনীয়তা দেখাল, তখন আল্লাহ পাক তার উপর অভিসম্পাত করেন এবং তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক আদমের প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং তাকে সব (কিছুর) নাম পরিচয় শিখিয়ে দিয়ে বললেন, হে আদম! এদেরকে এ (সবের) নামগুলি বলে দাও। যখন সে তাদেরকে সে (সবের) নামগুলি বলে দিল, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান যমীনের গায়েব বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত আছি এবং আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ কর ও যা

গোপন কর। ফেরেশতারা বলল, সুবহানাল্লাহ, আপনি পবিত্র। আপনি আমাদের যে ইলম দান করেছেন, তার অতিরিক্ত আমাদের কোনও ইল্‌ম নেই নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাবান। অর্থাৎ—আপনি যে বিষয় আমাদের ইল্‌ম দান করেছেন আমাদের জবাব ছিল শুধু সে বিষয়ে; আর যে বিষয়ের ইল্‌ম আপনি আমাদের দেননি, সে বিষয়ে আপনিই সমধিক অবগত। উল্লেখ্য যে, হযরত আদম (আ) সেদিন যে বস্তুর যে নামে নামকরণ করেছিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা সে নামেই থাকবে।

ইবনে জুরায়জ (রহ) বলেন, আদম (আ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে যা অবগত করিয়েছিলেন সে বিষয়েই ফেরেশতারা কথা বলেছিল, এবং সে বিষয়েই তারা বলেছিল, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء "আপনি কি পৃথিবীতে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে?'

কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতারা যে اتجعل فيها......ويسفك الدماء বলেছিল, তার কারণ এই যে, মানবের দ্বারা এরূপ ঘটনা ঘটাবার সংবাদ দেয়ার পর আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন ফেরেশতারা প্রশ্ন করেছিল এবং বিস্মিত হয়ে বলেছিল—হে আমাদের প্রতিপালক, কেমন করে তারা আপনার অবাধ্য হবে অথচ আপনি হলেন তাদের সৃষ্টিকর্তা! তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে বলেছিলেন انی اعلم مالا تعلمون আমি যা জানি

তোমরা অবগত না হও। আর শুধু তাদের দ্বারাই নয়, যাদের তোমরা এখন (বাহ্যতঃ) অনুগত দেখছ, এমন কারো কারো দ্বারা [illegible] হয়ে পড়বে। এ কথার দ্বারা আল্লাহ পাক তাঁর ইলমের তুলনায় তাদের ইল্‌মু-এর স্বল্পতা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেছেন, ফেরেশতাদের উক্তি—'আপনি কি সেখানে এমন জাতি সৃষ্টি

তাদের প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের আপত্তি প্রত্যাখ্যানমূলক ছিল। বরং তাদের প্রশ্ন ছিল জানার উদ্দেশ্যে। সেই সাথে তারা নিজেদের সম্পর্কে এ খবর দেয়ার প্রয়াস পেয়েছিল যে, তারা নিজেরাই সর্বদা পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনায় নিয়োজিত। তাস্‌বীহ-তাহমীদে এ অভিমত পোষণকারীর মতে ফেরেশতাদের এরূপ বলার কারণ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করা হবে' এ বিষয়টি তারা না করতো। কারণ, ইতিপূ[illegible]তিকে আদেশ করা হয়েছিল এবং তারা অবাধ্য হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেছেন যে, ফেরেশতাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল, এ সম্পর্কে তাদের অজানা বিষয়ে সঠিক অবগতি লাভ করা। তা হলো তারা যেন এ কথা বলেছিল যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করুন। সুতরাং প্রশ্নটি ছিল খবর ও অবগতি লাভের প্রার্থনা, প্রতিবাদমূলক প্রশ্ন নয়।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, ফেরেশতাদের উক্তি বর্ণনা করে নাযিলকৃত আল্লাহ পাকের আয়াত—

اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

"আপনি কি সেখানে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে?" এর উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের মাঝে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা সেটি যাতে বলা হয়েছে যে, এ উক্তি ছিল ফেরেশতা

দের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিপালকের সমীপে খবর ও অবগতি লাভের আবেদন। অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের অবগত করুন যে, আপনি কি এমন স্বভাবের প্রতিনিধি পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন আমাদের মধ্য হতে কাউকে আপনার প্রতিনিধি না করে? অথচ আপনার হামদের তাসবীহ আমরাই করছি, এবং আমরাই আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকি। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে জ্ঞান দানের পর তাদের বক্তব্য আপত্তিকর নয়। যদিও 'আল্লাহ পাকের কোন মাখলুক তাঁর অবাধ্য হবে'—বিষয়ক খবর প্রাপ্তির পর বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত মারাত্মক বোধ হয়েছিল। আর যারা দাবী করেছেন যে, মহান আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদানের প্রেক্ষিতে তারা এ প্রশ্ন তুলেছিল—তাদের এ দাবীর সমর্থনে আল-কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনায় কোন দলীল নেই এবং বিনা আপত্তিতে মেনে নেয়ার মত কোন অকাট্য যুক্তি-প্রমাণও নেই। এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণও নেই।

আর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিপালকের দরবারে জানতে চাওয়ার স্থলে মানব জাতির পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি ও রক্তপাত করার ব্যাপারটি অসম্ভব কিছু নয়।

হযরত ইবনে 'আব্বাস ও ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে সুদ্দী বর্ণিত ও কাতাদা সমর্থিত ব্যাখ্যা-বর্ণনা এর অনুকূলে রয়েছে। যার সারকথা ছিল এই যে, মহান আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে এ মর্মে খবর দিয়েছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর বুকে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, যার বংশধররা এ ধরনের আচরণ করবে। তখন ফেরেশতারা বলেছিল, আপনি কি এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চান? যারা অশান্তি সৃষ্টি করবে? এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ব্যাপার যদি এমনই হয় যে, তাদেরকে বিষয়টির খবর পূর্বেই দেয়া হয়েছিল, তাহলে পুনরায় জানতে চাওয়ার যুক্তি কি? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মূলতঃ তাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল বিষয়টির নিতান্ত বাস্তবতা এবং তার বাস্তব সংঘটনকালে তাদের হাল-অবস্থার অবগতি প্রার্থনা করা আর সেই সাথে তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি রূপে প্রেরণের প্রার্থনা করা যাতে প্রতিনিধিরা অবাধ্য না হয়।

আর ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে দাহ্হাক যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন—যার অনুগমন করেছেন রবী' ইবনে আনাস, সে বর্ণনাও অসার বা অযৌক্তিক নয়। যার সারকথা ছিল, এই যে, ফেরেশতারা আদম (আ)-এর পূর্ববর্তী যুগে পৃথিবীর বাসিন্দা জিনদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই তারা প্রতিপালকের সমীপে নিবেদন করেছিল, "আপনি কি সেখানে জিনদের ন্যায় কোন সৃষ্টিকে প্রেরণ করবেন—যারা তেমনই কর্মকাণ্ড ঘটাবে—যেমন ওরা ঘটিয়েছিল? এ প্রশ্ন ছিল তাদের প্রতিপালক সমীপে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। ঐ সব দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া সাব্যস্ত করনের ভংগীতে নয়। তেমন হলে অবশ্য ফেরেশতাদেরকে অদৃশ্য জগতের অজানা বিষয়ে খবর দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেত।

অনুরূপ ইবনে যায়দ এর অভিমতও ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ নয়, যাতে তিনি বলেছেন যে, ফেরেশতাদের ঐ উক্তি ছিল বিস্ময় প্রকাশের ভংগীতে। কারণ আল্লাহ্র কোন মাখলুক তাঁর অবাধ্য হবে—এটা ছিল তাদের কাছে কল্পনাতীত ও চরম বিস্ময়ের ব্যাপার।

তবে ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে দাহ্হাকের উদ্ধৃত ও রবী' ইবনে আনাস সমর্থিত বর্ণনা—যার

৪০—

একটি ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন ইবনে যায়দ—তা আমি সম্পূর্ণ বর্জন করেছি। কারণ, তাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমি এমন কোন যুক্তি-প্রমাণ খুঁজে পাইনি যা সব প্রশ্ন, আপত্তি ও সন্দেহ বিদূরীত করে শ্রোতাকে তা প্রমাণরূপে গ্রহণে বাধ্য করতে পারে। আর বিগত যুগ ও পূর্ববর্তীদের বিষয় সম্পর্কে কোন খবরের বিশুদ্ধতার ইলম তখনই সাব্যস্ত হতে পারে, যখন তা হঠকারিতা ও পক্ষপাত বিমুক্ত হয় এবং তা মিথ্যা, ভ্রান্ত ও ভুল হওয়া অসম্ভব প্রমাণিত হয়, অথচ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে দাহ্‌হাকের উদ্ধৃত ও রবী ইবনে আনাসের সমর্থিত বর্ণনা কিংবা ইবনে যায়দ প্রদত্ত ব্যাখ্যা উল্লেখিত দোষমুক্ত ও গুণযুক্ত নয়।

উপরের বিশদ আলোচনার আলোকে আমি বলতে পারি যে, সেই ব্যাখ্যাটিই আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যারূপে গৃহীত হবে, যা বাস্তব যুক্তি নির্ভর এবং যার অনুকূলে পবিত্র কুরআনের আয়াতে থাকবে স্পষ্ট প্রমাণ। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুতাবিক আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো-যেমন আপনি উল্লেখ করেছেন-যে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ মর্মে খবর দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর বুকে নিয়োগ পরিকল্পিত তার খলীফার ঔরষজাতেরা সেখানে ফেতনা ফাসাদ করবে এবং সেখানে হানাহানিতে লিপ্ত হবে। এ খবরের প্রেক্ষিতে ফেরেশতারা বলেছিল 'আপনি কি সেখানে এমন সৃষ্টি নিয়োগ করবেন যারা সেখানে ফেতনা ফাসাদ করবে? এখন জিজ্ঞাস্য হল এই যে, এ কথাটির উল্লেখ আল্লাহ পাকের কিতাবে কোথায় আছে? এ প্রশ্নের জবাব হল এই যে, আল্লাহ পাকের প্রকাশ্য কালামে যে ইঙ্গিত রয়েছে, তাই যথেষ্ট। যেমন কবিতায়

فَلَا تَدْفِنُونِي اِنَّ دَفْنِي مُحَرَّمٌ — عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ خَامِرِي اُمَّ عَامِرِي

"তোমরা আমাকে মাটির তলায় দাফন কর না, আমাকে দাফন করা তোমাদের প্রতি হারাম; তবে তোমরা আমাকে ফেলে রাখবে ঐ প্রাণীটির জন্য, যাকে শিকারকালীন বলা হয় উম্মে আমির।" ওহে হায়ার! আত্মগোপন করে থাক, বেরিয়ে পড় না ধরা পরে যাবে। এ পংক্তিতে دعوني للتي يقال لها عند صيدها خامري ام عامري (আমাকে তার জন্য ফেলে রাখ, যাকে শিকার কালীন বলা হয়) বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে, কারণ, যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে তাতে অপ্রকাশ্য অংশের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।

অনুরূপ আল্লাহ পাকের কালাম اتجعل فيها من يفسد فيها আয়াতাংশের ও হয়েছে। কেননা اني جاعل في الارض خليفة। আয়াতের শেষাংশ। পৃথিবীতে ... ... اتجعل فيها আয়াত যেহেতু প্রেরিতব্য প্রতিনিধি বংশধরদের অশান্তি সৃষ্টি বিষয়ক উহ্য খবরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তাই এ ইঙ্গিতকে যথেষ্ট মনে করে অনুল্লেখ্য অংশকে অপ্রকাশ রাখা হয়েছে—যেমন উল্লেখিত পংক্তিতে আমি বর্ণনা করেছি। পবিত্র কুরআন ও আরবী কাব্য-সাহিত্যে এ ধরনের উহ্য রাখার অসংখ্য নজির রয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত যুক্তি প্রমাণ ও বাক-বিধির আলোকে اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমার মতে যা গ্রহণীয় তাই বর্ণনা করেছি।

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, نسبح بحمدك অর্থ আমরা আপনার হামদ ও শুকরের আদায়ের মাধ্যমে আপনার মাহাত্ম বর্ণনা করি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন فسبح بحمد ربك (অতএব, হামদ সহযোগে তোমার প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ কর)। আর এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন والملائكة يسبحون بحمد ربهم (আর ফেরেশতারা হামদ সহযোগে তাদের প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করে থাকে) (আল-শূরা ৪২/৫)। আরববাসীরা যে কোন পন্থায় আল্লাহর যিকর করাকে তাসবীহ ও সালাত মনে করে। যেমন তারা বলে, قضيت سبحتى من الذكر والصلاة : আমার যিকর ও সালাতের তাসবীহ ও ওজীফা আদায় করেছি।

কোন কোন মনীষীর মতে 'তাসবীহ'-ই ফেরেশতাদের সালাত। সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) বলেন, (একদিন) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন (এবং একটি লোক পাশে বসা ছিল।) তখন একজন মুসলমান ব্যক্তি (সেই উপবিষ্ট) এক মুনাফিক ব্যক্তির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম কালে তাকে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছেন, আর তুমি বসে রয়েছ ? লোকটি জবাব দিল, কোন কাজ থাকে তো আপন কাজে যাও! মুসলমান ব্যক্তি বললেন, আমি নিশ্চিত আশা রাখি যে, অবিলম্বে তোমার এখান থেকে এমন কেউ যাবেন, যিনি তোমার আচরণের যথাযোগ্য প্রতিবাদ করতে পারবেন। একটু পরেই হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সে পথে যাচ্ছিলেন। তিনি লোকটিকে বললেন, ও মিয়া! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছেন, আর তুমি বসে রয়েছ! এবারও লোকটি পূর্বের ন্যায় জবাব দিল। হযরত 'উমার (রা) লোকটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মার লাগালেন। অতঃপর এগিয়ে গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত সমাপ্ত করলে হযরত 'উমার (রা) তাঁর খিদমতে 'আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! এই মাত্র আমি অমুকের পাশ কেটে যাচ্ছিলাম তখন 'আপনি সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছেন, আর তুমি দিব্যি বসে রয়েছ ? লোকটি আমাকে বলল, তোমার কোন কাম-কাজ থাকে তো আপন কাজে যাও! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা হলে তুমি তার গর্দান উড়িয়ে দিলে না কেন ? তখন উমার (রা) দ্রুত সে দিকে যেতে উদ্যত হলে তিনি বললেন, উমার! ফিরে এস! কেননা, তোমার ক্রোধ হল প্রভাব-প্রতিপত্তি; আর তোমার সন্তুষ্টি ও শান্ত অবস্থা হল যথার্থ ফয়সালা। (অর্থাৎ ক্রোধের অবস্থায় ন্যায় ফয়সলা করা দুষ্কর)। সাত আসমানে আল্লাহ পাকের (অগণিত) ফেরেশতা রয়েছে যারা তাঁর সালাত আদায় করে থাকে, অমুকের সালাতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তখন উমার (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী! তাদের সালাত কি (রূপ) ? তিনি তখনই কোন জবাব দিলেন না। ইতিমধ্যে জিবরীল (আ) উপস্থিত হয়ে বললেন, 'উমার আপনাকে আসমান বাসীদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ? তিনি বললেন, হাঁ। জিবরীল (আ) বললেন, 'উমারকে সালাম জানিয়ে এ খবর দিবেন যে, দুনিয়ার (প্রথম) আসমানের অধিবাসী ফেরেশতারা কিয়ামত পর্যন্ত সিজদারত অবস্থায় থাকবে এবং বলতে থাকবে : سبحان ذى الملك والملكوت (পবিত্র সে আল্লাহ পাক যিনি ইহলোক ও পরলোকের একচ্ছত্র মালিক)। দ্বিতীয় আসমান বাসীরা কিয়ামত পর্যন্ত রুকু অবস্থায় থাকবে তাদের তাসবীহ হল, سبحان ذى العزة والجبروت (পবিত্র সে আল্লাহ যিনি মহীয়ান এবং পরাক্রম-

শীল)। আর তৃতীয় আসমানের ফেরেশতারা কিয়ামত পর্যন্ত দন্ডায়মান অবস্থায় থাকবে এবং বলতে থাকবে سبحان الحى الذى لايموت (পবিত্র সেই আল্লাহ যিনি চিরঞ্জীব যার মৃত্যু নেই)।

ইমাম আবূ জাফার তাবারী (রহ) বলেন, আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আবূ যার (রা)-কে তাঁর অসুস্থ অবস্থায় দেখতে তাশরীফ আনলেন, কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের অসুস্থ অবস্থায় আবূ যার (রা) দেখতে গেলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান ! উৎসর্গীত ! আল্লাহ পাকের নিকটে সর্বাধিক পছন্দনীয় কথা কোনটি ? তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক তাঁর ফেরেশতাদের জন্য যে কালাম পছন্দ করেন سبحان ربى وبحمده (পবিত্র আমার প্রতিপালক আর তাঁর হামদ)।

আলোচ্য বিষয়ে আরো অনেক বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হতে পারে মনে করে আর অধিক বর্ণনা করতে চাই না। শুধু নমুনা স্বরূপ যৎসামান্য বর্ণনা করেছি।

আরবদের কাছে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্‌-এর প্রকৃত অর্থ হল আল্লাহ পাকের জন্য সমীচীন নয়, এমন গুণাগুণের সম্বন্ধ তাঁর সাথে স্থাপন হতে তাঁকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ ঘোষণা করা এবং ঐ সবের সাথে তাঁর সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করা। যেমন, ছা'লাবা গোত্রের কবি আশা বলেছেন,

اقول لما جاءنى فخره — سبحان من علقمة الفاخر

(আমি তার গর্বের কথা শুনে বলছি, গর্বকারী 'আলকামার গর্ব' হতে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা)। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌-ই পবিত্র নিষ্কলুষ, 'আল-কামার মত লোকের গর্ব করার কি অধিকার আছে ?) এ পংক্তির প্রকৃত রূপ হল, سبحان الله من فخر علقمة অর্থাৎ 'আলকামা যে গর্ব করেছে, তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে কবি আল্লাহ্‌র জন্য পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের তাসবীহ ও তাকদীস—পবিত্রতা-নিষ্কলুষতা প্রকাশ-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

কারো কারো মতে نسبح بحمدك অর্থ اصلى لك আমরা আপনার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করি। হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাস'উদ (রা) ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, نصلى لك (আমরা আপনার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করি)।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তাসবীহ এখানে প্রচলিত তাসবীহ অর্থেই।

কাতাদা (রহ) থেকেও ونحن نسبح بحمدك তাসবিহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ونقدس لك (আর আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি)। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, تقديس হল পবিত্রতা ও মাহাত্ম বর্ণনা করা। এ অর্থেই আরবদের سبوح قدوس এ উক্তিতে سبوح অর্থ আল্লাহ্‌র জন্য পবিত্রতা আর قدوس অর্থ তাঁর পবিত্রতা ও মর্যাদা-মাহাত্ম। এ অর্থেই বিশেষ ভূখণ্ড (যেমন বায়তুল-মুকাদ্দাস, মক্কা-মদীনা) কে الارض المقدس। অর্থাৎ পবিত্র ভূমি বলা হয়। অতএব, উল্লেখিত বিশ্লেষণের আলোকে ফেরেশতাদের উক্তির অর্থ হবে (ونحن نسوح بحمدك) মুশরিকরা আপনার প্রতি যে সব কথা আরোপ করে আমরা সে সব থেকে

আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি; ونقدس لك—আর কাফিরদের আরোপিত গুণাগুণ ও যাবতীয় পংকিলতা হতে পবিত্র হওয়ার গুণাবলী আপনার সাথে সম্পৃক্ত করছি।

কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাদের ইবাদত হলো তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করা। হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত ونقدس لك আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন نقدس হল সালাত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, نقدس لك অর্থ আপনার মাহাত্ম্য ও আপনার মর্যাদা বর্ণনা করছি। হযরত আবু সালিহ থেকে ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল আমরা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করি এবং আপনার মর্যাদা বর্ণনা করি।

হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত ونقدس لك আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন এর অর্থ, আমরা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করি এবং আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করি।

হযরত ইবনে ইছহাক থেকে বর্ণিত ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك আমরা আপনার নাফরমানী করি না. এবং এমন কোন কাজ করি না, যা আপনি অপছন্দ করেন। হযরত দাহহাক (রহ) থেকে বর্ণিত ونقدس لك আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন نقدس হলো পবিত্রতা বর্ণনা করা।

যারা نقدس অর্থ সালাত ও মর্যাদা বর্ণনা হওয়ার অভিমত পেশ করেছেন, তাদের বর্ণিত অর্থ আমার বর্ণিত অর্থের সমপর্যায়ের। কারণ, বিশ্বপালকের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণের ছালাত তাঁর মর্যাদা প্রকাশ এবং তাঁর প্রতি কাফিরদের আরোপিত গুণাগুণ হতে পবিত্রতা বর্ণনারই শামিল ونقدس لك-এর স্থলে ونقدسك বলা হলে তাও শুদ্ধ হত। কারণ, আরবরা এ শব্দটিকে দু ভাবে ব্যবহার করে থাকে। যেমন يسبح الله ويقدسه فلان আবার يسبح الله ويقدس له উভয় বাক্যের অর্থ অভিন্ন। পবিত্র কুরআনেও দু রকমের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। যেমন আল্লাহ পাকের ইরশাদ—
يسبح لله ما في السموات والارض এবং অন্যত্র كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا।

اني اعلم ما لا تعلمون-এর ব্যাখ্যা।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা ও তার উদ্দিষ্ট বিষয়ে তাফসীর বিশারদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, 'আমি জানি যা তোমরা জান না' দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইবলীসের মনে লুক্কায়িত অবাধ্যতা (-র সংকল্প) এবং সুপ্ত অহংকার, যা মহান আল্লাহ পাক অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ফেরেশতাগণের কাছে তা গোপন ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত اني اعلم ما لا تعلمون। অর্থ আমি ইবলীসের অন্তরে এমন বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি, যা তোমরা অবগত হতে পারনি—অর্থাৎ তার অহংকার ও আত্ম-প্রতারনা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবী থেকে মুর্‌রার সূত্রে বর্ণিত اني اعلم مالا تعلمون । অর্থাৎ ইবলীসের (মনের) অবস্থা।

হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত আরও দুটি সূত্রে একই অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত اني اعلم مالا تعلمون।-এর অর্থ আদম (আ)-কে সিজদা না করার ব্যাপারে ইবলীসের অন্তরে লুকানো অহংকার তিনি জানতেন।

হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে আল্লাহ পাকের কালাম اني اعلم مالا تعلمون। সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ পাক 'ইবলীসের অবাধ্যতা (-র সংকল্প) অবগত হলেন।'

হযরত মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত اني اعلم مالا تعلمون। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইবলীসের অবাধ্যতা (-র সংকল্প) তিনি জানেন আর তাকে সে লক্ষ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি এ বর্ণনায় কখনো (ইবলীসের স্থলে) আদম (আ) (এর নাম) বলেছেন। মুজাহিদ (রহ)-কে আমি তার পিতা থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, আল্লাহ পাকের কালাম اني اعلم مالا تعلمون। সম্পর্কে, তিনি (মুজাহিদ) বলেন, 'ইবলীসের অবাধ্যতার বিষয়ে অবগত এবং সে লক্ষ্যেই তাকে সৃষ্টি করেছেন আর আদমের (আ) আনুগত্য অবগত ছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত اني اعلم مالا تعلمون। আয়াতাংশের অর্থ তিনি বলেন, ইবলীসের ব্যাপারে অবাধ্যতা অবগত ছিলেন এবং সে লক্ষ্যে তাকে সৃষ্টি করেছেন। হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বর্ণিত যে, اني اعلم مالا تعلمون। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের থেকে, তবে তা তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না। অর্থাৎ অবাধ্যতা, অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাতের কথা।

অপরাপর মুফাসসিরীন বলেছেন, اني اعلم مالا تعلمون। অর্থ, ঐ প্রতিনিধির (বংশধরদের) মধ্য হতে আনুগত্যপ্রিয় ও আল্লাহর বন্ধুত্বপ্রাপ্ত লোক তৈরী হবে।

হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত اني اعلم مالا تعلمون। অর্থ আল্লাহ্‌র ইলমে এ কথা ছিল যে, ঐ প্রতিনিধির (বংশধরদের) মধ্যে অনেক নবী রসূল এবং সৎকর্মশীল ও জান্নাতের অধিবাসী জন্ম নিবে। আল্লাহ পাকের এ কালাম ইংগিত বহন করে যে, ফেরেশতারা اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء—এ উক্তি করেছিল এ কারণে যে, 'আল্লাহ্‌রই কোন সৃষ্টি তাঁর নাফরমানী করবে''-এ তথ্য অবগত হয়ে তারা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছিল। সে কারণেই আল্লাহ পাক তাদের বলেছিলেন, اني اعلم مالا تعلمون। এ কালামের অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত। তোমরা আল্লাহর কাজে বিস্মিত হয়েছো, এবং ঘাবড়ে গিয়েছো, অথচ আমি জানি যে, ঐ (অবাধ্যতা) বিষয়টি তোমাদের কতেকের মাঝে(ও) বিদ্যমান রয়েছে। আর তোমরা নিজেদের এমন ভাবে প্রকাশ করছো যে, তোমাদের কারো কারো মাঝেও তার বিপরীত কর্মকান্ডের কথা আমি জানি; আরো তোমরা এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছো, যা আমি তোমাদের ভিন্ন অন্য কারো জন্য স্থির করে রেখেছি। এ কথা বলার কারণ, আল্লাহ পাক যখন তাঁর প্রতিনিধির বংশধরদের দ্বারা ভবিষ্যতে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত হওয়ার খবর তাঁর ফেরেশ-

তাদের দিলেন, তখন তারা তাঁদের প্রতিপালক সমীপে নিবেদন করল, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি কি পৃথিবীতে আমাদের ব্যতীত অন্য কোন জাতি থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, যার বংশধরদের মাঝে আপনার অবাধ্যতাও জন্ম নিবে, কিংবা আমাদের মধ্য হতে কাউকে প্রেরণ করবেন? আমরা তো আপনাকে তা'যীম করি, এবং আপনার ইবাদত করি, আপনার হুকুম মেনে চলি, এবং আপনার নাফরমানী করি না। ফেরেশতারা তো শয়তানের অন্তরে লুকায়িত তার প্রতিপালকের প্রতি আত্মম্ভরিতার কথা জানতে পারেনি। তাই তাদের প্রতিপালক তাদের বললেন, তোমরা যা কিছু বলছ, তার ব্যতিক্রম তোমাদেরই কারো কারো মাঝে আমি অবগত রয়েছি। আর তা হল ইবলীসের মনে লুকানো অহংকার, যা ছিল ফেরেশতাদের জন্য গোপন বিষয়। সুতরাং তাদের এ উক্তি এবং তাতে ব্যাপক ও সমষ্টিগত ভাবে নিজেদের গুণাবলী উল্লেখ করায় তাদের ভৎর্সনা করা হয়েছিল।

(৩১) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

(৩১) এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন; তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ মালাকুল মওত (আযরাঈল আলাইহিস্-সালাম)-কে পাঠালেন। তিনি পৃথিবীর মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন যা পৃথিবীর উর্বর ও উষর অংশে উপরিভাগে ছিল। তা দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করা হল। আর এখান থেকেই আদম নামে অভিহিত করা হল এ কারণেই যে, তাকে মাটির 'আদীম' (اديم) (উপরের আস্তরণ) দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল 'আদীম' (মাটির উপরিভাগের আস্তরণ) হতে। তাতে উত্তম ও কল্যাণকর এবং নিকৃষ্ট ও অকল্যাণকর অংশ ছিল। এ জন্যই তুমি তার সন্তানদের মাঝে এ সবই দেখতে পাও।—কেউ পুণ্যবান কল্যাণকর। কেউ অকল্যাণকর নিকৃষ্ট।

সা'ঈদ ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আদম (আ)-কে পৃথিবীর 'আদীম' (উপরি-আস্তরণ) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ কারণেই তার নাম আদম রাখা হয়েছে।

সা'ঈদ ইবনে জুবায়র (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদমকে 'আদীম' নাম দেওয়া হয়েছে এ কারণে যে, তাকে পৃথিবীর 'আদীম' (উপরি-আস্তরন) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মুররা (রহ) হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর সূত্রে (উল্লেখ করেছেন, এ মর্মে যে, মালাকুল মওতকে পৃথিবী থেকে আদম তৈরীর মাটি নিয়ে আসার জন্য পাঠানো হলে তিনি পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে মিশ্রিত করে মাটি নিলেন।

তিনি এক স্থান থেকে নিলেন না, বরং লাল, সাদা, কাল—সব বর্ণের ধূলো নিলেন। এ কারণেই আদম সন্তানরা বিভিন্ন বর্ণের জন্ম নেয়, আর যেহেতু পৃথিবীর 'আদীম' (আস্তরণ) দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে কারণে তার নাম 'আদম' রাখা হয়েছে।

আদম শব্দের অর্থ বর্ণনায় আমি যাদের উক্তি উদ্ধৃত করেছি, তাদের সে সব উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে, এমন একখানি হাদীস হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক আদম (আ) কে এক মুষ্টি (মাটি) দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা তিনি সমগ্র পৃথিবী থেকে তুলে নিয়েছিলেন। ফলে আদম সন্তানেরাও পৃথিবীর অনুপাত লাভ করেছে। তাদের মাঝে কেউ লাল, কেউ কালএবং কেউবা গোরা বর্ণের; আবার কেউ বা মাঝামাঝি-শ্যামল। আবার কেউ কোমল, কেউ কঠোর, কেউ ইতর এবং কেউ ভদ্র।

সুতরাং আদমকে আদম নামকরণে যারা এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তাকে পৃথিবির 'আদীম' থেকে তৈরী করা হয়েছে—তাদের অভিমত অনুসারে শব্দটি ادم ক্রিয়ার ওযনে হবে। ক্রিয়াকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করে প্রথম মানবের নাম 'আদম' রাখা হয়েছে। যেমন احماد ও اسعاد ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত احمد ও اسعد ক্রিয়া দ্বারা নাম রাখা হয়েছে। এবং এজন্যেই শেষ অক্ষরটি 'যের' বিশিষ্ট হয়নি।

এ বিশ্লেষণের আলোকে শব্দটির পূর্ণাংগ রূপে হবে ادم الملك الارض—অর্থাৎ ফেরেশতা পৃথিবীর ادمة পর্যন্ত পেঁছে গেল। আর ادمة হল পৃথিবীর ভূমির উপরস্থ বাহ্য আবরণ। চামড়া ও খোলসযুক্ত যে কোন প্রাণী বা বস্তুর উপরের আররণটিকে যেমন ادمة বলা হয়, ভূমির আবরণ বা উপরের আস্তরণকে ও ادمة বলা হয়। এ কারণেই গোশ্‌ত ও তরকারীর ঝোলকে ادم বলা হয়।। কেননা, তা ঐ বস্তুর উপরের চামড়ার ন্যায়। মূলকথা হল—ক্রিয়া শব্দটিকে অবশেষে বিশেষ্য রূপে ব্যক্তি বিশেষের নামে ব্যবহার করা হয়েছে।

الاسماء كلها-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আদম (আ)-কে যে নামগুলো শেখানো হয়েছিল, এবং অতঃপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, সে বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক আদম (আ)-কে সব নাম শিখিয়ে দিলেন। সেগুলি হল সাধারণ মানুষের মাঝে পরিচিত ও প্রচলিত এ সব নাম। যেমন, মানুষ, পশু, পৃথিবী, স্থলভাগ ও সমুদ্রভাগ, পাহাড়, গাধা, গরু ইত্যাদি ইত্যাদি।

হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে আল্লাহ পাকের কালাম وعلم ادم الاسماء كلها সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে সব কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন।

হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে কাক, কবুতর এবং প্রতিটি জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহ) থেকে বর্ণিত। আদম (আ)-কে সব কিছু এমন কি উট-গরু-বকরীর নাম পর্যন্ত শিখিয়ে দিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আদম (আ)-কে সব কিছু এমন কি বাসন-পেয়ালা ইত্যাদির নামও শিখিয়ে দিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত আদম (আ)-কে সব কিছুর নাম শেখালেন, এমন কি বাসন-পেয়ালা ইত্যাদি ছোট বড় সব কিছুর নামও।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ পাকের কালাম وعلم ادم الاسماء كلها-র ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন, 'তাকে সব কিছুর নাম শিখিয়ে দিলেন—যত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের নামও শিখিয়ে দিলেন।

হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত وعلم ادم الاسماء كلها ... انبئهم باسمائهم প্রসংগে আল্লাহ পাক আদমকে বলেন, এসবের নাম তুমি বলো, তখন আদম (আ) আল্লাহ পাকের সর্ব প্রকার সৃষ্টির নাম বলে দিলেন। প্রত্যেক সৃষ্টির শ্রেণী নির্দেশ করে দিলেন।

হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত وعلم ادم الاسماء كلها-এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন। যেমন, এটি পর্বত, ঐটি সাগর, এটি অমুক, ওটি তমুক—এভাবে প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর নাম, অতঃপর সে বিষয় ও বস্তুগুলি ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত করে বললেন, فقال انبئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صدقين ০ "আমাকে এ সবের নামগুলি বলে দাও—যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও।" হযরত হাসান (রহ) ও কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ) কে সব কিছুর নাম শিখিয়ে দিলেন—এই ঘোড়া, এই খচ্চর, উট, জিন, বন্য পশু ইত্যাদি। তিনি প্রতিটি জিনিসকে তার নাম ধরে উল্লেখ করতে লাগলেন।

হযরত রবী (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর নাম। কেউ কেউ বলেছেন وعلم ادم الاسماء كلها অর্থাৎ সকল ফেরেশতার নাম শিখিয়ে দিলেন। রবী থেকে وعلم ادم الاسماء كلها-এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য মুফাসসিরগণের মতে, তাঁকে তাঁর সকল বংশধরদের নাম শিখিয়েছিলেন। হযরত ইবনে যায়েদ (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وعلم ادم الاسماء كلها আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, তার বংশধরদের সকলের নাম।

وعلم ادم الاسماء كلها আয়াতে যারা হযরত আদম (আ)-এর সকল বংশধর ও সকল ফেরেশতার নাম হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন, তাদের অভিমতই উপরে বর্ণিত অভিমতসমূহের মধ্যে অধিকতর সংগত, আল-কুরআনের প্রকাশ্য বর্ণনার আলোকে অধিকতর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। কারণ আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, ثم عرضهم على الملائكة এর দ্বারা আদম (আ)-কে শেখানো

নামগুলির প্রকৃত সত্তা উদ্দেশ্য। কেননা আরববাসীরা 'হা-মীম' অক্ষর দিয়ে সচরাচর মানব জাতি ও ফেরেশতাদের উপ-নামকরণ করে থাকে। আর মানুষ ও ফেরেশতা ব্যতীত অন্যান্য পশু পাখী এবং সর্ববিধ সৃষ্টিকে বুঝাবার জন্য তারা 'হা-আলিফ' (ها-সেগুলি, সেগুলির) কিংবা 'হা-নূন' هن-সেগুলি সে সবের) অক্ষর ব্যবহার করে থাকে। তখন তারা বলে عرضهن না عرضها অনুরূপ ভাবে সব ধরনের সৃষ্টি পশু পাখী ও অন্যান্য জাতিকুল এবং মানব ও ফেরেশতাদের এক সাথে বুঝাতে হলে তখনও 'হা-নূন' (هن) বা 'হা-আলিফ' (ها) অক্ষর ব্যবহার করে। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক সময় 'হা-মীম' (هم) অক্ষরের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ্‌র কালাম—

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلٰى اَرْبَعٍ ۞

"আল্লাহ পাক প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণীকে (এক প্রকার) পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তাদের মাঝে কেউ পেটে ভর দিয়ে চলে, কেউ দু পায়ে চলে আর কেউ চার পায়ে চলে" (সূরা নূর, আয়াত সংখ্যা ৪৫)। এখানে 'হা-মীম' (তথা هم) দ্বারা সর্ব প্রকার সৃষ্টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টিও রয়েছে।

এ ব্যবহার পদ্ধতি আরবী ভাষায় ব্যাকরণগত দিক থেকে বৈধ হলেও বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সম্মিলন ক্ষেত্রে তাদের নাম ও বিশেষ্যের পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার কালে 'হা-আলিফ' (ها) অথবা 'হা নূন, (هن) ব্যবহার করাই আরবী ভাষায় ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। এ কারণেই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আদম (আ)-কে যে সব নাম শিখানো হয়েছিল সেগুলি আদম সন্তানদের নাম এবং ফেরেশতাদের নাম হওয়াই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকতর সংগত ও বিশুদ্ধ। যদিও এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমতের পক্ষে আল্লাহ্‌র কিতাবে প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, فمنهم من يمشي على بطنه - الاية (তাদের মধ্যে কেউ পেটের উপর ভর দিয়ে চলে) তদুপরি এমন কথার উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইবনে মাস'উদ (রা)-র সংকলিত সহীফায় এ আয়াতে ثم عرضهن রয়েছে এবং হযরত উবাই (রা)-এর সহীফায় রয়েছে ثم عرضها তাই এমনও হতে পারে যে, ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উবাই (রা)-র কিরাআতের অনুসরণে আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুর নাম শেখার কথা বলেছেন। কারণ আমাদের অবগতি মর্মে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উবাই (রা)-র কিরাআত অনুসরণে তিলাওয়াত করতেন। হযরত উবাই (রা) থেকে উধৃত কিরাআতকে ভিত্তি সাব্যস্ত করলে ইবনে আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। বরং তা-ও আরবী ভাষার ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত ব্যবহার হিসাবে স্বীকৃত—যে কথা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আমাদের কিরাআতের আলোকে এ আয়াতের অধিকতর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। সেখানে আমি একথাও বলেছি যে,

عرضهم-এর هم সর্বনাম দ্বারা সব ধরনের সৃষ্টিকে শামিল করায় তুলনায় শুধু মানব জাতি ও ফেরেশতাদের নির্দেশ করা উত্তম, যদিও সব ধরনের সৃষ্টি ও জাতি গোষ্ঠীকে শামিল করা বৈধ। আমার এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তিগুলোও আমি একই সাথে উল্লেখ করেছি। ثم عرضهم আয়াতাংশে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য—'অতঃপর তিনি সব নামধারীদের ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন। وعلم ادم الاسماء আয়াতাংশে তাফসীরবিদগণের যেমন বিভিন্ন মত ছিল, ثم عرضهم-এর ব্যাখ্যায়ও তাদের তেমনি বিভিন্ন মত রয়েছে। এ বিষয় আমার জানা মনীষীদের সব অভিমতই এখানে উল্লেখ করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ثم عرضهم على الملئكة —অতঃপর এ নামগুলো অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টির বিভিন্ন গোত্র গোষ্ঠী ও সমুদয় বিষয় বস্তুর যে নামগুলো আদমকে শিখিয়েছিলেন—সে সমুদয় ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও কয়েকজন সাহাবী বলেন যে, ثم عرضهم-এর অর্থ হল অতঃপর তিনি সৃষ্টি জগতকে ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন।

ইবনে যায়দ (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি আদম (আ)-এর বংশধরদের সকলের নাম, যাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে গ্রহণ করেছিলেন—"অতঃপর তিনি তাদেরকে ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন।"

কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'তাকে প্রতিটি জিনিসের নাম শিখিয়ে দিয়ে সে নামগুলোকে ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন।

মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি ثم عرضهم এর ব্যাখ্যায় বলেন—যাদের নামকরণ করা হয়েছে তাদেরকে ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন। মুজাহিদ থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি ثم عرضهم على الملئكة আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, সব নাম প্রকাশ করলেন, যেমন—কবুতর, কাক ইত্যাদি।

হাসান ও কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, তাঁকে প্রতিটি জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন—এই ঘোড়া, এই খচ্চর ইত্যাদি ইত্যাদি। তার সামনে এক একটি করে জাতি নিয়ে আসা হল, আর তিনি প্রতিটিকে তার নির্দিষ্ট নামে উল্লেখ করতে লাগলেন। فقال انبؤني باسماء هؤلاء অর্থ অতঃপর বললেন, এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, انبؤني-এর অর্থ اخبروني-আমাকে খবর দাও।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ... انبؤني অর্থ আমাকে এ সবের নামগুলির খবর দাও। এ অর্থেই যুবয়ান গোত্রের কবি নাবিগা বলেন ঃ

وانباه المنبئ ان حيا — حلول من حرام اوجذام

এ চরণে انبا শব্দের অর্থ اخبره واعلمه তাকে খবর দিল ও অবহিত করল। باسماء هؤلاء অর্থ এ সমুদয়ের নাম। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি

আল্লাহ পাকের কালাম باسماء هؤلاء আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ এ সমুদয়ের নাম যা আমি আদমকে বাতলে দিয়েছি।

মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ পাকের কালাম انبئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতেন—এ সমুদয়ের নাম যা আমি আদমকে বাতলে দিয়েছি। আল্লাহ পাকের বাণী ان كنتم صادقين অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ان كنتم صادقين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তোমরা জানতে কি উদ্দেশ্যে আমি পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করছি।

হযরত মূসা ইবনে হারূন (রঃ) থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যদি তোমরা এ কথাতে সত্য হয়ে থাক যে, মানুষ পৃথিবীতে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করবে আর রক্তপাত ঘটাবে। কাসিম (রহ) থেকে হাসান (রহ) ও কাতাদা (রহ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের ইরশাদ করেন, অ মাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও—যদি তোমরা এ দাবীতে সত্য হও যে, আমি যা সৃষ্টিকরব তোমরা তার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। সুতরাং তোমরা (স্বীয় দাবীতে) সত্য হয়ে থাকলে আমাকে এগুলোর নাম বলে দাও।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত বিভিন্ন অভিমতের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) ও তদনুরূপ ব্যাখ্যাকারদের অভিমতই উত্তম। আয়াতের মর্মঃ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা তো বলেছিলে—"আপনি কি আমাদের ছাড়া পৃথিবীতে এমন অন্য কাউকে প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছেন যারা তথায় দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে, না আমাদের থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন? যেহেতু আমরা আপনার তাছবীহ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি"।

এখন তোমাদের সামনে যাদেরকে আমি হাযির করলাম, তোমরা আমাকে এগুলোর নাম বলে দাও। যদি তোমরা এ কথাতে সত্য হও যে, আমি তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানালে তার বংশধরগণ দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। আর তোমাদেরকে তথায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে তোমরা আমার অনুগত হবে এবং সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আমার পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে আমার আদেশ পালন করবে। অতএব, আমার সৃষ্টি থেকে যাদের তোমাদের সামনে হাযির করলাম, যদি তোমরা তাদের নাম অবগত না হও; অথচ তারা সৃষ্ট, তোমাদের সম্মুখে রয়েছে, তোমরা তাদের প্রত্যক্ষ করতে পারছ; তাহলে এখনও যা মওজুদ নয়, যা সৃষ্টি করা হয় নাই, যা তোমাদের নয়নের আড়ালে রয়েছে যে সম্পর্কে তোমরা অবগত না হওয়াটাই স্বাভাবিক। সুতরাং যে বিষয় সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নাই, সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। নিশ্চয় আমি অবগত আছি কোন্ জিনিস তোমাদের জন্য উপযোগী আর কোন্ জিনিস তাদের জন্য উপযোগী। যে সকল ফেরেশতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আপত্তি করেছিল—"তবে কি আপনি পৃথিবীতে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টিকারী প্রতিনিধি সৃষ্টি করবেন?" তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের এ (ধমকিমূলক)

ব্যবহার, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের উক্তির ন্যায়। যখন নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাককে বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক। আমার পুত্র আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আর আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। আপনি সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিচারক।" প্রতিউত্তরে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—"তুমি আমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করছি যে, এরূপ প্রশ্নের ফলে তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণও স্বীয় প্রতিপালকের কাছে আবেদন করেছে যেন তারা পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে তথায় তাঁর তাছবীহ এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারে। কেননা তিনি পৃথিবীতে যাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে যাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেছেন তার বংশধররা তথায় দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তপাত করবে।

প্রতিউত্তরে আল্লাহ পাক তাদের ইরশাদ করেন—"আমি যা জানি তোমরা তা জান না"। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদের দাবী খণ্ডন করে বলেন—আমি জানি যে, সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ গুনাহগার তোমাদের মধ্য থেকেই হবে। সে হল ইবলীস।

অতঃপর তারা যা প্রত্যক্ষ করেছে সে ব্যাপারে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার প্রমাণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাদের উক্তিতে নিজেদের পদস্খলন সম্বন্ধে অবগত করেছেন। তারা বর্তমানে মওজুদ যে সকল সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে নাই এবং এদেরকে সামনে উপস্থাপন করে এদের নাম সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়। কি ভাবে তারা এদের নাম বলতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাকের উক্তি—'তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক যে, যদি আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করি তাহলে তোমরা আমার তসবীহ করবে, আমার পবিত্রতা বর্ণনা করবে। আর যদি তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করি তাহলে তাদের বংশধররা আমার অবাধ্য হবে, দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে ও রক্তপাত ঘটাবে"—সম্পর্কেও তাদেরকে অবগত করার মাধ্যমেও তাদের বক্তব্যের ভুল দেখিয়েছেন। তাদের সামনে নিজেদের বক্তব্যের ত্রুটি ও ভুল প্রতিভাত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা তওবা করে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত হয়ে যায় এবং বলে "আপনি পবিত্র। আমরা কোন কিছু জানি না, তবে আপনি আমাদের যা শিক্ষা প্রদান করেছেন (সেগুলি ব্যতীত)।" এ ভাবে তারা অতি শীঘ্র স্বীয় ভুল উপলব্ধি করে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ পাক নূহ আলাইহিস সালামের আবেদন সম্পর্কে এ বলে সতর্ক করার পর—"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আবেদন করো না;" হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আরয করেছিলেন—"হে আমার প্রতিপালক। যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমি আপনার কাছে আবেদন করেছি বলে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি; যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।" অনুরূপভাবে যাকে সত্য পথ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং সত্য গ্রহণের তৌফিক দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি নত হয়ে অনতিবিলম্বে সত্য গ্রহণ করে যাবেন।

বসরার জনৈক ব্যাকরণবিদ বলেন, "যদি তোমরা (স্বীয় দাবীতে) সত্য হয়ে থাক তাহলে আমাকে এগুলোর নাম বলে দাও"—এই কথা ফেরেশতাগণ কোন কিছু দাবী করেছিল বলে আল্লাহ পাক বলেননি বরং আল্লাহ পাক এ আয়াতের মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কথা প্রকাশ

করেছেন এবং স্বীয় জ্ঞান ও মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন, "যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক, তাহলে আমাকে বল।" যেমন কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির মূর্খতা প্রকাশ করার জন্য বলে—এ বিষয় সম্পর্কে যদি তুমি অবগত থাক তাহলে আমাকে বল অথচ সে জানে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তা অবগত নয়। আরেকটি আয়াতও উদাহরণটির অনুরূপ।

উক্ত ব্যাকরণবিদের এ অভিমতের উপর কেউ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তার অভিমতেই রয়েছে স্ববিরোধিতা। যেহেতু তার ধারণা - আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের সামনে বস্তুসমূহ উপস্থাপিত করে ইরশাদ করেছিলেন—"তোমরা এদের নাম বল" অথচ তিনি জানেন যে—তারা এ সম্পর্কে অবগত নয়। অধিকন্তু এ বাক্য দ্বারা তাদের তিরস্কার করা যেতে পারে এমন কোন বিষয়ের দাবীও তারা করে নাই। সে এ কথাও ধারণা করে যে (নিম্নে উল্লেখিত উদাহরণ) ان كنتم صادقين-এর অনুরূপ। যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল—এ বিষয় সম্পর্কে যদি তুমি অবগত থাক, তাহলে আমাকে বল—অথচ সে জানে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি এ সম্পর্কে অবগত নয়। এ ধরনের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয় ব্যক্তির মূর্খতা প্রকাশ করা (আয়াতটিও তদ্রূপ)।

এতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই যে ان كنتم صادقين-এর অর্থ যদি তোমরা স্বীয় উক্তিতে সত্য হও অথবা স্বীয় কর্মে সত্য হও। কেননা, আরবী পরিভাষায় সত্য হওয়া বলতে সংবাদ প্রদানে সত্য হওয়া বুঝায়। জ্ঞানে সত্য হওয়া বুঝায় না। আর যে কোন ভাষায় صدق الرجل সে জানে এই অর্থ করাও যুক্তিসংগত নয়।

صدق শব্দটির এই অর্থ গ্রহণ করা হলে অত্র আয়াত সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যার ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি তদনুসারে বিষয়টি এই দাঁড়ায় যে, انبؤنى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের একথা বলার সময়ই তিনি জানেন যে—তারা সত্য নহে। ফলতঃ তিনি এই উক্তি দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে তারা নিজ দাবীতে সত্য নয়। আর ব্যাকরণবিদ আয়াতের এ অর্থকে অস্বীকার করে যাচ্ছেন। কারণ তাঁর ধারণা যে, ফেরেশতারা কোন কিছুর দাবী করেন নাই। এমতাবস্থায় তাদেরকে কিভাবে একথা বলা ঠিক হবে যে, "যদি তোমরা সত্য হও তাহলে আমাকে এগুলোর নাম বল" (কেননা সত্য ও অসত্যের সম্পর্ক দাবীর সাথে)। অধিকন্তু তাঁর এ অভিমত পূর্বাপর সমস্ত তাফসীরকারগণের অভিমতসমূহের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে—এই আয়াতে ان كنتم صادقين-এর অর্থ اذ كنتم صادقين যদি এস্থলে ان শব্দটি اذ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে ان শব্দের হামযাকে অবশ্যই যবর যোগে পাঠ করতে হবে। কারণ اذ-এর পূর্বে কোন ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া (فعل مستقبل) উল্লেখিত হলে اذ পূর্বে উল্লেখিত ক্রিয়ার বর্ণিত হুকুমের কারণ হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কেউ اقوم اذ قمت বাক্যটি উচ্চারণ করল। এক্ষেত্রে বাক্যটির অর্থ হল—তুমি দণ্ডায়মান হয়েছ বলে আমিও দণ্ডায়মান হব। আদেশসূচক ক্রিয়া ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ان শব্দটি اذ অর্থে ব্যবহৃত হলে আয়াতের অর্থ হবে—তোমরা সত্য, এই কারণে আমাকে এগুলোর নাম বল। তদুপরি ان-কে এস্থলে اذ-এর অর্থে ব্যবহার করলে আয়াতের শাব্দিকরূপ انبؤنى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين অর্থাৎ হামযা যবর বিশিষ্ট হবে। অথচ এস্থলে

إن-এর হামযাকে যের যোগে পাঠ করার ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একমত। তাদের এ ঐক্যমতই إن-কে এস্থলে إذ-এর অর্থে ব্যবহার সঠিক না হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(٣٢) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ -

(৩২) ফেরেশতারা বললো তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের আর কোন জ্ঞান নাই। নিশ্চয় তুমিই মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি বিষয়ে যে ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলো, তা থেকে তারা ফিরে আসে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। তাদের অজানা বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহর আছে—সে বিষয়টি স্বীকার করে এবং আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান ছাড়া তারা বা অন্য কেউ যে আর কোন উপায়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে না সে দাবী থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করে।

এ তিনটি আয়াতে শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং উপদেশ রয়েছে। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা এমন সব সূক্ষ্ম বিষয় অন্তর্নিহিত রেখেছেন যার বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করতে বাকশক্তি অক্ষম। মনোযোগসহ শ্রবণকারী কান এবং হৃদয় মনের জন্য এসব আয়াতে যথাযথ বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে। এ সব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বপক্ষে বনী ইসরাঈলের ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানিয়েছেন। অথচ তাঁর সৃষ্টির বিশেষ কোন ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকেই তিনি তা জানান নি। নবীগণও তাঁর পক্ষ থেকে জানানো ছাড়া এ জ্ঞান লাভ করতে পারেন নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ভাবে গায়েবের জ্ঞান দান করার উদ্দেশ্য হলো, ইহুদীদের সামনে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তারা জানতে পারবে যে, তিনি যা কিছু তাদের সামনে পেশ করেছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে, অতীতে বা ভবিষ্যতে কোন বিষয় সম্পর্কে কেউ যদি কোন খবর দেয়, আর তা যদি অতীতে না থেকে থাকে বা ভবিষ্যতেও সংঘটিত না হয় এবং উক্ত বিষয় সম্পর্কে সে কোন প্রমাণও উপস্থাপিত করতে সক্ষম না হয় তবে বুঝতে হবে যে, বিষয়টি ঐ ব্যক্তির মনগড়া। তাই সে তার প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি লাভের যোগ্য।

তুমি কি দেখছো না আল্লাহ তাআলা (إني أعلم ما لا تعلمون) "আমি যা জানি তোমরা তা জানো না" বলে ফেরেশতাদের

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؟

(তুমি কি এমন মাখলুক সৃষ্টি করে সেখানে পাঠাবে যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো প্রশংসাসহ তোমার তাসবীহ করছি ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এই কথার

জবাব দিলেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, এরূপ কথা বলা তাদের জন্য জায়েজ নয়। সাথে সাথে তাদেরকে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা সম্পর্কেও জানিয়ে দিলেন। কারণ নাম পরিচয় সম্পন্ন কিছু বস্তু পেশ করে তাদেরকে ঐ সব বস্তুর নাম পরিচয় বলতে আহবান জানানো হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين কিন্তু তারা এ ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করলো। আল্লাহ তাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তাছাড়া আর কিছু তারা জানে না বলেও স্পষ্টভাবে বলে দিল। তারা বললো سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا (আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই)। এ ঘটনার মধ্যে হস্তরেখা বিশারদ, গণক ও জ্যোতি-র্বিদের গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানার দাবী মিথ্যা হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আমরা যে সব আহলে কিতাবদের কথা উল্লেখ করেছি তাদের বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষরা যখন আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল তখন আল্লাহও তাদেরকে অগণিত নিয়ামত দান এবং করুণা বর্ষণ করেছিলেন। তাদের কথা উল্লেখপূর্বক আহলে কিতাব থেকে বিনীতভাবে হিদায়াতের দিকে ফিরে আসার আহবান জানানো হয়, তিরস্কার করে মুক্তির পথে চলতে বলা হয় এবং বিদ্রোহ, পথভ্রষ্টতা ও আযাব নাযিল হওয়া সম্পর্কে সাবধান করা হয়। ঠিক যেমন তাদের শত্রু ইবলীস ক্রমাগত বিদ্রোহাত্মক আচরণ করার কারণে তার উপর অপমানকর শাস্তি হয়েছে।

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا-এর ব্যাখ্যা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতারা বললো, (سبحانك) অর্থাৎ পবিত্রতা মহান আল্লাহর জন্য। কারণ, তিনি ব্যতীত আর কেউ-ই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী নয়। হে আল্লাহ, আমরা আপনার হুযুরে তওবা করলাম। আপনি আমাদেরকে যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন তা ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই। গায়বী ইল্‌মু সম্বন্ধে তারা তাদের পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করলো। তবে আপনি আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন কেবল তাই আমরা জানি। যেমন আপনি (আদমকেও) জ্ঞান দান করেছেন। এখানে سبحان শব্দটি مصدر। এর অর্থ হলো, আমরা আপনার তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করি। অর্থাৎ তারা যেন বললো, আমরা যথোপযুক্তভাবে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আর আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তার বাইরে আমরা কিছু জানি এরূপ অপবাদ থেকেও আমরা মুক্ত।

انك انت العليم الحكيم-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি মহাজ্ঞানী, যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে, সমস্ত বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ অবগত। আপনি সমস্ত গায়বী বিষয়ে পরিজ্ঞাত যা আপনার সৃষ্টির আর কেউ জানে না। এভাবে তারা لاعلم لنا الا ما علمتنا বলে তাদের প্রতিপালকের শেখানো জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জ্ঞান থাকার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আর যে জ্ঞান তাদের নাই বলে তারা স্বীকার করেছে তা তাদের প্রতিপালকের আছে বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং তারা বলেছে انك انت العليم। অর্থাৎ তারা মহান আল্লাহকে এমন এক

মহা জ্ঞানময় সত্তা মনে করেছে যিনি কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা ব্যতীতই জ্ঞানী। কারণ আল্লাহ পাক ব্যতীত আর সবাই শিক্ষা লাভ ছাড়া কিছু জানতে পারে না। হাকীম অর্থ, যিনি হিকমত বা কৌশলের অধিকারী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আলীম' যিনি তার ইলম ও জ্ঞানে পূর্ণ আর হাকীম যিনি হিকমত বা কৌশলের ক্ষেত্রে পূর্ণ। কেউ কেউ বলেছেন حكم অর্থ এখানে حاكم যেমন علم অর্থ عالم এবং خبير অর্থ خابر অর্থাৎ যার কাছে সব খবর আছে।

(৩৩) قَالَ يٰٓادَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۔

(৩৩) তিনি বললেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে এ সবের নাম বলে দাও। যখন সে তাদেরকে এ সবের নাম বলে দিল, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান-যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ে আমি নিশ্চিতভাবে অবগত আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং গোপন রাখ, আমি তাও জানি।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ পাকের যে সব ফেরেশতা তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানানোর জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিল এবং যেখানে অন্যেরা পৃথিবীতে অশান্তি ও রক্তপাত করছিলো, সেখানে তারা আল্লাহর আনুগত্য করছে ও তার নির্দেশের সামনে মাথা নত করছে বলে দাবী করেছিল, আল্লাহ তা'আলা সেই সব ফেরেশতাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি তাদেরকে অবহিত না করা পর্যন্ত তারা তাঁর ফয়সালা ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। যেমন তাদের সামনে পেশকৃত বস্তুসমূহের নাম পরিচয় জানার ব্যাপারেও তারা অজ্ঞ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ সব বস্তুর নাম শিখিয়ে দেন নি। তাই তারা তা শিখতে সক্ষম হয়নি। তাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাদেরসহ অন্য বান্দাদেরকে যতটুকু জ্ঞান দান করেন, তারা কেবল ততটুকুই জানতে পারে। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে যতটুকু জ্ঞান দান করতে চান, ততটুকুই দান করেন। আবার যাকে যে জ্ঞান দিতে না চান, তাকে সে জ্ঞান দেন না। যেমন ফেরেশতাদের সামনে পেশকৃত বস্তুসমূহের নাম হযরত আদম (আ)-কে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাদেরকে তা শিখান নি। তবে শেখানোর পরে তারা সে বিষয়ে জানতে পেরেছিল।

قَالَ يٰٓادَمُ اَنْۢبِئْهُمْ -এর ব্যাখ্যা।

"আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম! তুমি ফেরেশতাদের জানিয়ে দাও।" এখানে اَنْۢبِئْهُمْ শব্দের هم সর্বনামটি ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। بِاَسْمَآئِهِمْ অর্থাৎ ঐ নামসমূহ যা ফেরেশতাদের বলা হয়েছে। এখানে اسمائهم শব্দের هم সর্বনামটি দ্বারা انبئوني باسماء هؤلاء فلما انبأهم বাক্যটির هؤلاء শব্দটিতে যেসব বস্তুর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে সেগুলোকে নির্দেশ করা

হয়েছে। ফেরেশতাদের নিকট যেসব বস্তু তুলে ধরা হয়েছিল, তখন হযরত আদম (আ) তাদেরকে ঐ সব বস্তুর নাম বলে দিলেন। কিন্তু তারা ঐগুলোর নাম বলতে পারেনি। এভাবে তারা নিজেদের বক্তব্যের ত্রুটি বুঝতে পারে যাতে তারা বলেছিল :

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

"(হে আল্লাহ) তুমি কি পৃথিবীতে এমন মাখলুককে প্রতিনিধি করে পাঠাবে, যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। অথচ আমরাই তো আপনার হামদের তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" এবার ফেরেশতারা বুঝতে সক্ষম হলো যে, তারা ঐ ব্যাপারে ভুল করে ফেলেছে এবং এমন কথা বলেছে যে বিষয়ে তারা কিছুই জানতো না। যে বিষয়ে তারা তাদের বক্তব্য বা মতামত পেশ করেছে সে বিষয়ে আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের ধারা সম্পর্কে তারা কিছুই জানতো না। আল্লাহ পাক তাদেরকে বললেন : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموت والأرض

অর্থাৎ "আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান ও যমীনের গায়েবী বিষয়সমূহে সম্পূর্ণ অবগত আছি?" গায়েব হলো এমন বস্তু যা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে, যা তারা দেখতে পায় না। পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার আবেদন করে অতীতে তারা যে ভুল ও বাড়াবাড়ি করেছিল এভাবে আল্লাহ তাদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন। যেমন এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

قال يادم أنبئهم بأسمائهم আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে এ সবের নাম পরিচয় জানিয়ে দাও।

فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم

অর্থাৎ হযরত আদম (আ) যখন তাদেরকে ঐ সব বস্তুর নাম-পরিচয় জানিয়ে দিলেন তখন আল্লাহ পাক বললেন, হে ফেরেশতারা! আমি কি তোমাদেরকে বিশেষভাবে বলিনি যে إني أعلم غيب السموت والأرض আমি আসমান ও যমীনের গায়বী বিষয়সমূহে জানি? আমি ব্যতীত আর কেউ তা জানে না।

হযরত ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি ফেরেশতা ও আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন : ফেরেশতাদের যেহেতু ঐ সব বস্তুর নাম পরিচয় জানা ছিল না, তাই আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বললেন, যে ভাবে এ বস্তুসমূহের নাম তোমরা জান না, ঠিক এ ভাবে এ বিষয়টিও তোমরা জান না যে, আমি আদম ও তার সন্তানকে এজন্য সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছি; যেন তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে আমি অবগত আছি। আমি তোমাদের কাছে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছিলাম, তা হল আমি পৃথিবীতে এমন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করতে যাচ্ছি যাদের মধ্যে কিছু লোক অবাধ্য হবে, কিছু লোক অনুগত হবে।

হযরত ইমাম তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রথমেই এ সিদ্ধান্ত হয়ে আছে : لأَمْلأَنَّ جهنم من الجنة والناس اجمعين "আমি মানুষ ও জিন দিয়ে দোযখ পরিপূর্ণ করবো।" হযরত ইমাম তাবারী (রহ) বলেন, এ বিষয়টি সম্পর্কে ফেরেশতাদের জ্ঞান ছিল না। আর তারা এটা উপলব্ধিও করতে পারেনি। যখন তারা দেখলো, আল্লাহ তাআলা আদমকে জ্ঞান দান করেছেন তখন আদম আলাইহিস সালামের সম্মান ও মর্যাদা স্বীকার করে নিল।

واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেছেন, মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ পাকের বাণী واعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون-এর ব্যাখ্যায় বলেন : আমি প্রকাশ্য বিষয়সমূহ যেমন জানি তেমনি গোপন বিষয়সমূহও জানি। অর্থাৎ যে গর্ব-অহংকার ও ধোঁকাবাজি ইবলীস তার মনে গোপন করে রেখেছিল তাও আমি জানি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون—এর ব্যাখ্যায় বলেন তোমরা যা প্রকাশ করছো এবং যা গোপন করছো তা আমি জানি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও সাহাবাগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন اتجعل فيها من يفسد فيها। এই কথাটি ফেরেশতারা প্রকাশ করেছে, ইবলীসের অন্তরে যে অহংকার ছিল তা গোপন করেছে।

আহমাদ ইবনে ইসহাক আল-আহওয়াযী আবু আহমাদ আয-যুবাইরীর মাধ্যমে সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون আয়াতাংশের অর্থ হলো, ইবলীস হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা না করার কারণ হলো—গর্ব ও অহংকার যা সে গোপন রেখেছিল।

হাসান ইবনে দীনার বলেছেন, আমরা হাসান বসরীর বাড়ীতে তাঁর মজলিসে বসা ছিলাম। এই সময় হাসান ইবনে দীনার হাসান (রা)কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু সাঈদ ! আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেছিলেন : واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون অর্থাৎ তোমরা যা প্রকাশ করে থাকো এবং যা গোপন করে থাকো তা আমি জানি। আপনার মতে ফেরেশতারা কি বিষয় গোপন করেছিল ? জওয়াবে হযরত হাসান বসরী (রহ) বললেন: আল্লাহ তাআলা যখন আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন তাকে ফেরেশতাদের কাছে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি বলে মনে হলো। এতে তাদের মনে একটি নতুন চিন্তার উদয় হলো। তারা এ বিষয়ে একে অপরের প্রতি মনোনিবেশ করলো এবং বিষয়টি নিজেদের মধ্যে গোপন রাখলো। তোমরা এই মাখলুককে এত গুরুত্ব প্রদান করছো কেন ? আল্লাহ পাক এমন কোন মাখলুক সৃষ্টি করেননি আমরা যার তুলনায় অধিক সম্মানিত নই।

واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون-এর ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন : ফেরেশতারা নিজেদের মধ্যে এ কথাটি গোপন রেখেছিল আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করবেন। তবে আমাদের চেয়ে সম্মানিত আর কাউকে সৃষ্টি করবেন না।

রবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ফেরেশতারা যা প্রকাশ করেছিল তা হলো এ আয়াতাংশ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا। আর তারা যা গোপন করেছিল তা হলো তাদের মধ্যেকার এই কথোপকথন যে, আমাদের প্রভু কখনো এমন কোন মাখলুক সৃষ্টি করবেন না যাদের তুলনায় আমরা অধিক জ্ঞানবান ও সম্মানিত হবো না। কিন্তু পরে তারা উপলব্ধি করলো যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ)-কে জ্ঞান ও সম্মানের দিক থেকে তাদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদা দান করেছেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, পেশকৃত এসব বক্তব্যের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-র বক্তব্যই এ আয়াতের ব্যাখ্যা হওয়ার অধিক উপযুক্ত। তাঁর বক্তব্য অনুসারে وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ আয়াতাংশের অর্থ হলো আসমান ও যমীনের গায়বী বিষয়সমূহ জানার সাথে সাথে তোমরা যে সব বিষয় মুখে প্রকাশ করো তাও আমি জানি। وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ আর যা তোমরা মনের মধ্যে গোপন রাখো তাও জানি। তাই আমার কাছে কিছুই গোপন থাকে না। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই আমার কাছে সমান। এ ক্ষেত্রে তারা যা মুখে প্রকাশ করেছিল আল্লাহ তাআলা তা জানিয়ে দিয়েছেন। তারা বলেছিলঃ

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

"(হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন মাখলুককে প্রতিনিধি করে পাঠাবেন, যারা সেখানে অশান্তি ও রক্তপাত ঘটাবে ...?" তারা যা গোপন করছিল তা হলো ইবলীসের আল্লাহ পাকের আনুগত্য না করে গর্ব ও অহংকার করা এবং তাঁর আদেশ পালনে অবাধ্য হওয়া। কারণ উল্লেখিত দুটি কারণের একটির এ আয়াতের ব্যাখ্যা হওয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। অপর কারণটি হলো আমাদের বর্ণিত হযরত হাসান (রহ) ও হযরত কাতাদা (রহ)-এর উক্তি।

আর যারা বলেন, ফেরেশতারা গোপনে যে কথোপকথন করেছিল তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা। কারণ তারা তা গোপনে রাখার প্রয়াস পেয়েছিল। কথাটা ছিল আল্লাহ পাক যে কোন মাখলুকই সৃষ্টি করুন না কেন, আমরা সব সময় তার চেয়ে অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী থাকব। কারণ উল্লেখিত দুটি উক্তির যে কোন একটি ছাড়া যখন এ আয়াতের আর কোন ব্যাখ্যাই নাই এবং তারও একটির আবার অপরটির তুলনায় বিশুদ্ধতার প্রমাণ অনুপস্থিত, তখন অপর ব্যাখ্যাটিই সঠিক।

হযরত হাসান (রহ), হযরত কাতাদাহ (রহ) ও তাঁদের সাথে ঐক্যমত পোষণকারীগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যা বলেন তার সপক্ষে কিতাবুল্লাহর কিংবা হাদীসের কোন গ্রহণযোগ্য দলীল নাই। এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যা বলেছেন, ইবলীস সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী তার সত্যতা প্রতিপাদন করে। কারণ আল্লাহ পাকের বাণীতে উল্লেখ আছে যে, যখন তিনি হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আহবান জানিয়েছিলেন তখন সে তা অমান্য করেছিল, অবাধ্য হয়েছিল এবং অহংকার করেছিল। সমস্ত ফেরেশতার সামনে তার এই অবাধ্যতা ও অহংকার প্রকাশ করা সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন। অথচ ইতিপূর্বে সে তা গোপন করতো।

এক্ষেত্রে কেউ যদি এ ধারণা পোষণ করে যে, ফেরেশতারা গোপন করেছিল বলে যা বলা হয়েছে তা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হিসাবে যা বলা হয়েছে তা জায়েয নয়। আর যারা ঐ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এভাবে ইবলীসের অহংকার ও গুনাহ গোপন করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাখ্যা নির্ভুল। এ ধারণাটিও ভুল। কেননা আরবদের নীতি হলো, যখন তারা একদল লোকের মধ্য থেকে নাম উল্লেখ না করে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলে তখন তারা সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে কথাটি বলে। তবে উদ্দেশ্য সবাই হবে না। যেমন, কেউ যদি বলে সেনাবাহিনী পরাজিত ও নিহত হয়েছে। অথচ নিহত হয়েছে বাহিনীর একজন বা কিছু সংখ্যক অথবা পরাজিত হয়েছে একজন বা কয়েকজন। এক্ষেত্রে কথাটি নিহত বা পরাজিত ঐ এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, সবার জন্য প্রযোজ্য হবে না। এর উদাহরণ হলো, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون -

"হে নবী! যারা আপনাকে ঘরের বাইরে থেকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।" (সূরা হুযুরাত ৫৯/৪)

যে ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ (স)-কে ডেকেছিল এ আয়াতে তার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং আয়াতটি নাযিলও হয়েছে তার সম্পর্কে। তামীম গোত্রের একদল লোক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসেছিল। এ লোকটিও উক্ত দলে ছিল। তাই আয়াতে উল্লেখিত বিবরটি দলের সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। অনুরূপ واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون আয়াতাংশের বিষয়বস্তুও সবার জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং একজনের জন্যই তা প্রযোজ্য।

(৩৪) واذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكفرين -

(৩৪) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন: واذ قلنا আয়াতাংশ واذ قال ربك للملئكة আয়াতাংশের সাথে সংযোগ (عطف) করা হয়েছে। আমরা পূর্বে যেমন আলোচনা করেছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈল বংশীয় ইহুদীদেরকে তাদের প্রতি দেওয়া তার নিয়ামতের কথা গুণে গুণে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেন তিনি তাদেরকে বলেছেন তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত দানের কথাটি স্মরণ করো। পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছি।

আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাতে যাচ্ছি। আমি আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান, মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে তোমাদের পিতা আদমকে ইজ্জত দান করেছিলাম। সে সময়টিও স্মরণ করো, যখন আমি সমস্ত ফেরেশতাকে দিয়ে আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করিয়েছিলাম। এখানে ইবলীসকে ফেরেশতাদের অন্তরভুক্ত বলার পর তাদের দল হতে পৃথক করা হয়েছে, এর দ্বারা বুঝা যায় ইবলীস ফেরেশতাদের সম্প্রদারভুক্ত ছিল। কারণ ফেরেশতাদের সাথে সিজদা করার জন্য তাকেও আদেশ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ - قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ -

"তবে ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হয়নি। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে সিজদা করার নির্দেশ দিলে কে তোমাকে তা করতে বাধা দিয়েছিল?" এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করার জন্যে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়ার সময় তিনি ইবলীসকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা এ কথাও জানিয়েছেন যে, আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করার এই নির্দেশ যারা পালন করেছিল তাদের মধ্য থেকে ইবলীস বিরত ছিল। আল্লাহর নির্দেশ পালন করার যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য ফেরেশতাদের মধ্যে আছে তা ইবলীসের মধ্যে নাই।

ইবলীস ফেরেশতা ছিল না জিন এ বিষয়ে মুফাসসিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ইবলীস জিন নামক ফেরেশতাদের একটি গোত্রের অন্তভুক্ত ছিল। তাদেরকে ধোঁয়াবিহীন আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়। তার নাম ছিল হারিস। সে ছিল জান্নাতের একজন খাদেম বা কোষাধ্যক্ষ। এই দলটি ছাড়া অন্য সব ফেরেশতাদেরকে নূর বা জ্যোতি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর কুরআন পাকে উল্লেখিত জিনদেরকে ধোঁয়াবিহীন আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়, প্রজ্জলিত আগুনের শিখা দিয়ে।

অন্য এক সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, অবাধ্য হওয়ার পূর্বে ইবলীস ফেরেশতাদের অন্তভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল আযাযীল। সে ছিল পৃথিবীর অধিবাসী এবং কঠোর পরিশ্রমী। সে ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিল। এই জ্ঞানের কারণেই সে অহংকারে লিপ্ত হয়। সে জিন নামে ফেরেশতাদের একটি সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি বলেন যে, ইবলীস ছিল একজন ফেরেশতা। তার নাম ছিল আযাযীল। সে ছিল পৃথিবীর অধিবাসী। সেই সময় পৃথিবীতে ফেরেশতাদের একটি দল বাস করতো। তারা জিন নামে পরিচিত ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও একদল সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবলীসকে পৃথিবীতে নিয়োজিত ফেরেশতাদের তত্ত্বাবধায়ক করা হয়েছিল। সে জিন নামক ফেরেশতাদের একটি গোত্রের অন্তভুক্ত ছিল। তাদের জিন নামকরণের কারণ হলো তারা জান্নাতের খাজাঞ্চি ছিল। আর ইবলীস ছিল ফেরেশতাদের খাজাঞ্চি।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ইবলীস ছিল সম্মানিত ফেরেশতাদের মধ্যে একজন। তার গোত্রও ছিল সর্বাধিক সম্মানিত। সে ছিল জিনদের খাজাঞ্চি। পৃথিবী ও পৃথিবীর আসমানের কর্তৃত্ব ছিল তার হাতে। ইবনে আব্বাস (রা) আল্লাহ পাকের বাণী وكان من الجن-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ ইবলীসের নাম জিন রাখার কারণ হলো সে জান্নাতের খাজাঞ্চি ছিল। ঠিক যেমন কোন মানুষকে মক্কী, মাদানী, কূফী ও বাসরী বলা হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে জুরাইজ (রহ) বলেন, কিছু সংখ্যক লোকের মতে জিনরা ফেরেশতাদের একটি গোত্র। সুতরাং ইবলীসের গোত্রের নাম ছিল জিন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন—জিনদের গোত্রও ফেরেশতাদের একটি গোত্র। ইবলীস ছিল সেই গোত্রেরই একজন। সে আসমান-যমীনের মধ্যেকার সব কিছু তত্ত্বাবধান করতো।

হযরত দাহহাক (রহ) ইবনে মুযাহিম (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন فسجدوا الا ابليس كان من الجن। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেনঃ ইবলীস সর্বাধিক সম্মানিত ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য ছিল। তার গোত্রও ছিল সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এতটুকু বলার পর তিনি হযরত ইবনে জুরাইজ (রহ) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যার বর্ণনা করেছেনঃ ইবলীস পৃথিবীর আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের নেতা ছিল।

হযরত কাতাদা (রহ) বর্ণিত

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইবলীস ছিল জিন নামক ফেরেশতাদের একটি গোত্রের সদস্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইবলীস ফেরেশতা না হলে তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হতো না। সে দুনিয়ার আকাশের কোষাধ্যক্ষ ছিল। হযরত কাতাদা (রহ) বলেন, সে আল্লাহর আনুগত্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

হযরত কাতাদা (রহ) থেকে অন্য সূত্রে الا ابليس كان من الجن। আয়াতাংশের উল্লেখিত 'ইবলীসের' ব্যাখ্যায় বলেন, সে জিন নামক ফেরেশতাদের একটি গোত্রের সদস্য ছিল।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, আরবরা বলে থাকে—যারা নিজেদেরকে গোপন করে রাখে, দেখা যায় না, তাদেরকে জিন বলে। আল্লাহর বাণী الا ابليس كان من الجن। আয়াতাংশে উল্লেখিত ইবলীস ছিল ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ফেরেশতারা নিজেদেরকে গোপন করে রাখে। তাদেরকে দেখা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

"তারা আল্লাহ্ ও জিনদের মাঝে বংশ ও রক্তের সম্পর্ক স্থির করে রেখেছেন। অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে—" (সূরা ছাফ্‌ফাত ৩৭/১৫৮)। এর কারণ হলো কুরাইশরা বলতো, ফেরেশতারা হলো আল্লাহ্‌র কন্যা। তাই আল্লাহ্ বলছেন, ফেরেশতারা যদি আমার মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে ইবলীসও আমার মেয়ে। আর তারা আমার এবং ইবলীস ও তার সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশ ও রক্তের সম্পর্ক স্থির করে রেখেছে। বনী কায়েস ইবনে সা'লাবাতুল বিকরী গোত্রের কবি আশা সুলায়মান ইবনে দাউদ (আ) ও তাঁকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন :

ولو كان شيئ خالدا او معمرا ـ لكان سليمان البرى من الدهر

براه البهى واصطفاه عباده ـ وملكه مابين ثريا الى مصر

وسخر من جن الملئكة تسعة ـ قياما لديه يعملون بلا اجر ـ

অর্থাৎ "কোন জিনিস যদি চিরস্থায়ী বা দীর্ঘায়ু হতো তা হলে সুলাইমান আলাইহিস সালাম কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হতেন। মহান প্রতিপালক তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সমস্ত বান্দাদের মধ্যে থেকে তাঁকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং ছুরাইয়া থেকে মিসর পর্যন্ত ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন। তারা সব সময় তার দরবারে হাজির থাকে এবং বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে।"

হযরত ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রহ) বলেনঃ আরবী ভাষায় জিন নামকরণ এজন্য করেছেন যে, তারা গোপনে থাকে এবং দৃষ্টিগোচর হয় না। আর হযরত আদম (আ)-এর সন্তানের নাম ইনসান বা মানুষ রাখার কারণ—তারা গোপন থাকে না বরং প্রকাশিত থাকে। তাই যা প্রকাশ পায় তা ইনসান বা মানুষ। আর যা প্রকাশ পায় না বা দেখা যায় না তাকেই জিন বলা হয়।

হযরত হাসান (রহ) বলেন, ইবলীস এক পলকের জন্যও ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না এবং ইবলীস জিনদের আসল, যেমন হযরত আদম (আ) মানব জাতির আসল।

হযরত হাসান (রহ) الا ابليس كان من الجن আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে তার বংশধরদের প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন افتتخذونه و ذريته اولياء من دونى "তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে ইবলীস ও তার সন্তান-সন্ততিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছো——।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম-সন্তানের মত তারা সন্তান জন্ম দেয়।

হযরত শাহর ইবনে হাওশাব (রা) من الجن আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইবলীস ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। এ সব জিনদেরকেই ফেরেশতারা বিতাড়িত করেছিল। এই সময় কিছু সংখ্যক ফেরেশতা ইবলীসকে বন্দী করে আসমানে নিয়ে গিয়েছিল।

হযরত সা'দ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফেরেশতারা জিনদের সাথে লড়াই করছিল।

এক সময়ে ইবলীসকে বন্দী করা হলো। সে তখন ছোট ছিল। সে ফেরেশতাদের সাথে ছিল এবং তাদের সাথে ইবাদত-বন্দেগী করতো। কিন্তু হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হলে ইবলীস তা করতে অস্বীকার করলো। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, إلا إبليس كان من الجن।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফেরেশতাদের একটি দলের নাম জিন। ইবলীস তাদেরই একজন। সে আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছুর উপর কার্যরত ছিল। এরপর সে নাফরমানী করে বসলো। তাই আল্লাহ তাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিগণিত করলেন।

হযরত ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত যে, ইবলীস হলো জিনদের আদি পিতা, যেমন হযরত আদম (আ) মানুষের আদি পিতা। এই বক্তব্য প্রদানকারীর যুক্তি হলো, আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবে বলেছেন যে, তিনি ইবলীসকে প্রজ্জ্বলিত আগুন থেকে এবং আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ফেরেশতাদেরকে এর কোনটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন বলে কিছুই জানাননি। আর আল্লাহ পাক বলেছেন, ইবলীস জিনদের একজন। তাই আল্লাহ যে ভাবে তার সম্পৃক্ততা বর্ণনা করেছেন, তাছাড়া অন্য কিছুর সাথে ইবলীসের সম্বন্ধ ও সম্পৃক্ততা দেখানো জায়েজ নয়। ইবলীসের বংশধারা ও সন্তানাদি আছে, কিন্তু ফেরেশতাদের তা নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ তাআলা এক মাখলুক সৃষ্টি করলেন এবং বললেন, আদমকে সিজদা করো। কিন্তু তারা বললো, আমরা আদমকে সিজদা করবো না। এতে আল্লাহ আগুন পাঠিয়ে তাদের পুড়িয়ে ফেললেন। এরপর আর একটি মাখলুক সৃষ্টি করে বললেন, আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করবো। তোমরা আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করো। তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহ আগুন পাঠিয়ে তাদেরকে পুড়িয়ে ফেললেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তারপর আল্লাহ এদেরকে সৃষ্টি করে বললেন, আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করো। তারা তাই করলো। ইবলীস তাদেরই (পূর্বে বর্ণিতদের) একজন যারা আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিলো।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেনঃ এ কারণগুলোই এর প্রবক্তাদের জ্ঞানের দৈন্য প্রকাশ করে। কারণ একথা তো অনস্বীকার্য যে, মহান আল্লাহ বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতা গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কাউকে নূর থেকে, কাউকে আগুন থেকে এবং কাউকে এ দুটি ভিন্ন অন্য উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাদের কি উপাদানে সৃষ্টি করেছেন নাযিলকৃত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তা জানাতে চাননি। আর ইবলীসের সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়ার অর্থ এ নয় যে, সে আর ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এর অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ পাক একদল ফেরেশতাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং ইবলীস তাদেরই একজন। আবার ইবলীসকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করার কারণ হয়তো এই যে, তাকে আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাদেরকে আগুনের শিখা দিয়ে সৃষ্টি করা হয় নাই। এ ছাড়াও তার বংশধারা ও সন্তান-সন্তুতি থাকা, তার প্রকৃতিতে যৌন আবেগ ও ভোগের আনন্দ থাকা এবং তার থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া, তাকে ফেরেশতাদের দল থেকে খারিজ করে না। যদিও ফেরেশতাদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য ছিল না।

আর ইবলীস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন যে, সে ছিল জিন। এ কথাটিও

যুক্তিসংগত। আর যে সব বস্তু মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না তা সবই জিন নামে অভিহিত। কারণ جن শব্দের অর্থ পর্দা বা আড়াল করা। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে কবি আ'শার কবিতা উল্লেখ করেছি। সুতরাং মানুষের চোখ থেকে অদৃশ্য থাকার কারণে ইবলীস ও ফেরেশতা উভয় প্রজাতিই জিন হিসেবে পরিগণিত।

ইবলীস শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা মত রয়েছে। ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, ابليس। শব্দটি الإبلاس থেকে افعيل-এর ওযনে গঠিত। এর অর্থ কল্যাণ থেকে নিরাশ হওয়া, অনুতাপ-অনুশোচনা ও দুঃখ-দুশ্চিন্তা।

এই মর্মে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবলীস নামকরণ এজন্যে যে, আল্লাহ তাকে সব রকম কল্যাণ থেকে নিরাশ করেছেন এবং তাকে বিতাড়িত শয়তান বানিয়ে দিয়েছেন। তার গুনাহর শাস্তি দেয়ার জন্য এসব করা হয়েছে।

সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবলীসের প্রকৃত নাম ছিল হারিস। তার নাম ইবলীস রাখার কারণ হলো, সে সত্য থেকে নিরাশ হয়ে নিজেকে পরিবর্তিত করেছিল। শব্দটিকে এ অর্থে আল্লাহ তাআলাও ব্যবহার করে বলেছেন فاذا هم مبلسون অর্থাৎ তারা কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে এবং দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে। যেমন কবি আজজাজ বলেন—

يا صاح هل تعرف رسما مكرسا — قال نعم اعرفه وابلسا

আর কবি রুবা বলেন,

وحضرت يوم الخميس الأخماس — وفي الوجوه صفرة وإبلاس

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, ابليس শব্দটি الإبلاس শব্দ থেকে افعيل-এর ওযনে গঠিত হলে শব্দটিকে منصرف হিসেবে গণ্য করে যের দেয়া হয়নি কেন? এর জবাব হলো, এ শব্দটিকে যের দিয়ে পড়লে তার উচ্চারণ কঠিন হয়ে পড়ে এবং এমন একটি اسم বা নাম হয়ে যায়, আরবী ভাষায় যার কোন নজীর নেই। এমতাবস্থায় আরবরা এই اسم বা নামটিকে অনারবী ভাষা নামের অনুরূপ মনে করে যের দিয়ে পড়তো। অথচ এ ধরনের অনারব اسم-এর ক্ষেত্রে তারা যের দিয়ে পড়ে না। যেমন তারা বলে مررت باسحاق এ ক্ষেত্রে তারা যের দিয়ে পড়ে না। اسحاق-এর অর্থ হলো, من اسحقه الله اسحاقا অর্থাৎ যাকে আল্লাহ অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। কারণ শব্দটি আজমী ভাষার اسم হিসেবে مبدا হয়েছে। আরবরা এ শব্দটিকে اسم বা নাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তা নাম হিসেবে চালু হয়ে গিয়েছে। আজমী শব্দের اسم হিসেবে এতে اعراب প্রযুক্ত হবে। তাই তা منصرف হয়নি। যেমন ايوب শব্দটিও আজমী। এটি آب - يئوب থেকে فيعول-এর ওযনে ايوب হয়েছে।

أَبَىٰ-এর ব্যাখ্যা

أبى। শব্দটির فاعل বা কর্তা হিসেবে মহান আল্লাহ ইবলীসকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ ইবলীস হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করা থেকে বিরত থাকলো। সে সিজদা করলো না, বরং অহংকার করলো। সে নিজেকে বড় মনে করলো এবং হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো না। এটি ইবলীস সম্পর্কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি খবর স্বরূপ হলে আল্লাহ্‌র যে সব মাখলুক ইবলীসের মত গর্ব ও অহংকারের কারণে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের সামনে মাথা নত করে না এবং তার আনুগত্য করে না এবং তিনি পরস্পরের যে অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা মেনে নেয় না তাদের জন্য তীব্র তিরস্কারও বটে। আর আল্লাহ্‌র হুকুমের সামনে মাথা নত করতে, তার আনুগত্য করতে, তাঁর ফয়সালা মেনে নিতে এবং অন্যের যেমন হক আদায় করা আল্লাহ তাদের জন্য আবশ্যকীয় করে দিয়েছিলেন তা আদায় করতে অস্বীকার করে যারা অহংকার করেছিল তারা হলো ইয়াহুদ। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরতকারী মুহাজিরদের সামনেই ছিল। তাদের ধর্মযাজকগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিচয়সূচক গুণাবলী সম্পর্কে অবগত ছিল। তিনি যে সারা বিশ্বের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল তাও তাদের জানা ছিল। কিন্তু এসব জানা সত্ত্বেও তারা অহংকার ও গর্বের কারণে তাঁর নবুওয়াত স্বীকার করতো না এবং বিদ্রোহ ও হিংসার কারণে তাঁর আনুগত্য করতো না। ইবলীস সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের তীব্র ভৎর্সনা ও তিরস্কার করেছেন। কারণ হিংসা-বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের বশবর্তী হয়েই সে হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইবলীসের এমন সব দোষ বর্ণনা করেছেন যা ঐ সব লোকের মধ্যেও আছে যাদের সামনে ইবলীসকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কারণ অহংকার ও হিংসা পোষণ এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের সামনে নত হতে ইবলীস ও য়াহুদ উভয়েই অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এ কারণে আল্লাহ পাক জানিয়েছিলেন, وكان من الكافرين অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যে নিয়ামত ও অনুগ্রহ তার উপরে ছিল হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করার হুকুম অমান্য করে সে প্রকারান্তরে ঐ সব নিয়ামত ও অনুগ্রহ অস্বীকার করলো। ঠিক তেমনিই য়াহুদরাও তাদের ও তাদের পূর্ব পুরুষদের আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'মান্ন' ও 'সালওয়া'র দ্বারা খাদ্য প্রদান, মাথার উপর মেঘমালা দিয়ে ছায়াদান এবং আরো অগণিত নিয়ামত অস্বীকার করেছিল। বিশেষ করে যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের সমসাময়িক তাদের জন্য রসূলের যুগ পাওয়া এক দুর্লভ নিয়ামত ছিল। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র 'হুজ্জত' বা প্রমাণাদি স্বচক্ষে দেখেছিল, অথচ নবী (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে সঠিক পরিচয় পাওয়ার পরও হিংসা-বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ করে তা অস্বীকার করেছিল। তাই আল্লাহ পাক ইবলীসকে কাফেরদের সাথে সম্পর্কিত এবং একই 'দীন' ও মিল্লাতের মধ্যে গণ্য করেছেন, যদিও জাতি ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন। ঠিক যেমন মুনাফিকদের বংশ ও স্থান-কাল ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পরস্পরের সহযোগী ও বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন

المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ

"মুনাফিক পুরুষ ও নারী একে অপরের অনুরূপ—(তওবা"—৯/৬৭)। একই ভাবে ইবলীস সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী مِنَ الْكَافِرِينَ-كان-এর তাৎপর্য হলো, ইবলীস আল্লাহ্র সাথে কুফরী করা ও তাঁর হুকুমের অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে তাদের মতই কাফের। যদিও তাদের বংশ ও জাত সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং আল্লাহ্র বাণী وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ-এর অর্থ হলো যখন সে সিজদা করতে অস্বীকার করে বসলো তখনই সে কাফের হিসেবে পরিগণিত হলো। وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবুল আলীয়া থেকে বর্ণিত যে, এস্থানে তিনি كَافِرِينَ শব্দের ব্যাখ্যা করতেন—অবাধ্য, নাফরমান।

হযরত আবুল আলীয়া (রহ) وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন অবাধ্য বা নাফরমান বলে।

হযরত রবী (রহ) পূর্ব বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তা ঐ বিষয়ে আমার ব্যাখ্যার অনুরূপ। আর হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের সিজদা করা ছিল হযরত আদম (আ)-কে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য, হযরত আদম (আ)-এর ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়।

হযরত কাতাদা (রহ) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র হুকুমের আনুগত্য করার জন্য হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করা হয়েছিল। ফেরেশতাদের দ্বারা হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করিয়ে আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন।

(৩৫) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ -

(৩৫) এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হও না। অন্যথায় তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেছেন, এ আয়াতে স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে যে, অহংকার বশতঃ হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করতে অস্বীকার করার পরই ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং ইবলীসকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগেই আদমকে বেহেশতে বাস করতে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ কি বলেন তা কি তোমরা শোন না।

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, লা'নতপ্রাপ্তি ও অহংকার প্রকাশের পর ইবলীস তাদের উভয়কে আল্লাহ্‌র হুকুমের আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কারণ হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে রূহ ফুৎকার করে দেয়ার পরেই তাঁর উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের সিজদা করার ঘটনা ঘটেছিল। এ সময় ইবলীস তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। আর এই অস্বীকৃতির কারণে তার প্রতি লা'নত এসেছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত মুররা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের আরো কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস আল্লাহ্‌র মর্যাদার শপথ করে বলেছিল যে, সে হযরত আদম (আ), তাঁর সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীকে বিভ্রান্ত করে ছাড়বে। আল্লাহ্‌র লা'নতপ্রাপ্তি, জান্নাত থেকে বহিষ্কার, পৃথিবীতে আগমন ও হযরত আদমকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বস্তুর নাম-পরিচয় শিখানোর আগে সে এ শপথ করেছিল। তবে আল্লাহ পাকের একনিষ্ঠ বান্দাদের সে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে না।

হযরত ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবলীসকে তিরস্কার করা এবং লা'নত দিয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করার পর আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আ)-এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তিনি ইতিপূর্বেই হযরত আদম (আ)-কে সব বস্তুর নাম-পরিচয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই তিনি হযরত আদম (আ)-কে বললেন يٰادم انبئهم باسمائهم থেকে انك انت العليم الحكيم পর্যন্ত।

যে সময় ও পরিস্থিতিতে হযরত আদম (আ)-এর প্রশান্তির জন্য তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয় সে বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, লা'নত দেওয়ার সময় ইবলীসকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল এবং হযরত আদম (আ)-কে জান্নাতে বাস করতে দেয়া হয়েছিল। তিনি সেখানে সংগীহীন অবস্থায় চলাফেরা করতেন। তাঁর কোন জোড়া বা স্ত্রী ছিল না, যার সান্নিধ্যে তিনি প্রশান্তি লাভ করতে পারতেন। এই অবস্থায় এক সময় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে মাথার কাছে একজন স্ত্রীলোককে বসা অবস্থায় দেখলেন। তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। হযরত আদম (আ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি একজন স্ত্রীলোক। হযরত আদম (আ) বললেন, তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেন? তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে প্রশান্তি লাভ করবে সেজন্য। এই সময় ফেরেশতারা হযরত আদম (আ)-এর জ্ঞান যাচাই করার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আদম! তার নাম কি? হযরত আদম (আ) বললেন, তার নাম 'হাওয়া'। ফেরেশতারা আবার প্রশ্ন করলো, তুমি তার নাম 'হাওয়া' রাখলে কেন? তিনি বললেন, তাকে জীবন্ত বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই তার নাম হাওয়া রেখেছি। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ)-কে বললেন—

يَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ـ

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ)-কে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তাকে হযরত আদম (আ)-এর জন্য প্রশান্তির কারণ বানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

অপরাপর ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, হযরত আদম (আ)-কে জান্নাতে দেওয়ার পরেই বরং হযরত হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ মতের অনুসারীদের দলীল প্রমাণ :—

হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ ইবলীসকে ভৎর্সনা করার পর হযরত আদম (আ)-এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ইতিপূর্বেই তিনি হযরত আদম (আ)-কে সব কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি হযরত আদম (আ)-কে বললেন يَآدَمُ اَنْبِئْهُم بِاَسْمَائِهِمْ—থেকে الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اِنَّكَ اَنْتَ পর্যন্ত। ইবনে ইসহাক বলেন: তাওরাতের অনুসারী আহলে কিতাব এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য আলেম ও ব্যাখ্যাকারগণের মতে তারপর হযরত আদম (আ) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর বাঁ পাঁজর থেকে একখানা হাড় নিয়ে স্থানটি মাংস দ্বারা পূর্ণ করা হলো এবং তা দিয়ে তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হলো। হযরত আদম (আ) তখনো নিদ্রা থেকে জেগে উঠেননি। এ ভাবে হযরত হাওয়া (আ)-কে এক পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীলোকে রূপান্তরিত করা হলো যাতে হযরত আদম (আ) তাঁর কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। যখন হযরত আদম (আ)-এর তন্দ্রা কেটে গেল এবং তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, তখন তাঁকে পাশেই দেখতে পেলেন, তিনি বললেন: এ যে আমার গোশত, আমার রক্ত, আমার স্ত্রী! তিনি তাঁর কাছে প্রশান্তি লাভ করলেন। অতঃপর বরকতময় মহান আল্লাহ তাদেরকে বিয়ের মাধ্যমে জোড়া বেঁধে দিলেন এবং তাঁর নিজের প্রশান্তির উপকরণ বানিয়ে দিলেন। আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ)-কে বললেন:

يَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِينَ ـ

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, স্ত্রীকে আরবীতে زوج বা زوجة বলা হয়। তবে আরবরা স্ত্রী বুঝাতে زوج শব্দের চেয়ে زوجة শব্দটি অধিক ব্যবহার করে থাকে। স্ত্রী অর্থে زوج শব্দের ব্যবহার আযুদ গোত্রের রীতি। তবে স্বামী অর্থে زوج শব্দের ব্যবহারে আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে কোন ভিন্নমত নেই।

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, رغد শব্দের অর্থ প্রচুর আনন্দদায়ক জীবনোপকরণ যা তার অধিকারীকে উদ্বিগ্ন করে না। رغد فلان। বলা হয় যখন কেউ আনন্দদায়ক প্রচুর জীবনোপকরণ লাভ করে। ইমরাউল কায়েস ইবনে হিজর বলেছেন

بينما المرء تراه ناعما — يأمن الأحداث في عيش رغد

"তুমি মানুষকে দেখতে পাবে সে নিরাময়প্রাপ্ত, এবং প্রচুর জীবনোপকণের মধ্যে বিপর্যয় থেকে নিরাপদ আছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) এবং আরও কয়েকজন সাহাবায়ে কিরাম থেকে وكلا منها رغدا আয়াতাংশের অর্থ সম্পর্কে বর্ণনা আছে। তাঁরা বলেছেন رغد অর্থ আনন্দদায়ক।

হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে وكلا منها رغدا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এর অর্থ—তাদের সেখানকার কোন জিনিসের হিসাব দিতে হবে না।

হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে অন্য সূত্রে وكلا منها رغدا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হলো—তাদের কোন হিসাব দিতে হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে وكلا منها رغدا حيث شئتما আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, رغد শব্দের অর্থ জীবনোপকরণের প্রাচুর্য। অতএব আয়াতের অর্থ হলো, আর আমি বললামঃ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা জান্নাতের প্রচুর ভোগ সামগ্রী অনন্ত-অসীম নিয়ামতসমূহ এবং আনন্দদায়ক জীবনোপকরণ উপভোগ করো।

হযরত কাতাদাহ (রহ) يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য যে পরীক্ষা নির্ধারিত করা হয়েছিল, তদনুযায়ী সমস্ত সৃষ্টিকে ইতিপূর্বেই পরীক্ষা করা হয়েছিল। হযরত আদম (আ)-এর জন্যও ঠিক একই পরীক্ষা নির্ধারিত ছিল। মহান আল্লাহ্ জান্নাতের সব কিছু হযরত আদম (আ)-এর জন্য হালাল করে দিয়েছিলেন। তিনি যেমন ইচ্ছা প্রচুর পরিমাণে তা ভোগ করতে পারতেন। তবে একটি গাছ সম্পর্কে তাকে নিষেধ করা হয়েছিল। এই গাছের মাধ্যমেই হযরত আদম (আ)-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল। নিষিদ্ধ বিবরটিকে পরীক্ষার জন্য অবশেষে তাঁর সামনে পেশ করা হয়।

ولا تقربا هذه الشجرة-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, যে সব উদ্ভিদ নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়াতে সক্ষম আরবদের ভাষায় সে সব উদ্ভিদকেই গাছ বলা হয়। মহান আল্লাহ্র বাণীর والنجم والشجر يسجدان

গুল্মলতা ও বৃক্ষ উভয়ই সিজদা করে। نجم হলো যে সব উদ্ভিদ লতিয়ে চলে। আর شجر হলো যে সব উদ্ভিদ তার কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

যে বৃক্ষের ফল খেতে হযরত আদম (আ)-কে নিষেধ করা হয়েছিল সেই বিশেষ বৃক্ষটি সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন—তা ছিল শীষ (ছড়া)। এ মতের অনুসারীগণের বক্তব্য :-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আদম (আ)-কে যে গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল তা ছিল গমের শীষ।

হযরত আবু মালেক (রা) থেকে বর্ণিত ولا تقربا هذه الشجرة আয়াতাংশে উল্লেখিত شجرة বলতে গমের শীষ বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবু মালেক (রা) থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আতিয়া (রহ) থেকে ولا تقربا هذه الشجرة, আয়াতাংশে উল্লেখিত شجرة শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ গমের শীষ। হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত। যে গাছের নিকটে যেতে হযরত আদম (আ)-কে নিষেধ করা হয়েছিল তা হলো—গমের শীষ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবুল খুলদের কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন যে, হযরত আদম (আ) কোন্ গাছের ফল খেয়েছিলেন এবং কোন্ গাছের পাশে তাঁর তওবা কবুল হয়েছিল। জবাবে আবুল খুলদ তাঁকে লিখে জানালেন, হযরত আদম (আ) কোন্ গাছের ফল খেয়েছিলেন আপনি আমার নিকট তা জানতে চেয়েছেন। তা হলো গমের শীষ। আপনি আরো জানতে চেয়েছেন যে, কোন গাছের নিকট হযরত আদম (আ) তওবা করেছিলেন। তা হলো যায়তুন বা জলপাই গাছ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হযরত আদম (আ)-কে যে গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল, তা হলো গমের শীষ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীকে যে গাছের ব্যাপারে নিষেধ করেছিলেন তা ছিল গমের শীষ।

হযরত ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বিহ আল-ইয়ামানী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তা হলো গমের শীষ। তবে জান্নাতে তার ফল ছিল গরুর মূত্রগ্রন্থি বা অণ্ডকোষের ন্যায়। তা ছিল মাখনের মত নরম ও মধুর চেয়ে মিষ্টি। তাওরাতের অনুসারীরা তাকে গম বলে অভিহিত করতো।

হযরত ইয়াকুব ইবনে উতবা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তা হলো এমন এক গাছ, চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য ফেরেশতারাও যার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

হযরত মুহারিব ইবন দিছার (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন—তা হলো গমের শীষ।

হযরত হাসান (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন—তা হলো গমের শীষ। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় এটিকে তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য রিযিক বা খাদ্যদ্রব্য বানিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আরো কয়েকজন তাফসীরকার বলেছেন, তা ছিল আংগুরের ছড়া। এ মতের সমর্থকগণের বক্তব্যঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা হলো আংগুরের ছড়া।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী থেকে ولا تقربا هذه الشجرة আয়াতাংশের الشجرة শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, এর অর্থ আংগুরের ছড়া। ইয়াহূদীদের বর্ণনা মতে তাহলো গম।

হযরত সুদ্দী (রহ) থেকে الشجرة শব্দের অর্থ আংগুর গাছ বলে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে হুবাইরা (রহ) থেকে বর্ণিত যে, ولا تقربا هذه الشجرة আয়াতাংশের মধ্যে উল্লেখিত الشجرة শব্দের অর্থ আংগুরের গাছ।

হযরত ইবনে হুবাইরা (রহ) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, ولا تقربا هذه الشجرة আয়াতাংশের الشجرة শব্দের অর্থ আংগুর। হযরত ইবনে হুবাইরা (রহ) থেকে বর্ণিত ولا تقربا هذه الشجرة আয়াতাংশের الشجرة শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছেন আংগুর।

হযরত ইবনে হুবাইরা (রহ) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আদম (আ)-কে যে গাছের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছিল তা ছিল শরাবের গাছ।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ) থেকে বর্ণিত ولا تقربا هذه الشجرة আয়াতাংশে الشجرة শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছেন আঙুর।

হযরত সুদ্দী (রহ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন—এর অর্থ আঙুর।

মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ আঙুর। অন্য কয়েকজন তাফসীরকারের মতে তা ছিল ডুমুর। এ মতের অনুসারীগণের বক্তব্য ইবনে জুরাইজ (রহ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, তা হলো ডুমুর।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে গাছের ফল খেতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে নিষেধ করেছিলেন তাঁরা সে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন। এ ভাবে তাঁরা উভয়ে এমন এক ভুল করে ফেললেন যা করতে আল্লাহ তাঁদের নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের, সেই নির্দিষ্ট গাছটির কথা বলে তা খেতে নিষেধ করলেন এবং এভাবে নির্দিষ্ট গাছটি দেখিয়ে দিলেন ولا تقربا هذه الشجرة "অর্থাৎ তোমরা উভয়ে এই গাছটির নিকটবর্তী ও হবে না।" তবে কোন্ বিশেষ গাছটির নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছিল আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তার সুস্পষ্ট ভাষায় বা ইশারা-ইংগিত দিয়ে কোন কিছু তাঁর বান্দাদের বলে দেননি। কোনটি সেই গাছ তা জানার মধ্যে যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত থাকতো তাহলে

আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের নির্দিষ্ট সেই গাছটি সম্পর্কে জ্ঞান দানের জন্য কুরআন মজীদে কোন না কোন ভাবে ইংগিত দিতেন। যেমন যেসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে তার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় সে সব বিষয়ে তিনি অবহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সঠিকভাবে যা বলা যায়, তা হলো বেহেশতের বৃক্ষরাজির মধ্য থেকে একটি বৃক্ষ খাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা উভয়ে এ নির্দেশ লংঘন করে তা খেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন। নিষিদ্ধ গাছ কোনটি সে সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। কারণ কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য এর কোন প্রমাণ বা ইংগিত রাখেননি। সহীহ্ কোন হাদীসেও তা উল্লেখ নেই। তাই আর কিভাবে-এর দলীল পাওয়া যাবে ?

বলা হয়েছে, গাছটি ছিল গমের, আঙুরের বা ডুমুরের। তবে এর মধ্যে কোন একটা তো হবে। এটি যদি কেউ জানতেও পারে তবে সে জানাটা তার কোন উপকারে আসবে না। আবার কেউ না জানলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ -এর ব্যাখ্যা।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রহ) বলেন, আরবী ভাষাভাষীরা وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কুফার কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন: وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হলো, তোমরা দুজন যদি ঐ গাছের নিকটবর্তী হও তাহলে জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। এখানে বাক্যের দ্বিতীয় অংশটি جواب الجزاء-এর স্থানে আছে। আর جواب الجزاء এর প্রথম অংশ এর উপরে আমল করে। যেমন বলা হয় ان تقم اقم। এখানে প্রথম অংশকে জযম বা সাকিন করলে দ্বিতীয় অংশকে জযম বা সাকিন করতে হবে। আল্লাহ্ পাকের বাণী فَتَكُونَا শব্দটিও অনুরূপ। ف হরফটি যেহেতু প্রথম শর্তের স্থানে বসেছে তাই তা দ্বারা খবর দেয়া হয়েছে। যেমন كى শব্দটি ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ভবিষ্যত নির্দেশক ক্রিয়াপদকে যবর দেয়। কারণ جزاء-এর মূল হলো ভবিষ্যত। তাই ف হরফটি এখানে كى শব্দটির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

বসরাবাসী কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, তোমাদের উভয়ের দ্বারা যদি এ গাছটির নিকটবর্তী হওয়ার কাজটি হয় তাহলে তোমরা উভয়েই জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। তবে তাঁরা বলেছেন, لا শব্দের সাথে ان শব্দটি প্রকাশিত থাকে না, বরং উহ্য থাকে। এ ক্ষেত্রে বাক্যের বিশুদ্ধতার জন্য একটি اسم অর্থাৎ ان আরেকটি اسم-এর উপর عطف করার প্রয়োজন হয়। এ কারণে عَسَى الْفِعْلُ ; عَسَى أَنْ يَفْعَلَ ; مَا كَانَ لِيَفْعَلَ এবং مَا كَانَ لَأَنْ يَفْعَلَ বলা শুদ্ধ নয়।

আর কেউ যদি سرني قيامك অর্থাৎ তোমার দাঁড়ানোতে আমি খুশী হয়েছি বুঝানোর জন্য سرني تقوم يا هذا বলে তাহলে তা সমস্ত আরবী ব্যাকরণবিদের মতে অশুদ্ধ হবে। অনুরূপ কেউ যদি لاتقم তুমি দাঁড়াবে না। বুঝানোর জন্য لايكن منك قيام বলে তাও এ নীতি অনুসারে সবার মতে ভুল হবে আবার সবার মতে لاتقم বাক্যটির বিশুদ্ধ হওয়া سرني قيامك বুঝানোর জন্য سرني تقوم বাক্যটি বলা অশুদ্ধ হওয়া ঐ ব্যক্তির দাবীর ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যিনি ولا تقربا هذه الشجرة আয়াতাংশের لا শব্দের সাথে أن শব্দ উহ্য আছে বলে মনে করেন। তেমনি এ ভাবে অন্যদের দাবীর বিশুদ্ধতাও প্রমাণিত হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী فتكونا من الظالمين-এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। এর একটি হলো فتكونا বলা হয়েছে ولا تقربا-এর উপরে عطف করার নিয়তে। এমতাবস্থায় এর ব্যাখ্যা হবে – তোমরা দুজনে এ গাছের নিকটবর্তী হবে না এবং জালেমও হবে না। এ ক্ষেত্রে ولا تقربا শব্দটিকে যে কারণে جزم দেয়া হয়েছে সেই একই কারণে فتكونا শব্দটিকেও جزم দেয়া হয়েছে। যেমন, বলা হয়ে থাকে لاتكلم عمرا ولا تؤذه উমারের সাথে কথা বলো না এবং তাকে কষ্ট দিও না। কবি ইমরুউল কায়েস বলেছেন ঃ

فقلت له صوب ولا تجهدنه — فيذرك من اخرى القطاة فتزلق

এখানে لاتجهدنه-কে যে কারণে جزم দেয়া হয়েছে সেই একই কারণে فيذرك কেও جزم দেয়া হয়েছে। এখানে যেন নিষেধাজ্ঞাটাই পুনরায় উক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, فتكونا من الظالمين আয়াতাংশ نهى হওয়ার জবাব। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, তোমরা এ গাছের নিকটবর্তী হবে না। কেননা তোমরা যদি এর নিকটবর্তী হও তাহলে জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। যেমন বলা হয় لاتشتم عمرا فيشتمك مجازاة অর্থাৎ 'উমারকে গালি দিও না, তাহলে পরিবর্তে সেও তোমাকে গালি দেবে। তাই সে ক্ষেত্রে فتكونا শব্দটি نصب বিশিষ্ট হবে। হরফ হলে তা ভিন্ন রূপে عطف করা হতো। কারণ, ولا تقربا শব্দের মধ্যে আমেল ও হরফ বর্তমান। সুতরাং فتكونا-র মধ্যে তার পুনরাবৃত্তি যথোপযুক্ত নয়। তাই বিষয়টির প্রারম্ভে যে কারণ উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে نصب বিশিষ্ট হবে।

আর فتكونا من الظالمين আয়াতাংশের অর্থ হল তোমাদের যতটুকু অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের জন্য যা বৈধ করা হয়েছে তাতে তোমরা সীমা লংঘনকারী হয়েছ। তথা তোমরা ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়েছ। অতএব তোমরা আমার সীমা লংঘন করেছ এবং আমার আদেশ অমান্য করেছ। আর যা আমি হারাম করেছি তাকে তোমরা হালাল মনে করেছ। কেননা জালেমরা পরস্পর বন্ধু। আর আল্লাহ্ পাক পরহেজগার লোকদের অভিভাবক।

আরবী ভাষায় জুলুমের অর্থ হলো কোন বস্তুকে যথাস্থানের পরিবর্তে তা অন্যত্র রাখা। যেমন যুবয়ান গোত্রের কবি নাবিগার কথায় রয়েছে ঃ

الا الأوارى لأيا ما ابينها — والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد۔

কবি এখানে ভূমিকে অত্যাচারিত বলেছেন। কারণ গর্তকারী ব্যক্তি গর্তের উপযুক্ত জায়গায় গর্ত না করে যে জায়গায় গর্ত করা উচিত নয় এমন জায়গায় করেছে। তাই ভূমিকে মজলুম বলা হয়েছে। আর এমনিভাবে কবি ইবনে কুমাইয়া বৃষ্টি সম্পর্কে বলেন :

ظلم البطاح بها انهلال حريصة — فصفا النطاف له بعيد المقلع

এ পংক্তিতে বৃষ্টির নিজের উপর জুলুম করার তাৎপর্য হলো : অসময়ে আগমন এবং অনুপোযোগী জায়গায় বর্ষণ। এ অর্থে কাবোর নিজের উটের প্রতি জুলুম করার অর্থ হলো বিনা কারণে তাকে যবেহ করা। আরবদের দৃষ্টিতে একেই অনুপোযোগী স্থানে যবহ করা বলা হয়।

জুলুম শব্দের অনেকগুলো অর্থ হতে পারে। এ অর্থগুলো বিস্তারিত বিবরণের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। ইনশাআল্লাহ আমরা তা যথাস্থানে আলোচনা করব। জুলুম শব্দের মূল অর্থ যা আমরা বলেছি তা—হল কোন বস্তুকে তার অনুপোযোগী স্থানে স্থাপন করা।

(৩৬) فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه ۔ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين ۔

(৩৬) কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদের বহিষ্কৃত করল। আমি বললাম, তোমরা পরস্পরের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা আছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন : কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ আয়াতের পঠন পদ্ধতিতে মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ فازلهما শব্দটির লাম হরফটিতে তাশদীদ প্রয়োগ করে পড়েছেন। অর্থাৎ সে তাদের উভয়কে পথভ্রষ্ট ও বিচ্যুত করতে চাইলো। زل الرجل في دينه অর্থ "লোকটি তার দীনের ব্যাপারে ভুল করেছে।" তাই সে এমন কাজ করে বসেছে যা করা তার জন্য শোভনীয় ছিল না। আর ازله غيره অর্থ কেউ এমন কারণ সৃষ্টি করেছে যা তার দীন অথবা দুনিয়ার ব্যাপারে বিচ্যুতি ও ভুল-ত্রুটি ঘটিয়েছে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা শব্দটিকে ইবলীসের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাত থেকে বের হওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে বলেছেন: ইবলীস তাদের উভয়ে যেখানে ছিলেন সেখান থেকে বের করে দিল। কেননা ইবলীসই ছিল তাদের উভয়ের সেই ভুলের কারণ, যার পরিণামে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন।

আরেক দল কিরাআত বিশেষজ্ঞ পড়েছেন فازالهما অর্থ "কোন জিনিসকে কোন জিনিস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া।" ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তাআলার فازلهما الشيطان এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ শয়তান তাদের উভয়কে বিভ্রান্ত করেছে। উল্লেখিত পঠন পদ্ধতির মধ্যে فازلهما পঠন পদ্ধতিটি অধিক সহীহ্।

কারণ, মহান আল্লাহ পাক জানিয়েছেন যে, আদম ও হাওয়া (আ) যেখানে ছিলেন তাঁদেরকে সেখান থেকে বের করেদিন ইবলীস। فازالهما-র অর্থ এটা। সুতরাং ازال শব্দের অর্থ যখন বহিষ্কার ও দূরে সরিয়ে দেয়া তখন فازالهما الشيطان عنها فا خرجهما مما كانا فيه বলার কোন কারণ থাকতে পারে না। কেননা তখন এর অর্থ দাঁড়াবে فازالهما الشيطان فاخرجهما مما كانا فيه বাক্যটির মত। এটা উদ্দিষ্ট অর্থ নয়। বরং উদ্দিষ্ট অর্থ পেতে হলে বলা দরকার فاسـزلهما ابليس من طاعة الله "ইবলীস তাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করতে চাইলো।" আল্লাহ তাআলা ঐ কথাটিই এভাবে বলেছেন فازلهما الشيطان আর কিরাআত বিশেষজ্ঞগণও এভাবেই পড়েছেন। এর অর্থ শয়তান তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে।

এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে ইবলীস কিভাবে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত করেছিলো যে তাদের জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার কাজটি ইবলীসের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে? এর জবাবে মুফাসসিরগণ অনেক যুক্তি পেশ করেছেন যার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।

এ ব্যাপারে ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ) ও তাঁর সন্তান-সন্তুতি অথবা স্ত্রীকে—(ইমাম তাবারীর সন্দেহ তাঁর মূল গ্রন্থে وذريته শব্দ আছে) জান্নাতে বসবাস করতে দিলেন এবং তাঁকে গাছের থেকে নিষেধ করলেন। গাছটির শাখা-প্রশাখা পরস্পর জড়িয়ে ছিল। এ গাছে যে ফল ফলতো ফেরেশতারা চিরজীবন লাভের জন্য তা খেতো। আল্লাহ তাআলা আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে এ ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। যখন ইবলীস তাঁদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করল, তখন সে সাপের উদরে প্রবেশ করল। সাপের ছিল চারটি পা। যেন তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি সুদর্শন উট। সাপ জান্নাতে প্রবেশ করলে ইবলীস তার পেট থেকে বের হলো এবং হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়ার (আ) জন্য আল্লাহ্র নিষিদ্ধ গাছ নিয়ে হাওয়ার কাছে গিয়ে বললো, এই গাছটি একটু দেখ। এর খোশবু, স্বাদ ও বর্ণ কত সুন্দর। তখন হযরত হাওয়া (আ) গাছটি নিয়ে তা থেকে খেলেন। তারপর সে হযরত আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে বললো, দেখ, এ গাছটির খোশবু, স্বাদ ও বর্ণ কত সুন্দর। তখন হযরত আদম (আ)-ও তা খেল। এবার তাদের গোপন অংগসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়লো। হযরত আদম (আ) তখন গাছটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন, হে আদম! তুমি কোথায়? তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি এখানে। প্রতিপালক বললেন, তুমি কি বের হবে না? হযরত আদম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সামনে বের হতে আমার ভীষণ লজ্জা হয়। আল্লাহ পাক বললেন, অভিশপ্ত মাটি থেকেই আমি তাকে সৃষ্টি করেছি। এমন অভিশপ্ত যা তার ফলকে কণ্টকাকীর্ণ করবে। হযরত ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) বলেন, জান্নাত বা পৃথিবীতে খেজুর ও ফুল গাছের চাইতে

উত্তম গাছ আর কিছুই ছিল না। তারপর তিনি আবার বলেন, হে হাওয়া! তুমিই তো আমার বান্দাকে প্রতারিত করেছো। তাই তুমি কষ্টসহ গর্ভ ধারণ করবে। আর গর্ভস্থ সন্তান প্রসব কালে বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি হবে। সাপকে বললেন, এই অভিশপ্ত শয়তান তোমার পেটে প্রবেশ করে আমার বান্দাকে প্রতারিত করেছে। তুমি এমন অভিশপ্ত হলে যে, তোমার পা হবে পেটের অভ্যন্তরে আর তোমার খাদ্য হবে মাটি। তুমি বনী আদমের শত্রু, আর তারা তোমার শত্রু। তুমি তাদের কারো নাগাল পেলে পায়ের গোড়ালীতে দংশন করবে। আর তারা তোমার দেখা পেলে মস্তক চূর্ণ করবে।

হযরত আমর ইবনে আবদুর রহমান (রহ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহকে জিজ্ঞেস করা হল—ফেরেশতারা কি খেয়ে জীবন ধারণ করে? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই খেয়ে থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবা থেকে বর্ণিত। যে সময় আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ)-কে বললেন—

اسكن انت و زوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ـ

"হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান করো এবং যেভাবে ইচ্ছা এর প্রাচুর্য থেকে খাও ও ভোগ করো। তবে এ গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না। তাহলে তোমরা জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।" ঐ সময়ই ইবলীস জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের কাছে যেতে মনস্থ করে। কিন্তু জান্নাতের তত্ত্বাবধায়কগণ তাকে বাধা দেয়। তখন সে সাপের কাছে যায়। সাপের চারটি পা ছিল. দেখতে ছিল উটের ন্যায়; সে ছিল সুদর্শন একটি পশু। ইবলীস সাপকে বললো যে, সে তাকে নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে আদমের কাছে নিয়ে যাক। তাই সাপ তাকে মুখের মধ্যে পুরে নিল এবং বেহেশতের তত্ত্বাবধায়কদের সামনে দিয়ে প্রবেশ করলো। ব্যাপারটি তারা বুঝতেই পারলো না। কারণ এটাই ছিল আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। ইবলীস সাপের মুখ থেকেই হযরত আদম (আ)-এর সাথে কথা বললো। কিন্তু হযরত আদম (আ) সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তখন সে সাপের মুখ থেকে বেরিয়ে বললো: هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى "হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেবো অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?" (তহা ২০/১২০)।

অর্থাৎ আমি কি তোমাকে এমন বৃক্ষের সন্ধান জানাবো না যা খেলে তুমি মহান আল্লাহ্‌র মত বাদশাহ হয়ে যাবে অথবা তোমরা উভয়েই অমর হয়ে যাবে, কোন দিনই মরবে না? শয়তান মহান আল্লাহ্‌র শপথ করে তাদের বললো انى لكما من الناصحين। "আমি তোমাদের দু'জনের জন্য কল্যাণকামী উপদেশদাতা"—(সূরা আরাফ ৭/২১) এ ভাবে সে তাদের পরিধেয় খুলে ফেলে গোপনঅংগ সমূহ প্রকাশ করে দিতে চায়। সে ফেরেশতাদের চিঠিপত্র পড়তো। তাই সে তাদের গোপন অংগসমূহ

সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু হযরত আদম (আ) তা জানতেন না। তাদের পোশাক ছিল নখের। হযরত আদম (আ) উক্ত গাছ থেকে অস্বীকার করলেন। তখন হযরত হাওয়া (আ) এগিয়ে আসলেন এবং তা খেলেন। তারপর বললেন ঃ হে আদম! তুমিও খাও। কারণ আমি ইতিমধ্যেই তা খেয়েছি। কিন্তু আমার কোন ক্ষতি হয়নি। আদম (আ) যখন তা খেলেন—

بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ -

"তখন তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের শরীর আবৃত করলো।"

হযরত রবী (রহ) থেকে বর্ণিত, শয়তান পা বিশিষ্ট উটের মত জন্তুর রূপ ধরে জান্নাতে প্রবেশ করেছিল। অভিশাপ দেয়া হলে জন্তুটির পা খসে যায় এবং সে সাপে রূপান্তরিত হয়।

হযরত আবুল আলিয়া (রহ) থেকে বর্ণিত। উটটি শুরুতে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেন, একটি নির্দিষ্ট গাছ ব্যতীত তার জন্য জান্নাতের সব কিছু হালাল করা হয়েছিল। তাদের দুজনকে বলা হয়েছিল - وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ "তোমরা এই গাছে নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।" তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ শয়তান প্রথমে বিবি হাওয়া (আ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমাদের কি কোন জিনিস নিষেধ করা হয়েছে ? বিবি হাওয়া (আ) বললেন, হাঁ, এই গাছটি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তখন শয়তান বললো ঃ (পবিত্র কুরআনের ভাষায়) "পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও, অথবা বেহেশতে চিরস্থায়ী হয়ে যাও, এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদের নিষেধ করেছেন। সূরা আ'রাফ ৭/২০।

مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ -

বর্ণনাকারী বলেন, প্রথমে বিবি হাওয়া (আ) ঐ বৃক্ষ থেকে খেলেন, অতঃপর হযরত আদম (আ)-কে খেতে বললেন, এবং তিনি ও খেলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এটি ছিল এমন এক গাছ যা কেউ খেলে সে অপবিত্র হয়ে যেতো। আর কোন অপবিত্র ব্যক্তির জান্নাতে থাকা সাজে না। তিনি বলেছেন فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ অর্থাৎ আদমকে জান্নাত থেকে বের করে দিল।

হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বর্ণিত, কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, হযরত আদম (আ) জান্নাতে প্রবেশ করে যখন সেখানে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁকে দেয়া আল্লাহর নিয়ামত সমূহ দেখলেন, তখন চিন্তা করলেন—এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারলে কতই না উত্তম হতো! একথা শুনে শয়তান একে মোক্ষম সুযোগ বলে মনে করলো। সুতরাং এ পথে সে তার কাছে ভিড়লো।

হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বর্ণিত। শয়তান তাদের (আদম ও হাওয়া) সাথে প্রথম যে

চক্রান্ত করে, তাহলো সে তাদের জন্য এমন ভাবে কাঁদিতে শুরু করে যে, তা শুনে তারা ভীষণভাবে দুঃখিত হন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কারণে কাঁদছো ? সে বললো, আমি তোমাদের জন্যই তো কাঁদছি। তোমরা তো মৃত্যু বরণ করবে। সে কারণে এখন যেসব নিয়ামত ও মর্যাদা লাভ করছো, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এ কথাটি তাদের মনে লাগে। এরপর সে তাদের কাছে এসে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। সে বলে—

يٰادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى - وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين - وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين -

অর্থাৎ এভাবে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে। অথবা ফেরেশতা না হলেও জান্নাতের নিয়ামতের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করবে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন فدلاهما بغرور সে তাদের উভয়কে প্রতারিত করলো।

হযরত ইবনে যায়েদ (রহ) থেকে বর্ণিত। শয়তান গাছটির বিষয়ে হাওয়াকে প্ররোচিত করলো এবং শেষে তাঁকে নিয়ে গাছের কাছে গেলো। অতঃপর বিবি হাওয়া (আ)-কে হযরত আদম (আ)-এর দৃষ্টিতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলল। রাবী বলেন, হযরত আদম (আ) বিবি হাওয়া (আ)-কে তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য আহ্বান জানালেন। বিবি হাওয়া (আ) বললেন, না, বরং আপনাকে এখানে আসতে হবে। যখন তিনি আসলেন, তখন বিবি হাওয়া (আ) তাঁকে বললেন, না এতেও হবে না। আপনাকে এই গাছ থেকে খেতে হবে। তখন তাঁরা উভয়েই তা থেকে খেলেন কিন্তু এতে তাঁদের উভয়ের গোপন অংগ প্রকাশিত হয়ে পড়লো। তখন হযরত আদম (আ) দৌড়িয়ে জান্নাতের মধ্যে গেলেন। তখন তাঁর প্রতিপালক তাকে ডেকে বললেন, হে আদম! তুমি কি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যাচ্ছো ?

হযরত আদম (আ) বললেন, না হে আমার প্রতিপালক। বরং তোমার সামনে লজ্জিত হওয়ার কারণেই এরূপ করেছি। প্রতিপালক বললেন, হে আদম ! কোথা থেকে তোমাকে দেয়া হয়েছে ? হযরত আদম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক, বিবি হাওয়ার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ পাক বললেন, এখন তার জন্য আমার কর্তব্য হলো প্রতি মাসে একবার করে তাকে রক্তাক্ত করা যেমন সে এ গাছকে রক্তাক্ত করেছো। তুমি এবং আমি তাকে আহমক বানাবো। অথচ আমি তাকে ধৈর্যশীল করে সৃষ্টি করেছি। আর আমি তাকে কষ্টসহ গর্ভধারণ করাবো এবং কষ্টসহ প্রসব করাবো। অথচ আমি তার গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব সহজ করে দিয়েছিলাম।

হযরত ইবনে যায়েদ (রহ) বলেছেন, যে দুর্ভাগা বিবি হাওয়া (আ)-কে স্পর্শ করেছিল তা যদি না হতো তাহলে দুনিয়ার কোন স্ত্রীলোকেরই মাসিক হতো না। আর তারা সহজে গর্ভধারণ করতো এবং সহজেই সন্তান প্রসব করতো। তবে মেয়েরা অত্যন্ত ধৈর্যশীলা।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর শপথ করে বলেন, হযরত আদম (আ) বুঝেশুনে গাছ থেকে খাননি। বিবি হাওয়া (আ) তাঁকে শরাব পান করিয়েছিলেন। এ ভাবে তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তখন তাঁর সামনে গাছ পেশ করা হলে তিনি তা থেকে খেয়েছিলেন।

হযরত ইবনে হুমাইদ (রহ)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর দুশমন ইবলীস পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর কাছে তাকে বহন করে জান্নাতে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। এভাবে সে আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু সব পশুই তাকে বহন করতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে সে সাপের কাছে গিয়ে বললো, তুমি যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও তাহলে তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। আমি তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবো। তখন সাপ তাকে তার সম্মুখের প্রধান দাঁতের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলো। ইবলীস সাপের মুখ গহবর থেকেই হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বললো। তখন সাপের দেহ থাকতো আবৃত। সে চার পায়ে চলতো। আল্লাহ পাক তার শরীর উলঙ্গ করে দিয়েছেন এবং পেটের উপর ভর দিয়ে চলতে বাধ্য করেছেন। বর্ণনাকারী তাউস (রহ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা সাপকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। আল্লাহর শত্রুর নিরাপত্তা দানকে ভংগ ও ব্যাহত করো।

ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওরাতের অনুসারীরা শিক্ষা দিত যে, আদম (আ) সাপের সাথে কথা বলেছিলেন। তবে তারা এ কথাটি ইবনে আব্বাস (র) মত ব্যাখ্যা করে বলেননি।

মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া (আ)-কে বেহেশতের একটি গাছ খেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু অন্য সব কিছু যদৃচ্ছা খাওয়ার ও ভোগ করার অধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু সাপের পেটে প্রবেশ করে শয়তান তাদের কাছে আসলো এবং বিবি হাওয়ার সাথে কথা বললো। শয়তান হযরত আদম (আ)-কে প্রলুব্ধ করলো। সে বললো :

مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ -

وَقَاسَمَهُمَا اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ -

"তোমাদের রব তোমাদের এ গাছের ব্যাপারে নিষেধ করেছেন এ জন্যে যে, তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। সে শপথ করে তাদের বললো, আমি তোমাদের একজন কল্যাণকামী।" হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস (রহ) বলেন, বিবি হাওয়া (আ) দাত দিয়ে গাছটি চিবালে তা রক্তাক্ত হয়ে যায় এ সময় তাঁদের উভয়ের দেহের আবরণ খুলে পড়লো।

৪৫ —

وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما
الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين -

"তারা উভয়ে তখন জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে শরীর ঢাকতে শুরু করলো। আর তাদের প্রভু তাদের ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদের ঐ গাছটির ব্যাপারে নিষেধ করিনি এবং একথা বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? তিনি হযরত আদম (আ)-কে বললেন, আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি তা খেলে কেন? হযরত আদম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! হাওয়া আমাকে তা খাইয়েছে। তিনি হাওয়াকে বললেন, তুমি তাকে কেন খাওয়ালে? তিনি বললেন, সাপ আমাকে নির্দেশ দিয়েছে। তিনি সাপকে বললেন, তুমি তাকে নির্দেশ দিয়েছো কেন? সাপ বললো, ইবলীস আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল। আল্লাহ বললেন সে অভিশপ্ত এবং রহমত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। হে হাওয়া! তুমি যেহেতু গাছটিকে রক্তাক্ত করেছো, তাই প্রত্যেক চান্দ্রমাসে তুমি একবার করে রক্তাক্ত হবে। আর হে সাপ আমি তোমার পাগুলি কেটে ফেলবো এবং তুমি উবু হয়ে হেঁচড়ে চলবে। আর যে-ই তোমাকে দেখবে পাথর দিয়ে তোমার মাথা চূর্ণ করবে। اهبطوا بعضكم لبعض عدو তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পরের শত্রু।"

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহর শত্রু ইবলীস কর্তৃক আদম ও তাঁর স্ত্রীকে সত্যচ্যুত করা সম্পর্কে যে সব সাহাবা, তাবিঈন ও অন্যান্য রাবী থেকে এসব বর্ণনা করা হয়েছে, আমিও তাদের "নিকট থেকেই এটি বর্ণনা করেছি।

এসব বর্ণনার মধ্যে যেগুলো আল্লাহর কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল সেগুলোই ন্যায় ও সত্য হওয়ার অধিক উপযোগী। মহান আল্লাহ আমাদের ইবলীস সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, সে হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করেছিল যাতে তাদের গোপন অংগসমূহ প্রকাশ করে দিতে পারে। তাই সে তাদের বললো —

ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين -

এটা ছিল তার ধোঁকাবাজী। ইবলীস اني لكما لمن الناصحين এই কথা বলে শপথ করে হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে যে ধোঁকা দিয়েছিল মহান আল্লাহ তা আমাদের অবহিত করেছেন। এতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইবলীস নিজে সরাসরি হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে সম্বোধন করে কথা বলেছিল। এটা তাদের দৃষ্টির আড়াল থেকে হতে পারে আবার দৃষ্টিতে ধরা দিয়েও হতে পারে কারো এরূপ বক্তব্য পেশ করা আরবী ভাষায় অযৌক্তিক যে, قاسم فلان فلانا فى كذا وكذا

অর্থাৎ যখন কোন কারণ সৃষ্টি করে সে তার কাছে পৌঁছবে শপথ করা ছাড়াই। কোন কারণ সৃষ্টির ব্যাপারে অর্থাৎ হলফ বা শপথ হয় না। একইভাবে আল্লাহর বাণী فوسوس الهما الشيطان সম্পর্কেও বলা চলে যে, হযরত আদম (আ)-এর জন্য শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা প্রলুব্ধকরণ যদি তাঁর সন্তান-সন্ততিকে প্রলুব্ধ করার মত হয় অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আদমকে যে গাছ খেতে নিষেধ করেছিলেন তা সৌন্দর্য মন্ডিত করে পেশ করা এবং কথা বা প্রতারণা দ্বারা তাকে বিভ্রান্ত ও সত্যচ্যুত করতে চাওয়া হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেন وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين একইভাবে যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করেছে সে যদি আজ বলে, আমি যে গুনায় লিপ্ত হয়েছি ইবলীস সেটি আমার জন্য সৌন্দর্য মন্ডিত করে পেশ করেছিল এবং সে শপথ করে আমাকে বলেছিল, আমি তোমার একজন মংগলাকাংখী তাই আমি এ কাজ করেছি। তাহলে বলতে হবে, হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারটাও হুবহু এরূপ ছিল। কারণ আল্লাহ পাক বলেন, وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين তবে তা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁর ন্যায়-ব্যাখ্যাকারগণ যা বর্ণনা করেছেন তার অনুরূপ।

আল্লাহ তাআলা ইবলীসকে জান্নাত থেকে বের করে তাড়িয়ে দেয়ার পর সে যে উপায়ে জান্নাতে প্রবেশ করে হযরত আদম (আ)-এর সাথে কথা বলেছিল তা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে নাই। তা ছিল এমন এক বক্তব্য যা কোন বিবেক-বুদ্ধি অস্বীকার করে না। আবার তাতে এমন কোন খবরও নাই যার বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন আছে। এ সব এমন ঘটনা বা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এ ব্যাপারে আসল কথা হলো, আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন যে, ইবলীস হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীর কাছে পৌঁছে তাঁদের সাথে কথা বলেছিল। হতে পারে যে, ব্যাখ্যাকারগণ যা বলছেন সেই ভাবেই সে তাদের কাছে পৌঁছেছিল। বরং তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই ঐ ভাবে সংঘটিত হয়েছিল। ভাষ্যকারগণের বক্তব্যসমূহে মিল থাকায় তা সত্য ও সঠিক বলেই প্রতীয়মান হয়; যদিও হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। বিষয়টি হযরত ইবনে সালামা (রহ)-এর মাধ্যমে হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে (والله اعلم)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও তাওরাতের অনুসারীগণ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ) ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের পরীক্ষার জন্য ইবলীসকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন তার সাহায্যে সে হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রী কাছে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সে তো হযরত আদম (আ)-এর সন্তানের কাছে আসে তাদের ঘুমের সময়, জাগ্রত অবস্থায় এমন কি সর্বাবস্থায়। সে তার ইচ্ছার উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এভাবে সে তাদের গুনাহের কাজে আহবান জানায় এবং মনের মধ্যে যৌন আবেদন সৃষ্টি করে। তবে হযরত আদম (আ)-এর সন্তান তাকে দেখতে পায় না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন فوسوس لهما الشيطان فاخرجهما مما كانا فيه "শয়তান তাদের প্রলুব্ধ করলো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে বের করে আনলো।" তিনি আরো বলেছেন :

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا

لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون -

"হে আদম সন্তানেরা! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফিতনার মধ্যে না ফেলে। যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে ফিতনার মধ্যে ফেলে জান্নাত থেকে বের করেছিল। তাদের দেহের পোশাক ছিনিয়ে নিয়েছিল যাতে তাদের লজ্জাস্থানসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে ও তার দলবল তোমাদের দেখতে পায়। কিন্তু তোমরা তাদের দেখতে পাও না। যারা ঈমানদার নয় আমি শয়তানদের তাদের বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি।" আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে আরো বলেছেন قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس সূরার শেষ পর্যন্ত। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছ বর্ণনা করে শুনালেন ان الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم অর্থাৎ "রক্ত যেমন মানুষের শরীরে চলাচল করে শয়তান ঠিক তেমনি মানুষের দেহে চলাচল করতে পারে।" হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদের আল্লাহ পাকের দুশমনের সম্পর্ক ঠিক তেমনি, যেমন হযরত আদম (আ)-এর সাথে শয়তানের সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন—

اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين -

"তুমি এখান থেকে নীচে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি অধমদের অন্তর্গত।" (আ'রাফ ৭/১৩)

অতঃপর সে আদম (আ) ও তাঁর সহধর্মিণীর কাছে পেঁছে তাদের সাথে আলাপ করে। যেমন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

فوسوس اليه الشيطان قال يادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা বলে দিব?" (সূরা ত্বহা ২০/১২০)। ইবলীস তাদের কাছে এমন ভাবে পেঁছেছিল যে ভাবে তাঁর সন্তান কাছে পেঁছে,

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন যে, ইবনে ইসহাকের অভিমতও দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যদি ইবনে ইসহাক নিজেই এ কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী হতেন যে, ইবলীস

সামনা সামনি সম্বোধনের দ্বারা হযরত আদম (আ) ও তাঁর সহধর্মিণীর কাছে পৌঁছে নাই তাহলে জ্ঞানীদের কোনরূপ প্রশ্ন করা সম্ভব হত না। অথচ আল্লাহ পাক সংবাদ প্রদান করেন যে, সে তাদের সাথে কথা বলেছে এবং সরাসরি সম্বোধন করেছে। অধিকন্তু আহলে ইলম থেকে এ সম্পর্কে মশহুর বক্তব্যও এসেছে আর এসব মশহুর বক্তব্যের সত্যতার উপর কুরআনের প্রমাণও রয়েছে। সুতরাং কিভাবে সন্দেহযুক্ত বক্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে। আল্লাহর নিকট আমরা এ সম্পর্কে তৌফীক প্রার্থনা করছি।

فاخرجهما مما كانا فيه (তারা যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল)। আল্লাহর বাণী فاخرجهما সম্পর্কে ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, শয়তান আদম (আ) ও তাঁর সহধর্মিণীকে তাঁরা যে স্থানে ছিলেন অর্থাৎ হযরত আদম (আ) ও তাঁর সহধর্মিণী জান্নাতের যে সুখস্বাচ্ছন্দে এবং তথাকার যে প্রচুর নিয়ামতে নিমজ্জিত ছিলেন তা থেকে তাদের বের করে দিল। আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক তাদেরকে বের করলেও তাদেরকে বের করার কারণ হিসাবে শয়তানকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তাদেরকে বের করার কারণই ছিল শয়তান—তাই বের করার সম্পর্ক তার দিকে করা হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির কষ্ট হয়েছে। আর সে কষ্টের কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বীয় বাসস্থান ত্যাগ করল। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার বাসস্থান থেকে আমাকে সরিয়েছ। অথচ প্রথম ব্যক্তি তাকে সরায় নাই। তবে যেহেতু তার জন্য স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ সে তার স্থান ত্যাগের কারণ হয়েছে। তাই স্থান ত্যাগের কারণের সম্পর্ক তার দিকে করা হয়েছে।

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو (আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু)। আল্লাহর এ বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, যখন কেউ কোন স্থানে বা কোন গ্রামে অবতীর্ণ হয় তখন তার সম্পর্কে বলা হয় هبط فلان ارض كذا او وادى كذا যেমন কবি বলেন—

ما زلت ارمقهم حتى اذا هبطت — ايدى الركاب بهم من راكس فلقا

আমরা যা বলেছি মহান আল্লাহর এ বাণী তার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-কে জান্নাত থেকে আল্লাহই বের করেছেন। আর তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার সম্পর্ক আল্লাহ পাক ইবলীসের দিকে করেছেন। আর এরূপ সম্পর্ক করার ব্যাপারে আমরা যে পন্থার উল্লেখ করেছি ঐ পন্থা অনুসারে এ সম্পর্কটিও হওয়ার বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে। অত্র আয়াত একথাও প্রমাণ করে যে, হযরত আদম (আ), তাঁর সহধর্মিণী ও তাদের শত্রু ইবলীসের নীচে নেমে আসা একই সময়ে হয়েছে। কেননা হযরত আদম (আ) ও তাঁর সহধর্মিণীর ভুল এবং ইবলীসের অপরাধের কারণ হওয়ায় তাদেরকে নীচে নামিয়ে দেয়াকে আল্লাহ পাক একত্রিত করে বর্ণনা করেন। اهبطوا শব্দের দ্বারা যাদেরকে নীচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে আদম (আ) ও তাঁর সহধর্মিণী উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও আর কে কে উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবু সালেহ থেকে বর্ণিত। তিনি اهبطوا بعضكم لبعض عدو

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন—এখানে আদম, হাওয়া, ইবলীস ও সাপের কথা বলা হয়েছে। হযরত সুদ্দী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ পাকের কালাম তোমরা নীচে নেমে যাও اهبطوا بعضكم لبعض عدو—এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা সাপকে অভিশাপ দেন, এর পাসমূহ কেটে দেন। সে পেটের উপর ভর দিয়ে যেন চলে এমন অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেন আর তার আহার্য হল মৃত্তিকা। আর আদম, হাওয়া, ইবলীস ও সাপকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। اهبطوا بعضكم لبعض عدو (তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু হবে) এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হযরত আদম (আ) ইবলীস ও সাপকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এখানে হযরত আদম (আ), ইবলীস ও সাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাদের পরস্পরের বংশধর পরস্পরের শত্রু। হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এখানে হযরত আদম (আ) এবং তাঁর বংশধর আর ইবলীস ও তার বংশধর উদ্দেশ্য। আবুল আলীয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ইবলীস ও হযরত আদম (আ)-এর কথা বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পরস্পর পরস্পরের শত্রু দ্বারা উদ্দেশ্য হল—হযরত আদম (আ), হযরত হাওয়া (আ), ইবলীস ও সাপ একে অপরের শত্রু। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এখানে আদম, হাওয়া, ইবলীস ও সাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে। হযরত ইবনে যায়দ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এখানে আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) এবং তাদের বংশধরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন—যদি কেউ বলে, হযরত আদম (আ) ও তাঁর সহধর্মিণী এবং সেই সাপের মধ্যে কি শত্রুতা ছিল ? উত্তরে বলা যায়—হযরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের সাথে ইবলীসের শত্রুতা হল—ইবলীস হযরত আদম (আ)-কে হিংসা করা এবং তাকে সিজদা করে আল্লাহর অনুগত হওয়ার ব্যাপারে অহংকার প্রকাশ করা। যখন সে তার প্রতিপালককে বললো, আমি তার থেকে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। মু'মিনদের সাথে ইবলীসের শত্রুতার কারণ হলো, আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়া, নাফরমানী করা। ইবলীসের সাথে হযরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের শত্রুতা হল আল্লাহর সামনে অহংকার প্রকাশ করা এবং তাঁর আদেশের বিরোধিতা করা। হযরত আদম (আ) ও তাঁর মু'মিন বংশধরদের ইবলীসের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা আল্লাহর প্রতি তাঁদের ঈমানের জীবন্ত প্রমাণ। পক্ষান্তরে হযরত আদম (আ)-এর সাথে ইবলীসের শত্রুতার অর্থ আল্লাহর সাথে কুফরী করা। হযরত আদম (আ), তাঁর বংশধরগণ এবং সাপের মধ্যে শত্রুতার কথা আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) থেকে বর্ণিত হাদীছে আলোচনা করেছি। যেমন এ শত্রুতা সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন—আমরা এদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার পর সন্ধি করি নাই; যে কেউ ভয়ে সাপ হত্যা করা পরিত্যাগ করে সে আমার দলভুক্ত নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি (স) বলেন—এদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার পর আমরা এদের সাথে সন্ধি করি নাই; যে কেউ ভয়ে এদেরকে হত্যা করা পরিত্যাগ করে সে আমার উম্মাতভুক্ত নয়।

ইমাম আবু জাফর (রহ) বলেন—যে যুদ্ধের কথা আমরা বর্ণনা করেছি তার মূল উৎস হল যা

আমাদের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনাসমূহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা'হল ইবলীসকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করার পর সাপ ও ইবলীসকে জান্নাতে প্রবেশ করানো, যার ফলে ইবলীস হযরত আদম (আ)-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের ব্যাপারে পদস্খলিত করতে পেরেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাপ হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি ইরশাদ করেন, সাপ ও মানুষের প্রত্যেককে একে অন্যের শত্রু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ সাপ দেখলে ভয় পায়। সাপ তাকে দংশন করে ব্যথিত করে তুলে। সুতরাং এদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর।

ولكم فى الارض مستقر (তোমাদের জন্য পৃথিবীতে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে)। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন যে, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আবুল আলীয়া (রহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ولكم فى الارض مستقر আয়াতাংশের অর্থ আর الذى جعل لكم الارض فراشا (তিনি এমন সত্তা যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন) আল্লাহ্‌র এ বাণীর অর্থ একই (বাকারা—২/২২)। হযরত রবী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র বাণী ولكم فى الارض مستقر-এর অর্থ وجعل لكم الارض قرارا (আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বসবাসের স্থান বানিয়েছেন)। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, আয়াতাংশের অর্থ—"তোমাদের জন্য পৃথিবীতে অবস্থানের যে ঘোষণা রয়েছে তার অর্থ কবরের অবস্থান। সুদ্দী (রহ) থেকে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণনা রয়েছে, তিনিও আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই করেছেন। তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ, পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান। ইমাম আবূ জাফর (রহ) বলেছেন, আরবী ভাষায় مستقر বলা হয় এমন স্থানকে যেখানে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে। যখন শব্দ এরূপ অর্থই বহন করে তখন সে যেখানেই থাকুক না কেন, ঐ স্থানই তার জন্য مستقر (অবস্থান স্থল)। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক বুঝিয়েছেন যে, মানুষের জন্য পৃথিবীতে অবস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে তাদের বাড়ীঘরে এবং তাদের অবস্থান জান্নাতে ও আসমানে। আল্লাহ পাকের কালাম ومتاع-এর অর্থ হলো, মানুষের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে ভোগ সম্পদ যেমন ভোগ সম্পদ রয়েছে জান্নাত।

ومتاع الى حين (এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপভোগের সামগ্রী রয়েছে)। আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন যে, অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও তাফসীরকারগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, তোমাদের তথায় মৃত্যু পর্যন্ত উপজীবিকা রয়েছে। এ অভিমত প্রদানকারীগণ বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে সুদ্দী (রহ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ومتاع الى حين -এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ—মৃত্যু পর্যন্ত উপজীবিকা রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ومتاع الى حين-এর অর্থ করেছেন জীবনকাল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে متاع الى حين অর্থ কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত উপভোগের সামগ্রী। এ অভিমত প্রদানকারীগণও স্বপক্ষে বর্ণনা উল্লেখ করেন।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি ومتاع الى حين এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন—উপভোগের সামগ্রী কিয়ামত দিবস অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত। অন্যান্য তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেন যে, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত। যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন তাঁদের আলোচনা স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেন। রবী থেকে বর্ণিত, তিনি ومتاع الى حين-এর ব্যাখ্যায় বলেন মৃত্যু পর্যন্ত।

আরবী ভাষায় ومتاع الى حين বলা হয় উপভোগ্য বস্তুমাত্রকেই। যেমন উপভোগ্য উপজীবিকা, অথবা পোশাক, অথবা সাজসজ্জা বা আনন্দ উল্লাস প্রভৃতি। যখন متاع শব্দের এ অর্থই হল আর আল্লাহ্ পাকও প্রতিটি প্রাণীর জীবনকে তার জন্য উপভোগের বস্তু হিসাবে তৈরী করেছেন সে তা উপভোগ করে তার জীবন ভর। মানব জাতির জন্য পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন ভোগের স্থান রূপে যেনো তাতে সে অবস্থান করে। আল্লাহ্ পাক যমীন থেকে যা কিছু ফলমূল সৃষ্টি করেন তা থেকে সে খাদ্য গ্রহণ করে। এ পৃথিবীতে উপভোগ্য আল্লাহ্র সৃষ্টি বিভিন্ন সামগ্রী মানুষ উপভোগের জন্য গ্রহণ করে। আর তিনি এ পৃথিবীকে মানুষের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহের জন্য বাসস্থান বানিয়েছেন। متاع শব্দটি উল্লেখিত সব কিছুকেই বুঝায়। আর যেহেতু আয়াতে এমন কোনো বিবেক সম্মত যুক্তি নাই, আবার এ সম্পর্কে কোনো হাদীছও নেই যে, এ সকল বিষয় থেকে আয়াতে বিশেষ বিশেষ বিষয় পরিগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যাবলীর মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা এটাই হবে যে, আয়াত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর উল্লিখিত হাদীসও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হবে যে, মানুষ ও ইবলীসের বংশধর তা পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত উপভোগ করবে। যখন আমাদের বর্ণিত ব্যাখ্যাই আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা তাহলে আয়াতের অর্থ এরূপ হওয়াই অপরিহার্য যে, আকাশ ও জান্নাতসমূহের বাসস্থানের ন্যায় বাসস্থান পৃথিবীতেও তোমাদের জন্য রয়েছে—যাতে তোমরা বসবাস করতে পারবে। আর তথায় তোমরা যে উপজীবিকা, পোশাক পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা ও আনন্দ উপভোগের বস্তু ভোগ করেছো, পৃথিবীর উৎপন্ন বস্তু থেকে তোমাদের উপভোগের সে সব বস্তুও তোমরা তোমাদের পার্থিব হায়াতে লাভ করবে।

তোমাদের মৃত্যুর পরবর্তী কালের জন্য যমীনকে তোমাদের কবর বানিয়েছি, যাতে তোমাদের মৃতদেহ দাফন করতে পার এবং পৃথিবী ধ্বংস করা পর্যন্ত যেন পৃথিবী হতে উৎপাদিত বস্তুসমূহ পূর্ণ উপভোগ করতে পার।

(৩৭) فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

(৩৭) অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, فَتَلَقَّى آدَمُ –এর অর্থ হল, হযরত আদম (আ) গ্রহণ করলেন। কেউ কেউ বলেন, فَتَلَقَّى শব্দের মূল হল التلقاء অর্থাৎ 'সাদর অভ্যর্থনার সাথে গ্রহণ করা'। যেমন দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থেকে আসার পর বা সফর থেকে আসার পর এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়, অনুরূপ কথা আল্লাহ্‌র বাণী فَتَلَقَّى آدم –এর মাঝেও প্রযোজ্য। যেন হযরত আদম (আ)–এর প্রতি ওহী নাযিল করার পর বা এ সম্বন্ধে হযরত আদম (আ)–কে অবহিত করার পর তিনি মহান আল্লাহ্‌র ওহী সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে কবুল করলেন। এ হিসাবে আয়াতাংশের অর্থ হল, মহান আল্লাহ্ হযরত আদম (আ)–কে তওবার বাণী শিক্ষা দিলে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে আন্তরিকভাবে নিজ প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করলেন। সেই ওহী সাদর অভ্যর্থনার সাথে গ্রহণ করার কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি দয়া পরবশ হলেন। যেমন হযরত যায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ)–কে رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْـفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْـفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ("হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো") আয়াতটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কি বাণী পেয়েছিলেন তা নির্ধারণের ব্যাপারে তাফসীরকাগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْـهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আদম (আ)–এর প্রাপ্ত বাণীগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

আদম আলাইহিস্ সালাম আরয করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে কি আপনি আপনার কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেন নি"?

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ "হ্যাঁ"।

আদম (আ) আরয করলেন,

"হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কি আপনার সৃষ্ট রূহ আমর মধ্যে ফুঁকে দেন নি"?

তিনি ইরশাদ করেন, "হাঁ"।

আদম (আ) পুনরায় আরয করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কি আমাকে আপনার জান্নাতে বসবাস করতে দেন নি"?

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "হাঁ"।

আদম (আ) আরয করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আপনার রহমত কি আপনার গযবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেনি"?

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "হাঁ"।

আদম (আ) আরয করলেন, "আমি তওবা করেছি ও আত্মসংশোধন করেছি। আমাকে কি জান্নাতে ফিরে যেতে দেবেন ?

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "হাঁ"।

আর তাই হলো আল্লাহ্ পাকের বাণী فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ –এর মর্মকথা।

অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আদম (আ) অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করার পর তাঁর নিকট আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি এবং সংশোধন হয়ে যাই, তবে আমার কি হবে ? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাকে জান্নাতে বাসস্থান প্রদান করব।

হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট দরখাস্ত করে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি এবং নিজেকে সংশোধন করে নেই, তবে আমার কি হবে ? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, তাহলে আমি তোমাকে পুনরায় জান্নাতে বাস করতে দিব। হযরত হাসান (র) বলেন, তখন হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) উভয়েই পড়েছিলেন : رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ

تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো"।

হযরত আবুল আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করার পর হযরত আদম (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি এবং নিজেকে সংশোধন করে নেই তবে আমার পরিণাম কি হবে ? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমি পুনরায় তোমাকে জান্নাত প্রদান করব"। এই হল মহান আল্লাহ্র শিখানো বাণীসমূহ। বর্ণনাকারী বলেন, رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -ও আল্লাহ্র শিখানো এবং ইলহামকৃত বাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্র শিখানো বাণীসমূহ এই ছিল যে, তখন হযরত আদম (আ.) আরয করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কি আমাকে আপনার কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেন নি"? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "হাঁ"। তিনি আরয করলেন, আপনি কি আমার মধ্যে আপনার সৃষ্ট রূহ্ ফুঁকে দেন নি ? ইরশাদ হলো, "হাঁ"। তিনি পুনরায় আরয করলেন, "আপনার রহমত কি আপনার গযবের চেয়ে অগ্রগামী নয়"? ইরশাদ হল, "হাঁ"। তিনি আরয করেন, "হে আমার প্রতিপালক" ! এ বিষয়টি আপনি কি পূর্ব হতেই আমার জন্য অবধারিত করে রাখেন নি" ? ইরশাদ হল, "হাঁ"। তারপর তিনি আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! যদি আমি তওবা করি এবং নিজেকে সংশোধন করে নেই তবে আপনি কি আমাকে পুনরায় জান্নাত দান করবেন? ইরশাদ হল, "হাঁ"। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى (সূরা তোয়াহা-১২২) অর্থাৎ "তারপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি দয়াপরবশ হলেন এবং তাকে পথ প্রদর্শন করলেন"।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন,

হযরত উবায়দা ইব্ন উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আদম (আ.) আরয করলেন,

"হে আমার প্রতিপালক ! আমি যে ভুল করেছি তা কি আমার সৃষ্টির পূর্বেই আপনি আমার জন্য অবধারিত করে রেখেছিলেন, নাকি আমার পক্ষ হতে আমি নতুনভাবে জন্ম দিয়েছি। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "হাঁ", তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তোমার ভাগ্যে এটা ঘটবে বলে আমি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম। তখন আদম (আ) আরয করেন, যেহেতু পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে তাই আমার সে ভুল মেহেরবানী করে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কালাম فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ -এর মধ্যে একথাই বর্ণনা করেছেন।

আরো চারটি বিভিন্ন সনদে উবায়দ ইব্ন উমাইর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ -এর ব্যাখ্যায় নিম্নের বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেন।

আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌র ইলহামকৃত বাণীর মর্ম হল, তখন আদম (আ) বললেন, اَللّٰهُمَّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ تُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔

"হে আল্লাহ্ ! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনার সত্তা পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই নিবেদিত। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তওবা করছি। আপনি আমার তওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চিতভাবে তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আদম (আ) -এর প্রাপ্ত বাণী হল, رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেই كَلِمَاتٍ ছিল,

اَللّٰهُمَّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ تُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔

"হে আল্লাহ্ ! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনার সত্তা পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই নিবেদিত। হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। হে আল্লাহ্ ! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনার সত্তা পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য নিবেদিত। হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আমার প্রতি রহম করুন, দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। হে আল্লাহ্ ! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনি পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য নিবেদিত। হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হোন, আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু"।

হযরত মুজাহিদ (র) فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, كَلِمَات -এর দ্বারা رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا ......الاية -কে বুঝানো হয়েছে।

অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, كَلِمَاتٍ -এর অর্থ তখন আদম (আ) আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি তবে আপনি দয়া করে কি তা কবুল করবেন ? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, হাঁ, কবুল করব। তারপর আদম (আ) তওবা করলেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর তওবা কবুল করে নিলেন।

হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তাআলা كَلِمَات বলে رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ আয়াতকে বুঝিয়েছেন।

ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী হল رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরে যেসব মতামত আমি উল্লেখ করেছি শব্দগত দিক থেকে

এগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ্ তাআলা আদম (আ)-কে কিছু বাণী শিক্ষা দিলেন এবং তিনিও তা তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে শিখে নিলেন, তদনুযায়ী আমলও করলেন। সর্বোপরি তিনি এ সমস্ত দোয়ার মাধ্যমে নিজের ভুলের কথা স্বীকার করে কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে মহান আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হলেন। মহান আল্লাহ্র ইল্হামকৃত এসব বাণী যার দ্বারা আদম (আ) অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন এবং মহান আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা চেয়েছেন, তা কবুল করার কারণে আল্লাহ্ তাআলা আদম (আ)-এর প্রতি রহম করেন এবং তার তওবা কবুল করেন।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে, আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে যে বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা ছিল, رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ এ দোয়া পড়েই আদম (আ) নিজ ভুলের কথা স্বীকার করলেন এবং তার প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভ করলেন। পক্ষান্তরে আমার এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে যারা অন্যান্য দুআর কথা উল্লেখ করেছেন তাদের এ কথা পবিত্র কুরআন দ্বারা সমর্থিত নয় এবং তাদের এ বক্তব্যের পেছনে এমন প্রমাণাদি নেই যা মেনে নেয়া যায়।

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে আদম (আ)-কে দেওয়া বাণী এবং তা পাঠ করার মাধ্যমে তিনি তওবা করেছেন, এই বিবরণ কুরআন করীমে উল্লেখ করে সমগ্র মানবজাতিকে তওবা করার পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত এতে রয়েছে সতর্কবাণী। যারা কুফর ও নাফরমানীতে লিপ্ত, যারা পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের নাজাতের পথ তাই যা তাদের আদি পিতা আদম (আ) তাঁর মাগফিরাতের জন্য অবলম্বন করেছেন। কুরআন করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ • "তোমরা কিভাবে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করো, অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তোমাদের পুনর্জীবন দান করবেন, তারপর তোমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাবে" (সূরা বাকারা -২৮)।

মহান আল্লাহ্র বাণী فَتَابَ عَلَيْهِ আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি দয়া করলেন।

ইমাম তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্ তাআলা আদম (আ)-এর প্রতি দয়া করলেন। عَلَيْهِ শব্দের هاء সর্বনামটি দ্বারা আদম (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। فَتَابَ عَلَيْهِ -এর ভাবার্থ হল, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ভুল থেকে তওবা করার তাওফীক দিলেন। শরীআতের পরিভাষায় তওবার অর্থ মহান আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ অর্থ তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশের মর্মার্থ হল, মহান আল্লাহ্র পাপী বান্দাদের থেকে গুনাহ্ হয়ে যাওয়ার পর যারা গুনাহ্ বর্জন করতঃ মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ধাবিত হয়, মহান আল্লাহ্র নিকট তওবা করে, আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আমি "আল্লাহ্র নিকট বান্দার তওবার কথা" পূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হল, যেসব কাজ আল্লাহ্ পাক পসন্দ করেন না এবং যেসব কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা বর্জন করে যে কাজে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হন, তার দিকে ধাবিত হওয়া এবং মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া। এই হল তওবা। অনুরূপভাবে বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ্র তওবা হল, বান্দাকে তওবা করার তাওফীক দেয়া এবং তার প্রতি গযবকে সন্তুষ্টিতে রূপান্তরিত করা এবং শাস্তিকে ক্ষমায় পরিণত করা।

اَلرَّحِيْمُ - এর মানে হল তওবাকারী ব্যক্তির প্রতি মহান আল্লাহ্ পরম দয়ালু। তওবাকারীর প্রতি মহান আল্লাহ্র রহমত বর্ষণের মর্ম হল, তার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া এবং তার শাস্তি রহিত করে দেওয়া।

(٣٨) قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

(৩৮) আমি বললাম, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে হেদায়াত আসবে, আর যারা আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে তাদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তারা বিষণ্ণও হবে না।

ইমাম তাবারী (র) বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا -এর ব্যাখ্যা আমি পূর্বে

উল্লেখ করেছি, তাই এ সম্বন্ধে পুনঃ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেননা উভয় স্থানে তার অর্থ এবং ব্যাখ্যা একই।

আবূ সালিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্‌র এ নির্দেশের মধ্যে আদম (আ), হাওয়া (আ), এমনকি সাপ এবং ইবলীসও অন্তর্ভূক্ত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى

"তারপর যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট আসবে হেদায়াত"।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ "আমার পক্ষ হতে যখন হিদায়াত আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে هُدًى শব্দের অর্থ হল, বয়ান ও পথ নির্দেশনা। যেমন,

আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى –এর ব্যাখ্যায় বলেন, هُدًى–এর ভাবার্থ হল পথপ্রদর্শক (নবী, রাসূল) এবং বয়ান। আবুল আলিয়া (র) যা বলেছেন, তা যদি যথাযথ হয়, তবে اهْبِطُوْا –এর সম্বোধন যদিও আদম (আ) এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ) সম্বন্ধে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদম (আ), হাওয়া (আ) এবং তাঁদের সন্তান সন্ততি সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত হবে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে اهْبِطُوْا শব্দটি মহান আল্লাহ্‌র বাণী فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ –এর মতই, যার অর্থ হল, "তারপর তিনি আসমান–যমীনকে বললেন, তোমরা উভয়ে (মহান আল্লাহ্‌র বিধানের অনুগত হয়ে) এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা হাযির হয়েছি অনুগত হয়ে"।

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ –এর অর্থ হল, আসমান–যমীন আরয করলো, আমাদের মধ্যস্থিত সমস্ত সৃষ্টি সহ আমরা অনুগত হয়ে হাযির হয়েছি।

فَمَنْ تَبِعَ هُدًى রাসূলগণের মাধ্যমে আমার যে হেদায়াত দিয়েছি, তা যারা অনুসরণ করবে, যেমন নিম্নের রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি فَمَنْ تَبِعَ هُدَىَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতাংশে বর্ণিত هُدًى অর্থ আমার বয়ান।

لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ অর্থ, দুনিয়াতে তারা যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেছে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ ও হিদায়াত মেনে চলেছে, তাই কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় তারা মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। তাদের কোন ভয় থাকবে না। وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ তাদের ইনতিকালের পর তারা দুনিয়াতে যা রেখে এসেছে তার জন্য তারা চিন্তিতও হবে না। যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনায় রয়েছে যে,

হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ভবিষ্যতে তোমাদের কোন ভয় নেই এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময় যে কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থা আসবে এ অবস্থায়ও তারা নিরাপদ থাকবে। সর্বোপরি তারা দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে চিন্তামুক্ত থাকবে এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

(٣٩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۔

(৩৯) যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তারাই দোযখবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, যারা আমার আয়াত অস্বীকার করবে এবং আমার রাসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করবে। আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অর্থ, মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও রবুবিয়্যাতের (প্রতিপালনের) দলীল-প্রমাণাদি যা রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। কুফরীর অর্থ কোন বস্তু ঢেকে রাখা, যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ 'তারাই হল জাহান্নামের অধিবাসী, অন্যরা নয় এবং যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, অনাদি-অনন্তকাল সেখানে থাকবে। যেমন হাদীছে বিবৃত হয়েছে যে,

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করেন, জাহান্নামে জাহান্নামী লোকদের অবস্থা এমন হবে যে, তথায় তারা বাঁচবেও না এবং মরবেও না। কিন্তু পাপের কারণে যেসব মুমিন জাহান্নামে যাবে, তাদের মৃত্যু হল, তারা পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। তারপর তাদের

৪৭-

জন্য সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে।

(٤٠) يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ٠

(৪০) হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আমার নিআমত স্মরণ কর যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, আমিও তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব এবং কেবল আমাকেই ভয় কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ অর্থ 'হে বনী ইসরাঈল'।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, 'হে বনী ইসরাঈল' অর্থ, হে ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম। ইয়াকূব (আ)-কে ইসরাঈল বলা হত। ইসরাঈল অর্থ, মহান আল্লাহ্‌র বান্দা এবং সৃষ্টির মাঝে মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত সত্তা। কেননা اِيْلُ অর্থ আল্লাহ্ এবং اِسْرَا অর্থ বান্দা, যেমন বলা হয় যে, জিব্‌রাঈরল অর্থ মহান আল্লাহ্‌র বান্দা। যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনায় রয়েছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইসরাঈল' অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দাহ্।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় 'ঈল' অর্থ আল্লাহ্।

আল্লাহ্ তাআলা 'হে বনী ইসরাঈল' বলে মুহাজির সাহাবীদের মাঝে বনী ইসরাঈলের যেসব ধর্ম-যাজক বিদ্যমান ছিল, তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে 'বনী ইসরাঈল' বলেছেন, যেমনিভাবে মানব সন্তানকে তিনি 'বনী আদম' বলে খেতাব করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ বক্ষমাণ আয়াত এবং আল্লাহ্‌র নিআমতের আলোচনা সম্বলিত পরবর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ সূরার শুরুতে বনী ইসরাঈল এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, তাদের কতিপয় লোক এমন আছে যারা এমন এমন ঘটনা এবং আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে যার মধ্যে পূর্ববর্তীদের কাহিনী উল্লেখ রয়েছে এবং তারা বলে যে, এ সম্পর্কিত বিশুদ্ধ জ্ঞান কেবল তাদের নিকটই আছে, অন্য কারো নিকট নেই। হাঁ যদি অন্যরা তাদের থেকে শিখে থাকে তবে অন্যদের কাছেও এ সম্পর্কিত সহীহ্ ইল্‌ম থাকতে পারে।

এমতাবস্থায় বনী ইসরাঈল সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, মুহাম্মাদ (স) বনী ইসরাঈলের সমসাময়িক ব্যক্তি নন। তিনি বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অনেক পরের লোক। তাই তিনি তাদের সম্পর্কে জানেন না। সর্বোপরি যেসব বই-পুস্তকে এসব ঘটনা রয়েছে এগুলোর সাথেও তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এমতাবস্থায় মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি মহান আল্লাহ্র দেওয়া ওহী প্রাপ্ত হয়েই এ কথা বলছেন। কেননা এমন বিশুদ্ধ তথ্য তো আর কারো কাছেই নেই। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসিত করার জন্যই আল্লাহ্ তাআলা এক্ষেত্রে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতাংশ নাযিল করেছেন। যেমন নিম্নের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'হে বনী ইসরাঈ' -এর ভাবার্থ হল 'হে ইয়াহূদীদের পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ '!

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اُذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

"আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর, যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি"।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা যে অনুগ্রহ করেছেন তার মধ্যে কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহ হল, তাদের মধ্য থেকে তিনি বহু নবী-রাসূল নির্বাচন করেছেন, তাদের প্রতি বহু আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, ফিরআওনের সৃষ্ট বিপর্যয় ও সন্ত্রাস থেকে তাদের মুক্তি দিয়ে পৃথিবীতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, পাথর থেকে নহর প্রবাহিত করেছেন এবং তাদেরকে "মান্না ও সালওয়া" (বেহেশতী খাদ্য) ইত্যাদি দান করেছেন। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলের পরবর্তী লোকদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি আল্লাহ্ পাক যে নিআমত দান করেছেন তারা যেন তা স্মরণ রাখে এবং তা ভুলে না যায়। তাহলে মহান আল্লাহ্র নিআমতের কথা ভুলে যাওয়া এবং এগুলোকে অস্বীকার করার কারণে তাদের প্রতি যে আযাব ও শাস্তি আপতিত হয়েছিল তা তাদের প্রতিও আপতিত হবে। যেমন নিম্নের বর্ণনায় রয়েছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি اُذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর ভাবার্থ হল, তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি আমি যে নিআমত দান করেছি তোমরা তার কথা স্মরণ কর। তা হল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ফিরআওন এবং তার

কাওম থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اُذْكُرُوْا نِعْـــمَتِى –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বনী ইসরাঈলকে দেওয়া নিআমত হল, তাদের মধ্য হতে বহু নবী–রাসূল প্রেরণ করা এবং তাদের প্রতি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করা।

হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اُذْكُرُوْا نِعْـمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা ঐ সমস্ত নিআমত যা তিনি বনী ইসরাঈলকে প্রদান করেছেন, যেগুলোর কিছু বিবরণ এখানে আছে আর কতগুলোর বিবরণ এখানে নেই। সেই নিআমতসমূহের কতিপয় হল, পাথর থেকে নহর (ঝর্ণা) প্রবাহিত করা, তাদের প্রতি মান্না ও সাল্ওয়া (বেহেশতী খাদ্য) নাযিল করা এবং তাদেরকে ফিরআওন সম্প্রদায়ের গোলামী থেকে মুক্তি দেওয়া।

হযরত যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اُذْكُرُوْا نِعْـــمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে নিআমত বলে ব্যাপক নিআমতের কথা বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসলাম থেকে উত্তম নিআমত আর কিছুই নেই। ইসলাম ব্যতীত বাকী নিআমতসমূহ হল ইসলামেরই ফলশ্রুতি। তারপর তিনি পাঠ করলেন..... يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لاَّ تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلاَمَكُمْ "তারা মনে করে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে। (হে রাসূল !) আপনি বলুন, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করা আমাকে ধন্য করেছে বলে মনে করো না। বরং আল্লাহ্ পাকই তোমাদেরকে ধন্য করেছেন ঈমানের জন্য হিদায়াত করে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।

বস্তুতঃ এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (স)–এর মুবারক যবানে তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আ) তাঁর বয়োজেষ্ঠ্যদেরকে মহান আল্লাহ্র নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে, وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتَاكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ·

"স্মরণ কর সে সম্পর্কে যখন মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিল, হে আমার কাওম ! তোমরা মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্য হতে নবী করেছিলেন এবং তোমাদেরকে রাজত্ব দান

করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাউকে যা তিনি দেননি তা তোমাদেরকে দান করেছেন।"

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ

"তোমরা অমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব।"

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, العهد -এর অর্থ এবং এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের যে একাধিক মত রয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনাসহ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, উপরোক্ত আয়াতে আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার বলতে ঐ অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈল হতে গ্রহণ করেছিলেন, যার বিবরণ "তাওরাত" কিতাবে বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তারা লোকদের নিকট এ মর্মে বয়ান করবে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল। 'তাওরাত' কিতাবেও তাঁর নবী হওয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং তারা তাঁর প্রতি ও যা তিনি নিয়ে আসবেন অর্থাৎ কুরআন মজীদের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। এ হল "আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার" -এর ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, তোমরা এ অঙ্গীকার পূর্ণ কর, তাহলে আমি আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। তাদের সঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার হল, তারা নেক আমল করলে এবং মহান আল্লাহ্‌র হুকুম মানলে তাদেরকে জান্নাত প্রদান করা হবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

"আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলে এবং তাদের মধ্য হতে বারোজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আর আল্লাহ্ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো ও তাদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ

প্রদান কর তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই দূরীভূত করে দিব এবং নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এর পরও কেউ কুফরী করলে সে সরল পথ হারাবে"।

আরো ইরশাদ হয়েছে– فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۔ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

"কাজেই আমি তা (রহমত) তাদের জন্য নির্দ্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে সেই রাসূলের যিনি উম্মী নবী ; যার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্‌জীল এবং যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখলসমূহ হতে যা তাদের উপর ছিল। কাজেই যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে নাযিল হয়েছে তার সাক্ষী হয়, তার অনুসরণ করে, তারা সকলেই সফলকাম"।

যেমন নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে,

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমার নবী তোমাদের নিকট আবির্ভূত হলে তার সাথে তোমাদের করণীয় কি এ বিষয়ে আমি তোমাদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছি তোমরা তা পূর্ণ কর, তাহলে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। অর্থাৎ নবী মুহাম্মাদ (স)–কে বিশ্বাস করলে এবং তাঁর অনুকরণ করলে, "তোমাদের গুনাহের কারণে তোমাদের উপরের গুরুভার এবং শৃংখল সরিয়ে দেওয়ার যে অঙ্গীকার আমি করেছি" তাও পূর্ণ করব।

হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্‌র সাথে বান্দাদের কৃত অঙ্গীকার হল, দীন ইসলামের অনুসরণ করা। তোমরা যদি এ কাজটুকু কর

তবে আল্লাহ্ বলেন, আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব অর্থাৎ তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করব।

হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবে বর্ণিত যে অঙ্গীকার আমি তোমাদের থেকে নিয়েছি, তোমরা তা পূর্ণ কর, তবে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব অর্থাৎ তোমরা আমার আনুগত্য করলে আমি তোমাদেরকে জান্নাত দান করব।

হযরত ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে অঙ্গীকারের কথা বলে ঐ অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা সূরা মাইদার وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا আয়াতের মাঝে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য, যারা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার পূরা করবে এবং আল্লাহ্ও তাদের সাথে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহাম্মাদ (স) ও অন্যান্যদের যবানে আমি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার জন্য যে আদেশ দিয়েছি এবং আমার নাফরমানী থেকে বিরত থাকার জন্য যে হুকুম করেছি তা তোমরা পূরা করলে আমিও তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরা করব অর্থাৎ তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদেরকে জান্নাত দান করব।

হযরত ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা আমার আদেশ পালন করলে আমিও তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছি তা পূরা করব। তারপর তিনি অঙ্গীকারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার লক্ষ্যে পাঠ করেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

"আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত

আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে ? তোমরা যে সওদা করেছো, সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং এটাই হল মহা সাফল্য"।

এটাই হল আল্লাহ্‌র ওয়াদা যা তিনি তাদের সাথে করেছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنَ

"এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।"

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنَ -এর ব্যাখ্যা হল, "হে বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গকারী গাদ্দার লোকেরা এবং ঐ বিষয়ে আমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকেরা ! যার অঙ্গীকার আমি তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম আমার নবীদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মাধ্যমে, তা এই যে, তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে। তোমরা আমাকে ভয় কর এ বিষয়ে যে, তোমরা যদি আমার দিকে ধাবিত না হও, আমার রাসূলের আনুগত্য করে আমার দরবারে তওবা না কর এবং তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের স্বীকৃতি প্রদান না কর, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা ও আমার রাসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করার কারণে যেমনিভাবে আযাব নাযিল করেছি, তেমনিভাবে তোমাদের প্রতিও আযাব নাযিল করব। যেমন নিম্নের বর্ণনায় রয়েছে ঃ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হল তোমরা আমাকেই ভয় কর, এ বিষয়ে যে, আমার হুকুম অমান্য করলে আমি তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করব যেমনিভাবে আযাব নাযিল করেছি তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি, যা তোমরা জান। যেমন আকৃতি বিকৃত করে দেওয়া ইত্যাদি।

হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ "এবং তোমরা আমাকেই ভয় কর"।

হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল "এবং তোমরা আমাকেই ভয় কর"।

(٤١) وَاٰمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ۔

(৪১) আমি যা নাযিল করেছি তা বিশ্বাস কর। এটা তোমাদের নিকট যা আছে তার সত্যতার স্বীকৃতিদাতা। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা আমাকেই ভয় করো।

وَاٰمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ –এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, اٰمِنُوا অর্থ صَدِّقُوا বিশ্বাস স্থাপন করো, যেমন ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। بِمَا اَنْزَلْتُ মানে হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি আল–কুরআনের যা কিছু নাযিল করেছি। مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ মানে ইয়াহুদী বনী ইস্‌রাঈলের নিকট তাওরাত গ্রন্থের যা অবশিষ্ট আছে, কুরআন মজীদ তার সমর্থক। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে কুরআন করীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছেন যে, তারা কুরআন করীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে সেটা তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাস বলে গণ্য হবে। কেননা কুরআন মজীদে হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর নবূওয়াতে বিশ্বাস, তার স্বীকারোক্তি এবং তাঁকে অনুসরণের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা ইন্‌জীল ও তাওরাতে বর্ণিত নির্দেশেরই অনুরূপ। কাজেই হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে এতে তাদের তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাস হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তারা যদি কুরআন মজীদকে অস্বীকার করে, তবে তা হবে তাদের তাওরাতকে অস্বীকার করার শামিল। اَنْزَلْتُ মূলে ছিল اَنْزَلْتُهٗ ; 'ه' যমীর (সর্বনাম)–টি مَا–এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। مُصَدِّقًا উক্ত লোপকৃত যমীরের حال ।

আয়াতাংশের সারমর্ম এরূপ, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায় ! তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে, তার সমর্থকস্বরূপ আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন। উল্লেখ্য, তাতে 'কিতাব' বলে তাওরাত ও ইন্‌জীলকে বোঝান হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاٰمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, " তোমাদের কাছে যে তাওরাত ও ইন্‌জীল আছে, আমি কুরআন মজীদকে তার সমর্থকরূপে নাযিল করেছি। হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায় ! আমি মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি যা নাযিল করেছি তা বিশ্বাস কর। তা তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থক। আবুল আলিয়া (র) বলেন, তাওরাত ও ইন্‌জীলের মধ্যে তারা মুহাম্মাদ (স)–এর উল্লেখ পেত।

وَلَا تَكُوْنُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ –এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, 'كافر' শব্দটি তো একবচন, অথচ وَلَا تَكُوْنُوْا বহুবচন শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। এ প্রকাশভঙ্গি যদি সমীচীন হয় তবে কি কারোর পক্ষে এরূপ বাক্য ব্যবহার করার অবকাশ আছে, যেমন لَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ رَجُلٍ قَامَ "তোমরা প্রথম দণ্ডায়মান ব্যক্তি হয়ো না''?

জওয়াবে বলা যায়, এমন ব্যবহার বৈধ হতে পারে, যদি শব্দটি فعل – يفعل –এর মূল থেকে নিষ্পন্ন হয়। من শব্দের বহুবচন ও স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর ঘটে না। যখন فعل - يفعل হতে গঠিত কোন বিশেষ্য পদ তার স্থলাভিষিক্ত হবে তখন সেও অনুরূপ একবচন হয়েও বহুবচন এবং স্ত্রীলিঙ্গের অর্থ আদায় করবে। এটা ঠিক اَلْجُنْدُ يَقْدُمُ ও اَلْجَيْشُ يَنْهَزِمُ –এর মত। الجند ও الجيش শব্দগতভাবে একবচন বিধায় ক্রিয়াও একবচন হয়েছে। আবার এ শব্দ দুটো বহুবচনের অর্থ দেয় বলে الجيش رجل ও الجند غلام বলা শুদ্ধ নয় ; বরং বলতে হবে الجيش رجال ও الجند غلمان কেননা فعل - يفعل হতে গঠিত নয় এমন বিশেষ্য পদ একবচন হলে তা বহুবচনের অর্থ আদায় করে না। এ নীতি অবলম্বনেই কবি বলেন–

وَ اِذَا هُم طَعِمُوا فَاَلاَمُ طَاعِمٍ + وَ اِذَا هُم جَاعُوا فَشَرُّ جِيَاعٍ

"যখন তাদের ইচ্ছা হয় খেয়ে নেয়, অতি হীন আহারকারী তারা। আবার যখন ইচ্ছা অনাহারে থাকে, নিকৃষ্টতম অনাহারী তারা।"

এ কবিতাটিতে فعل - يفعل হতে গঠিত বিশেষ্যকে একবার উহ্য مَن–এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার উদ্দেশ্য পদের বহু সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। যদি একবচনের স্থলে বহুবচন এবং বহুবচনের স্থলে একবচন ব্যবহার করা হত তাও ঠিকই হত।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আহলে কিতাবের জ্ঞানীগণকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেছেন, তোমরা মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মজীদে বিশ্বাস কর। এ কিতাব তোমাদের কিতাবের সমর্থক। তোমাদের তাওরাত ও ইন্‌জীল কিতাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ (স) আমার প্রেরিত সত্য নবী ও রাসূল। কাজেই তোমরাই এর প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না এবং পবিত্র কুরআন যে আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তা অস্বীকার করো না। এ সম্পর্কে তোমাদের নিকট যে জ্ঞান আছে তা অন্যদের নেই।

আয়াতে পবিত্র কুরআন কারীমকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ বলে অস্বীকার করাকে 'কুফ্‌র' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের بِه-এর সর্বনাম بِمَا اَنزَلتُ-এর 'مَا' -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। এর উদ্দেশ্য কুরআন মজীদ। যেমন হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِه অর্থ 'তোমরাই কুরআন মজীদের প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না'।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে এ সম্পর্কে বর্ণিত যে, এ সর্বনাম দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ তোমরাই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ তোমরাই তোমাদের কিতাবের প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। কেননা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে অবিশ্বাস করা স্বয়ং তাদের কিতাবকেই অবিশ্বাস করার নামান্তর। যেহেতু তাদের কিতাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে।

শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুটি সঠিক মনে হয় না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতের প্রথমে ইরশাদ করেছেন, اٰمِنُوْا بِمَا اَنزَلتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্ তার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, মুহাম্মাদ (স)-এর যুগে আল্লাহ্ তাআলা যা নাযিল করেছেন তা মুহাম্মাদ (স) নন ; বরং কুরআন কারীম। মুহাম্মাদ (স) তো রাসূল ও প্রেরিত পুরুষ, অবতীর্ণ ব্যক্তি নন। অবতীর্ণ যা তা হলো কিতাব। তারপর নিষেধ করেছেন, যেন তারা যার প্রতি ঈমান আনতে বলা হয়েছে তার প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী না হয়। এটাই আয়াতের স্পষ্ট মর্ম। হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে কোন উল্লেখ বাহ্যত এ আয়াতে নাই। এমতাবস্থায় وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِه-এর সর্বনাম দ্বারা তাঁকে বোঝান হলে সেটা শুধু রূপক হিসেবেই হতে পারে। অবশ্য বাক্যে বিশেষ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে সে ক্ষেত্রে সর্বনামের ব্যবহার অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যারা বলেন, بِه-এর ه সর্বনামটি لِمَا مَعَكُم-এর مَا-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ এর দ্বারা ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের কিতাব তাওরাত-ইন্‌জীলকে বোঝান হয়েছে। তাও ঠিক নয় যদিও এরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। কেননা বাক্যের বাকধারা অনুসারে এ ব্যাখ্যা অতি দূরের প্রতীয়মান হয়। পূর্বেই বলেছি, যার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো কুরআন মজীদ। কাজেই যা অবিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে তাও হবে সেই কুরআন মজীদ, অন্য কিছু নয়। একই বাক্যে, একই আয়াতে এক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ করা হবে এবং নিষেধ করা হবে অন্য বিষয় অবিশ্বাস করতে তা হতে পারে না। দূরবর্তী ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে অনিবার্যভাবে এরূপই দাঁড়ায়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, হে কিতাবীগণ! তোমাদের কিতাবের সমর্থকরূপে যা অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তাতে বিশ্বাস কর এবং তোমরাই তার প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। এ বিষয়ে তোমাদের যে জ্ঞান আছে তা অন্যদের নাই।

وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا -এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক

মত রয়েছে। হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَلاَ تَشْتَرُوا بِايَاتِى ثَمَنًا قَلِيلاً –এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, তোমরা এর বদলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করো না। পূর্ববর্তীদের কিতাবে লেখা আছে, হে মানব সন্তান! বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দাও, যেমন তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বিনা পারিশ্রমিকে।

হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلاَ تَشْتَرُوا بِايَاتِى ثَمَنًا قَلِيلاً অর্থ, মহান আল্লাহ্র নাম গোপন করে তুচ্ছ লালসা চরিতার্থ করো না। এ লালসাকেই আয়াতে الثمن (মূল্য) বলা হয়েছে। এ হিসেবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, আমি আমার কিতাব ও তাঁর আয়াতের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছি তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। পার্থিব ধনৈশ্বর্য তুচ্ছ বৈ কি ! বিক্রয় করার অর্থ তাদের কিতাবে হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা মানুষের কাছে প্রকাশ না করা। তাদের কিতাব তাওরাত ও ইন্‌জীলে তারা লেখা পেয়েছিল যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)–ই প্রতিশ্রুত নিরক্ষর নবী। তুচ্ছ মূল্য মানে তাদের অনুসারী স্বধর্মীয় লোকদের উপর নেতৃত্ব রক্ষা করা এবং কারও কাছে তাওরাত–ইন্‌জীলের উক্ত বাণী প্রকাশ করার বিনিময়ে উৎকোচ গ্রহণ করা ।

لاَ تَشْتَرُوا–এর প্রকৃত অর্থ ক্রয় করো না। কিন্তু আমরা এখানে অর্থ করেছি বিক্রয় করো না, মহান আল্লাহ্র আয়াতের বিনিময়ে যে ব্যক্তি তুচ্ছ মূল্য ক্রয় করে, সে প্রকৃতপক্ষে মূল্যের বিনিময়ে আয়াত বিক্রয় করে। বস্তুতঃ পণ্য ও মূল্য এ দুয়ের প্রত্যেকটিই তার মালিকের পক্ষে বিক্রয় এবং অপর পক্ষ তার ক্রেতা।

হযরত আবুল আলিয়া (র)–র ব্যাখ্যা অনুসারে এ আয়াতের মর্ম, হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর বিষয়টি তোমরা মানুষের কাছে প্রকাশ কর এবং এর বিনিময়ে তাদের থেকে পারিশ্রমিক কামনা করো না। কাজেই প্রকাশ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য ক্রয়েরও নিষেধাজ্ঞা।

وَ اِيَّاىَ فَاتَّقُونِ–এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ তোমরা তুচ্ছ মূল্যে আমার আয়াত বিক্রয়, আয়াতের বিনিময়ে নগণ্য মালমাত্তা ক্রয়, আমি আমার রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তা প্রত্যাখ্যান এবং আমার নবীর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্কে ভয় কর। এ পথে চলার কারণে তোমাদের পূর্বসূরীদেরকে যে শাস্তি দিয়েছিলাম, সেরূপ শাস্তি তোমাদেরকেও দিতে পারি।

(٤٢) وَلاَ تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَاَنْتُم تَعْلَمُونَ ٠

(৪২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।

وَلاَتَلْبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلِ–এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, لاَ تَلْبِسُوا অর্থ, 'মিশ্রিত করো না'। اللبس অর্থ মিশ্রিত করা।

বলা হয় لَبَسْتُ عَلَيهِمُ الاَمرَ اُلبِسَةٌ لَبسًا অর্থ, বিষয়টি তাদের সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছি।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَلَبَسنَا عَلَيهِم مَا يَلبِسُونَ-এর অর্থ বলেছেন, তাদের সাথে সেরূপ মিশ্রিত করে ফেলতাম, যেরূপ মিশ্রিত তারা করে (সূরা আনআম, আয়াত ৯)।

কবি আল-আজ্‌জাজ বলেন-

لَمَّا لَبَسنَ الحَقَّ بِالتَّجَنِّى + غَنِيْنَ وَاستَبدَلنَ زَيدًا مِنِّى

"তারা যখন পাপের অপবাদ দিয়ে সত্যকে মিশ্রিত করল, তখন আবার প্রেমের বেসাতি খুলল এবং আমার বদলে যায়দকে গ্রহণ করল"। এখানে কবি لبسن বলে মিশ্রিত করাই বুঝিয়েছেন।

আবার اَللُّبس অর্থে কাপড় গায়ে জড়ানো বা পরিধান করা। এর ব্যবহার হচ্ছে لبسته البسه لبسا و ملبسا যেমন, কবি আখতাল বলেন,

لَقَد لَبِستُ لِهذَا الدَّهرِ اَعصُرَهُ + حَتَّى تَجَلَّلَ رَأسِى الشَّيبُ وَاستَعَلاَ

(আমি যুগের সাথে এমনভাবে মিশে গেছি,শেষপর্যন্ত আমার মস্তকোপরি বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে এবং তা শুভ্রোজ্জল হয়ে গেছে।

কুরআন কারীমে اللبس (মিশ্রিত করা, বিভ্রম সৃষ্টি করা)-এর ব্যবহার অন্যত্রও রয়েছে, যেমন وَ لَلَبَسنَا عَلَيهِم مَا يَلبِسُونَ "এবং আমি তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে।"

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তারা তো কাফির। তারা আল্লাহ্ তাআলাকে অস্বীকার করত। সুতরাং এমন কি সত্যের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করবে ?

জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিল মুনাফিক। তারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস প্রকাশ করত, কিন্তু হৃদয়ে পোষণ করত কুফ্‌র ও অবিশ্বাস। এরাই ছিল জঘন্য কাফির। তারা বলত, মুহাম্মাদ (স) প্রেরিত নবী বটেন, তবে আমাদের প্রতি নয় ; বরং অন্যদের প্রতি। এভাবে মুনাফিক কাফিরগণ সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করত। অর্থাৎ সত্যকে মুখে প্রকাশ করত এবং মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত ও তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের সত্যতা স্বীকার করত, কিন্তু বাইরের এই সত্যকে হৃদয়ে লালিত মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করত। যারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে অন্যদের প্রতি প্রেরিত বলে স্বীকার করত এবং নিজেদের প্রতি প্রেরিত হওয়ার কথা অস্বীকার করত, তাদের স্বীকারোক্তিটুকু সত্য এবং অস্বীকৃতিটুকু মিথ্যা। তারা এই সত্য-মিথ্যার মিশাল দিত, হক ও বাতিলের মাঝে বিভ্রম সৃষ্টি করত। বস্তুত আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সমগ্র সৃষ্টির কাছে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, لاَ تَلبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِل অর্থ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না। হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত যে, তিনি এ আয়াতের অর্থ করেন,

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারে তোমরা মহান আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি কল্যাণকামিতার দায়িত্ব আদায় কর।

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের অর্থ করেন যে, তোমরা ইসলামকে ইয়াহূদী ও নাসারা ধর্মের সাথে মিশ্রিত করো না।

হযরত ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বর্ণিত যে, لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত যায়দ (র) বলেন, সত্য হচ্ছে তাওরাত গ্রন্থ যা আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করেছেন এবং বাতিল হলো তা, যা তারা নিজেরা লিখেছে।

وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। এক. আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সত্য গোপন করতে নিষেধ করেছেন, যেমন করেছেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করতে। তখন আয়াতের সারমর্ম হবে, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে গোপন করো না। এ হিসাবে وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ আয়াতাংশে وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ বাক্যের উপর عطف হবে।

দুই. পূর্বের আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে নিষেধ করা হয়েছে, যেন তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করে। আর এ আয়াতাংশে রয়েছে এ সংবাদ যে, তারা জেনেশুনে সত্য গোপন করে। যেহেতু পূর্বোক্ত وَلَا تَلْبِسُوا আয়াতাংশের অর্থ থেকে এ আয়াতাংশের ধারা পরিবর্তন হয়েছে। সে আয়াতাংশ নিষেধাজ্ঞামূলক। এ আয়াতাংশ সংবাদসূচক। আয়াতে যে দুই ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেছি, তার প্রথমটি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মত অনুযায়ী।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ অর্থ তোমরা সত্য গোপন করো না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (র) ও আবুল আলিয়া (র)-এর অভিমত অনুসারে।

হযরত আবুল আলিয়া (র) وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা জেনেশুনে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের কথা গোপন রাখত।হযরত মুজাহিদ (র) হতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে।

তারা জেনেশুনে যে সত্য গোপন রাখত তা কি? এ সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আমার রাসূল ও তাঁর পরিচয় নিয়ে আসা কিতাব সম্পর্কে তোমরা যা কিছু জান তা গোপন করো না। তোমাদের হাতে যে সমস্ত কিতাব আছে তাতে তোমরা এ সম্পর্কে বিবরণ পাও।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা জানো হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল। কাজেই তোমরা তা গোপন করো না।

হযরত মুজাহিদ (র) وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আহলে কিতাব সম্প্রদায় মুহাম্মাদ (স)–এর কথা গোপন রাখত। অথচ তারা তাওরাত ও ইনজীলে তাঁর উল্লেখ লিখিত পেয়েছিল। অন্য সূত্রেও মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ আয়াতে হক বা সত্য বলে হযরত মুহাম্মাদ (স)–কে বোঝান হয়েছে।

আবুল আলিয়া (র) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর আবির্ভাবের কথা গোপন রাখত, অথচ তাদের কিতাবে তাঁর কথা লিপিবদ্ধ পেয়েছিল। মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা মুহাম্মাদ (স)–কে গোপন কর অথচ তোমরা জান এবং তাওরাত ও ইনজীলে তাঁর কথা লিপিবদ্ধ পেয়েছ।

উপরোক্ত আলোচনা দৃষ্টে আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, হে ইয়াহুদী ধর্মজাযকগণ! তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করো না। তোমরা ধারণা করো, তিনি এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি প্রেরিত, অন্যান্যদের প্রতি নয়। অথবা তোমরা অনেকে তাঁর ব্যাপারে কপটতার আশ্রয় নিয়েছো। অথবা তোমরা জান তিনি তোমাদের ও অপরাপর সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত। এভাবে তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করছ। তোমরা তোমাদের কিতাবে তাঁর পরিচয় ও গুণাবলী এবং তিনি সমস্ত মানুষের জন্য আমার রাসূল একথা লিপিবদ্ধ পেয়েও গোপন করছ। وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ মানে তোমরা জান তিনি আমার রাসূল। তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা আমারই পক্ষ হতে। তোমরা আরও জান আমি তোমাদের কিতাবে তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে, তোমরা তাঁর প্রতি এবং তিনি যা নিয়ে আসেন তার প্রতি ঈমান আনবে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে।

(٤٣) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۔

(৪৩) তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদী পণ্ডিত ও মুনাফিকরা মানুষকে সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা তা পালন করত না। তাই আল্লাহ্ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স) ও তাঁর নিয়ে আসা কিতাবে বিশ্বাসী মুসলিমদের সাথে তাদেরও সালাত কায়েম, মালের যাকাত আদায় এবং মুমিনদের অনুরূপ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ সম্পর্কে বলেন যে, সালাত ও যাকাত অবশ্য পালনীয় ফরয। তোমরা এ দুটো আদায় কর। সালাত কায়েমের কি অর্থ তা আমি ইতোঃপূর্বে এ

কিতাবেই আলোচনা করেছি। পুনরাবৃত্তি দূষণীয় মনে করি। যাকাত আদায়ের অর্থ হচ্ছে, মালের যে পরিমাণ সদকা ফরয করা হয়েছে তা দিয়ে দেওয়া। যাকাতের প্রকৃত অর্থ সম্পদের বৃদ্ধি ও প্রাচুর্য। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা যখন ফসলের প্রাচুর্য দান করেন তখন বলা হয় زَكَا الـزَّرعُ 'প্রচুর ফসল হয়েছে'। এমনিভাবে বলা হয় زكت النفقة (ব্যয় বেড়ে গেছে)। কেউ যখন বিবাহ করে এবং ফলে তার সাথে একজন বেড়ে গিয়ে বেজোর জোড়ায় পরিণত হয়, তখন বলা হয় زكا الفرد 'সদস্য বেড়ে গেছে' (বা বেজোড় জোড় হয়েছে)। কবি বলেন,

كَانُوا خَسًا اَو زَكًا مِّن دُونِ اَربَعَةٍ + لَم يَخلُقُوا وَجُدُودُ النَّاسِ تَعتَلِجُ

" তারা ছিল বেজোড়, কিংবা জোড় 'চার'-এর নিচে। তারা কিছুই সৃষ্টি করল না, অথচ মানুষের পূর্বপুরুষগণ পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত।"

অন্য একজন বলেন,

فَلا خَسًا عَدِيدُهُ وَلا زَكًا + كَمَا شِرَارُ البَقلِ اَطرَافُ السَّفَا

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, السفا অর্থ বুহ্মা (এক প্রকার কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ)-এর কাঁটা। اطراف السفا মানে বুহ্মার সেই চারা যা এখনও ঝিল্লির অভ্যন্তরে গোলাকার অবস্থায় আছে। শ্লোকটির সারমর্ম হল, "নিকৃষ্টতম উদ্ভিদ কচি বুহ্মা বৃক্ষের ন্যায় তার আবির্ভাবে তাদের বেজোড় সংখ্যা জোড়ে পরিণত হয় নাই"।

যাকাতকে যাকাত বলা হয় কেন, যেখানে এর দ্বারা সম্পদের অংশবিশেষ হ্রাস করে দেওয়া হয়? উত্তর এই যে, যাকাত দেওয়ার ফলে আল্লাহ্ তাআলা মালিকের হাতে অবশিষ্ট সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। তাছাড়া যাকাত নাম দেওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, যাকাত মালিকের অবশিষ্ট সম্পদকে পবিত্র করে এবং প্রাপকদের প্রতি যুলুম করা হতে তাকে মুক্ত রাখে। মূসা (আ)-এর ঘটনার বিবরণে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেন- اَقَتَلتَ نَفسًا زَكِيَّةً "আপনি একটা পবিত্র জীবন নাশ করলেন"? অর্থাৎ যে অপরাধ হতে মুক্ত ও পবিত্র। বলা হয়ে থাকে هو عدل زكى 'লোকটি ন্যায়পরায়ণ, পবিত্র। যাকাতের নামকরণের এই কারণই আমার কাছে প্রথমোক্ত কারণ অপেক্ষা সুন্দর মনে হয়, যদিও সেটাও গ্রহণযোগ্য। যাকাত দেওয়া মানে প্রকৃত অধিকারীর হাতে তা পৌঁছান।

রুকূ' অর্থ বিনয়াবনত হওয়া। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয় প্রদর্শন করা। কেউ যখন কারও সম্মুখে বিনয়াবনত হয় তখন বলা হয়, ركع فلان لكذا او كذا। কবি বলেন,

بِيعَت بِكَسرٍ لَئِيمٍ وَاستَغَاثَ بِهَا + مِنَ الهُزَالِ اَبُوهَا بَعدَ مَا رَكَعَا

" নিতান্ত তুচ্ছ দ্রব্যের বিনিময়ে তাকে বিক্রয় করা হয়েছে। তার পিতা চরম দৈন্য ও দুর্দশায় অবনমিত হওয়ার পর তাকে দিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হতে পরিত্রাণ চেয়েছে"।

আল্লাহ্ তাআলা বনী ইস্রাঈলের ধর্মযাজক ও মুনাফিকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা তওবা করে ও আল্লাহ্মুখী হয় এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, মুসলমানদের সাথে ইসলামে প্রবেশ করে ও ইবাদত–আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয়াবনত হয়। এতদসঙ্গে নিষেধ করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর নবুওয়াতকে যেন তারা গোপন না করে। কেননা তারা জানে তাঁর নবুওয়াত সত্য। এ সম্পর্কে বহু দলীল– প্রমাণ তাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন আমি ইতোঃপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এমনিভাবে তাদেরকে বহুবার ক্ষমা করা হয়েছে, সতর্ক করা হয়েছে, তাদের ও তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ সবই করা হয়েছে তাদের প্রতি বিশেষ মেহেরবানী প্রদর্শন এবং তাদের ওযর–অজুহাত চূড়ান্তরূপে দূর করার জন্য।

(٤٤) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۰

(৪৪) তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বোঝ না"?

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ–এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, তাফসীরকারগণ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ–এর মধ্যে কাদের সম্বোধন করা হয়েছে এ বিষয়ে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তবে بر শব্দের অর্থ মহান আল্লাহ্র আনুগত্য, এ বিষয় সবাই একমত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষকে নিষেধ কর, যেন তারা তোমাদের নবুওয়াত ও তাওরাতে বর্ণিত অংগীকার অস্বীকার না করে, অথচ তোমরা নিজেরা তা বর্জন করছ। তোমরা আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কিত তাওরাতের অংগীকার অস্বীকার করছ, আমার প্রতিশ্রুতি ভংগ করছ এবং জেনেশুনে আমার কিতাব প্রত্যাখ্যান করছ।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষকে মুহাম্মাদ (স)–এর দীনে দাখিল হতে, সালাত কায়েম করতে এবং অনুরূপ বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দিয়ে চলেছো, অথচ নিজেদেরকে ভুলে আছো।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ البر অর্থ করেছেন মহান আল্লাহ্র ইবাদত ও তাক্ওয়া।

হযরত সুদ্দী (র) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মানুষকে মহান আল্লাহ্র ইবাদত, আনুগত্য ও তাক্ওয়ার নির্দেশ দিত অথচ নিজেরা তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশ করতো।

হযরত কাতাদা (র) হতে এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইস্রাঈল মানুষকে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাক্ওয়া এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা করত তার বিপরীত। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এ আয়াতে লাঞ্ছিত করেছেন।

হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তাআলা আহলে কিতাব ও মুনাফিক সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, তোমরা সালাত ও সাওমের নির্দেশ দিয়ে চলেছো, কিন্তু নিজেরা তা পালন কর না, তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, তার উচিৎ সে কাজে সে সর্বাধিক যত্নবান হয়।

হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। এ আয়াতাংশে ইয়াহুদীদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের অভ্যাস ছিল, যখন কোন ব্যক্তি তাদেরকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, যা সত্য ছিল না। তারা এ ব্যাপারে কোন ঘুষ বা বিনিময় না দিলে, অসত্যকে সত্য বলে আদেশ দিত। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও ! অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তবে কি তোমরা বোঝ না ?

আবূ কিলাবা (র) হতে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত দীনের পরিপূর্ণ ফকীহ (বিজ্ঞ) হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ তাআলার জন্য মানুষের মনে অন্যায়ের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি করবে। তারপর যে নিজের দিকে লক্ষ্য করবে এবং উক্ত ঘৃণায় সে হবে সর্বাপেক্ষা কঠোরতর।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় যতগুলি মত উল্লেখ করলাম, সবগুলিই কাছাকাছি অর্থের। কেননা ইয়াহুদী ও মুনাফিকগণ যেই البر। (সৎকর্ম) সম্পর্কে অপরকে আদেশ দিত এবং নিজেরা তা থেকে বিরত থাকত, যে কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করেছেন, সেই البر।-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করলেও তারা এ ব্যাপারে একমত যে, ইয়াহুদী ও মুনাফিকগণ মানুষকে এমন কথা ও কাজের নির্দেশ দিত, যার মাঝে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত, কিন্তু নিজেরা করত তার বিপরীত। কাজেই আয়াতের বাহ্য পাঠ যে ব্যাখ্যার সমর্থন করে তা নিম্নরূপ, তোমরা কি মানুষকে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে তার অবাধ্যতায় ছেড়ে রেখেছ ? মহান প্রতিপালকের আনুগত্য করার যে নির্দেশ অপরকে দাও তা নিজেদেরকে কেন দাও না ? এতদ্বারা তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং তাদের নিকৃষ্টতম কর্মকাণ্ডের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এখানে বর্ণিত হয়েছে, তারা নিজেদেরকে বিস্মৃত হয়, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ "তারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে। ফলে আল্লাহ্‌ও তাদেরকে বিস্মৃত হয়েছে" (সূরা তওবা, ৬৭)। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য বর্জন করেছে। ফলে আল্লাহ্‌ও তাদেরকে ছওয়াব হতে বঞ্চিত রেখেছেন।

وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, تتلون অর্থ তোমরা অধ্যয়ন কর, পাঠ কর। ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথচ তোমরা তাওরাত কিতাব পাঠ কর।

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, أَفَلَا تَعْقِلُونَ অর্থ তোমরা কি উপলব্ধি করো না ও বোঝনা তোমাদের এ আচরণ কত জঘন্য যে, অপরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে নিজেরা নাফরমানী করছ এবং অপরকে নাফরমানী করতে নিষেধ করে নিজেরা তাতে লিপ্ত হচ্ছ ? অথচ তোমরা জান হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর অনুসরণ ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অধিকার ও আনুগত্য ততটুকু বর্তায় যতটুকু বর্তায় তোমরা যাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ তাদের উপর।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, أَفَلَا تَعْقِلُونَ অর্থ তোমরা কি বোঝ না ? আল্লাহ্ তাআলা এর দ্বারা তাদেরকে এই নিন্দনীয় চরিত্র হতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, এটা আমার পূর্বোক্ত বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করে যে, ইয়াহুদী ধর্মযাজকগণ অন্যদেরকে মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিত এবং তারা বলত, তিনি আমাদের প্রতি প্রেরিত হননি, বরং অন্যদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

(٤٥) وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ٠

(৪৫) তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রর্থনা কর এবং এটা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিত কঠিন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ অর্থ তোমরা তোমাদের কিতাবে আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা পালনের ব্যাপারে ধৈর্য ও সালাত দ্বারা আমার সাহায্য প্রার্থনা কর। তোমরা অংগীকার করেছিলে আনুগত্য করবে, আমার নির্দেশ পালন করবে, নেতৃত্বের আসক্তি ও দুনিয়াপ্রেম বর্জন করবে, আমার নির্দেশের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করবে যদিও তা তোমাদের অপসন্দ, আর আমার রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করবে।

কেউ বলেন, এ স্থলে সব্‌র অর্থ সাওম (রোযা)। আমাদের মতে সবরের অর্থ ব্যাপক। সাওম তার একটা অংশবিশেষ। আমাদের দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা বর্জন সংশ্লিষ্ট যা কিছুই মনের কাছে অপসন্দ, কষ্টকর, সেসব কিছুতেই তিনি ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সব্‌র-এর প্রকৃত অর্থ প্রবৃত্তিকে তার আসক্তি ও যথেচ্ছাচারিতা হতে বিরত রাখা। এজন্যই বিপদে ধৈর্য ধারণকারীকে সাবির বলা হয়। যেহেতু সে নিজেকে অস্থিরতা হতে বিরত রাখে। রমযান মাসকে বলা হয় সবরের মাস। রোযাদার দিনের বেলা পানাহার হতে নিজেকে বিরত রাখে। কোন ব্যক্তি কাউকে কোন কাজ থেকে আটকে রাখলে এবং তা করতে না দিলে সে ক্ষেত্রেও সব্‌র শব্দ প্রযুক্ত হয়। অনুরূপ কোন অপরাধীকে যদি হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাঁধা হয় এবং বাঁধা অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়, তবে সেখানেও এ শব্দের ব্যবহার আছে। বলা হয় قَتَلَ فُلَانٌ فُلَانًا صَبْرًا 'অমুক ব্যক্তি অমুককে বেঁধে হত্যা

করল'। নিহত ব্যক্তি মাস্‌বূর এবং হত্যাকারী সাবির।

সালাত শব্দের বিশ্লেষণ পূর্বেই করা হয়েছে। কেউ যদি বলে, অংগীকার রক্ষা ও ইবাদত-আনুগত্যে যত্নবান থাকার উপর ধৈর্যধারণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অর্থ তো জানলাম। এবারে প্রশ্ন, মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, তাঁর অবাধ্যতা ত্যাগ করা এবং নেতৃত্বের লালসা ও দুনিয়ার আসক্তি পরিহার করার ব্যাপারে সালাত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার অর্থ কি ? জওয়াবে বলা যায়, সালাত এমন একটি ইবাদত, যার মাঝে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করা হয়। কিতাবের আয়াত মানুষকে দুনিয়ার আসক্তি ও তার ভোগ-বিলাস ত্যাগের আহবান জানায়, মানবাত্মাকে দুনিয়ার রঙ-তামাসা, সৌন্দর্য ও তার প্রতারণা হতে সতর্ক করে দেয়, আখিরাত ও তার নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ হিসাবে সালাত মহান আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদেরকে ইবাদত ও আনুগত্যে অধিকতর মেহনতী ও যত্নবান হতে সাহায্য করে। তাই তো হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কোন সংকট উপস্থিত হওয়া মাত্রই তিনি সালাতের শরণাপন্ন হতেন।

হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمرٌ فَزِعَ اِلَى الصَّلٰوةِ "কোন বিষয় রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সংকটে ফেললে তিনি সালাতে লিপ্ত হতেন"।

হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, কোন বিষয় اِذَا حَزَبَهُ اَمرٌ صَلَّى বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে দেখতে পেলেন যে, তিনি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পেটে ব্যাথা। তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, ওঠ সালাতে রত হও। কেননা নামাযের মধ্যে সত্যিকারের শান্তি।

আল্লাহ্ তাআলা ইয়াহুদী ধর্মযাজকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অংগীকার পালনের জন্য সালাত ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে। অনুরূপ নির্দেশ তিনি তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-কেও দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- فَاصبِر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ غُرُوبِهَا وَمِن اٰنَائِ الَّيلِ فَسَبِّح وَاَطرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرضٰى। "হে মুহাম্মাদ ! তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার" (সূরা তোয়াহা-১৩০)।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি বিপদ-আপদে সবর ও সালাতের শরণাপন্ন হন।

আব্‌দুর রহ্‌মান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় সংবাদ আসলো তাঁর ভাই কুসাম (রা) শহীদ হয়েছেন। সাথে সাথে তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া

ইন্না ইলায়হি রাজিঊন' পাঠ করলেন এবং তারপর রাস্তার পাশে সওয়ারী বসিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুই রাকআত সালাতে তিনি বসে থাকলেন দীর্ঘক্ষণ। অতঃপর তিনি সওয়ারীর দিকে হেঁটে আসলেন। তখন তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল . وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ 'তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর এবং এটা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।'

আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় কার্য সাধনে সবর ও সালাত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর এবং জেনে রাখ যে, এ দুটোও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাত ও সবর আল্লাহ্‌র রহমত লাভে সহায়ক।

ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুশরিকরা বলেছিল, হে মুহাম্মাদ (স) ! তুমি আমাদেরকে বড় কঠিন বিষয়ের প্রতি আহ্‌বান করছ। অর্থাৎ সালাত ও আল্লাহে বিশ্বাস ছিল তাদের কাছে অতি কঠিন কাজ।

وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, انها-এর সর্বনাম দ্বারা সালাতকে বোঝান হয়েছে। কেউ বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আহ্‌বানে সাড়াদানকে বোঝান হয়েছে। পূর্বে স্পষ্টভাবে সাড়াদান (اجابة)-এর উল্লেখ নাই বিধায় ها-কে তার প্রতি ইঙ্গিত মনে করা হবে। বলাবাহুল্য, কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে প্রচ্ছন্ন অর্থ গ্রহণ বিধেয় নয়।

لكبيرة অর্থ কঠিন, দুরূহ। দাহহাক (র) হতে বর্ণিত। وَ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ অর্থ এটা নিশ্চিত কঠিন, তবে তাদের জন্য নয়, যারা বিনয়াবনতভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে, তাঁর শক্তিকে ভয় করে এবং তাঁর ওয়াদা ও সতর্কবাণী বিশ্বাস করে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ অর্থ আল্লাহ্ যা নাযিল করেন তাতে যারা বিশ্বাসী।

আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, الخاشعين অর্থ ভয়কারীগণ।

মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি الخاشعين শব্দের অর্থ করেন প্রকৃত বিশ্বাসীগণ। মুজাহিদ (র) হতে আল-মুছান্না (র)-এর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত যে, তিনি الخشوع ভয় করা, এ স্থলে আল্লাহ্‌র ভয়। এর প্রমাণে তিনি আয়াত পেশ করেন خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ "অপমান ভয়ে ভীত অবস্থায়" (আশ-শূরাঃ ৪৫)। অর্থাৎ যে ভয় তাদের মনে সঞ্চার হয়েছে তা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে এবং তাতে তারা প্রকম্পিত হয়েছে। বস্তুতঃ الخشوع-এর মূল অর্থ বিনয় প্রদর্শন, আনুগত্য দেখান, নত হওয়া। কবি বলেন,

لَمَّا أتى خَبرُ الزُّبَيرِ تَوَاصَفَت + سُوْرُ المَدِينَةِ وَ الجِبَالُ الخُشَّعُ

"যখন যুবায়রের (মৃত্যু) সংবাদ এল তখন (তাঁকে হারানোর মহা বিপদে) নগর প্রাচীর নুইয়ে পড়ল এবং পর্বতমালাও হল অবনত।"

এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে, হে আহলে কিতাব ধর্মযাজকগণ ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর, নিজেদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যে লাগিয়ে রাখা, তাঁর অবাধ্যতা হতে ফিরিয়ে রাখা ও সালাত কায়েম করার মাধ্যমে, যে সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজে বাধা দেয় এবং আল্লাহ্র পসন্দনীয় কাজের দিকে এগিয়ে নেয়। সালাত কায়েম কঠিন বটে, তবে তাদের জন্য নয়, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত, তাঁর আনুগত্যে অবনমিত ও তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত।

(٤٦) اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُم مُّلٰقُوا رَبِّهِم وَاَنَّهُم اِلَيهِ رَاجِعُونَ ·

(৪৬) তারাই বিনীত, যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাত ঘটবে এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।

اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ–এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, الظن শব্দের অর্থ সন্দেহ করা। যারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান তারা কাফির। কাজেই ইবাদত-আনুগত্যে যে বিনয়াবনত তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার এ কালামে পাকের কি করে এ অর্থ হতে পারে যে, সে তার সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে ?

উত্তরে বলা যায়, আরবগণ কখনও বিশ্বাসকেও الظن বলে। আবার কখনও সন্দেহকেও। যেমন তারা আলোকেও سدفة বলে, আবার অন্ধকারকেও سُدْفَة বলে। অনুরূপ সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্যদাতা উভয়কেই صارخ বলে। আরবী ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে যা পরস্পর বিরোধী দুই অর্থ প্রদান করে। বিশ্বাস অর্থেও যে الظن-এর ব্যবহার আছে তার প্রমাণে দুরাইদ ইব্নুস সিম্মা-এর নিম্নোক্ত শ্লোকটি পেশ করা যেতে পারে,

فَقُلتُ لَهُم ظَنُّوا بِالفَى مُدَجَّجٍ + سَرَاتُهُم فِي الفَارِسِيِّ المُسَرَّدِ

"আমি বললাম, তোমরা সশস্ত্র দুই হাজার সৈন্যের প্রতি বিশ্বাস রাখ (তারা তোমাদের কাছে আসবেই)। তারা সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী।" এখানে ظنوا মানে বিশ্বাস করো।

আমীরাহ্ ইব্ন তারিক বলেন ঃ

بِاَن تَغتَرُّوا قَومِي وَ اقعُدَ فِيكُم + وَ اجعَلَ مِنِّى الظَّنَّ غَيبًا مُرَجَّمًا

এখানেও الظن শব্দটি বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে বিশ্বাস অর্থে الظن-এর ব্যবহার হয়েছে।যতটুকু উল্লেখ করেছি সমঝদারের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্র

বাণীতেও এর উদাহরণ রয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে وَ رَاَى الْـمُجْـــرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُم مُوَاقِعُوْهَا "অপরাধীরা আগুন দেখামাত্র বিশ্বাস করবে যে, তারা তথায় পতিত হতে চলেছে" (সূরা কাহফ ঃ ৫৩)।

আমি যা বললাম, তাফসীরবিদ উলামা-ই কিরাম এরূপই বলেছেন।

আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন يَظُنُّونَ اَنَّهُم مُلاَقُوا رَبِّهِم আয়াতে الظن শব্দটি বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরআন মজীদে যত স্থানে ظن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সবই يقين বা দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থে। মুজাহিদ (র) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। কুরআন কারীমে যত স্থানে ظن আছে, সবগুলোর অর্থ জ্ঞান।

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত, اَلَّذِيْنَ يَظُنُّونَ اَنَّهُم مُلاقُوا رَبِّهِم আয়াতে يَظُنُّوْنَ অর্থ বিশ্বাস করে।

ইব্‌ন জুরায়জ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা নিশ্চিত জানে যে, তারা তাদের প্রতি-পালকের সাথে সাক্ষাত করবে। এর দৃষ্টান্ত হলো, اِنِّى ظَنَنْـتُ اَنِّى مُلاَقٍ حِسَابِيَه "আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে" (সূরা হাক্কা ঃ ২০)। এখানে الظَنّ 'জানা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি اَلَّذِيْـنَ يَظُنُّونَ اَنَّهُم مُلاَقُوا رَبِّهِم আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এখানে ظَنّ অর্থ সন্দেহ নয়, বরং বিশ্বাস। তিনি প্রমাণস্বরূপ اِنِّى ظَنَنْـتُ اَنِّى مُلاَقٍ حِسَابِيَه আয়াতটি পাঠ করেন।

اَنَّهُم مُلاَقُوا رَبِّهِم-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, ملاقوا ربهم মূলে ছিল ملاقون ربهم অতপর ملاقون-কে رب-এর দিকে সম্পর্কিত করে 'ن'-কে লোপ করা হয়েছে। কেউ বলতে পারে, আরবী ভাষার নিয়ম হচ্ছে, ক্রিয়াপদ হতে গঠিত বিশেষ্য পদ যদি অতীত কালের অর্থ দেয়, তবেই তাকে পরবর্তী শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত (اضافت) করে 'নূন' লোপ করা হয়। পক্ষান্তরে যদি সে বিশেষ্য পদ বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের অর্থে হয়, তাহলে اضافت না করে 'ن' বহাল রাখাই বিধেয়। আমরা জেনেছি, আলোচ্য আয়াতে ملاقوا শব্দটি অতীত নয় ; বরং ভবিষ্যত কালের অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে (يلقون ربهم)। সে হিসাবে এখানে اضافت না করে 'ن' বহাল রাখা উচিত ছিল। তথাপি এখানে কি করে اضافت করে বলা হল ملاقوا ربهم ?

উত্তরে বলা হবে, فعل - يفعل (ক্রিয়া) হতে গঠিত বিশেষ্য পদ যখন বর্তমান ও ভবিষ্যত (يفعل لفاعل) অর্থবোধক হয়, তখন তাকে اضافت করা বৈধ। এ ব্যাপারে আরবী ভাষাবিদদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কাজেই প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন অহেতুক। হাঁ এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে একাধিক মত আছে যে, এ স্থলে কি কারণে اضافت করা হয়েছে এবং 'ن'-কে লোপ করা হয়েছে ?

ব্যাকরণবিদগণ বলেন, مُلَاقُوا رَبِّهِم এবং অনুরূপ যে সকল ক্রিয়া শব্দগতভাবে বিশেষ্য (اسم), কিন্তু অর্থ বর্তমান বা ভবিষ্যত ক্রিয়ার, তাতে উচ্চারণগত জটিলতাই 'ن'-কে লোপ করার কারণ। আলোচ্য আয়াতের ন্যায় كُلُّ نَفسٍ ذَائِقَةُ الـموت (প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে)-এর মাঝেও তাই হয়েছে। অনুরূপ اِنَّا مُرسِلُوا النَّاقَةِ فِتـنَةً لَّهُم (আমি তাদের কাছে উটনী পাঠাব, তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ) আয়াতেও উচ্চারণগত জটিলতার কারণে مرسلُوا-এর 'ن' লোপ করা হয়েছে, অথচ مرسلوا অতীত নয় ; বরং ভবিষ্যত ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত । এমনিভাবে কবি বলেন,

هَل اَنتَ بَاعِثُ دِينَارٍ لِحَاجَتِنَا + اَو عَبدَ رَبِّ اَخَاعَونِ بنِ مِخرَاقِ

"তুমি কি আমাদের প্রয়োজনে দীনার পাঠাবে, না তোমার গোলাম আওন ইব্‌ন মিখরাকের ভাইকে?"

এখানে কবি باعث শব্দকে دينار -এর দিকে اضافت করেছেন, অথচ باعث অর্থ (يبعث) পাঠাবে, এখনও পাঠায়নি। دينار শব্দটি যেরযুক্ত হলেও যেহেতু نصب -এর স্থানে অবস্থিত তাই عبد رب -কে তার প্রতি عطف করে نصب দিয়েছেন।

অন্য কবি বলেন,

اَلحَافِظُو عَورَةَ العَشِيرَةِ لَا + يَاتِيهِم مِن وَّرَائِهِم نَطَفُ

" তারা তাদের গোত্রীয় মর্যাদা রক্ষা করে। তাদের মাঝে ভিন্ বীর্যের অনুপ্রবেশ ঘটে না।"

এখানে عورة শব্দে نصب -ও হতে পারে এবং যেরও হতে পারে। যের হবে اضافت হিসাবে এবং نصب হবে উচ্চারণগত জটিলতার কারণে ن -কে লোপ করে। আর এটাই উদ্দেশ্য। এ হলো বসরার ব্যাকরণবিদদের কথা।

কুফাবাসী ব্যাকরণবিদগণ বলেন, ملاقوا শব্দটি ভবিষ্যত ক্রিয়া (يلقون) অর্থে হওয়া সত্ত্বেও اضافت বৈধ। শব্দগতভাবে এটা বিশেষ্য হওয়ায় প্রকৃত বিশেষ্যের اضافت সংক্রান্ত নিয়ম এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং সে কারণেই এর ن -কে লোপ করা হয়েছে। এর মত আরও যত বিশেষ্য আছে সেগুলোরও এই একই বিধান। কুফার ব্যাকরণবিদগণ আরও বলেন, এরূপ স্থলে কোথাও যদি اضافت বর্জন করতঃ ن বহাল রাখা হয়, তবে তার কারণ এই যে, শব্দটির মাঝে يفعل অর্থাৎ এমন ক্রিয়ার অর্থ রয়েছে, যা এখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হওয়া অনিবার্য নয়। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে اضافت করা হয় শব্দের ভিত্তিতে এবং اضافت বর্জন করা হয় অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে।

এবারে আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, তোমরা আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই সালাত কঠিন কাজ, তবে তাদের জন্য নয় যারা আমার শাস্তিকে ভয় পায়, আমার নির্দেশের সম্মুখে বিনয়াবনত হয় এবং মৃত্যুর পর আমার কাছে প্রত্যাবর্তন ও আমার সাথে সাক্ষাত হওয়ার বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ্ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা উল্লিখিত গুণের

অধিকারী নয়, তাদের জন্য সালাত খুবই কঠিন। কেননা যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাসী নয়, মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তন স্বীকার করে না, ছওয়াব ও শাস্তি বলে কিছু মানে না, তার কাছে সালাত অনর্থক কাজ ও পণ্ডশ্রম। কারণ সে এর দ্বারা কোন উপকার লাভ বা অপকার খণ্ডনের আশা করে না। এই যার অবস্থা সালাত তার জন্য কঠিন ও বোঝা বৈ কি।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী, সালাত কায়েম দ্বারা তারা পুরস্কারের আশাবাদী, অনাদায়ে কঠিন শাস্তির ভয়ে কম্পমান, সেই মুমিনদের পক্ষে সালাত সহজ বিষয়। কেননা তারা সালাত কায়েম করে পরলোকে মহান আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত অধিক পুরস্কার লাভের আশা রাখে এবং কায়েম না করলে তথাকার শাস্তির ভয় করে। কাজেই বনী ইস্‌রাঈলের ধর্মযাজকগণকে (এ আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে) আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যদি আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তন এবং কিয়ামতে তার সাথে সাক্ষাত করার বিশ্বাস রাখে, তবে যেন সওয়াবের আশাবাদী হয়ে সালাত আদায়ে যত্নবান থাকে।

وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, اَنَّهُمْ-এর সর্বনাম দ্বারা اَلْخَاشِعِيْنَ (বিনীতগণ)-কে এবং اليه-এর সর্বনাম দ্বারা مُلَاقُوْا رَبِّهِمْ-এর رب (প্রতিপালক)-কে বোঝান হয়েছে। বাক্যটির ব্যাখ্যা এরূপ, সালাত নিশ্চিতভাবে কঠিন। তবে সেই বিনীতদের জন্য নয় যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। راجعون দ্বারা কোন্ প্রত্যাবর্তন বোঝান হয়েছে সে নিয়ে তাফসীরবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আর তারা বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের দিন তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তারা মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তবে আবুল আলিয়া (র) প্রদত্ত ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্টতর। কেননা আল্লাহ্ তাআলা এর পূর্বের এক আয়াতে ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা কিরূপে আমাকে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন, পরিণামে তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে" (বাকারা ঃ ২৮)। এখানে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে মৃত্যুর পর পুনরায় উত্থিত ও জীবিত হওয়ার পরই আল্লাহ্‌র কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা কিয়ামতের দিবসেই ঘটবে। সুতরাং وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-এর ব্যাখ্যাও অনুরূপই হবে।

(٤٧) يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۔

(৪৭) হে বনী ইস্‌রাঈল ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগ্রহীত করেছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

يٰبَنِى اِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِى اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ –এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্বেকার اُذْكُرُوْا نِعْـمَتِىَ الَّتِى اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْـدِى (সূরা বাকারাঃ ৪০) আয়াতের ব্যাখ্যার অনুরূপ। সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা দান করেছি।

وَاَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ –এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এটাও বনী ইস্‌রাঈলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার এক অনুগ্রহের উল্লেখ যা আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।' আমি তোমাদেরকে বিশ্বের সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম' –এর অর্থ তোমাদের পূর্বপুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পূর্বপুরুষদের প্রতি নিআমত ও অনুগ্রহকে তাদের প্রতি অনুগ্রহ বলে বোঝানো হয়েছে। কেননা পূর্বপুরুষদের গৌরব বংশধরদেরও গৌরব। বাপ–দাদার সম্মান সন্তানদেরও সম্মান।বাপ–দাদা হতেই তো সন্তানদের উৎপত্তি। وَاَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাআলা তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে ব্যাপকভাবে বিশ্বের সকলের উপরে বলে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য বিশেষ মানবগোষ্ঠী। কেননা এর অর্থ, তোমরা যে যুগের মানুষ সে যুগের সকলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

হযরত কাতাদা (র) وَاَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সমকালীন বিশ্বের সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। হযরত আবুল আলিয়া (র) وَاَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ। –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা বনী ইস্‌রাঈলকে যে রাজত্ব, রাসূলবর্গ ও কিতাবসমূহ দান করেছিলেন, তদ্বারা তাদেরকে সমকালীন বিশ্বের সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে–ছিলেন। প্রত্যেক যুগেরই একটা বিশ্ব আছে।

হযরত মুজাহিদ (র) وَاَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা যে যুগে ছিল সে যুগের সবার উপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। অপর এক সূত্রেও মুজাহিদ (র)–এর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

য়ূনুস ইব্‌ন আব্‌দিল আলা (র.)–এর সূত্রে ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন যায়দ (র)–কে وَاَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, বিশ্বের সবার উপরে মানে সমকালীন বিশ্বের সবার উপরে।যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَلَقَدِ اخْتَرْنَا هُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ "আমি জেনেশুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম" (সূরা দুখানঃ ৩২)। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বে। ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, এ শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তাঁদেরকেই দিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর আনুগত্য করেছিল ও তাঁর নির্দেশ পালন করেছিল। তাদের মধ্যে একদল অবাধ্যতা করে বানরও হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর কাছে তারা ছিল সর্বনিকৃষ্ট জীব।পক্ষান্তরে তিনি বর্তমান উম্মত সম্পর্কে বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّـةٍ

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ("তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব– জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে", আল ইমরানঃ ১১০)। বলা বাহুল্য, এও তাদেরই জন্য প্রযোজ্য যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর নির্দেশ পালন করে এবং তাঁর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ পরিহার করে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, য়াহূদী জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বদানের অর্থ যে ব্যাপকভাবে সমগ্র মানুষের উপর নয়, বরং বিশেষভাবে তৎকালীন বিশ্বের সকলের উপর, হাদীছেও এর প্রমাণ মেলে।

বাহ্য ইব্ন হাকীম (র) হতে বর্ণিত। তাঁর দাদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)–কে বলতে শুনেছিঃ أَلاَ إِنَّكُمْ وَفَّيْتُمْ سَبْعِينَ أُمَّةً শোন, তোমরা সত্তরটি উম্মত পূর্ণ করলে। য়াকূব (র)–এর বর্ণনায় এ বাক্যটিও সংযোজিত হয়েছে أَنْتُمْ اخِرُهَا (তোমরাই সর্বশেষ উম্মত।) আর হাসান বসরী (র)–এর বর্ণনায় আছে أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَاَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ (তোমরাই আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমাদৃত উম্মত)। রাসূলে আকরাম (স)–এর এ হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় যে, বনী ইস্রাঈল উম্মতে মুহাম্মাদী (স) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না।

আর أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ এবং فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ –এর অর্থ ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

(٤٨) وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ شَفَاعَةٌ وَّلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ۰

(৪৮) তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না এবং কারও সুপারিশ গৃহীত হবে না এবং কারও নিকট হতে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا –এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) আয়াতাংশটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ অত্র আয়াতাংশে فِيهِ শব্দ উহ্য আছে। যেমন নিম্নের কবিতায় উহ্য আছে।

قَدْ صَبَّحَتْ صَبَّحَهَا السَّلاَمُ + بِكَبِدٍ خَالَطَهَا سَنَامُ + فِى سَاعَةٍ يُحِبُّهَا الطَّعَامُ

"আমি তাকে সকাল বেলায় আন্তরিক সালাম জানালাম এবং কলিজা ও কুঁজের গোশ্ত দিয়ে নাস্তা পরিবেশন করলাম, এমন সময় যখন খাবার তার একান্ত কাম্য ছিল" এখানে يحبها মূলে ছিল يحب فيها আয়াতে اليوم (দিন)–এর প্রত্যাবর্তিত ها সর্বনাম আবশ্যিক, যেহেতু একে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করবে, যা কোন কাজে আসবে না, যেমন وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسٌ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে। বাকি যেহেতু উক্ত সর্বনামটি বাক্যের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা বোঝা যায় তাই তাকে উহ্য রাখা হয়েছে।

আরবী ভাষাবিদদের অনেকে মনে করেন যে, এখানে উহ্য সর্বনাম هَا ছাড়া আর কিছুই হতে পারে

না। আবার অন্যদের মতে শুধু فيه হতে পারে, অন্য কিছু নয় । ইতোঃপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে, বাক্যের শব্দাবলী দ্বার যা এমনিতেই বুঝে আসে, তা সবই উহ্য রাখা বৈধ।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে কিয়ামতের শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দেন যে, তা এমন দিনে, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না, পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। لاَ تَجـزِى মানে لاَ تُغنِى অর্থাৎ কাজে আসবে না, উপকার দেবে না।

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَاتَّقُوا يَومًا لاَّ تَجـزِى نَفسٌ -এর لاَ تَجزِى অর্থ করেন لا تغنى কোন কাজে আসবে না।

শব্দটি الجزاء হতে উৎপন্ন, যার প্রকৃত অর্থ পরিশোধ করা, বিনিময় দেওয়া। বলা হয় جزيته قرضه ودينه اجزيه جزاء 'আমি তার ঋণ শোধ করেছি' এখান থেকেই বলা হয় جَزَى اللّٰهُ فُلاَنًا عَنِّى خَيـرًا أَوشَرًا 'আল্লাহ্ তাআলা আমার পক্ষ হতে অমুককে উত্তম বা নিকৃষ্ট বদলা দিন।' অর্থাৎ তার পক্ষ হতে আমার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তার বিনিময় দিন।

আরবী ভাষাবিদদের অনেকে বলেন, কেউ কাউকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করলে বলে থাকে أَجزَيتُ عَنهُ كَذَا 'আমি তাকে অমুক ব্যাপারে সাহায্য করেছি।' আর কারও পক্ষ থেকে বদলা দিলে বলে থাকে جَزَيتُ عَنكَ فُلاَنًا 'আমি তোমার পক্ষ হতে অমুককে বদলা দিয়েছি। কেউ বলেন جَزَيتُ عَنكَ মানে তোমার পক্ষ থেকে শোধ করেছি এবং اجزيت মানে তোমার পক্ষ হতে বদলা দিয়েছি।

অন্যান্যগণ বলেন, اجزيت ও جـزيت উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত। বলা হয় جُزَتُ عَـنكَ شَاةٌ وَ أَجزَتُ 'তোমার পক্ষ হতে একটি বকরী আদায় করেছি। অনুরূপ جُزَى عَنكَ دِرهَمٌ وَأَجـزَى 'তোমার পক্ষ হতে এক দিরহাম শোধ করা হয়েছে'। এমনিভাবে لاَ تُجـزَى عَنكَ شَاةٌ وَلاَ تُجـزى 'তোমার পক্ষ হতে একটি বকরী আদায় করা হবে না (এর সবগুলোতেই বাবে ضرب ও বাবে افعال হতে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।তবে ভাষাবিদগণ একথাও বলেছেন যে, جـزت عنك - لا تجـزى عنك হতে হিজাযবাসীদের ভাষা এবং اجـزأ - تجـزئ অন্যদের ভাষা। তাঁরা বলেন, আরব গোত্রসমূহের মধ্যে শুধু তামীম গোত্রই اجزأ - تجزئ ব্যবহার করে থাকে।

অন্যান্যগণ বলেন যে, جزى অর্থ পরিশোধ করা এবং اجزأ অর্থ বদলা দেওয়া। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা ভয় কর সে দিনের যেদিন কেউ কারও পক্ষ হতে কিছু শোধ করতে পারবে না এবং কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, এর মানে? উত্তরে বলব, দুনিয়ার জীবনে সন্তান পিতার পক্ষ হতে, বা পিতা সন্তানের পক্ষ হতে, অনুরূপ এক বন্ধু ও আত্মীয় অপর বন্ধু ও আত্মীয়ের পক্ষ হতে ঋণ শোধ করে থাকে। কিন্তু আখিরাতের জীবনে এরূপ হবার নয়। সেদিন

সম্পর্কে আমরা হাদীসের বাণী দ্বারা জানতে পাই যে, মানুষ তার সন্তান বা পিতার কাছে তার হক প্রমাণ করতে চাইবে। কেননা কিয়ামতের দিন অপরের হক আদায় হবে পাপ–পুণ্য দ্বারা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি দয়া করুন, যার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার জুলুম আছে, মান–সম্মানের ব্যাপারে, অথবা আবূ বাক্র (রা)–এর বর্ণনা অনুসারে–অর্থ–সম্পদ বা মর্যাদার ব্যাপারে (যা তার ভাই তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল)। তার ভাই তা ফেরত গ্রহণের পূর্বেই সে তা আত্মসাৎ করেছে। আখিরাতে তো দিরহাম দীনার অচল। কাজেই তার যদি কোন পুণ্য থাকে তবে পাওনাদাররা তা নিয়ে নেবে। আর যদি তার কোন পুণ্য না থাকে তবে তারা তাদের গুনাহর বোঝা তার উপর চাপাবে।

অপর এক সূত্রেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সাবধান! তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরের ঋণের বোঝা নিয়ে ইন্তিকাল না করে। কেননা সেখানে দিরহাম ও দীনার নেই, সেখানে পাপ–পুণ্য বন্টন করা হবে।একথা বলার সময় হযরত (স) তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা ডানে বামে ইঙ্গিত করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্হাক (র)–এর সূত্রে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, একথাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا অর্থাৎ একজনের কাছে অন্যের কোন পাওনা থাকলে তৃতীয় কেউ তা শোধ করে দিতে পারবে না। কেননা তথায় ঋণ শোধ হবে পাপ–পুণ্য হতে। আর কি করেই বা সেদিন একজন অন্যজনের ঋণ শোধ করে দেবে, যেখানে তার নিজেরই ইচ্ছা হবে যদি তার সন্তান বা তার পিতার কাছে তার কোন হক প্রমাণ হত, তাহলে তা উসুল করে নিত, তাকে ক্ষমা করত না?

বসরা কেন্দ্রিক কিছু ব্যাকরণবিদ বলেন, لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا অর্থ, কেউ কারও বদল হতে পারবে না।কিন্তু আয়াতের গঠনপ্রণালী এ অর্থের ভ্রান্তিই প্রমাণ করে। কেননা আরবী ভাষায় কেউ 'তুমি আমার বদল হতে পারবে' অর্থে مَا أَغْنَيْتَ عَنِّي شَيْئًا বাক্য ব্যবহার করে না। বরং কোন বস্তু সম্পর্কে যদি এ কথা জানান উদ্দেশ্য হয় যে, এ বস্তুটি ওই বস্তুর বদল হতে পারে না তখন তারা বলে, لَا يَجْزِي هٰذَا مِن هٰذَا এরূপ ক্ষেত্রে لَا يَجْزِي هٰذَا مِن هٰذَا شَيْئًا–এর ব্যবহারকে তারা কখনই বৈধ বলে না। কাজেই لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا –এর ব্যাখ্যা যদি তাই হত যা উক্ত ব্যাকরণবিদগণ বলেছেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করতেন, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ যেমন বলা হয়ে থাকে لَا تَجْزِي نَفْسٌ مِّنْ نَفْسٍ অর্থাৎ শেষের শব্দ শামিল হত না। কুরআন মজীদে আয়াতাংশের এরূপ ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আয়াতের আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি তাই সঠিক এবং কথিত ব্যাকরণবিদগণের ব্যাখ্যা ঠিক না।

وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ –এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, الشفاعة শব্দটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বলা হয়ে থাকে যে, شَفَعَ لِى فُلاَنٌ اِلَى فُلاَنٍ شَفَاعَةً (অমুকে আমার প্রয়োজন সমাধার জন্য অমুকের কাছে বিশেষভাবে সুপারিশ করল)। সুপারিশকারীকে شافع – شفيع বলার কারণ, সে সুপারিশপ্রার্থীর সাথে তার প্রয়োজনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। যেন সে তার জোড় ও অংশীদার হয়ে যায়, তাকে সুপারিশ ধরার আগে প্রার্থী তার প্রয়োজনের ব্যাপারে একা ছিল। এখন সে আর একা নয়। সুপারিশকারী তার شفيع অর্থাৎ দোসর হয়ে গেছে (উল্লেখ্য شفيع অর্থ অংশীদার, দোসর) এবং তার প্রার্থনা হয়ে গেছে 'শাফাআত' বা অংশ। জমি বা বাড়ীর পার্শ্ববর্তী মালিককেও এ কারণেই شفيع বলা হয়, যেহেতু বিক্রেতা তার দ্বারা জোড়ায় পরিণত হয়।

কাজেই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও পক্ষ হতে দেনা শোধ করতে পারবে না, সে দেনা মহান আল্লাহর হোক বা অন্য কারও এবং সে দেনার ব্যাপারে কোন সুপারিশকারীর সুপারিশও কবূল করা হবে না। যে দেনা সে নিজ ঘাড়ে চাপিয়েছে তা তার ঘাড়েই চাপা থাকবে।

বলা হয়ে থাকে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদী, তারা বলত, "আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়ভাজন এবং আমরা তাঁর নবীদের বংশধর আমাদের পিতৃপুরুষগণ আমাদের জন্য তাঁর কাছে সুপারিশ করবে।" আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন কেউ কারও কোন উপকারে আসবে না এবং কারও জন্য সেদিন কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। প্রত্যেকের থেকে হকদারের হক আদায় করে নেওয়া হবে।

হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন শিংবিহীন জীব শিংবিশিষ্ট জীব হতে কিসাস গ্রহণ করবে। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِيْنَ .

"এবং কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৭)।

কাজেই আল্লাহ তাআলা ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের হতাশ করে দিলেন যে, জেনেশুনে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর আনীত কিতাবের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও পূর্বপুরুষ ও অন্যান্যদের সুপারিশে তারা মহান আল্লাহর আযাব হতে মুক্তি পেয়ে যাবে বলে যে আশা হৃদয়ে পোষণ করে, তা দুরাশা মাত্র। নিস্কৃতি পাওয়ার একই পথ। তা হলো কুফ্র হতে মহান আল্লাহর

কাছে তওবা করা এবং ভ্রষ্টতার পথ পরিহার করে মহান আল্লাহর পথ গ্রহণ করা। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ইয়াহূদীদের পথ অবলম্বন করে, এ আয়াতে তাদের জন্য হিদায়াতের আলো রয়েছে। যাতে কেউ ধর্মত্যাগী হয়ে মহান আল্লাহর রহমতের আশা না করে।

পাঠ হিসাবে যদিও আয়াতের অর্থ ব্যাপক (বুঝা যায় যে, কারও কোন সুপারিশ গৃহীত হবে না), কিন্তু দলীল-প্রমাণদৃষ্টে এর উদ্দেশ্য বিশেষ গন্ডিভুক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস সুবিদিত যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, شَفَاعَتِي لأهل الكبائر من أُمَّتِي "আমার উম্মতের মধ্যে যারা মহাপাপী তাদেরই জন্য আমার শাফাআত''। তিনি আরও ইরশাদ করেন,

لَيسَ مِن نَبِيٍّ الاَّ وَقَد أُعطِيَ دَعوَةً وَاِنِّي اختَبَاتُ دَعوَتِي شَفَاعَـةً لأُمَّتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ ان شَاءَ اللّٰهُ مِنهُم مَّن لاَ يُشرِكُ بِاللّٰهِ شَيئًا ۔

"প্রত্যেক নবীকেই একটি বিশেষ দুআ দেওয়া হয়েছে।আমি আমার দুআ আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য লুকিয়ে রেখেছি। আল্লাহ চাহে তো আমার সে সকল উম্মত তা লাভ করবে, যারা মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না"।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুপারিশক্রমে আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের বহু অপরাধ মার্জনা করবেন এবং শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেবেন। কাজেই وَلاَ يُقبَلُ مِنهَا شَفَاعَةٌ-এর মর্ম হলো, যে সকল লোক কাফির অবস্থায় মারা যায় এবং তওবা ব্যতীতই দুনিয়া হতে বিদায় নেয়, তাদের পক্ষে কোন সুপারিশ গৃহীত হবে না। বস্তুতঃ শাফাআত, শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করার জায়গা এটা নয়। এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে ইনশা আল্লাহ্।

وَلاَ يُؤخَذُ مِنهَا عَدلٌ -এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আরবী ভাষায় العدل। শব্দটি ع-এ যবর দিয়ে পঠিত হয়, অর্থ ক্ষতিপূরণ। আবুল আলিয়া (র) وَ لاَ يُؤخَذُ مِنهَا عَدلٌ-এর অর্থ করেন, ক্ষতিপূরণ।

হযরত সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَلاَ يُؤخَذُ مِنهَا عَدلٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যার দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।যেমন বলা হয়েছে, যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারও নিকট হতে সমগ্র পৃথিবীর সমান স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও তাদের তরফ থেকে কবূল করা হবে না।

হযরত কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَلاَ يُؤخَذُ مِنهَا عَدلٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি সে পৃথিবীর সব কিছুও হাযির করে তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতে عدل অর্থ বদল, ক্ষতিপূরণ।

হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত, তিনি وَلاَ يُؤخَذُ مِنهَا عَدلٌ -এর ব্যাখ্যা করেন, যদি কারও

পৃথিবীর সমান স্বর্ণ থাকে এবং তা সবই ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করে তবুও তা গৃহীত হবে না।

সিরিয়াবাসী উমায়্যা গোত্রীয় এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হে রাসূল ! العدل কি ? তিনি ইরশাদ করেন, الفدية অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ।

কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ বা বদলকে عدل বলার কারণ, সে বদল মূল্যের বরাবর হয়ে থাকে (আর عدل-এর প্রকৃত অর্থও বরাবর)। বদল হিসেবে প্রদত্ত বস্তু অন্য জাতীয় হলে তাকে মূল্য ও বিনিময় হিসেবে العدل বলা হয়, গঠন ও আকৃতিগতভাবে নয়।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন وَاِن تَعدِل كُلَّ عَدلٍ لاَ يُؤخَذ مِنهَا "এবং সে বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না" (সূরা আনআম-৭০)। বলা হয়ে থাকে, هذا عَدلُهُ وَ عَدِيلُهُ এটি ঐ বস্তুর বিনিময়।

اَلعِدلُ-এর ع যেরযুক্ত হলে তখন তা الحمل-এর অনুরূপ অর্থাৎ বোঝা, যা পিঠে বহন করা হয়। عِنـدِى غُلام عِدلُ غُلامِكَ "আমার নিকট তোমার গোলামের ওজনের (সমতুল্য) গোলাম আছে।" অনুরূপ عِنـدِى شَاة عِدلُ شَاتِكَ "আমার কাছে তোমার বকরীর সমতুল্য বকরী আছে।" এটা তখনই বলা হয়, যখন এক বকরী এবং এক গোলাম অন্য গোলামের বরাবর হয়। মোদ্দাকথা এক জাতীয় দুইটি বস্তুর একটি অন্যটির বরাবর হলে তখন এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে বদল যদি একই জাতীয় না হয়, বরং মূল্য হিসাবে অন্য জাতীয় বস্তু মূল্যের বরাবর হয়, তখন العدل-এর ع যবরযুক্ত হয়। বলা হয়, عِندِى عَدلُ شَاتِكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ আমার নিকট তোমার বকরীর মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ আছে।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, العَدلُ-এর অর্থ যদি 'ক্ষতিপূরণ' হয় তখন তার ع -এ যবর হয়, যেহেতু বিনিময় হিসাবে তা মূল্যের বরাবর হয়। তাদের এ মতপার্থক্য মূলতঃ উভয় عدل-এর অর্থগত নৈকট্যের কারণে। বাকি যে عدل-এর বহুবচন الاعدال-তার ع যেরযুক্ত শ্রুত নয়।

وَلاَ هُم يُنصَرُونَ-এর ব্যাখ্যা

অর্থাৎ সেদিন যেমন তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী সুপারিশ করবে না এবং তাদের পক্ষে হতে কোন ক্ষতিপূরণ ও বিনিময় গৃহীত হবে না, তেমনি কেউ তাদের সাহায্যও করবে না। সর্বপ্রকার ভালবাসার বন্ধন সেদিন ছিন্ন হয়ে যাবে। উৎকোচ ও সুপারিশের কোন ব্যবস্থা থাকবে না। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা রহিত হয়ে যাবে। মহাপ্রতাপশালী বিচারকের একচ্ছত্র ফয়সালাই সেদিন কার্যকর হবে, যাঁর কাছে সুপারিশকারী ও সাহায্যকারীগণ কাজে আসে না। তিনি অন্যায়-অপরাধের তুল্য পরিণাম দেবেন। ন্যায়ের সুফল দান করবেন দশগুণ। ইরশাদ হচ্ছে - وَقِفُوهُم اِنَّهُم مَسئُولُونَ مَالَكُم لاَتَنَاصَرُونَ بَل هُمُ اليَومَ مُستَسلِمُونَ -"তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না ? বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে" (সূরা সাফ্‌ফাত-২৪-২৫-২৬)।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে لَا تَنَاصَرُوْنَ -এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা একে অপরকে অন্যায় ও অপরাধ হতে বিরত রাখছ না কেন ? আজ আর তোমাদের সেই ক্ষমতা নাই।

কেউ কেউ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ -এর অর্থ করেছেন যে, সেদিন মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না যে, যখন আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন তখন তারা মহান আল্লাহর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। কেউ এর অর্থ করেছেন যে, কোন প্রকার অনুরোধ, সুপারিশ ও বিনিময় দ্বারা তারা সাহায্য লাভ কতে পারবে না।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন এমন এক দিন যেদিন শাস্তিযোগ্য কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ দিয়ে রেহাই পাবে না, যেদিন কোন সুপারিশ নাই, নাই কোন সাহায্যকারী। দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য এসব কিছুই ছিল। কাজেই জানিয়ে দেওয়া হলো যে, কিয়ামতের দিন এগুলোর কোন অস্তিত্ব থাকবে না এবং তাদের জন্য এসবের কোন সুযোগও থাকবে না।

(٤٩) وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۔

"স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা ছিল।"

وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ -এর ব্যাখ্যা

পূর্বের يَا بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ -এর সাথে এর সংযোগ। যেন বলা হল, হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং স্মরণ কর সেই অনুগ্রহকেও যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম।

آل فرعون বলতে ফিরআওনের স্বধর্মীয়, স্বগোত্রীয় এবং তার দলের লোকদের বোঝান হয়েছে। آل শব্দটি মূলে ছিল اهل। তার পর 'ه'-কে হামযার (ا) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হলো, ماء মূলত ماه ছিল। পরে 'ه'- কে হাম্‌যায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাসগীর করলে এর হামযাকে তার আসল অবস্থায় নিয়ে مويه বলা হয়ে থাকে। অনুরূপ آل-কেও তাস্‌গীর করলে أهيل বলা হয়। আরবদের থেকে শুনে آل-এর তাস্‌গীর اويل -ও বর্ণিত হয়েছে। কখনও বলা হয় فُلَانٌ مِّنْ اٰلِ النِّسَاءِ বোঝান হয়, সে মেয়েলী চরিত্রের। আবার এ অর্থও হয় যে, সে নারীসঙ্গ প্রত্যাশী, তাদের প্রতি আসক্ত। কবি বলেন,

فَاِنَّكَ مِنْ اٰلِ النِّسَاءِ وَاِنَّمَا + يَكُنَّ لِاَدْنٰى لَا وِصَالَ لِغَائِبِ

"তুমি নারী কামনা কর, অথচ তারা ওদেরই হয় যারা তাদের সন্নিকট। যে দূরে সে নারীসঙ্গ পায় না।"

ال শব্দটি ব্যবহারের সর্বোত্তম স্থান হলো প্রসিদ্ধ নাম। যেমন আলু মুহাম্মাদ, আলু আলী, আলু আব্বাস, আল-আকীল। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বা কোন স্থানের নাম ইত্যাদির সাথে এর ব্যবহার পসন্দনীয় নয়, যেমন رَئَيتُ آلَ الرَّجُلِ (আমি লোকটির আল-কে দেখেছি) رَانِى آلُ المَرءَةِ (লোকটির আল আমাকে দেখেছে) لَا رَئَيتُ آلَ البَصـرَةِ وَآلَ الكُوفَةِ (আমি বসরা ও কূফার আল (অধিবাসী]-কে দেখিনি)। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, কোন কোন আরবকে বলতে শোনা গেছে رَئَيتُ آلَ مَكَّةَ وَآلَ المَدِينَةِ (আমি মক্কা ও মদীনার আল-কে দেখেছি)। তবে তাদের ভাষায় তা সুবিদিত ব্যবহার নয়।

ফিরআওন মিসরের আমালিকা বংশীয় রাজাদের উপাধি, যেমন রোমান সম্রাটদের উপাধি কায়সার, কারও হিরাক্ল, পারসিক সম্রাটদের উপাধি আকাসিরা একবচনে কিসরা এবং ইয়ামানী সম্রাটদের তাবাবিআ, একবচনে তুব্বা।

হযরত মূসা (আ)-এর সময়কার ফিরআওন, যার কবল থেকে আল্লাহ্ তাআলা বনী ইস্রাঈলকে মুক্তি দেন, তার নাম আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুস্আব ইব্ন রাইয়ান। মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্হাক (র) হতে এরূপই বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নাম ছিল আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুস্আব ইব্ন রায়্যান।

প্রশ্ন হতে পারে, আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা না ফিরআওনকে পেয়েছে, না তার কবল হতে নিস্কৃতি লাভকারীদের দেখেছে, তথাপি কি করে বলা হল যে, আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম?

উত্তরে বলা যায়, এটা বৈধ হয়েছে, যেহেতু তারা নিস্কৃতি লাভকারীদের বংশধর, তাদেরই সম্প্রদায়। পূর্বপুরুষদের প্রতি অনুগ্রহকে তাদেরই প্রতি অনুগ্রহ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেদিন পূর্বপুরুষদের কুফ্রকে তাদের কুফ্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। একজন লোক অন্য একজনকে লক্ষ্য করে বলে থাকে, আমরা তোমাদের সাথে এরূপ করেছি, আমরা তোমাদেরকে বন্দী করেছি। অথচ এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য থাকে শ্রোতার সম্প্রদায় ও দল অথবা তার দেশ ও শহরবাসী, তাতে শ্রোতা তাদেরকে পাক বা নাই পাক। কবি আল্-আখ্তাল জারীর ইব্ন আতিয়্যাকে নিন্দা করে বলেন,

وَ لَقَدسَمَالَكُمُ الهُذَيلُ فَنَالَكُم + بِاِرَابِ حَيثُ يُقَسِّمُ الاَ نفَالاَ

فِى فَيلَقٍ يَدعُو الاَرَاقِمَ لَم تَكُن + فُرسَانُـهُ عُزلاً وَّ لاَ اَكفَالاَ

"হুযাইল একবার তোমাদের প্রতি চোখ দিয়েছিল। দেখে নিয়েছিল এক চোট তোমাদেরকে ইরাকের যুদ্ধে, যেখানে গণীমত বন্টন হয়....।" বলাবাহুল্য জারীর না হুযায়লকে দেখেছে বা তাকে পেয়েছে, না সে ইরাকের যুদ্ধে শরীক হয়েছে বা সে কাল পেয়েছে। কিন্তু যেহেতু কোন একদিন আখ্তালের সম্প্রদায় জারীরের সম্প্রদায়কে জব্দ করেছিল, তাই তার ও তার সম্প্রদায়ের সাথে ঘটনাকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে।

ঠিক তেমনি আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনী ইস্‌রাঈলকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমাদেরকে ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিয়েছিলাম। বস্তুত মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের পূর্বপুরুষকে এবং পূর্বপুরুষের সাথে আচরণকেই তাদের প্রতি আচরণ হিসাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

يَسُومُونَكُم سُوْءَ العَذَابِ -এর ব্যাখ্যা

এ বাক্যের দুই রকম ব্যাখ্যা হতে পারে।(১) হয়ত তা বনী ইস্‌রাঈলের প্রতি ফিরআওনের আচরণের একটি সংবাদ। তখন অর্থ হবে, স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম। আর ইতিপূর্বে তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিতে। এ হিসেবে يَسُومُونَكُم আয়াতাংশ رفع -এর স্থানে অবস্থিত।(২) অথবা يَسُومُونَكُم আয়াতাংশ آل فرعون -এর حال । তখন অর্থ হবে, স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম এ অবস্থায় যে, তখন তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিতেছিল।

يَسُومُونَكُم অর্থ ভোগানো, আস্বাদন করানো, অধিকারী করা। বলা হয় سَامَهُ خُطَّةَ صِنمٍ 'তাকে পাহাড়ের পাদদেশে একখন্ড জমির অধিকারী করল'। কবি বলেন- إن سِيمَ خَسْفًا وَجهُهُ تَرَبَّدَا 'তাকে ধূলিস্মাৎ করে শাস্তি দিলে মুখমন্ডল ধূলিধূসর হয়'।

سُوءَ العَذَابِ অর্থ যে শাস্তি তাদেরকে যন্ত্রণা দিত। কেউ বলেন, কঠোরতম শাস্তি। কিন্তু এরূপ হলে سُوءَ العَذَابِ না বলে বরং أَسوءَ العَذَابِ বলা হত।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে, ফিরআওন বনী ইস্‌রাঈলকে এমন কি শাস্তি দিত, যা তাদেরকে যন্ত্রণা দিত? তাহলে বলা যায়, এর উত্তর স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন, يُذَبِّحُونَ أَبنَاءَكُم وَيَستَحيُونَ نِسَاءَكُم "তারা তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত।"

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিরআওনের দেওয়া শাস্তি ছিল, সে তাদেকে তার ভৃত্যে পরিণত করেছিল এবং তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে এক এক শ্রেণীকে এক এক কাজে নিয়োজিত করেছিল। একদল তার ঘর-বাড়ি নির্মাণ করত। একদল চাষাবাদ করত। এরা সব ছিল তার ব্যক্তিগত কাজের। যারা তার কাজ করত না, তাদের উপর কর ধার্য করে রেখেছিল। এটাকেই আল্লাহ তাআলা سُوءَ العَذَابِ 'নিকৃষ্ট শাস্তি' বলে ব্যক্ত করেছেন।

সুদ্দী (র) বলেন, ফিরআওন তাদেরকে যত নিকৃষ্ট ও অশুচিকর কাজে নিযুক্ত করেছিল এবং সে তাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। সুদ্দী (র) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

يُذَبِّحُونَ أَبنَاءَكُم وَيَستَحيُونَ نِسَاءَكُم -এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, ফিরআওনী সম্প্রদায় বনী ইস্‌রাঈলকে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

দিত, তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত– এসব কিছুই তারা করত ফিরআওনের শক্তির দাপটে এবং তারই নির্দেশক্রমে। কিন্তু তথাপি আল্লাহ্ তাআলা এ আচরণকে তাদের প্রতিই আরোপ করেছেন, ফিরআওনের প্রতি নয়। কেননা এ আচরণ করেছিল তারা নিজেরা । এর দ্বারা ইঙ্গিত হয়েছে যে, কাউকে হত্যা করা বা অন্য কোন শাস্তিদানের কাজ যার দ্বারা সংঘটিত হবে, সেই সংঘটনকারীর প্রতিই উক্ত কাজকে আরোপিত করা হবে। সে–ই এর উপযুক্ত, যদিও সে তা করে অন্যের নির্দেশক্রমে এবং নির্দেশদাতা হয় অত্যাচারী, পাপিষ্ঠ ও মদমত্ত, সর্বোপরি তাকে বাধ্যকারী। সুতরাং অন্যের নির্দেশে বাধ্য হয়ে যদি কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে সে হত্যাকান্ডকে উক্ত হত্যাকারীর প্রতিই আরোপ করা হবে এবং তারই থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে।

ফিরআওন বনী ইস্‌রাঈলের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। এ সম্পর্কে আমরা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হতে যা জানতে পারি তা নিম্নরূপ।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফিরআওন ও তার পরিবারবর্গ হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ (আ)–এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার এ অংগীকারের কথা আলোচনা করল যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বংশধরের মাঝে নবী–রাসূল ও রাজা–বাদশাহের আবির্ভাব ঘটাবেন। আলোচনাশেষে তারা ষড়যন্ত্র পাঁকাল এবং স্থির করল যে, দেশের চারদিকে একদল লোক পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাদের হাতে থাকবে ধারাল ছুরি। তারা বনী ইস্‌রাঈলের মাঝে সন্ধান চালাবে। যেখানেই কোন ছেলে সন্তান পাবে, তাকে হত্যা করে ফেলবে। এভাবে কিছুদিন কাজ চলতে থাকল। এক সময় তারা লক্ষ্য করল, বনী ইস্‌রাঈলের শিশুদেরকে তো হত্যা করা হচ্ছে, অন্যদিকে তাদের বয়স্করাও ক্রমে আয়ু ফুরিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফিরআওন বলল, এভাবে যদি তোমরা বনী ইস্‌রাঈলকে সমূলে বিনাশ করে দাও, তাহলে এত দিন তোমরা যে বসে বসে খেতে সেটি আর হবার নয়। তারা তোমাদের যা কিছু ফরমাশ খাটত, এখন থেকে তোমাদের নিজেদেরকেই তা করতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ কর। এক বছর অন্তর অন্তর তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা কর। এতে তাদের সংখ্যা হ্রাস পাবে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হবে না। প্রথম যে বছর হত্যাকান্ডে বিরতি দেওয়া হল সে বছর মূসা (আ)–এর জননী হারূন (আ.)–কে গর্ভে ধারণ করেন এবং প্রকাশ্যেই তাকে ভূমিষ্ঠ করেন। দ্বিতীয় বিরতির বছর হযরত মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীন্দ্রিয়বাদীরা ফিরআওনকে বলল, এ বছর এমন একটি শিশুর জন্ম হবে, যে আপনার রাজত্ব খতম করে দেবে। একথা শুনে ফিরআওন প্রতি হাজার নারীর উপর একশজন, প্রতি একশ জনের উপর দশজন এবং প্রতি দশজনের উপর একজন করে লোক নিয়োগ করল এবং তাদেরকে বলে দিল, লক্ষ্য রাখবে কোন্ নারী গর্ভবতী হয়েছে। যখন সে গর্ভমোচন করবে তখন দেখবে ভূমিষ্ঠ সন্তান ছেলে না মেয়ে। ছেলে হলে তাকে হত্যা করবে আর মেয়ে হলে ছেড়ে দেবে। আয়াতে একথাই বলা হয়েছে–يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم وَفِى ذَالِكُم بَلاَءٌ مِّن رَّبِّكُم عَظِيمٌ . "তারা তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। তাতে তোমাদের

প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।"

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَاِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُم سُوْءَ الْعَذَابِ- এর ব্যাখ্যায় বলেন, ফিরআওন তাদের উপর চারশ বছর যাবৎ রাজত্ব করে। অতঃপর একদিন অতীন্দ্রিয়বাদীরা এসে বলে, এ বছর মিসরে একটি শিশু জন্ম নেবে। তার হাতে আপনার ধ্বংস হবে। একথা শুনে ফিরআওন মিসরের সর্বত্র ধাত্রী পাঠিয়ে দিল। কোন নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিলে সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে ফিরআওনের সম্মুখে উপস্থিত করত। ফিরআওন তাকে হত্যা করে ফেলত। আর কন্যা সন্তান হলে তাকে জীবিত রাখা হত।

রবী ইব্ন আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَاِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ফিরআওন মিসরে একটানা চারশ বছর রাজত্ব করে। অতঃপর এক আগন্তুক এসে তাকে বলল, এ বছর মিসরে বনী ইস্রাঈলের মাঝে একটি শিশু জন্ম নেবে। কালে সে আপনার উপর বিজয়ী হবে এবং তার হাতে আপনার জীবন নাশ হবে। একথা শুনে ফিরআওন সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে দলে দলে নারী পাঠিয়ে দিল। বাকি অংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফিরআওন স্বপ্ন দেখল যে, বায়তুল মাক্দিস হতে আগুন এসে মিসরের সমুদয় ঘর-বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর বনী ইস্রাঈলকে বাদ দিয়ে যত কিব্তী পেল সকলকে ভষ্মীভূত করল এবং মিসরের বাড়ীগুলো ধ্বংস করে দিল। স্বপ্ন দেখে ফিরআওন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। মিসরে যত যাদুকর, অতীন্দ্রিয়বাদী, শকুনজ্ঞ, জ্যোতিষী ও গণক ছিল সকলকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইল। তারা বলল, বনী ইস্রাঈল যে দেশ থেকে এসেছে অর্থাৎ বায়তুল মাকদিস থেকে একজন লোকের আবির্ভাব ঘটবে, তার দ্বারা মিসর ধ্বংস হবে। তখন ফিরআওন ফরমান জারি করল যে, বনী ইস্রাঈলের যত পুত্র সন্তানের জন্ম হবে সকলকে হত্যা করা হবে। শুধু কন্যা সন্তানদের নিস্কৃতি দেওয়া হবে। কিব্তীদেরকে নির্দেশ দিল, তোমাদের গোলাম ভৃত্যদের যারা বাইরের কাজকর্ম করে তাদেরকে ভেতরে নিযুক্ত কর আর বাইরের নিকৃষ্ট কাজগুলো বনী ইস্রাঈলের উপর ন্যস্ত কর। তাই করা হল। এখন থেকে বনী ইস্রাঈল কিব্তীদের যেসব কাজকর্ম করত তা করতে শুরু করল এবং গোলামরা ভেতরের সুবিধাজনক কাজে নিযুক্ত হল। এ সম্পর্কেই আয়াতে বলা হয়েছে,

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ .

"ফিরআওন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল (অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে ন্যাক্কারজনক কাজকর্মে বাধ্য করেছিল), তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীগণকে জীবিত রাখত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী" (সূরা কাসাস-৪)।

নির্দেশমতে বনী ইস্‌রাঈলে কোন পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়া মাত্রই তাকে হত্যা করা হত। তারা বড় হওয়ার সুযোগ পেত না। ওদিকে আল্লাহ তাআলা তাদের বয়স্কদেরও মৃত্যু ত্বরান্বিত করলেন। শীঘ্রই তারা সব নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। এ অবস্থা দেখে কিব্‌তী নেতৃবর্গ ফিরআওনের দরবারে হাযির হল। তারা এ ব্যাপারে তার সাথে আলোচনা করল। বলল, ওরা দিন দিন মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওদের শিশুরা বড় হতে পারছে না। আবার বৃদ্ধরাও সব মরে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত আমাদের গোলামদেরকেই সব কাজকর্ম করতে হবে। আপনি যদি ওদের কিছু সংখ্যককে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাহলে নির্দেশ দেন, যেন এক বছর অন্তর অন্তর হত্যা করা হয়। যে বছর হত্যাকান্ড বিরতি দেওয়া হয় সেই বছর হযরত হারূন (আ) জন্মগ্রহণ করেন। বিরতির কারণে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী হত্যাকান্ডের বছর মূসা (আ) মাতৃগর্ভে আসেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হাক (র) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, কথিত আছে যে, মূসা (আ)-এর আবির্ভাবকাল নিকটবর্তী হলে একদিন ফিরআওনের জ্যোতিষী পারিষদবর্গ তার নিকটে সমবেত হল। তারা বলল, আমাদের যতদূর জানাশোনা তাতে বনী ইস্‌রাঈলের একটি শিশুর জন্মলগ্ন আপনার মাথার উপর। সে আপনার রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে। আপনার উপর বিজয় লাভ করবে। আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। আপনার দীন-ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে। একথা শুনে ফিরআওন ফরমান জারি করল, বনী ইস্‌রাঈলে যত পুত্র সন্তান জন্ম নেবে সকলকে হত্যা করা হোক এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখা হোক। মিসরের সকল ধাত্রীকে সমবেত করে বলে দেওয়া হল, বনী ইস্‌রাঈলের যত নবজাত পুত্র তোমাদের হাতে আসবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। তারা এ নির্দেশ পালন করতে থাকল। এ ছাড়া ইতঃপূর্বে জন্মলাভকারী শিশু পুত্রদেরও হত্যা করা হল। গর্ভবতী নারীদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হল, যেন তাদেরকে উৎপীড়ন করে গর্ভপাত ঘটান হয়।

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, ফিরআওনের নির্দেশে বাঁশ চিড়ে ছুরির মত বানান হত এবং তা সারিবদ্ধভাবে পেতে রাখা হত। অতঃপর বনী ইস্‌রাঈলের গর্ভবতীদেরকে এনে তার মাঝে দাঁড় করান হত। তারপর তাদের পা কাটা হত। তখন এর যন্ত্রণা ও ভয়ে এক একজন গর্ভবতী গর্ভপাত ঘটিয়ে নব জাতকের উপর পা রেখে দাঁড়াত, যাতে ছুরির উপর পড়ে নিজের নাশ না ঘটে। এভাবে বেশ কিছুদিন চলতে থাকল। ফলে বনী ইস্‌রাঈল সম্পূর্ণ খতম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। অবস্থা দেখে বলা হল, আপনি তো বনী ইস্‌রাঈলকে চিরতরে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। তাদের বংশধারাও সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। অথচ তারা আপনার চাকর-বাকর। তার চেয়ে নির্দেশ দিন যেন এক বছর তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং এক বছর জীবিত রাখা হয়। সে মতে যে বছর এ হত্যাকাণ্ড বন্ধ রাখা হয় সে বছর হযরত হারূন (আ)-এর জন্ম হয় এবং যে বছর জারি রাখা হয় সে বছর হযরত মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত বর্ণনামতে যারা বলেন যে, ফিরআওনী সম্প্রদায়

বনী ইসরাঈলের ছেলেদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত, তাদের বক্তব্য হিসাবে وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ -এর ব্যাখ্যা হবে যে, তারা বনী ইসরাঈলের নারীদেরকে জীবিত রাখত। অপরপক্ষে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবুল আলিয়া (র), রবী ইব্‌ন আনাস (র) ও সুদ্দী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবজাত শিশু কন্যা হলে তারা তাকে হত্যা করত না। এ হিসেবে বলতে হবে যে, শিশু কন্যা ও ছোট্ট খুকীকেও امرءة (নারী), বহুবচনে نساء বলা যায়। যেহেতু তারা আয়াতের نساء শব্দের ব্যাখ্যা এটাই করেছেন যে, তারা সদ্যজাত কন্যাকে হত্যা করত না, জীবিত ছেড়ে দিত। কিন্তু ইব্‌ন জুরায়জ (র) তাদের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি।

হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) يَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ -এর অর্থ করেন, তারা তোমাদের নারীদেরকে বাঁদী বানিয়ে রাখতো। তিনি বলেন, যারা এর অর্থ করেছেন 'শিশু কন্যাকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া' তারা মূলতঃ نساء (নারীগণ) শব্দের অর্থ রক্ষায় যত্নবান থাকেননি।

কিন্তু বলা বাহুল্য, ইব্‌ন জুরায়জ (র) যে ব্যাখ্যাকে ভুল বলেছেন তার চেয়ে বড় ভুলকে তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। কেননা আরবী ও আজমী কোন ভাষাতেই গোলাম-বাঁদী বানানোর অর্থে استحياء (জীবিত রাখা) -এর ব্যবহার নেই। শব্দটি الحياة হতে বাবে استفعال-এর মাসদার, যেমন البقاء হতে الاستبقاء ও السقى হতে الاستسقاء। 'গোলাম-বাঁদী বানান' অর্থের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। আবার কেউ কেউ বলেন, يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ অর্থ 'তোমাদের পুরুষদেরকে অর্থাৎ ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত। যবেহ যে শিশুদের করা হত একথা তারা অস্বীকার করেন, যেহেতু এর সাথে النساء -কে সংযুক্ত করা হয়েছে। তারা বলেন, আয়াতে বলা হয়েছে তারা নারীদেরকে জীবিত রাখত। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যাদেরকে হত্যা করা হত তারা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ; শিশু নয়। কেননা নিহত যদি শিশুই হত, তাহলে তাদের বিপরীতে যাদেরকে জীবিত রাখা হত, তারা হত শিশু কন্যা। কিন্তু আয়াতে শিশুকন্যা না বলে বলা হয়েছে নারীগণ (النساء)। কাজেই নিহত হবে যারা নারীর বিপরীত, অর্থাৎ (প্রাপ্তবয়স্ক) পুরষ।

কিন্তু এই ব্যাখ্যাকারগণ একে তো সাহাবায়ে কিরাম ও মহান তাবিয়ীগণের ব্যাখ্যা থেকে সরে গেছেন, তদুপরি তারা সঠিক অবস্থান হতেও বিচ্যুত হয়েছেন। তারা লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর জননীকে ওহী মারফত নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি শিশুটাকে দুধ পান করাতে থাকেন। তারপর যখন হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে কোন আশংকাবোধ করবেন, তখন তাঁকে একটা বাক্সে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ফিরআওনী সম্প্রদায় যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরই হত্যা করত ও নারীদেরকে নিষ্কৃতি দিত, তাহলে হযরত মূসা (আ)-কে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবার প্রয়োজন পড়ত না। কিংবা হযরত মূসা (আ) যদি তখন প্রাপ্তবয়স্ক হতেন তবে তাঁর আম্মা তাঁকে সিন্দুকে ভরতেন না। মোটকথা এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হতে বর্ণিত

হয়েছে আমরা সেটাকেই গ্রহণ করি। অর্থাৎ ফিরআওনী সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলের শিশু পুত্রদের যবেহ করত এবং শিশু কন্যাদের নিস্কৃতি দিত আর শিশু কন্যাদের ন্যায় তারা তাদের আম্মাকেও রেহাই দিত।ছোট বড় কোন স্ত্রীলোককেই তারা যবেহ করত না। তাই একই সাথে বলে দেওয়া হয়েছে يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 'তারা তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত'। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মায়েদেরসহ কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা। যেমন বলা হয়, اَقْبَلَ الرِّجَالُ 'পুরুষগণ এসেছে', যদিও তাদের মধ্যে কিছু শিশুও থাকে। وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ –এর ব্যাপারটাও ঠিক অনুরূপ। বাকি যবেহকৃতদের মধ্যে যেহেতু শুধু শিশু ছেলেরাই ছিল, তাদের পিতাগণ নয়, তাই يُذَبِّحُونَ رِجَالَكُمْ 'তারা তোমাদের পুরুষদের যবেহ করত' না বলে বলা হয়েছে يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ 'তোমাদের শিশু ছেলেদেরকে যবেহ করত।'

وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ – এর ব্যাখ্যা

ফিরআওনী সম্প্রদায়ের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে আমি তোমাদেরকে যে নিস্কৃতিদান করলাম এর মাঝে তোমাদের জন্য মহাঅনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। এখানে بلاء শব্দের অর্থ নেয়ামত বা অনুগ্রহ।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ – এর بلاء শব্দের অর্থ করেছেন نعمة –অনুগ্রহ।

সুদ্দী (র) হতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর মাঝে তোমাদের প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্ন জুরায়জ (র) হতেও بلاء عظيم অর্থ বর্ণিত হয়েছে মহা অনুগ্রহ।

আরবী ভাষায় بلاء শব্দটির প্রকৃত অর্থ পরীক্ষা। পরবর্তীতে তা ভাল-মন্দ উভয় স্থলেই ব্যবহৃত হয়। কেননা পরীক্ষা যেমন মন্দ বিষয় দ্বারা হয়, তেমনি ভাল বিষয় দ্বারাও হয়ে থাকে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "আমি মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করি, যাতে তারা ফিরে আসে" (সূরা আরাফ-১৬৮)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً "অমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি" (সূরা আম্বিয়া-৩৫)।

আরবগণ মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়কেই بلاء নামে অভিহিত করে থাকে। তবে অমঙ্গলের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ بلاء – ابلوة – بلوة এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রে بلاء –ابلاء – ابلية – ابليتة ব্যবহৃত হয়।কবি যুহায়র ইব্ন আবী সালমা বলেন,

جَزَى اللّٰهُ بِالاِحسَانِ مَا فَعَلَا بِكُم + وَاَبلَاهُمَا خَيرَ البَلَاءِ الَّذِى يَبلُو

"তারা দু'জন তোমাদের জন্য যা করেছে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং

তাদেরকে শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ দান করুন, যদ্দারা তিনি বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন।"

এখানে কবি أَبْلَا (বাবে افعال হতে) ও البلاء (বাবে نصر হতে) উভয়ভাবেই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন।

(৫০) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا الَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

(৫০) (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তোমাদের জন্য সাগরকে ফাঁক করে দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ –এর ব্যাখ্যা

আয়াতাংশের সংযোগ পূর্বের وَ اِذْ نَجَّيْـنَاكُمْ –এর সাথে। অর্থাৎ স্মরণ কর, আমার সেই অনুগ্রহকে যদ্দারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম, এবং স্মরণ কর যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম এবং স্মরণ কর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে ফাঁক করে দিয়েছিলাম। فَرَقْنَا অর্থ ফাঁক করে দিয়েছিলাম। বনী ইসরাঈল বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। সে হিসেবে সাগরকে ফাঁক করে বারটি পথ তৈরী করা হয়। প্রত্যেক গোত্র এক একটি পথ দিয়ে সাগর পার হয়। সাগর ফাঁক করার দ্বারা একথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। হযরত মূসা (আ) যখন সাগর তীরে এসে উপনীত হলেন, তখন তিনি সাগরকে আবূ খালিদ উপনামে অভিহিত করলেন এবং হাতের লাঠি দ্বারা তাকে আঘাত করলেন। ফলে তা ফাঁক হয়ে গেল। প্রত্যেক ভাগ ছিল বিশাল পর্বতসদৃশ। এভাবে সাগরগর্ভে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। এক এক রাস্তা দিয়ে বনী ইস্রাঈলের এক একটি গোত্র সাগর পাড়ি দিল।

বসরাবাসী কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ অর্থ তোমাদের ও সাগরের পানির মধ্যে বিভাজন ও ব্যবধান সৃষ্টি করলাম এবং পানিকে বাঁধা দিয়ে রাখলাম। ফলে তোমরা সাগর পার হতে পেরেছিলে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের জন্য সাগর বিভক্ত করেন। কাজেই আয়াতের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য যা তাবিঈ সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের উপদল হিসেবে সাগরকে বারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا الَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ -এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেন ও বনী ইস্রাঈলকে উদ্ধার করেন, তাহলে উত্তরে নিম্নের বর্ণনা পেশ করা যায়। যেমন–

আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (র) বলেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফিরআওন হযরত মূসা

(আ)–এর অনুসন্ধানে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয়। তার বাহিনীতে কালো বর্ণের ঘোড়াই ছিল সত্তর হাজার। অন্যান্য ঘোড়ার তো কথাই নাই। হযরত মূসা (আ)–ও সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন। তিনি যেতে যেতে যখন সাগরের তীরে গিয়ে উপনীত হন এবং যাওয়ার আর কোন পথও নাই এমনি মুহূর্তে পেছন দিক হতে ফিরআওন তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত। উভয় দল যখন পরস্পরকে দেখল তখন হযরত মূসা (আ)–এর সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম ! হযরত মূসা (আ) বললেন, كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّى سَيَهْدِيْنِ "কিছুতেই নয়। নিশ্চয় আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি সহসাই আমাকে পথ দেখাবেন"। আমাকে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তিনি প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

ইব্ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সাগরকে নির্দেশ দেন যে, হযরত মূসা (আ) যখন তাঁর লাঠি দ্বারা তোমাকে আঘাত করবে, তখন তুমি ফাঁক হয়ে যাবে। নির্দেশের সাথে সাথে সাগর ভয়াল তরঙ্গে আকুল হয়ে উঠে। মহান আল্লাহর ভয়ে সে প্রকম্পিত। নির্দেশ পালনের প্রতীক্ষায় সে শিহরিত। ওদিকে হযরত মূসা (আ)–এর প্রতি প্রত্যাদেশ হল, হে মূসা ! তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর। তিনি আঘাত করলেন। লাঠির মাঝে প্রচ্ছন্ন ছিল আল্লাহ্র দেওয়া ক্ষমতা। ফলে সাগর ফাঁক হয়ে গেল। প্রত্যেক ভাগ ছিল বিশাল পর্বত সদৃশ। আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ اِضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى "হে মূসা ! তুমি তাদের জন্য সাগরের মাঝে এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। পেছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এ আশংকা করো না এবং ভয়ও করো না" (সূরা তাহা–৭)। যখন সাগর শান্ত ও স্থির হয়ে গেল এবং তার বুকে শুষ্ক পথ তৈরী হয়ে গেল তখন হযরত মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে সে পথে অগ্রসর হলেন। পেছন থেকে ফিরআওনও বাহিনীসহ তাঁর অনুসরণ করল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্নুল হাদ্দ আল–লায়ছী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল যখন সমুদ্রে প্রবেশ করল, তাদের একজনও আর বাকি রইল না, তখন ফিরআওন তার বিশাল বাহিনী নিয়ে সাগর তীরে এসে উপস্থিত। সে ছিল একটি নর ঘোড়ায় আরোহী। সাগর বক্ষে নামতে সে ভয় পেয়ে গেল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) একটি কামাসক্ত ঘোটকী নিয়ে হাজির হলেন। তিনি সেটাকে ফিরআওনের ঘোটকের কাছে করে দিলেন। ঘোটক তার ঘ্রাণ নিয়ে উম্মত্ত হয়ে উঠল। ঘোটকী যতই সম্মুখে অগ্রসর হয়, ঘোটক ততই পেছনে পেছনে এগিয়ে যেতে থাকে। ফিরআওন তো তার পৃষ্ঠদেশে আছেই। সৈন্যরা যখন দেখল ফিরআওন সমুদ্র বক্ষে ঝাপ দিয়েছে, তখন তারাও তার অনুসরণ করল। সবার আগে হযরত জিব্রাঈল (আ)। তাঁর পেছনে ফিরআওন আর তাকে অনুসরণ করছে তার বাহিনী। সর্ব পশ্চাতে হযরত মীকাঈল (আ) একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সকলকে হাঁকিয়ে নেন। তিনি বলছিলেন, তোমরা তোমাদের নেতার সাথে মিলিত হও। অবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ) যখন সাগর পাড়ি দিয়ে তীরে উঠলেন, তাঁর সামনে কেউ নেই এবং অপর তীরে হযরত মীকাঈল (আ) থেমে পড়লেন, তাঁরও পেছনে নেই কেউ, তখন আল্লাহ তাআলা সাগরের পানি মিলিয়ে দিলেন। ফিরআওন আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা ও শক্তি দেখতে পেলো এবং নিজের অসহায়ত্ব ও লাঞ্ছনা উপলব্ধি করল। তখন সে

চিৎকার করে উঠল- آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ "আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাঈল যাঁকে বিশ্বাস করে, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণ-কারীদের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা ইউনুস-৯০)।

আম্‌র ইব্‌ন মায়মূন আল-আওদী (র) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মূসা (আ) বনী ইস্‌রাঈলকে নিয়ে যখন বের হন, তখন এ সংবাদ ফিরআওনের নিকট পৌছলে সে বলল, এখন নয়, শেষ রাতে যখন মোরগ ডাকে তখন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ ! ভোর হওয়া পর্যন্ত সে রাতে মোরগ ডাকেনি। তার নির্দেশে একটি ছাগল যবেহ্ করা হল। তারপর ফিরআওন বলল, আমি এর কলজে খেয়ে শেষ করার আগেই যেন ছয় লাখ কিবতী এসে সমবেত হয়। তাই হল। তার কলজে খাওয়া শেষ না হতেই ছয় লাখ কিবতী এসে একত্র হল। ওদিকে হযরত মূসা (আ) সাগর তীরে পৌঁছে গেলেন। তার শিষ্য হযরত ইয়ূশা ইব্‌ন নূন (আ) বললেন, হে মূসা (আ)! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোন্ দিকে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি সাগরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমার সম্মুখের দিকে। হযরত ইয়ূশা (আ) তাঁর অশ্ব নিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু কিছু দূর গিয়ে আর ঠাঁই পাচ্ছেন না। ফিরে এসে আবার প্রশ্ন করলেন, হে মূসা (আ)! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোন্ দিকে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন? আল্লাহর কসম! আপনাকে মিথ্যা বলা হয়নি, আপনিও মিথ্যা বলেননি। এভাবে তিনবার করলেন। এরপর ওহী এল, হে মূসা ! তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। তিনি আঘাত করলেন। এতে সাগর বহুধা বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটা ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ, এরপর হযরত মূসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীগণ এগিয়ে চললেন। ফিরআওনও তাঁদের অনুগমন করল তাঁদেরই পথে। যখন তারা সাগর-গর্ভে গিয়ে পৌছল তখন আল্লাহ্ তাআলা সাগরের পানি মিলিয়ে দিলেন। তাই ইরশাদ হয়েছে- وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ "আমি ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।" হযরত মামার (র) বলেন, হযরত কাতাদা (র) বলেছেন, হযরত মূসা (আ)-এর সাথে লোকসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ এবং ফিরআওন তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল এগার লক্ষের এক বাহিনী নিয়ে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, "আমার বান্দাদেরকে সাথে নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়। নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। সেমতে মূসা (আ) রাতের বেলা বনী ইস্‌রাঈলকে সাথে নিয়ে বের হয়ে পড়েন। ফিরআওন দশ লক্ষ অশ্বারোহী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তাতে মাদী ঘোড়া ছিল না একটিও। ওদিকে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে ছিল মাত্র ছয় লক্ষ লোক। ফিরআওন তাদেরকে দেখে বলল, এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল। এরা অযথাই আমাদেরকে রাগিয়েছে। কত বিশাল আমাদের বাহিনী। সদা সতর্ক।"

যাহোক, হযরত মূসা (আ) বনী ইস্‌রাঈলকে সাথে নিয়ে চলতে থাকলেন, অবশেষে সাগর তীরে এসে উপনীত হলেন। হঠাৎ তাঁর লোকেরা সচকিত হয়ে উঠল। পেছনে তাকিয়ে দেখে লাখ লাখ ঘোড়া।

ধূলায় ধূসরিত দুনিয়া। তারা বলল, হে মূসা (আ)! তুমি আমাদের নিকট আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও। আমাদের সামনে ওই সাগর। পেছনে ফিরআওন ও তার বিশাল বাহিনী এসে পড়ল। তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে রাজ্যে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তোমরা কী কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। তারপর আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আ)–এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, হে মূসা ! সমুদ্রে তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত কর। সাগরকে আদেশ করলেন, মূসার কথা শোন এবং আঘাত করা মাত্রই তুমি তার আনুগত্য কর। হযরত মূসা (আ) সাগরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর শরীর কাঁপছে। বুঝতে পারছেন না কোন দিক দিয়ে সাগরে আঘাত করবেন। হযরত ইয়ূশা (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কি নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, সাগরে আঘাত করতে বলেছেন। হযরত ইয়ূশা (আ) বললেন, তাহলে আঘাত করুন। তখন তিনি নিজের লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সাগর ভাগ ভাগ হয়ে বারটি রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। এক একটা রাস্তা বিশাল পাহাড়ের মত। প্রত্যেক উপদলের জন্য একটি করে রাস্তা। তারপর তারা যখন যার যার পথে চলতে শুরু করল, তখন পরস্পরে বলতে লাগল, ব্যাপার কি, আমাদের অন্যান্য সাথীদের দেখছি না যে ? তারা হযরত মূসা (আ)–কে একথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, চল্‌তে থাক। তারা তোমাদেরই মত আরেকটি পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তারা বলল, তাদেরকে না দেখে একথা মান্‌ছি না। আম্মার আদ–দুহ্‌নী (র) বলেন, তখন হযরত মূসা (আ) বললেন, হে আল্লাহ্ ! আপনি এদের এই দুশ্চরিত্রের উপর আমাকে সাহায্য করুন। প্রত্যাদেশ হল, হে মূসা ! তোমার লাঠি ঘোরাও। তিনি লাঠি ঘুরালেন। ফলে পানির প্রাচীরে জানালা তৈরী হয়ে গেল। তা দিয়ে তারা একে অপরকে দেখতে পেল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এভাবে চলতে চলতে সাগর পার হয়ে গেল। যখন তাদের সর্বশেষ লোকটিও তীরে উঠে গেল, তখন ফিরআওন ও তার লশ্‌কর সাগরে ঝাঁপ দিল। ফিরআওন একটি কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ লোমশ লেজবিশিষ্ট ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। ঘোড়াটি ভয়ে কিছুতেই সাগরে ঝাঁপ দিতে রাজি হলনা। তখন জিবরাঈল (আ) একটি কামোন্মত্ত ঘোটকী সহ আবির্ভূত হলেন। ফিরআওনের ঘোটকটি সেটি দেখামাত্রই তাঁর পেছনে ধাবিত হল। হযরত মূসা (আ)–কে বলা হল, সাগরকে যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। ফিরআওন ও তার বাহিনী যখন সাগরে প্রবেশ করল আর তাদের একজনও আর অবশিষ্ট থাকল না এবং হযরত মূসা (আ)–ও সদলবলে তীরে উঠে গেছেন, তখন সাগর মিলে গেল। ফিরআওন ও তার সমপ্রদায় নিমজ্জিত হল।

হযরত সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আ)–কে আদেশ করলেন, যেন তিনি বনী ইস্‌রাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন। ইরশাদ হয়েছে– أَسرِ بِعِبَادِي لَيلاً انَّكُم مُّتَّبَعُونَ "আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় বের হও। নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।" সেমতে হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ) তাদের স্বজাতির সকলকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। এ সময় ফিরআওনের সম্প্রদায়ের উপর মৃত্যু আপতিত হলো। তাদের অবিবাহিত সকল যুবকই মারা গেল। তারা তাদের দাফন কাফনে ব্যস্ত হয়ে থাকল, যে কারণে বনী ইস্‌রাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করার সুযোগ

পেল না। এভাবে সূর্যোদয় হয়ে গেল। তারপর তারা বের হল। ইরশাদ হয়েছে- فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِيْنَ "তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল" (শূআরা-৬০)। হযরত মূসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের পশ্চাদভাগে এবং হযরত হারূন (আ) অগ্রভাগে। একজন মুমিন হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! কোন্ দিকে যাওয়ার নির্দেশ ? তিনি বললেন, সাগরে। লোকটি তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল। কিন্তু হযরত মূসা (আ) তাকে বিরত রাখলেন।

হযরত মূসা (আ) ছয় লক্ষ বিশ হাজার যোদ্ধা পুরুষ নিয়ে বের হয়েছিলেন যাদের বয়স বিশের উপরে নয়, তারা ছোট বলে গনায় ধরা হয়নি। অনুরূপ ষাট বছরের লোকদেরকেও ধরা হয়নি, যেহেতু তারা বৃদ্ধ। এর মাঝামাঝি যারা তাদেরকেই গনায় ধরা হয়েছিল। সন্তান-সন্ততি ছিল গনার বাইরে।

ফিরআওন সতের লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বনী ইস্‌রাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। তার মধ্যে ঘোটকী ছিল না একটাও। অগ্রভাগে ছিল হামান। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন- فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَائِنِ حَاشِرِيْنَ اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ। "তারপর ফিরআওন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল, সে বলল, এরা (বনী ইস্‌রাঈল) তো ক্ষুদ্র একটি দল।"

হযরত হারূন (আ) অগ্রসর হয়ে সাগরে এক আঘাত করলেন। কিন্তু সাগর একটুও ফাঁক হল না। উপরন্তু সে বলে উঠল, কে এই উদ্ধত ব্যক্তি যে আমাকে আঘাত করে ? অবশেষে হযরত মূসা (আ) আসলেন। তিনি সাগরকে আবূ খালিদ পদবিতে সম্বোধন করলেন। তারপর নিজ লাঠি দ্বারা তার উপর আঘাত করলেন। সাথে সাথে সাগর ভাগ ভাগ হয়ে গেল। এক একটা ভাগ বিশাল পাহাড়তুল্য।

বনী ইস্‌রাঈল সাগরে প্রবেশ করল। সাগরে মোট বারটি পথ হয়েছিল। প্রতি পথে একটি করে দল অগ্রসর হল। পথের দুই পাশে পানি জমে প্রাচীরমত হয়েছিল। ফলে এক দল অন্য দলকে দেখতে পাচ্ছিল না। তারা বলে উঠল, নিশ্চয়ই আমাদের সাথীরা নিহত হয়েছে। এ অবস্থা দেখে হযরত মূসা (আ) দোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা সে প্রাচীর জানালা বিশিষ্ট সেতু সদৃশ করে দিলেন। এবারে তারা এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেককে দেখতে পেল। তারা সাগর পার হয়ে তীরে উঠে গেল।

অতঃপর ফিরআওন ও তার সৈন্যদল সাগর তীরে এসে পৌছল। ফিরআওন সাগরকে বহুধা বিভক্ত দেখে বলল, তোমরা কি দেখছ না সাগর আমার আনুগত্যে বিভক্ত হয়ে পথ করে দিয়েছে, যাতে আমি আমার শত্রুদের ধরতে পারি এবং তাদেরকে হত্যা করতে পারি ? তখন ইরশাদ হলোঃ وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ। "আমি সেথায় উপনীত করলাম অপর দলটিকে" (ফিরআওনী সম্প্রদায়কে) (শুআরা-৬৪)।

ফিরআওন রাস্তার মুখে দাড়িয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে চাইল। কিন্তু তার ঘোড়া কিছুতেই সামনে চলতে চাচ্ছে না। তখন জিব্‌রাঈল (আ) একটি মাদী ঘোড়া নিয়ে হাজির হলেন। ফিরআওনের ঘোটক মাদীটির আঘ্রাণ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পেছেনে ছুটে চলল। যখন সবার আগের লোকটি তীরে উঠার উপক্রম করল এবং শেষ ব্যক্তি সাগরে নেমে আসল তখন সাগরকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন

তাদেরকে গ্রাস করে নেয়। সুতরাং সাগরের পানি পরস্পর মিলে গেল এবং গোটা বাহিনী নিমজ্জিত হল। হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিরআওন বনী ইসরাঈলকে ধাওয়া করে সাগরমুখে উপনীত করল। তারপর বলল, ওদেরকে বল, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে সাগরে নাম। মূসা (আ)-এর সঙ্গীরা তাদেরকে দেখে বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। হযরত মূসা (আ) বললেন, কিছুতেই নয়। আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ দেখাবেন।

হযরত মূসা (আ) সাগরকে বললেন, তুমি কি জান না আমি আল্লাহর রাসূল ? সাগর বলল, হাঁ। তিনি বললেন, আর ওরা আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাদেরকে নিয়ে বের হই? সাগর বলল, হাঁ। তিনি বললেন, এও তো জান যে, ফিরআওন আল্লাহ্‌র দুশমন ? সাগর বলল, হাঁ জানি। তিনি বললেন, তাহলে আমার ও আমার সঙ্গীদের জন্য তুমি বিভক্ত হয়ে পথ করে দাও। সাগর বলল, হে মূসা (আ) ! আমি তো আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত এরূপ করার কোন অধিকার আমার নাই। তখন আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যাদেশ করলেন, হে সাগর! মূসা যখন তার লাঠি দ্বারা তোমাকে আঘাত করবে, তখন তুমি বিভক্ত হয়ে যেও। মূসা (আ)-কে বললেন, যেন তিনি নিজ লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করেন। ইব্‌ন যায়দ (র) এই বলে পাঠ করেন- فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَّ لاَ تَخْشَى "এবং তাদের জন্য সাগরের মাঝ দিয়ে এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। পেছন দিক হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এ আশংকা করো না এবং ভয়ও করো না" (সূরা তোয়াহা-৭৭)। ইব্‌ন যায়দ (র) আরও পাঠ করেন, وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا "সাগরকে সে অবস্থায় অর্থাৎ সহজগম্য অবস্থায় থাকতে দাও" (সূরা দুখান-২৪)।

সাগর বার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটি উপদল এক এক পথে অগ্রসর হল। ফিরআওনের সৈন্যরা বলল, এরা তো সাগরে প্রবেশ করেছে। সে বলল, তোমরাও প্রবেশ কর। জিবরাইল (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের পশ্চাদভাগে এবং ফিরআওনী সম্প্রদায়ের সম্মুখে। তিনি বনী ইসরাঈলকে বলছিলেন, যারা পেছনে রয়েছে তারা সামনের সাথে সাথে চল। ফিরআওনী সম্প্রদায়কে বলছিলেন, একটু থাম। পেছনের লোকেরা এসে সম্মুখবর্তীদের সাথে মিলিত হোক।

সাগরে প্রবেশের পর বনী ইসরাঈলের প্রত্যেকটি দল তাদের আগে যারা প্রবেশ করেছে তাদের সম্পর্কে বলতে লাগল যে, নিশ্চয়ই তারা ধ্বংস হয়েছে। তাদের অন্তরে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হলে আল্লাহ্ তাআলা সাগরকে আদেশ করলেন তাদের জন্য এমনভাবে পথ করে দিতে যেন তারা একে অপরকে দেখতে পায়। অবশেষে যখন বনী ইস্রাঈল সাগরের অপর তীরে উঠে গেল এবং ফিরআওনী সম্প্রদায় সাগরে প্রবেশ করল, তখন মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে সাগর মিলে গেল।

وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ -অর্থাৎ তোমরা তাকিয়ে দেখলে কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করলেন। কিভাবে তিনি সে স্থানেই ফিরআওনী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করলেন, যে স্থান থেকে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দান করলেন। তোমরা দেখলে তাঁর অপার ক্ষমতা। সাগর তাঁর আনুগত্যে ও তাঁর

নির্দেশ পালনার্থে বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটা ভাগ বিশাল পাহাড়ের মত স্থির, অবিচল। অথচ এর পূর্বেও সে ছিল তরল, বহমান।

এ সবের দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলকে তাঁর নিদর্শন ও প্রমাণাদি ওয়াকিফহাল করান এবং তাদের পূর্বপুরুষের প্রতি নিজ দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সাথে সাথে সতর্ক করে দেন যেন তারা নবী মুহাম্মাদ (স)-কে অস্বীকার না করে। যদি করে তাহলে হযরত মূসা (আ)-কে অস্বীকার করার দরুন ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়ের যে পরিণতি হয়েছিল, সেরূপ পরিণতি তাদেরও হবে।

কিছু সংখ্যক আরবী ভাষাবিদ মনে করেন وَأَنتُم تَنظُرُونَ-এর অর্থ ضَرَبْتُكَ وَأَهْلُكَ يَنظُرُونَ -এর অনরূপ। অর্থাৎ 'তোমাকে মারলাম আর তোমার পরিবার-পরিজন তাকিয়ে রইল'। তারা কেউ তোমার কাজে আসল না এবং তোমার সাহায্য করল না। তাহলে এখানে وَهُم يَنظُرُونَ -এর অর্থ, দেখতে ও শুনতে পাওয়া যায় এমন স্থানে থাকা। সারকথা জ্ঞাত থাকা। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ "তুমি কি তোমার প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে দেখ না, কিভাবে তিনি ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন" (সূরা ফুরকান-৪৫)। এখানে বস্তুত বিষয়টি তাকানোর নয়, বরং জানার। তাকানো বলে 'জানা' বোঝান হয়েছে।

তাদের এরূপ ব্যাখ্যা করার কারণ হলো, তারা وَأَنتُم تَنظُرُونَ -এর সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন ফিরআওনের নিমজ্জিত হওয়ার সাথে। অর্থাৎ তোমরা ফিরআওনের নিমজ্জিত হওয়ার প্রতি তাকিয়ে রইলে। তারা বলেন, বনী ইস্রাঈল সাগরের যে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা তাদেরকে ফিরআওন ও তার নিমজ্জিত হওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করার মত সুযোগ দিয়েছিল কোথায় ? বস্তুতঃ তাদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। বরং وَأَنتُم تَنظُرُونَ-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে, তোমরা তাকিয়ে দেখলে কিভাবে সাগর তোমাদের জন্য বিভক্ত হল, কিভাবে তা ফিরআওনী সম্প্রদায়ের উপর ঠিক সে স্থানেই তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল, যে স্থানে সে এতক্ষণ তোমাদের জন্য শুষ্ক পথে পরিণত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তাদের এ দেখা ছিল চর্মচক্ষুর, জ্ঞান চক্ষুর নয়, যেমন উক্ত তাফসীরকারগণ বলেছেন।

(٥١) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ٠

(৫১) স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম চল্লিশ রাতের, তার প্রস্থানের পর তোমরা গো-বৎসকে গ্রহণ করলে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে সীমালংঘনকারী।

وَإِذْ وَاعَدْنَا-এর ব্যাখ্যা

কিরাআত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে وَاعَدْنَا-এর পাঠ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ পড়েন وَاعَدْنَا (বাবে مفاعلة থেকে)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সাথে কথোপকথনের জন্য তূর পাহাড়ে মিলিত হবেন। এখানে প্রতিশ্রুতি ছিল উভয়ের পক্ষ হতে। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে মূসা (আ)-কে এবং মূসা (আ)-এর পক্ষ হতে আল্লাহ্ তাআলাকে। তাঁরা

(বাবে ضَرَبَ হতে উৎপন্ন) وَعَدْنَا-এর উপর وَاعَدْنَا-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা বলেন, দুইজনের মাঝখানে সাক্ষাতকার ও মিলিত হওয়ার যে অঙ্গীকার হয় তাতে দুইজনের প্রত্যেকেই পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। সেমতে এ আয়াতে وَعَدْنَا -এর উপর وَاعَدْنَا -কেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যেহেতু وَاعَدْنَا- এর অর্থ হচ্ছে উভয় পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কিন্তু وَعَدْنَا -এর দ্বারা প্রতিশ্রুতি হয় এক পক্ষ হতে।

কিছু তাফসীরকার পড়েন وَعَدْنَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলাই মূসা (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দানকারী। তাঁর একার পক্ষ হতেই প্রতিশ্রুতি হয়েছিল, মূসা (আ)-এর পক্ষ হতে নয়। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে বলেন যে, দুই পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতি (المواعدة) মানুষের মধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার যে প্রতিশ্রুতি, তা ভালোর হোক মন্দের হোক এককভাবে তাঁরই পক্ষ হতে হয়। তাই কুরআন কারীমের সর্বত্র এ শব্দটি বাবে ضرب হতেই ব্যবহৃত হয়েছে। যথা اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেন, সত্য প্রতিশ্রুতি' (সূরা ইব্রাহীম-২২)। অন্যত্র বলেন وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ 'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ দুইটি দলের একটি সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে' (সূরা আনফাল-৭)। সুতরাং وَاِذْ وَعَدْنَا -এর মাঝেও প্রতিশ্রুতি এককভাবে আল্লাহ্রই পক্ষ হতে হবে এবং পড়তেও হবে সে হিসেবে।

আমাদের মতে সঠিক কথা হচ্ছে যে, শব্দটির উভয় পাঠই সহীহ্, উভয় কিরাআতই উম্মাতের কাছে বর্ণনা পরম্পরায় প্রাপ্ত এবং কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ উভয় রকমেই পাঠ করেছেন। এর এক কিরাআত দ্বারা অন্য কিরাআতের অর্থ বাতিল হয়ে যায় না, যদিও এক কিরাআতে বাহ্যত অন্য কিরাআত অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ রয়েছে। কিন্তু মর্ম উভয়ের এক ও অভিন্ন। কোন ব্যক্তি যখন কারও সম্পর্কে সংবাদ দেয় যে, সে এক ব্যক্তিকে অমুক স্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা দিয়েছে, তখন সে ওয়াদা যদি উভয়ের সম্মতি ও ঐক্যমতে হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যে, যাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে সেও মূলতঃ ঐ স্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা প্রদানকারী। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে তূর পাহাড়ে সাক্ষাতের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তাঁর সম্মতিতেই দিয়েছিলেন। কেননা হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তাআলার প্রতিটি আদেশে নিঃসন্দেহে সন্তুষ্ট ও সম্মত ছিলেন এবং মহান আল্লাহ্র ভালবাসায় তা পালনে তৎপর ছিলেন। অনুরূপ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ তাআলা উক্ত ওয়াদাদানের সাথে সাথেই মূসা (আ) তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহ্ তাআলা যেমন মূসা (আ)-কেও সেথায় সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আ)-কে কথোপকথনের জন্য ওয়াদা প্রদানকারী, একই সাথে ওয়াদা প্রাপ্ত। আবার মূসা (আ)-ও আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষাতের ওয়াদা প্রদানকারী, একই সাথে ওয়াদা প্রাপ্ত। কাজেই পাঠক وعد বা واعد যেভাবেই পাঠ করুক, ব্যাখ্যা ও ভাষাগত দিক হতে উভয়ই শুদ্ধ এবং উপরোক্ত আলোচনা হিসাবে সঠিক।

যিনি বলেন, দুই পক্ষের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি মানুষের মধ্যেই চলতে পারে, আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে নয়; যাবতীয় ভাল-মন্দের ওয়াদা ও অঙ্গীকারে আল্লাহ্ তাআলা সম্পূর্ণ একক, তার এ বক্তব্য অহেতুক। কেননা আল্লাহ্ তাআলা কেবল পুরস্কার ও শাস্তি, কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং ইষ্ট-অনিষ্টের অংগীকারেই একক, যা একচ্ছত্রভাবে তাঁরই হাতে। কিন্তু এই একত্ব মানুষের মাঝে প্রচলিত ভাষাকে পাল্টে দিতে পারে না এবং তার অর্থেও পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। পূর্বেই বলেছি, মানুষের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে যে, যেসকল ওয়াদা দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পন্ন হয়, তা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রত্যেকেরই পক্ষ হতে ওয়াদা। তাতে উভয়ে ওয়াদাকারীও এবং ওয়াদাপ্রাপ্তও। আর যে ওয়াদা এককভাবে ওয়াদাকারীর পক্ষ হতেই সম্পন্ন হয়, ওয়াদাপ্রদত্ত ব্যক্তির কোন দখল তাতে থাকে না সেটা মূলতঃ ওই ওয়াদা যা وعيد (সতর্কবাণী) নয়।

مُوسى –এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, موسى শব্দটি কিব্তী ভাষার এবং একটি যুক্তশব্দ। এর অর্থ পানি ও বৃক্ষ। مو (মূ) অর্থ পানি এবং شا (শা) অর্থ বৃক্ষ। এ নামকরণের কারণ যা জানা গেছে তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে মূসা (আ)-এর জননী যখন তাঁকে একটি সিন্দুকে ভরে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন এবং এক বর্ণনামতে সেটা ছিল নীল নদ, তখন তরঙ্গমালার আঘাতে আঘাতে এক সময় সিন্দুকটি গিয়ে ফিরআওনের প্রাসাদ সংলগ্ন গাছ-গাছালির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ফিরআওন পত্নী আসিয়া-র সখীগণ এসেছিল গোসল করতে। হঠাৎ সিন্দুকটির প্রতি তাদের চোখ পড়ে। তারা সেটা তুলে লয়। তাকে পাওয়া গিয়েছিল পানি ও বৃক্ষের মাঝে অর্থাৎ مو ও سا -এর মাঝে। কাজেই স্থানের নাম হিসাবে তাঁর নাম পড়ে যায় موسى (পানি ও বৃক্ষ)।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর বংশতালিকা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে, মূসা ইব্ন ইমরান ইব্ন ইয়াদহার ইব্ন কাহিছ ইব্ন লাবী ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইস্হাক ইব্ন ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ। ঐতিহাসিক ইব্ন ইস্হাক (র) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً –এর ব্যাখ্যা

এর অর্থ স্মরণ কর, আমি যখন মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম পূর্ণ চল্লিশ রাতের। পুরো চল্লিশ রাতই মেয়াদের অন্তর্ভুক্ত। বসরাবাসী কোন কোন ব্যাকরণবিদ মনে করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 'স্মরণ কর, আমি যখন মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম চল্লিশ রাত অতিক্রান্ত হওয়ার'। অর্থাৎ اربعين (চল্লিশ)-এর পূর্বে انقضاء (অতিক্রান্ত হওয়া) বা رأس (শেষ, মাথা) শব্দ উহ্য আছে, যেমন وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ (পল্লীকে জিজ্ঞেস কর)-এর মাঝে اهل শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ পল্লীবাসীকে জিজ্ঞেস কর। বলা হয়ে থাকে اَلْيَوْمَ اَرْبَعُوْنَ مُنْذُ خَرَجَ فُلَانٌ 'অমুকে বের হয়েছে আজ চল্লিশ দিন'। অর্থাৎ চল্লিশ দিন পূর্ণ হল। অনুরূপ اليوم يومان আজ দুইদিন পূর্ণ হল।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, তাদের এ ব্যাখ্যা তাফসীরকারগণের মতের খেলাফ এবং আয়াতের বাহ্য পাঠেরও পরিপন্থী। আয়াতে দৃশ্যতঃ একথাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছেন। কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে উহ্য অর্থে পরিবর্তিত করার অধিকার কারও নেই। তাফ্সীরকারগণের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَاِذْ وَاعَدْنَا مُوسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً -এর ব্যাখ্যায় বলেন, চল্লিশ রাত বলে যুল্-কাদাহ্ মাস ও যুল-হিজ্জাহ্র দশ দিন বোঝান হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা, যখন মূসা (আ) ভাই হারূন (আ)-কে বনী ইস্রাঈলের উপর নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে তূর পাহাড়ে চলে যান। তিনি সেখানে এক নাগারে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রতি তাওরাত নাযিল হয়, যা যাবারজাদ (মূল্যবান বেহেশ্তী পাথর) -এর ফলকে উৎকীর্ণ ছিল। তাছাড়া আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে অন্তরংগ আলাপের জন্য নিকটবর্তী করে নেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেন। হযরত মূসা (আ) কলমের খচ্খচ্ শব্দও শুনতে পেয়েছিলেন। কথিত আছে, এ দীর্ঘ চল্লিশ দিনে একবারও মূসা (আ)-এর শুচিতা নষ্ট হয়নি। পাক-পবিত্রতা নিয়েই তিনি তূর থেকে নেমে আসেন।

হযরত রবী (র) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইব্ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস এবং মূসা (আ) ও তাঁর কওমকে নিস্কৃতিদানের সময়েই এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি হযরত মূসা (আ)-কে প্রথমে ত্রিশ দিনের ওয়াদা দেন। তারপর আরও দশ দিন বৃদ্ধি করেন। এভাবে তাঁর প্রতিপালকের দেওয়া মেয়াদ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়। এ সময় হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করেন। মূসা (আ) তাঁর ভাই হারূন (আ)-কে কওমের উপর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং বলেন, আমি শীঘ্রই আমার প্রতিপালকের নিকট যাব। তুমি কওমের মাঝে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তাদের পথ অনুসরণ করো না। তারপর হযরত মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ সহকারে দ্রুত বাইর হলেন। হারূন (আ) রয়ে গেলেন বনী ইস্রাঈলের মাঝে। তার সাথে ছিল সামিরী। তিনি তাদেরকে নিয়ে মূসা (আ)-এর পদচিহ্ন অনুসরণ করলেন, যাতে তাদেরকে নিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারেন।

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-কে বনী ইস্রাঈলের মাঝে রেখে বাইর হয়ে পড়েন। তিনি তাদেরকে ত্রিশ দিনের ওয়াদা দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাতে দশদিন বাড়িয়ে চল্লিশ দিন পূর্ণ করেন।

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ অর্থ "তারপর তোমরা মূসার প্রতিশ্রুত দিনগুলোতে গো-বৎসকে মাবূদরূপে গ্রহণ করলে"। مِنْ بَعْدِهِ মানে হযরত মূসা (আ) তোমাদেরকে রেখে প্রতিশ্রুত স্থানে চলে যাওয়ার পর। بعده -এর ه সর্বনাম দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে বোঝান হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ্

(স)–এর বিরুদ্ধাচারী বনী ইস্রাঈলের অবিশ্বাসী ইয়াহূদীদেরকে তাদের পিতৃপুরুষ ও পূর্বসূরীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত করছেন। তাদের প্রতি তাঁর ক্রমাগত অনুগ্রহ ও পরিপূর্ণ নিমাতরাজির পরও কিভাবে তারা রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করত এবং নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করত। হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর সত্যতা জানা থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতা করছে, তাঁকে অবিশ্বাস এবং তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করছে। তা তাদের পিতৃপুরুষ ও পূর্বসূরীদের কার্যকলাপের অনুরূপ এবং এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করেন যে, নবী–রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করার দরুন তাদের পূর্বপুরুষদেরকে বানরে পরিণত করা ও অভিসম্পাত বর্ষণ করাসহ যেসব শাস্তি তাদের উপর এসেছিল, অনুরূপ শাস্তি এদের উপরও আসতে পারে।

বাছুরকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করার কারণ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। ফিরআওন ও তার বাহিনী যখন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল, তখন তার ঘোড়াটি ভয়ে ঝাঁপ দিতে চায়নি। তখন জিব্‌রাঈল (আ) একটি রমণাভিলাষী ঘোটকী নিয়ে হাযির হন। ফিরআওনের ঘোটক একে দেখামাত্রই তার পেছনে ধাবিত হল। সামিরী হযরত জিব্‌রাঈল (আ)–কে দেখে চিনতে পেরেছিল। কেননা তার জন্মের পর মায়ের যখন ভয় হল যে, পুত্রটিকে হত্যা করে ফেলা হবে, তখন তাকে একটি পাহাড়ের গুহায় রেখে এসেছিল এবং গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। হযরত জিব্‌রাঈল (আ) প্রত্যহ এসে তাকে নিজের আংগুল চোষাতেন। কোন আংগুল দিয়ে দুধ, কোনটি দিয়ে মধু এবং কোনটি দিয়ে ঘি বের হত। এভাবে হযরত জিব্‌রাঈল (আ) তাকে আংগুল চুষিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন। সে বড় হয়ে উঠে। কাজেই জিব্‌রাঈল (আ)–কে সমুদ্রে দেখেই সে চিনে ফেলেছিল। সে তাঁর অশ্বের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো মাটি তুলে রাখে । হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সে এক মুষ্টি মাটি নিয়েছিল খুরের নীচ থেকে। হযরত সুফিয়ান (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) পাঠ করতেন فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ 'সামেরী বলল, আমি সে দূতের ঘোড়ার পদচিহ্ন হতে এক মুষ্ঠি ধূলা রেখে দিয়েছিলাম' (সূরা তাহা–৯৬)। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সামিরীর মনে একথা সঞ্চার করা হয়েছিল যে, তুমি এ ধূলা কোন কিছুতে রেখে যদি বল, 'অমুক বস্তু হয়ে যা' তবে তা হয়ে যাবে। যাহোক সে ধূলাগুলো নিজের কাছে রেখে দেয়। এমনকি সাগর পার হওয়ার পরও সেগুলো তার হাতে ছিল।

হযরত মূসা (আ) ও বনী ইস্রাঈল সাগর পার হয়ে চলে গেলে ফিরআওনী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তাআলা নিমজ্জিত করলেন। তারপর হযরত মূসা (আ) তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ)–কে বললেন, তুমি কওমের মাঝে আমার স্থলাভিষিক্ত হও এবং তাদের সংশোধনকার্যে লিপ্ত থাক। তিনি নিজে তাঁর প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত স্থানে রওয়ানা হন।

বনী ইস্রাঈলের কাছে ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অলংকারাদি ছিল, যেগুলো এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিল। মনে মনে তারা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করছিল। তারা চাইল এ অপরাধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবে। তাই সবগুলো অলংকার বাইর করল। তাদের ইচ্ছা এগুলো আগুনে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করবে।

কিন্তু অলংকারগুলো একত্র করা শেষ হতেই সামিরী তার রক্ষিত ধূলা বের করে কি সব ইংগিত করল এবং তারপর তা অলংকারে নিক্ষেপ করে বলল, হয়ে যাও এক গো-বৎসের অবয়ব হাম্বা রব বিশিষ্ট। সে বাছুরের পশ্চাদ্দার দিয়ে বাতাস ঢুকাত এবং মুখ দিয়ে বের করত। ফলে হাম্বা হাম্বা রব শোনা যেত। তারপর বলে উঠল, এই তো তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ। ব্যস, তারা গো-বৎসের পূজা শুরু করে দিল এবং নিষ্ঠার সাথে তাতে লিপ্ত থাকল। হযরত হারূন (আ) বললেন, হে আমার সম্প্রদায় ! এর দ্বারা তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন 'রহ্মান'। কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মান। তারা বলল, আমরা এরই পূজায় লিপ্ত থাকব, মূসা ফিরে আসা পর্যন্ত।

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তাআলা যখন হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন, মিসর হতে বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে বের হও তখন তিনি বনী ইস্রাঈলকে প্রস্তুত হতে বললেন এবং আরও বললেন, যেন তারা কিব্তীদের থেকে অলংকার ধার লয়। তারপর যখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ও বনী ইস্রাঈলকে নিস্কৃতি দিয়ে সাগরের ওপারে পৌঁছালেন আর ফিরআওনী সম্প্রদায়কে করলেন নিমজ্জিত, তখন হযরত জিব্রাঈল (আ) এসে উপস্থিত হন। তিনি হযরত মূসা (আ)-কে তাঁর প্রতিপালকের কাছে নিয়ে যান। তিনি যে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন, তার প্রতি সামিরীর চোখ পড়ে যায়। সে দেখল এ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ঘোড়া এবং এটি একটি জীবন-ঘোড়া (فرس الحياة)। সে বলে উঠল, এ ঘোড়ার তো দেখ্ছি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই সে তার পদচিহ্ন হতে এক মুষ্ঠি ধূলি উঠিয়ে রাখে।

হযরত মূসা (আ) তাঁর ভাই হারূনকে খলীফা নিযুক্ত করেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন ত্রিশ দিন পর সাক্ষাত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আরো দশ দিন বৃদ্ধি করেন। হযরত হারূন (আ) বনী ইস্রাঈলকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের জন্য গনীমত হালাল নয়। কিব্তীদের অলংকারগুলো তো গনীমত। তোমরা সেগুলো সব একত্র কর এবং একটা গর্ত করে তাতে পুতে রাখ। মূসা এসে যদি হালাল বলেন তবে তা তুলে নিও। নচেৎ তা গর্তেই থেকে যাবে, ফলে একটা অবৈধ বস্তু ভোগ করা হতে তোমরা বেঁচে যাবে।

বনী ইস্রাঈল যখন অলংকারগুলি একটি গর্তে পুতে রাখে, তখন সামিরীও সেখানে উপস্থিত হয়। সে তার সংগ্রহ করা ধূলি সেই গর্তে নিক্ষেপ করে, আল্লাহ্ তাআলা সে অলংকার থেকে একটি গো-বৎসের অবয়ব বের করেন। বাছুরটি হাম্বা হাম্বা ডাক দেয়। বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-এর মেয়াদ গণনা শুরু করল। তারা রাতকে একদিন এবং দিনকেও একদিন ধরে গুণল। এভাবে যখন চল্লিশ দিন পূর্ণ হল এবং বাস্তবে তা ছিল মাত্র বিশ দিন, তখন গো-বৎস বের হয়েছিল। সামিরী বলল, এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্। 'কিন্তু সে ভুলে গেছে এবং ইলাহ্কে এখানে রেখে তাকে অন্যত্র খুঁজতে বের হয়েছে। কথাটা বনী ইস্রাঈলের মনে লাগল। তারা বাছুরটির পূজা করতে লেগে গেল। সেটি তাদের সামনে চলাফেরা করত এবং হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়ত। হযরত হারূন (আ) বললেন, হে বনী ইস্রাঈল ! এ

গো–বৎস দ্বারা তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়।

হযরত হারুন (আ) ও তাঁর সঙ্গের বনী ইসরাঈল কোনরূপ যুদ্ধ–বিগ্রহ ছাড়া সেখানে অবস্থান করেন। মূসা (আ) চলে গেলেন আল্লাহ্ তাআলার সাথে কথা বলার জন্য। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, হে মূসা ! তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে কিসে তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য করল ? তিনি বললেন, ওই তো তারা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাড়াতাড়ি আসলাম। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি, তোমার চলে আসার পর সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে" (সূরা তাহা–৮৩–৮৫)। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আ)–কে তাঁর সম্প্রদায়ের সংবাদ জানালেন। মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এই সামিরী লোকটাই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন বাছুরকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করে। আচ্ছা– বলুন তো কে তার ভেতর রূহ সঞ্চার করেছে ? আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন, 'আমিই'।

ইব্ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানা গেছে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে বনী ইস্রাঈলকে বললেন, তোমরা ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে আসবাবপত্র, অলংকার ও পোশাক–আশাক ধার করে লও। তারা ধ্বংস হলে পরে আমি সেগুলো তোমাদেরকেই দান করব। ফিরআওন যখন কিব্তীদেরকে বনী ইস্রাঈলের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আহ্বান করে তখন সে তাদেরকে এই বলেও উত্তেজিত করেছিল যে, ওরা শুধু নিজেরা গিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তোমাদের ধন–সম্পদও নিয়ে গেছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সামিরীর পূর্বপুরুষগণ ছিল বাজারমা–এর অধিবাসী। সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোক, যারা গরু পূজা করত। গরু পূজার আসক্তি তার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ছিল। বনী ইস্রাঈলের মাঝে সে দৃশ্যতই ইস্লাম গ্রহণ করেছিল। হযরত হারুন (আ) যখন বনী ইস্রাঈলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন এবং মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের কাছে চলে যান, তখন হযরত হারুন (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অলংকারাদি ও ধন–সম্পদ সঙ্গে নিয়ে এসেছ ; এখন সেগুলো থেকে পবিত্র হয়ে যাও। কারণ সেগুলো অপবিত্র। তিনি একটি অগ্নিকুন্ড প্রজ্জ্বলিত করলেন। তারপর বললেন, তোমরা তাদের সবকিছু এই আগুনে নিক্ষেপ কর। তারা তাঁর কথায় সাড়া দিল। যার কাছে যে পরিমাণ সোনাদানা ছিল তা এনে সে আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগল। অবশেষে যখন অলংকারগুলো দ্রবীভূত হয়ে গেল, তখন সামিরী এসে উপস্থিত। সে জিবরাঈল (আ)–এর ঘোড়ার পদচিহ্ন লক্ষ্য করেছিল এবং তা থেকে এক মুঠো ধূলো তুলে রেখেছিল। সে আগুনের কাছে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আমার হাতে যা আছে তা কি এ আগুনে ফেল্ব ? হযরত হারুন (আ) বললেন, হাঁ। তিনি ভেবেছিলেন, তার কাছেও অন্যান্যদের মত কিছু সোনাদানা থেকে থাকবে। সামিরী তার ধূলা আগুনে নিক্ষেপ করল এবং বলল, হয়ে যাও এখন একটি সত্যিকার বাছুর যে হাম্বা হাম্বা রবে ডাক্বে। বস্তুতঃ এটা ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হতে এক পরীক্ষা। কাজেই বাছুর বের হয়ে আসল। সামিরী বলল, এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্। ব্যস তারা নিষ্ঠার সাথে তার পূজায় লেগে গেল এবং তাকে এত বেশী ভালবাসল যে,

ইতিপূর্বে আর কোন বস্তুকে তার মত ভালবাসেনি। আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করলেন, فَنَسِيَ অর্থাৎ সামিরী এতদিন যে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা পরিত্যাগ করল। أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا "তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না" (তোয়াহা–৮৯)।

সামিরীর নাম ছিল মূসা ইব্‌ন যাফার। ঘটনাক্রমে সে মিসরে এসে পড়ে এবং বনী ইস্‌রাঈলের সাথে মিশে যায়।

হযরত হারূন (আ) বনী ইসরাঈলের অবস্থা দেখে বললেন, يٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَأَطِيْعُوْا أَمْرِيْ "হে আমার সম্প্রদায় ! এর দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়। কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল" (তোয়াহা–৯০)। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। তারা বলল, قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسٰى "আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত হব না" (তোয়াহা–৯১)।

হযরত হারূন (আ) তাঁর অনুসারী মুসলিমদের নিয়ে থাকলেন, যারা বিভ্রান্তির শিকার হয়নি। অপরদিকে বাছুর পূজারীরাও তাদের পূজায় লিপ্ত থাকল। হযরত হারূন (আ) তাঁর অনুসারী মুসলিমদের নিয়ে আর সম্মুখে অগ্রসর হলেন না। তাঁর ভয় ছিল হয়ত মূসা (আ) তাঁকে বলবেন যে, তুমি বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার নির্দেশ পালনে যত্নবান হওনি। বস্তুত তিনি মূসা (আ)–কে অত্যধিক ভয় করতেন এবং তিনি তাঁর খুবই অনুগত ছিলেন।

হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন ফিরআওনের কবল হতে বনী ইস্‌রাঈলকে নিষ্কৃতি দিলেন এবং ফিরআওন ও তার বাহিনীকে করলেন নিমজ্জিত, তখন মূসা (আ) তাঁর ভাই হারূন (আ)–কে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না। তারপর যখন তিনি যাত্রা করলেন, আল্লাহ্‌র সাক্ষাত বাসনায় আনন্দিত মনে অগ্রসর হলেন। তিনি জানতেন, গোলাম তার মনিবের কাজে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারলে এবং যথা শীঘ্র তাঁর নিকট পৌঁছলে মনিব সন্তুষ্ট হন।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, বনী ইস্‌রাঈল যখন মিসর হতে বের হয় তখন ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে অলংকারাদি ও পোশাক–আশাক ধার করে এনেছিল। হযরত হারূন (আ) তাদেরকে বললেন, এসব অলংকার ও বস্ত্র তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা আগুন জ্বালো এবং তাতে সবগুলো নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দাও। সুতরাং তারা আগুন জ্বালাল। সামিরী নামক লোকটি হযরত জিব্‌রীল (আ)–এর ঘোড়ার পদচিহ্নে বিশেষ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আর হযরত জিব্‌রাঈল (আ) একটি মাদি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। ঐ সময় সামিরী তার পদচিহ্ন হতে এক মুঠো ধূলো তুলে রেখেছিল। ধূলোগুলো তার

হাতেই ছিল। মূসা (আ)–এর সম্প্রদায় যখন অলংকারগুলো আগুনে ফেলে তখন সেও উক্ত ধূলো সেখানে নিক্ষেপ করে। সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা একটি সোনার বাছুর গড়ে দেন। বাছুরটির ভেতরে হাওয়া ঢুকে মুখ দিয়ে হাম্বা হাম্বা রব বেরুতে থাকে। তারা জিজ্ঞেস করল, এটা কি ? পাপিষ্ঠ সামিরী বলল, هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى "এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্।" ইব্ন যায়দ এ আয়াত থেকে حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى 'যতক্ষণ না আমাদের নিকট মূসা ফিরে আসে' (তাহা ৮৮–৯১) পর্যন্ত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, মূসা (আ) প্রতিশ্রুত স্থানে পৌঁছলে আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى 'হে মূসা ! তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে দ্রুত আসতে তোমাকে কিসে বাধ্য করল ?" (তাহা–৮৩)। তিনি বললেন, هُمْ اُولَآءِ عَلٰى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى "সে বলল, ওই তো তারা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক ! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসলাম তুমি সন্তুষ্ট হবে এজন্যে" (তাহা–৮৪)। অতঃপর ইব্ন যায়দ (র) اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ (তবে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে ?" তাহা –৮৬) পর্যন্ত পাঠ করলেন।

হযরত মুজাহিদ (র) ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, العجل অর্থ গো–শাবক। বনী ইস্রাঈল ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে অলংকারাদি ধার করে এনেছিল। হযরত হারূন (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা অলংকারগুলো বের কর এবং তা হতে পবিত্র হও। তোমরা ওগুলো জ্বালিয়ে দাও। সামিরী হযরত জিব্‌রাঈল (আ)–এর ঘোড়ার পদচিহ্ন হতে একমুঠো ধূলো রেখে দিয়েছিল। সে ধূলোগুলো অলংকারে নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে একটা বাছুর প্রস্তুত হয়ে গেল। তার একটা এমন পেট ছিল, যাতে বায়ু প্রবেশ করত।

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাছুরটিকে العجل (ত্বরা) নাম দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে, তারা তাড়াতাড়ি করে হযরত মূসা (আ)–এর ফিরে আসার অপেক্ষা না করেই বাছুরটিকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করেছিল। হযরত মুজাহিদ (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ –এর ব্যাখ্যা

এর অর্থ তোমরা ইবাদতকে অপাত্রে রেখেছ। কেননা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারুর জন্য ইবাদত করা উচিৎ নয়। তোমরা অন্যায়ভাবে গো–বৎসের ইবাদত করেছ। ইবাদতকে ব্যবহার করেছ অনুপযুক্ত স্থানে। ইতিপূর্বে অপর এক জায়গায় বলে এসেছি যে, যুলুম্–এর প্রকৃত অর্থ কোন বস্তুকে অপাত্রে স্থাপন করা। কাজেই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(৫২) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(৫২) তারপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

অর্থাৎ তোমরা গো–শাবককে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেইনি।

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ –এর ব্যাখ্যায় বলে "তোমরা গো–বৎসকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম।" لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ অর্থাৎ যাতে তোমরা শোকর কর। এস্থলে لَعَلَّ শব্দটি كَيْ (যেন) অর্থে ব্যবহৃত। ইতিপূর্বে বলে এসে যে, لَعَلَّ –এর এক অর্থ كَيْ অর্থাৎ 'যেন'। এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড় যে, তোমরা গো–শাবককে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যাতে এ ক্ষ প্রদর্শনের উপর তোমরা শোকর কর। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির নিকট ক্ষমা শোকরকে ওয়াজিব ক দেয়।

<u>প্রথম খন্ড শেষ</u>



ইফাবা. (উ.) ১৯৮৬–৮৭/অঃসঃ/৪৩৬৭–৫২৫০